বন কেটে বসত

মনোজ বসু

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রীমান চিত্তরঞ্জন ও শ্রীমতী রমাকে

৯ শ্রাবণ, ১৩৬৮

এই লেখকের

উপন্যাস

রূপবতী
মানুষ নামক জন্তু
রক্তের বদলে রক্ত
মানুষ গড়ার কারিগর
আগস্ট, ১৯৪২
এক বিহঙ্গী
ওগো বধূ সুন্দরী
জলজঙ্গল
নবীন যাত্রা
বকুল
বাঁশের কেল্লা
বৃষ্টি, বৃষ্টি!
ভুলি নাই
শত্রুপক্ষের মেয়ে
সবুজ চিঠি
সৈনিক
আমার ফাঁসি হল
বন কেটে বসত

ভ্রমণ

চীন দেখে এলাম ১ম
ঐ ২য়
সোবিয়েতের দেশে দেশে
পথ চলি
নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ

গল্প

মায়াকন্যা
গল্প-পঞ্চাশৎ
গল্প-সংগ্রহ (১ম খণ্ড)
একদা নিশীথকালে
কাচের আকাশ
কিংশুক
কুঙ্কুম
খদ্যোত
দেবী কিশোরী
নরবাঁধ
পৃথিবী কাদের
মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

নাটক

ডম্বরু ডাক্তার
চম্পক
নূতন প্রভাত
প্লাবন
বিপর্যয়
বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং
রাখিবন্ধন
শেষ লগ্ন
ডাকবাংলো (দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যায়িত)

বন কেটে বসত

এক

ফুটো ঘর। বৃষ্টির ফোঁটা না পড়তে ঘরের মধ্যে প্যাচপেচে কাদা। মেজ শালা নগেনশশী এসেছে এক বৃষ্টির দিনে। শ্বশুরবাড়ি গ্রামের ভিতরে—ভিন্ন পাড়ায়। তাদের অবস্থা ভাল। কুটুম্ব হওয়া সত্ত্বেও তাই সে কথা শোনাতে ছাড়ে না।

গরুর গোয়ালও যে এমনধারা হয় না। কি রকম করে থাক তোমরা ?

গগন বলে, তালুকমুলুক দালানকোঠা দেখে দিলে না কেন বোনের বিয়ে ?

পুরুষমানুষ তায় পেটে বিদ্যে আছে—এই সব দেখে দিয়েছিলাম। আমরা দিই নি, বাবা দিয়ে গেছেন। বাইরে থেকে খুঁটে আনতে না পারলে রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়। একটুখানি নড়ে বসবে না তো ভগবান হাত-পা দিয়েছেন কি জন্যে ?

ব্যস, ভাই ঐ যে খেই ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল, বউয়ের মুখে উঠতে বসতে সেই ধুয়া। ভাল ঘরবাড়ি চাই, ভাল পোশাক-আশাক, ভাল খাওয়াদাওয়া। বাচ্চা ছেলেপুলে নেই এখন ঘরে, কিন্তু আজকে না থাক আসবেই দু-দিন পরে। আর তোমার ঐ বোন—ওর পরিণাম ভাবতে হবে তো একটা। না, ভাইয়ের বাড়ি দাসীবৃত্তি-চেড়ীবৃত্তি করে চিরকাল এমনি কাটিবে ?

গগনের ছোটবোন চারুবালা। বিধাতাপুরুষ চেহারা দিয়েছেন, কিন্তু কপালে সুখ দিলেন না। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতে কপাল পুড়িয়ে ভাইয়ের বাড়ি ফিরে এল। তখন না হয় বোঝবার বয়স ছিল না—শ্বশুরবাড়ির জেলখানা থেকে ছাড় পেয়ে মহাস্ফূর্তিতে ফিরেছিল। কিন্তু এখন ভরভরন্ত যৌবনে সমস্ত বুঝে-সমঝেও সেই ছেলেমানুষের ভাব। কড়ে-রাঁড়ী বলে খাওয়ার বাছবিচার নেই—খাওয়া

নিত্যদিন কে দেখতে যায় রান্নাঘরে ঢুকে ? কিন্তু পর-রুচি পরনে। শঙ্খ-পাড় ধুতি পরে চারুবালা, সোনার পাতে বাঁধানো দু-গাছা শিঙের চুড়ি দু-হাতে। বিধবার সাজসজ্জা যা-কিছু এই।

আর একটা মেয়ে ছিল এমনি কড়ে রাঁড়ী। পালবাড়ির পদীবালা। ক্রোশ দেড়েক দূরের এক গাঁয়ে অম্বিক নামে একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বরের বয়স তখন পঞ্চাশের উপর, পদীবালার দশ। কিন্তু উপায় কি ? ওদের সমাজে মবলগ পণ লাগে বিয়ে করতে। কন্যাপক্ষকে দিতে হয়। হাটে হাটে হাঁড়িকলসি বেচে যা রোজগার—সংসার-খরচের পর ক'টা পয়সাই বা জমানো যায় বিয়ের জন্য ? তবু তো কনের বয়স কম বলে খাঁইও অনেক কম। ডাগর হলে পণের অঙ্ক শুনে ছিটকে পড়তে হত।

দশ বছুরে মেয়ে—অম্বিক ভেবেছিল, আর পাঁচটা ছ'টা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। পঞ্চাশ বছর সবুর করেছে, আর এই সামান্য সময় পারবে না ? হিসাবে ভুল ছিল না, বউ ক'টা বছরের মধ্যে ডাগরডোগর হয়ে উঠল। রোগা ডিগডিগে মেয়েটাকে গড়ে পিটে বিধাতা যেন নতুন করে সৃষ্টি করলেন। যে দেখে তার নজর ফেরে না। অম্বিক তখন নেই। সারা শীতকাল হাঁপানির টান টানত, টানের মধ্যে একদিন চোখ উলটে পড়ল।

এই চারুরই গতিক। সকলে হায়-হায় করত। শ্বশুরবাড়ির লোক একদিন গরুর গাড়ি করে পদীবালাকে ভাইয়ের বাড়ি তুলে দিয়ে গেল। কিন্তু এখানেও টিকতে পারে না। লোকে কুনজর দেয়। সংসারের ভারবোঝা ননদকে ভাজও দু চক্ষে দেখতে পারে না। ঝগড়ার চোটে পালবাড়ির ঘরের চালে কাক বসে না। তিতবিরক্ত হয়ে পদীবালা আবার বেরুল কোন এক গাঁয়ে দূরসম্পর্কের আত্মীয়-বাড়ি।

বছর পাঁচ-ছয় পরে এবারে পদীবালা ক'দিন ভাইয়ের বাড়ি এসেছিল। আরে সর্বনাশ, পদীবালা কী বলছ—নাম পালটে গেছে, পদ্মিনী। ঝকমকে চেহারা—কাল মেয়ের রং ফেটে পড়ছে। পরিচ্ছন্ন

ছিমছাম—বড়ঘরের মেয়ে বললে নিতান্ত বেমানান হবে না। আর কী খাতিরটা করছে সেই কলহপর ভাজ-ঠাকরুন! থালায় ভাত বেড়ে পাশে বাটি সাজিয়ে সর্বক্ষণ পাখা করছে পদ্মিনীর সামনে বসে। করবে না? ভাজের জন্য কল্কাপাড় শাড়ি নিয়ে এসেছে, ভাইপোর মুখ দেখল সোনার পুঁটে দিয়ে—

নাকি, সে শহরের কোন হাসপাতালে নার্স হয়ে আছে। মাস গেলে রমারম টাকা। সে শহর কোথায় কে জানে? কিন্তু টাকার মানুষ হয়ে এসেছে, সেটা চোখে দেখা গেল।

সেই থেকে গগন আর বিনোদিনী বলাবলি করে, চারুর এমনি কোন ব্যবস্থা হয় না! চারুবালাও নিশ্চয় মনে মনে ভাবছে তাই। পদীবালার চেয়ে সে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে। সাহস-হিম্মত আছে। বড় হরপের বাংলা বই বানান করে করে দু-পাতা চার-পাতা পড়ে যেতে পারে। কিসে কম?

আবার এক কাণ্ড হল। মিত্তিরদের বাগের পুকুরে চারুবালা চান করতে নেমেছে। চারিদিকে গাছপালা, রোদ পড়ে না, জলটা খুব ঠাণ্ডা থাকে। সেই জন্য আসে এত দূর। শিস দিচ্ছে ওদিককার গাছের উপর থেকে। ছাতারে-পাখীর আওয়াজের মতো। চারু চকিতে একবার দেখে নেয়। না, কিছুই নয়। গলা ডুবিয়ে কাপড়ের প্রান্ত জলে ভাসিয়ে থাবা দিয়ে দিয়ে কাচল। ছাতারে-পাখী আরও ক'বার ডেকেছে। ভিজে কাপড় ও গামছা গায়ের উপর জড়িয়ে সপসপ করতে করতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ—ওরে বাবা, খুন করল রে! চারু টিপিটিপি এসে চষা-ক্ষেতের ঢিল কুড়িয়ে দমাদম ছুড়ছে গাছের মাথায়। দু-চারটে লেগেছেও ছোঁড়াটার গায়ে—আর্তনাদ করতে করতে সে গাছ থেকে নামল। চেঁচামেচিতে মানুষজন এসে পড়ে। চারুবালা কোমরে আঁচল জড়িয়ে মল্লবেশে দাঁড়িয়ে। হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। ছোঁড়া চোঁচা দৌড় দিল। যাচ্ছে-তাই করছে সকলে তাকে। চারুবালাকেও ছাড়ে না: ডবকা ছুঁড়ী—তোরই বা আক্কেলটা কি! একা একা

বাপের পুকুরে এসেছিস, পাঁচ-সাত মরদে মিলে মুখে কাপড় পুরে যদি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেত!

এর পরে বিনি-বউ যেন ক্ষেপে গেল। পৈতৃক ভিটাবাড়ির উপর নির্বিরোধী মানুষটা শান্তিতে রয়েছে, নিতান্তই অসহ্য যেন তার। তার এবং চারুরও। ননদ-ভাজ একদলে। গগনকে পথে বের না করে ছাড়বে না, এই যেন পণ করে বসেছেঃ বেরিয়ে পড়। শহরে-বাজারে টাকা উড়ে বেড়ায়, চাকরি-বাকরি করে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে এস। বোনের একটা গতি কর। মাথার উপরে এমন দায়—দাউ-দাউ করে মাথায় তো আগুন জ্বলবার কথা। সে মানুষ ভুড়ুক-ভুড়ুক করে হুঁকো টানে কেমনে দাওয়ায় নিশ্চিন্ত বসে?

গড়িমসি করে চলে তবু কিছুকাল। শেষটায় একদিন ছুত্তোর বলে কাঁধে চাদর বগলে ছাতা নিয়ে গগন বেরুল। অজানা দেশ নয়, শহর-বাজার নয়—খবরাখবর নিয়েই বেরিয়েছে। চার ক্রোশ দূরের গাঁয়ে। সেখানকার ভবসিন্ধু গণ ওকালতি করে পয়সা করেছেন, পৈতৃক বাড়িতে দালান দিচ্ছেন।

গগন লেখাপড়া জানে বলে সুরাহা হয়ে গেল। সে হল সরকার। মিস্ত্রি-মজুরের হাজিরা রাখে, মালমশলার ব্যবস্থা করে। সদ্য গেঁথে-তোলা একটা কামরার ভিতর হাতবাক্স সহ আস্তানা করে নিয়েছে। গাঁথাই হয়েছে শুধু, মাটির মেজে, দেয়ালে চুনবালির জমাট ধরানো হয় নি—রাঙা রাঙা ইটের দাঁত বেরুনো। হোক গে, পাকা-দালানে তবু জীবনে এই প্রথম বসবাস। সকালে রোদ না ওঠা পর্যন্ত গড়ায়। ছাতের দিকে চেয়ে মনে মনে তারিফ করেঃ বাঃ বাঃ, বৃষ্টি-বাদলায় ভুবন রসাতলে গেলেও এক ফোঁটা জল গায়ে লাগবে না। বছর বছর খড় দেওয়ার হাঙ্গামা নেই। একবার গড়ে তুলতে পারলে জীবনভোর নিশ্চিন্ত। এক জীবনই নয় শুধু, নাতিপুতি তস্য নাতি—পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে আরামের বসত।

মাসান্তে মাইনের টাকা পেলে খোরাকির জন্য সামান্য কিছু রেখে

বিনোদিনীর কাছে দিয়ে আসে। ননদ-ভাজে মিলে চালাচ্ছে ওরা বেশ। হিসেব আছে। ঘর ছেয়ে ফেলেছে—চালের নতুন খড় সোনার মতন ঝিকমিক করে। গগনকে, দেখা যাচ্ছে, সংসারে কোন দরকার নেই—তার রোজগারের টাকাটা পেয়ে গেলেই হল। গগন বিনে ওদের দিব্যি চলে যায়।

বাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেল। শানাই বাজল একদিন, দোরগোড়ায় কলাগাছ-মঙ্গলঘট বসল, পুজো-আচ্চা হল। গণবাবুরা পৈতৃক মাটির-ঘর ছেড়ে পাকা-দালানে উঠলেন। গগনের মাইনে-পত্র চুকিয়ে বখশিশ বাবদে আরও পাঁচ টাকা ধরে দিলেন। বুড়ো বাবুকে গগন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু, এখনই কেন? ভোজ-টোজ খেয়ে তার পরে চলে যেও।

পাকা-দালানে বসবাসের মেয়াদ অতএব আরও ক'ঘণ্টা বাড়ল। খাওয়া শেষ হতে রাত দেড়টা দুটো। তখন আর কোথায় যাবে? বাকি রাতটুকু— ভিতরে জায়গা হল না আজ, বাড়ির লোক ও আত্মীয়-কুটুম্বরা এসে পড়েছেন—গগন একটা মাদুর পেতে নিল রোয়াকের উপর। মেঘ উঠল আকাশে, ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি হল না, বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু বিষম মশা। কোঁচার কাপড় খুলে গায়ে চাপিয়ে দিল, তাতে যত দূর ঠেকায়।

বাড়ি যাওয়ার আগে গঞ্জটা ঘুরে বউয়ের জন্য মন্দির পাড় শাড়ি আর বোনের জন্য ভেলভেট পাড় ধুতি কিনে নিল। যেন আকাশের চাঁদ উঠানে এসে পড়েছে, এমনি ভাব দেখাচ্ছে বিনোদিনী। চাকরি খতম—কথাটা বলি বলি করেও বলা যায় না। জানে, খাতিরযত্ন উবে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। দু-পাঁচ দিনের ছুটিতে এসেছে, এমনি ভাব দেখাচ্ছে। হাতে পয়সা থাকতে থাকতে একদিন নগেনশশীকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এল। পকেটে টাকা ঝনঝনিয়ে হাটে গিয়ে শোলমাছ কেনে। নগেনও দেখি আর এক মানুষ—হেসে হেসে কথা বলে, দু-পাঁচটা কথার ফাঁকে মিষ্টি সুরে জামাইবাবু ডেকে নেয় একবার।

সেই তো দাদা সেই তো দিদি তেঁতুলতলায় ঘর—
তখন কেন দিতে দিদি হাতে চেপে সর ?

গগন নগেনের সঙ্গে সমান তালে হাসে, আর নিশ্বাস চেপে নেয়। টের না পেয়ে যায় যে চাকরিটা নেই।

কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গিয়েও ছুটি ফুরোয় না, তখন আর কিছু চাপা থাকে না। গণবাবুদের গ্রামও অঞ্চল-ছাড়া নয়। একটা বর্ষা খেয়ে চালের সোনার বরণ খড় ইতিমধ্যে কটকটে কালো। ননদ-ভাজের পরনের কাপড় কোন্ কালে ছিঁড়ে গেছে। বাইরের আমদানী নগদ টাকা একবার ওরা হাতে পেয়েছে, বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে—আর শুনবে না। আবার লেগেছে: বাইরে যাও, রুজিরোজগার করে আন। পাড়াশুদ্ধ গ্রামশুদ্ধ লেগে গেল। শ্বশুরবাড়ির শুধুমাত্র নগেনশশী নয়— শাশুড়ী, তিন শালা, শালাজ, তাদের ছেলেপুলেরা অবধি এসে টিপ্পনী কাটে। কাছাকাছি বিয়ে করতে নেই—গগন ঠেকে শিখছে। বিনি-বউ তো মারমুখী হয়ে ওঠে এক এক সময়: জোয়ানযুবো মানুষ—অক্ষম অথর্ব নও। মেয়েমানষের আঁচল ধরে থাকতে লজ্জা করে না তোমার ?

কাজ বললেই পাওয়া যায় কোথা ? শহরে গেলেই চাকরি—কুচো-চিংড়ির মতো চাকরির ভাগা দিয়ে রাখে—কার কাছে শোন যত বাজে কথা ! কত দিকে খোঁজখবর নিচ্ছি, জান না তো !

এর মধ্যে আবার চারু এসে পড়ে। ভাইয়ে-ভাজে কথা, তার মধ্যে ছোট বোন। বলে, বেরিয়ে পড় দাদা। কত বড় দুনিয়া, মানুষ কাঁহা-কাঁহা মুলুক করে বেড়াচ্ছে। কাজ পাচ্ছেও তো মানুষে —চাকরি জুটিয়ে কে তোমায় ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাবে ?

গগন মরীয়া হল অবশেষে। সবাই শত্রু। বউ পরের মেয়ে, তার কথা ধরি নে—মায়ের পেটের বোনটা অবধি। দেশছাড়া করবার জন্য যারা কোমর বেঁধে লেগেছে, সে-ও তাদের মুখদর্শন করতে চায় না। যাবেই সে চলে।

পাঁজি দেখাতে গেল আচায্যি ঠাকুরের বাড়ি। উৎকৃষ্ট দিন হওয়া চাই। রুজিরোজগারের চেষ্টায় অঞ্চলের বাইরে একেবারে অজানা বিদেশে যাচ্ছে, গগনের কোন পুরুষে যা করে নি। তখন ক্ষেত-ভরা ধান, বিল-ভরা মাছ, গোয়াল-ভরা দুধাল গাইগরু। হায় রে সেকাল—ভাবেও নি পিতৃপুরুষেরা, কোন এক কালে এ বংশের মানুষের ঘর ছেড়ে বেরুতে হবে। সেই দুরদৃষ্টই যখন হল—অতি-উৎকৃষ্ট রকমের দিনক্ষণ বেছে দিন ঠাকুর মশায়, অচিরে যাতে বড়লোক হয়ে টাকার আণ্ডিল নিয়ে আবার বাড়ি ফিরে পায়ের উপর পা রেখে কাটাতে পারি বাকি জীবন।

নিখুঁত সর্বাঙ্গসুন্দর দিন বছরের মধ্যে ক'টাই বা। তা হোক, গগনের খুব তাড়া নেই। একটা দুটো মাস দেরিই যদি হয়, কী করা যাবে! দুনিয়ার কে চায় অদিনে অক্ষণে বেরিয়ে মারা পড়তে? অবশেষে মলমাস ত্র্যহস্পর্শ মঘা অশ্লেষা সংক্রান্তি পহেলা ইত্যাদি বাদ দিয়ে যোগিনীর অবস্থান ও তিথিনক্ষত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব-পত্র করে দিন একটা সত্যিই বেছে দিলেন আচায্যি ঠাকুর। দিন নয়, রাত্রি—সন্ধ্যার পরে সাতটা-পাঁচ থেকে আটটা-বিয়াল্লিশ অবধি মহেন্দ্রযোগ। তিথিটা ত্রয়োদশীও বটে। ঐ সময়ের মধ্যে যাত্রা করতে হবে। মিত্তিরবাড়ি দেয়াল-ঘড়িতে টং-টং করে সাতটা বাজলে চারু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে: এইবার, এইবার—খারাপ সময় পড়ে যাবে এর পরে। হাতের মুঠোয় বেলপাতা নাও দাদা। দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা—

দুর্গা নাম স্মরণ করে গগন চৌকাঠ পার হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজায় একঘটি জল, আমের পল্লব। মনটা হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, চোখে জল আসে। সত্যিকার আপন জনেরা স্বর্গে চলে গেছেন—মা নেই, বাপ নেই। বোনও মনে মনে নিজেরটাই ভাবছে। পদীবালা থেকে আবার এক পদ্মিনী হবে—ভাই সেই ধান্দায় বেরিয়ে পড়ুক। বিদেশে দূর করে দেবার জন্য একমাত্র বোন অবধি কোমর বেঁধেছে। হায় সংসার, হায় রে টাকা!

রাত্রিবেলা যায় আর কোথায়! তিন ক্রোশ এখান থেকে পাকা রাস্তা, সেই রাস্তায় বাস চলাচল করে। ভোর থাকতে রওনা হয়ে পয়লা বাস ধরবে। বাসে সদর অবধি। সদর থেকে তার পরে যে জায়গা কপালে লেখা আছে। যমালয়ও হতে পারে। খুব সম্ভব সেইটাই। দুনিয়ায় টাকাপয়সা সকলের বড়। টাকার জন্যেই তাকে তাড়াচ্ছে। হ্যাঁ, তাড়িয়ে দেওয়া বইকি! মেয়েলোক বলে ওরা দিব্যি ঘরবসত করবে, পুরুষ হয়েছে বলেই তাকে উঞ্ছবৃত্তি করতে হবে এদেশ-সেদেশ। এই যাচ্ছে, আর আসবে না কোন দিন। তাই হোক ভগবান, ফিরে যেন না আসতে হয়।

যাত্রা করে আর ঘরের মধ্যে ঢোকা চলবে না। তাহলে যাত্রা ভেঙে গেল। রাতটুকুর মতো গগন দাওয়ায় শুয়েছে। ঘুম আসে না, শুয়ে পড়ে আইঢাই করে। আকাশ-পাতাল ভাবে। কমবয়সী দু-জন মেয়েলোক—বিনি-বউয়ের বয়স বেশী নয়, চারু তো আরও ছেলেমানুষ—নিঃসহায় পড়ে থাকছে। নগেনশশী বারংবার বলেছে, কী জন্যে এখানে পড়ে থাকবে, আমাদের বাড়ি গিয়ে উঠুক যত দিন না তুমি ফিরে আসছ। বিনি চারু দু-জনেই—চারুও বোন আমাদের—বোনদের দু-বেলা চাট্টি ভাত দিতে পারব, তার জন্য আটকাবে না।

কিন্তু চারুর বিষম জেদ: পাড়ায় এত মানুষ রয়েছে—একা আমরা কিসে? ভরতের মা বুড়ী থাকে, তার উপর ভরত এসে রাত্রিবেলা শোবে। অন্য মানুষ লাগবে না। দরকার বুঝি, তখন ও-বাড়ি যাব।

নগেনের আড়ালে বলে, বউদি না হয় যাক চলে। বড়মানুষের বোন—এখানে পড়ে পড়ে কষ্ট করবে কেন? রাত্রিবেলা আমি মিত্তিরবাড়ি গিয়ে শোব। প্রাণ যায় সে-ও স্বীকার, ভাইয়ের শ্বশুর-বাড়ি উঠব না। নগনা-খোঁড়া লোক সুবিধের নয়।

মোটের উপর এ সম্পর্কে পাকাপাকি কিছু হল না। গগন বেশী কিছু বলে না। বলতে গেলে ধরে নেবে, কোন এক ছুতো

খুঁজে যাওয়াটা পণ্ড করার তালে আছে। এই নিয়ে বচন ঝাড়বে। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী রক্ষাকালী-মায়ের পাদপদ্মে ভরসা করে রেখে যাচ্ছে, যা হবার হোক গে।

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। আঃ উঃ—করে বার কয়েক। মাগো—বলে অস্ফুট একটু আর্তনাদ। ঘরের মধ্যে বিনোদিনীও ঘুমোয় নি, তক্তাপোশে নড়াচড়ার শব্দে বোঝা যায়। বিনি বলে, কি হল ?

কিছু না, একটু জল দিতে পার ?

ফেরোয় জল ভরে নিয়ে বিনি বাইরে এল। ঢক-ঢক করে গগন সমস্তটা জল টাকরায় ঢেলে দেয়। জল খেয়ে মুখ মোছে কাপড়ের প্রান্তে। নিশিরাত্রে চাঁদ উঠেছে, নারিকেলগাছের ছায়া দীর্ঘ হয়ে পড়েছে উঠানে। বউকে বলে, বসো না একটুখানি, বসে পড় এই মাদুরে। যাত্রা নষ্ট হবে না তুমি একটুখানি বসলে।

বিনি বলে, ঘুম ধরেছে, বসতে পারছি নে।

গগন সকাতরে বলে, বসো, কাল আর এসব কিছু বলতে যাব না।

বসে পড়ল বউ। এত করে বলছে, না বসে পারে কেমন করে? কথাবার্তা কিছু নয়। বিয়ের পর এই পাঁচ বছরে এত কথা বলেছে যে মাঝরাতে ঘুম কামাই করে বলবার মতন কিছু নেই। কথা বলে আর মায়া বাড়াবে না। অবহেলাই দেখাবে বেশী করে, তাতে যদি পৌরুষে লাগে।

চুপচাপ একটুখানি বসে হাই তুলে বিনি-বউ উঠে দাঁড়াল: শুই গে।

ঘরে ঢুকে বিনি দুয়োর বন্ধ করছে। গগন বলে, খিল দিও না গো—

বিনি ব্যঙ্গের সুরে বলে, ভারি যে মরদ! ভূতের ভয়?

এবারে গগন গর্জন করে ওঠে: দাও, দরজা দাও তুমি। খিল আঁট।

ভালমন্দ জবাব না দিয়ে বিনি-বউ তক্তাপোশে উঠল। গগন বলে, দিলে না খিল ? খিল না দাও তো দিব্যি-দিলেশা দেব।

বিনোদিনী বলে, চেঁচিও না। ও-ঘরে চারু আর ভরতের মা। ওরা শুনতে পাবে।

না, মরদের খোঁটা যখন দিয়েছ, খিল তোমায় দিতেই হবে। চলে যাচ্ছি যখন তখন আর কিসের লাজ-ভয়, কিসের মায়াদয়া ?

ঘরের ভিতরে সাড়াশব্দ নেই।

গগন বলে, ঘুমুলে ছাড়ব না। ঘরে ঢুকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তুলে দরজা দেওয়াব।

এবারে জবাব আসে: ঐ ভয়েই তো খিল এঁটে দিচ্ছিলাম। খিল না দিলে ঢুকে পড় আবার যদি। তা তুমি পার, যাত্রাটা ভেঙে যায় তাহলে। রক্ষে পাও।

চেহারা মিষ্টি-মিষ্টি হলে কি হয়, বিনির কথায় বিষম ধার। ঘরে গিয়ে আবার ওর আঁচলের তলে যাব, সেই জন্যে নাকি খিল আঁটছিল। চলে যাবার ক্ষণে এত বড় কথাটা মুখে আটকাল না বউর।

গগন বলে, দাও বলছি দুয়োরে খিল। না দিলেও ও-চৌকাঠ এ জন্মে আর মাড়াচ্ছি নে। আজ নয়, কোন দিন নয়। কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে মরলেও নয়। গাঁড়ারের গোঁ, আর মরদের গোঁ।

কান্নাকাটি ও মাথা খোঁড়াখুঁড়ির ভবিষ্যতে যত বড় আশঙ্কাই থাকুক, আপাতত ও-তরফ নিঃশব্দ। সংসারের নিকুচি করেছে!

আরও খানিকটা এপাশ-ওপাশ করে গগন উঠে বসল। তামাকের পিপাসা পেয়েছে। তামাকের ভাঁড় দাওয়ায়। গোয়ালে মশা তাড়ানোর জন্য সাঁজালের আগুনও আছে। কিন্তু হুঁকো-কলকে ঘরের মধ্যে। যাত্রা করবার মুখে এক ছিলিম খেয়েছিল তক্তাপোশের উপর মৌজ করে বসে ; খাওয়া অন্তে তক্তাপোশের পায়ার পাশে বেড়ায় ঠেসান দিয়ে রেখেছিল। হুঁকো বিহনে হাতের চেটোয় কলকে বসিয়ে অবশ্য টানা চলে। কিন্তু কলকেরও

...অনেক-অনেক ঘুরে দেখল, আতারক্ত কলকে যদি পড়ে থাকে কোথাও। নেই। পাষণ্ডী বিনিকে ডেকে তুলে সে কলকে চাইবে না, প্রাণ গেলেও না। দরকার নেই তামাক খাওয়ার।

উঠানের পূব দিকে পুকুর। ভিটের মাটি তুলে তুলে পুকুর মতো হয়েছে। খেজুরগুঁড়ির ঘাট, টোকা-শেওলায় জল ঢাকা। ঘাটের সামনেটায় তিনখানা বাঁশ তিন পাশে বেঁধে শেওলা আটকানো। ঘাটে নেমে গগন মাথায় ঘাড়ে আচ্ছা করে জলের ঝাপটা দিল। দেহ শীতল হোক, ঘুম আসুক। ঘুম, ঘুম, ঘুম। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগের রাতে দাওয়ার উপর মনের মতন একখানা ঘুম দেবে। ছুনিয়ার কাউকে সে চায় না, কারো জন্য কোন মাথাব্যথা নেই...

আদিম মানুষ গোষ্ঠী ছেড়ে বেরুল—সে-ও রাত কাটিয়েছিল এমনি বিনিদ্র ভাবে? খাদ্য মেলে না, বেরুতেই হল। যে ভূমিটুকু জানার মধ্যে, তার বাইরের চতুর্দিক রহস্যময়। কত ভাবনা আর বেদনা চেনা গণ্ডি ছাড়তে! গগনও চেনে না তার পরিচিত এই অঞ্চলটার বাইরে কী আছে। মানুষ থাকে, না জন্তু-জানোয়ার? হয়তো বা আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়ে, পাতাল থেকে তুফান ওঠে। ভূমিকম্পে ফেটে চৌচির হবে যে জায়গায় সে পা ফেলবে। কী যে হবে, ঘরে বসে কে সঠিক বলতে পারে?

আবার শুয়ে পড়ে ঘুমের চেষ্টা করছে। একটু যদি তন্দ্রার ভাব এসেছে, কত রকম স্বপ্ন! যেন বোধন-গাছ থেকে দৈত্য নেমে এসে টুঁটি ধরে উঁচু করে তুলেছে তাকে। ছুঁড়ে দিচ্ছে দূর-দূরান্তরে। আর একটু হলে চেঁচিয়ে উঠত—ভাগ্যিস তত দূর হয় নি—ঘুম ভেঙে বিনি তা হলে আবার কোন এক ক্ষুরধার উক্তি করে বসত। কানের ভিতর রি-রি করে জ্বলত অবশিষ্ট রাত্রিটুকু।

না—ঘুমুলে যদি এমনি স্বপ্ন আসে, তার চেয়ে জেগে থাকাই ভাল। কতই বা রাত আছে, জেগে বসেই রাতটুকু কাটাবে। হাওয়া দিয়েছে, শীত ধরে উঠল। একটা কাঁথা-টাঁথা হলে ভাল

হয়। কিন্তু চাওয়ার জো নেই—মনে ভাববে, ছুতো করে বিনিকে বাইরে ডাকছি।

মানুষ না পাখী! কেবলই ওড়া, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না।

জেগে রয়েছে, তবে একটা-তুটো কথা না বলে পারে কি করে! মনের চিন্তা কথায় ফুটে উঠেছে। গগন কথা বলে বলে ভাবছে।

পাখী বই কি! সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যে, রাত তুপুরে এই দাওয়ার উপর।

খিল-খিল করে হাসি ফেটে পড়ল দক্ষিণের ঘর থেকে। চারু হাসছে। জেগে আছে তাহলে চারু? কিংবা এক ঘুম ঘুমিয়ে হয়তো এইমাত্র জেগে উঠল। মায়ের পেটের বোন কিনা—মায়া-দয়া আছে। আর এদিকে আর একজনকে দেখ, গগনকে বাইরে সরিয়ে দিয়ে বড্ড জুত হয়েছে নিরুপদ্রবে ঘুমোনোর।

চারু বলে, দাদা কি বলছ একা-একা?

হাওয়া দিয়েছে, শীত ধরেছে বড্ড। জেগে আছিস যে চারু, ঘুম হচ্ছে না?

চারু বেরিয়ে এল। বলে, ভরতের মা আসে নি—যাত্রা শুনতে গিয়ে আসরেই বুড়ী হয়তো ঘুমিয়ে আছে। একা একা ভয় করছে, তুমি দাদা দক্ষিণের ঘরে যাও। ঘরের মধ্যে শীত করবে না। আমি বউদির সঙ্গে শুয়ে পড়ি।

যুক্তি ভাল। দক্ষিণের ঘরে একজন কারো থাকারও দরকার। গগন গিয়ে শুয়ে পড়ল। ও-ঘরে শুলে যাত্রা ভাঙবে না।

চারু এদিকে ঘুমন্ত বিনোদিনীর গা ঝাঁকাচ্ছে: শুনছ, শিগগির ওঠ বউদি।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বিনি বলে, কি রে?

একবার চল দক্ষিণের ঘরে। ভরতের মা আসে নি। মাচার উপর হাঁড়ি-ভাঁড়গুলো ঢকঢক করছে।

বিনি বলে, ইঁতুর। আমসত্ত্বের গন্ধে ঐ উঁচুতে উঠে পড়েছে। বিড়ালগুলো কোন কাজের নয়।

ইঁদুর কি অন্য-কিছু কেমন করে বলি। হেরিকেন জ্বালতে পারছি নে। দেশলাইটা নিয়ে চল একবার। দেখে আসবে।

আমসত্ত্ব নিয়ে বিনোদিনীরও উদ্বেগ খুব। ঘুম-চোখে হন্তদন্ত হয়ে দক্ষিণের ঘরে ঢুকেছে—পোড়ারমুখী চারু অমনি বাইরে থেকে ঝনাৎ করে দরজায় শিকল তুলে দিল।

কি রে?

চারু খিল-খিল করে হেসে বলে, আমি তোমার তক্তাপোশে আরাম করে শুই গে। রাত দুপুরে হাঁকডাক করতে যেও না। ডেকে সাড়াও পাবে না।

চারু, ওরে বজ্জাত, দুয়োর খোল বলছি—

গগন প্রসন্ন মুখে তড়পাচ্ছে: না, কারো এখানে এসে দরকার নই। বেশ তো আছি। একাই থাকব।

দুই

গগন বেরিয়ে পড়ল। রক্ষাকালীতলা গ্রাম-সীমানায়। জোড়া বট-অশ্বত্থ—মূলবৃক্ষ বটের দু-পাশে অশ্বত্থের দুই প্রকাণ্ড ডাল ভূমির সমান্তরে ঝুরির উপরে ভর দিয়ে আছে। যেন দুই হাতে গ্রাম আগলে রয়েছেন দেবী। গ্রাম ছেড়ে মাঠের রাস্তা এইবার। তার আগে দেবীস্থানে গগন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে: তোমার পায়ে রেখে যাচ্ছি। ফিরে আসি কিনা কে জানে—করুণা রেখো মা-জননী অবলা মেয়েলোক দুটোর উপর।

কোথায় কাজকর্ম, কী কায়দায় যোগাড় হবে—কিছুমাত্র জানা নেই। দুনিয়া এক অথই দরিয়া। সদরে একমাত্র জানা মানুষ ভবসিন্ধু গণ—তাঁর বাসায় গিয়ে উঠল।

একটা কাজকর্ম করে দিন উকিলবাবু। গাঁয়ে পড়ে থেকে চলে না। আপনাকে ছাড়া জানি নে, তাই এসে পড়লাম।

ভবসিন্ধু শুনে বললেন, কাজ কি সস্তা হে? লেখাপড়া জান না, কি কাজ করবে তুমি?

গগন অবাক হয়ে বলে, কী বলেন, জানি তো লেখাপড়া আপনার বাড়িতেই কত লেখাপড়ার কাজ করেছি।

ভবসিন্ধু হাসলেন: বানান করে করে ছুটো বাংলা কথা লিখলেই লেখাপড়া জানা বলে না। কত বি-এ এম-এ ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। উকিলের মুহুরী তা-ও আজকাল ম্যাট্রিক পাশের নীচে নিচ্ছে না।

গ্রামের মধ্যে গগনের খাতির। গোটা গোটা অক্ষরে খাতার পর খাতা সে লিখে যেতে পারে, বাধে না। চিঠি পড়াতে আসে কত লোক। খত হ্যাণ্ডনোট লেখাতে আসে। যখন বয়স খুব কম ছিল, নতুন বিয়ের মেয়েরা প্রেমপত্র লেখাতে আসত গগনের কাছে। কিন্তু কী নির্মম শহুরে বাসিন্দা এঁরা! চিরকালের প্রতিষ্ঠা এক কথায় চুরমার করে দিয়ে ভবসিন্ধু গণ তাকে মূর্খ বলে দিলেন।

তবু কিন্তু আশ্রয় দিলেন বাসায়: এসে যখন পড়েছ দু-চারদিন থেকে চেষ্টাচরিত্র করে দেখ। আমিও দেখি। দেশের মানুষ তো বটে। তার উপরে কর্মচারী ছিলে আমাদের।

একটু ভেবে বললেন, বার-লাইব্রেরির বুড়ো দপ্তরীটা মরে গেছে। লোক নেবে। বলে-কয়ে দেখব ওদের।

মফস্বল উকিলের বাসা। বাইরে বড় চৌরিঘরে তক্তাপোশ পেতে ফরাস পাতা। উকিলবাবুর সেরেস্তা। এক পাশে দেশী মিস্ত্রীর কাঁঠালকাঠে গড়া চেয়ার ও টেবিল—সেটা উকিলবাবুর জন্যে, মুহুরী দু-জন হাতবাক্স কোলে করে ফরাসে বসে। মক্কেলরাও ওঠাবসা করে ফরাসের উপর। রাত্রিবেলা সেরেস্তার কাজকর্ম সেরে ভবসিন্ধু ভিতর-বাড়ি চলে যান। হাতবাক্স ও কাগজ-[illegible] সরিয়ে নেয় ফরাস থেকে; সারি সারি বালিশ পড়ে। মক্কেলরা অনেকে হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে পড়ে এসে এখানে।

গগনও আছে। রোজ রোজ হোটেলে খাওয়ার পয়সা কোথা? সে খায় উকিলবাবুর বাসায়, শোয় ফরাসের এক পাশে। বার-লাইব্রেরির কাজটার জন্য ভবসিন্ধুকে তাগিদ দেয়। তিনি হবে-হবে করেন: লোক নেয় নি এখনো। বার কর্তার ব্যাপার তো—কবে নেবে কিছু বলা যায় না। সেই ভরসায় গগন চুপ করে থাকতে পারে না। অহরহ কাজের ধান্দায় ঘোরে। রাত্রিবেলাও বিরাম নেই। পাশে যারা শুয়ে আছে তাদের বলে, চাকরির খবর দিতে পারেন মশায়রা কেউ? অচল অবস্থা, ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

মনোহর নামে একদিন এক মক্কেল এল। শোনা গেল ডাক্তার। শাঁসালো ব্যক্তি, ভবসিন্ধুর খাতির দেখে বোঝা যায়। হোটেলে যেতে দিলেন না তাকে, কিছুতে নয়। সন্ধ্যাবেলা কাছারি থেকে ফিরে এসে ভবসিন্ধু গগনকে বাজারে পাঠালেন অতিরিক্ত কিছু মাছ কিনে আনবার জন্য। মনোহরের বিছানাও বাইরের ফরাসে বটে, কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে তাঁর জন্য ফরসা চাদর ও মশারি আসে। গগন পরিপাটি করে চাদর পেতে মশারি টাঙিয়ে দিল। তার পর যথারীতি দরবার করে: কোন একটা চাকরি-বাকরি যদি দেন জুটিয়ে—

মনোহর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিচয় নিল। উল্লসিত হয়ে বলে, আরে, স্বজাতির ছেলে তুমি। চল আমাদের কোকিলবাড়ি, আলবৎ চাকরি করে দেব। একলা একঘর আছি ওখানে, আর সমস্ত ভিন্ন জাত। যেদিন মরব, মড়া বয়ে নেবার চারটে লোক হবে না। অজাত-কুজাত কাঁধে করে ঘাটে নেবে। সেইজন্যে ঠিক করেছি, স্বজাতের মানুষ পেলে ঘর বেঁধে জমিজিরেতের ব্যবস্থা করে দেব। গুরু ঠাকুরের যত্নে রাখব। তা যেতে চায় কি কেউ? পেটে না খেয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে থাকবে, চেনা অঞ্চলের বাইরে তবু নড়েচড়ে দেখবে না।

বড় বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছে। গগন তাতে ঘাবড়ে যায়। কত

দূর—কোন্ অজঙ্গি জায়গা না জানি। বলে, কোন্ পথে কী ভাবে যেতে হয় বলেন দিকি।

যাওয়ায় কিছু কষ্ট বটে। কিন্তু কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না। বলি, আমি গিয়ে পড়েছিলাম কেমন করে? এখন তো ভাল। কত মানুষ গিয়ে ঘর বেঁধেছে, গ্রাম বসে গেছে। গ্রাম কোকিলবাড়ি, পরগনে রামচন্দ্রপুর, থানা শোলাডাঙা। সমস্ত চিহ্নিত একেবারে। ডাঙার উপর বাঁধা রাস্তা, জলের উপর নৌকো-ডিঙি—

মনোহর যখন গিয়ে বসতি পত্তন করে, সে কী অবস্থা! বাঘের ডাক শোনা যেত। সন্ধ্যা হলে বউকে ছেড়ে দাওয়ায় বেরুনোর জো নেই, বউ কেঁপে মরে। এখন লোকজনে গমগম করে মনোহরের ডাক্তারখানা। দিন পালটে গেছে। আরও যাবে—সবুর কর না পাঁচটা সাতটা বছর।

বলে, চক-মেলানো দালান দেব—ইট কাটাচ্ছি এবারে। তারই কয়লার যোগাড়ে এসেছিলাম। এসে পড়েছি তো উকিল মশায় নিলামে দুটো গাঁতি ডেকে দিলেন। কাজকর্ম চুকে গেল, পরশুদিন ফিরে যাচ্ছি। তা আমার সঙ্গেই চল না কেন। আমি তো হেঁটে যাব না। মনোহর ডাক্তার পায়ে হাঁটবে, সে কেমন! নৌকো নিয়ে নেব, যে ভাড়াই লাগুক। সে-ভাড়া নেপিছেপি লোকে দিয়ে উঠতে পারবে না। সমস্তখানি পথ আমার সঙ্গে দিব্যি নৌকোয় চলে যাবে।

গগন চুপ করে থাকে। শহর জায়গা ছেড়ে এক কথায় অমনি যায় কেমন করে? নিজের চাকরিই শুধু নয়, বোনের দায় ঘাড়ের উপর। হাসপাতালের নার্স হোক কিংবা যা-ই কিছু করুক বোনের কাজ শহরের উপর। নার্স হওয়ার কায়দাটা কি—কত জনকে জিজ্ঞাসা করল, কেউ কোন হদিস দিতে পারে না।

মনোহর বলছে, গিয়ে দেখই না হে! আমরা সেই গিয়ে পড়লাম —বাইরের মানুষ দেখবার জন্য হাঁপিয়ে উঠতাম মাঝে মাঝে। মানুষ দেখতে চলে গেছি কুমিরমারির হাট অবধি। হাট আর কি—

তখন গাঙের ধারে খান দেড়েক চালাঘর। হাটের সময় কিছু দোকানপাট আর খদ্দেরপত্তর এসে জমত। তাই দেখবার জন্য যেতাম। নৌকো জোটে নি তো কাদা ভেঙে খাল সাঁতরে চলে গেছি। সেই কুমিরমারি এখন গিয়ে দেখ গে। আমাদের বাদার কলকাতা। ভাতের হোটেল অবধি খুলেছে সেখানে। তা শোন, আমার নিজেরই একজন ভাল লোকের দরকার। পুরানো কম্পাউণ্ডার প্রায় সমস্ত শিখে জেনে নিল। পুরো ডাক্তার হয়ে কবে বেরিয়ে পড়ে! স্বজাতির ছেলে তোমায় পেলে আমি আস্তে আস্তে তার জায়গায় বসিয়ে দেব।

লোভনীয় প্রস্তাব বটে, কিন্তু চারুবালার কি করা যায়? বোনের সমস্যা যাকে তাকে খুলে বলা চলে না। গৃহস্থঘরের মেয়ে গাঁয়ে পড়ে থেকে উপোস করুক অথবা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি করুক—এসব বরঞ্চ ভাল, কিন্তু শহরে গিয়ে কাজকর্ম করবে অনেকে তাতে নাক সিঁটকায়, কাজ নিয়ে একবার দাঁড়িয়ে যেতে পারলে তখন অবশ্য আলাদা কথা। গগন বলে, আমি পরে যাব ডাক্তারবাবু। পথটা ভাল করে বাতলে দিয়ে যান। উকিল-লাইব্রেরিতে একটা চাকরির কথা হচ্ছে, হেস্তনেস্ত না হলে যেতে পারছি নে।

আদ্যোপান্ত শুনে মনোহর বলে, ভারি তো চাকরি! উকিল মশায়দের তামাক সাজা, আর জলের গেলাসটা কি আইনের বইখানা এগিয়ে দেওয়া। কম্পাউণ্ডারির চেয়ে বেশী মানের হবে সেটা?

তবু ধরুন, দশটা ভাল লোকের সঙ্গে শহর জায়গায় থাকা। এরপর ভাল কিছু জুটতে পারে। অন্যের জন্যেও জোটানো যায়।

মনোহর ক্ষেপে গেল: শহর আর শহর—ওই তো মরণ হয়েছে মানুষের। ঝাঁকে ঝাঁকে শহরে এসে মরবে আলোর পোকার মতন। বলি, আছে কি শহরে? গাদা গাদা পোড়া ইট—রসকষ যা-কিছু হাজার লক্ষ মানুষ আগেভাগে শুষে মেরে দিয়েছে। বাদুড়-চোষা আমের আঁঠি দেখেছ, সেই জিনিস।

মনোহর একা ফিরে গেল গগনকে পথ বুঝিয়ে দিয়ে যায়:

শহরের নেশা কাটুক, তারপরে গরজ বোঝ তো যেও চলে। কোকিলবাড়ি। কোকিলবাড়ি ডাক্তারবাবুর নাম করো, যে না সে-ই দেখিয়ে দেবে।

কথাটা ভবসিন্ধুর কানে উঠল। অবাক হয়ে তিনি বলেন, গেলে না তুমি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিলে? ডাক্তারের ময়লা কাপড় আর তালি-দেওয়া জুতো দেখে ঘাবড়ে গেলে, কিন্তু দক্ষিণ দেশের চালচলন ওই। আমাদের মতন দুটো-চারটে উকিল-হাকিম মনোহর ডাক্তার নগদ টাকায় কিনে রাখতে পারে।

অন্তঃপুরেও গিয়ে থাকবে কথাটা। উকিল-গিন্নির মুখ বেজার। শোনা গেল, রসুই বামুনকে বলছেন, কদ্দিন পড়ে পড়ে খাবে জিজ্ঞাসা করো তো। নিখরচার হোটেলখানা পেয়েছে। আমাদেরও হয়েছে, দেশের লোক বলে চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারি নে।

অন্তরাল থেকে শোনা অবধি গগন কিছুতে গিন্নীর মুখোমুখি হয় না। চক্ষুলজ্জা দৈবাৎ যদি কাটিয়ে ওঠেন, সোজাসুজি বলে দেন যদি ঐ কথাগুলো। সকলের খাওয়াদাওয়া মিটে গেলে ভৃত্য নিমাই ও বামুনঠাকুরের সঙ্গে একপাশে সে কলাপাতা পেড়ে বসে। শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ঘোরাঘুরিতে দেরি হয়ে যায়। লাইব্রেরির চাকরি তো হয়েই আছে পনের আনা। আরও তিন-চার জায়গায় কথাবার্তা চলছে। একটা না একটা গেঁথে যাবে নির্ঘাৎ। তোমাদের মায়া কাটাব এবার নিমাই। বড্ড ভাল লোক তোমরা।

নিমাইয়ের সত্যি সত্যি কেমন টান পড়েছে গগনের উপর। বাবুদের জলখাবার থেকে দু-পাঁচখানা লুচি সরিয়ে রাখে ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ফাঁক মতন বের করে খায়। গগনকে কাছাকাছি পায় তো বলে, কলাবনে যাও দিকি একবার। ভাব কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? বলছি গরজ আছে, যাও না।

রান্নাঘরের পিছনে কলাবন। লুচি-মোহনভোগে দলা পাকিয়ে

হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে বলে, হাঁ করে কি দেখ, গিলে ফেল তাড়াতাড়ি। সব সুদ্ধ গালে ভরে দাও। কে কোন্ দিকে দেখে ফেলবে।

ভালবাসা না থাকলে এমন হয় না।

অনেক দিন বাড়ি-ছাড়া—মাঝে মাঝে গগনের মন বড্ড খারাপ হয়ে পড়ে। যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কোন্ মুখ নিয়ে যায়? কত জনকে বলল, একটুকু আশা দেয় না কেউ। ভরসা এখন উকিল-লাইব্রেরির কাজটা। এখনো লোক নেয় নি, লাইব্রেরির কেরানীবাবুর কাছ থেকে জেনে এসেছে। এটা যদি হাত-ছাড়া হয়, সর্বশেষ তখন মনোহর ডাক্তার। সেই দূর আবাদ অঞ্চলে পয়সাকড়ির হয়তো মুখ দেখবে, কিন্তু চারুবালার সুব্যবস্থা কোন দিন হয়ে উঠবে না।

ঘোর হয়েছে। গগন এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়ায়, রাত্রি করে বাসায় ফেরে বাড়ির লোকের খাওয়াদাওয়া মিটে গেলে। ঘুরতে ঘুরতে আজ বাজারের দিকে এসে পড়েছে। আধেলার বিড়ি কিনে একটা সবে ধরিয়েছে, কোন্ দিক দিয়ে নিমাই এসে হাত পাতে: প্রসাদ দাও দাদা।

দুটো টানও দেয় নি, ছিনিয়ে নিল মুখের বিড়ি। নিজের মুখে পুরে ফকফক করে টানছে।

গগন বলে, কাজকর্ম ছেড়ে এখন কি করতে বাজারে এলি?

বাবুর হুঁকোর নলচে ভেঙে গেল। মক্কেল এসে পড়েছে, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে হবে না। এক্ষুনি হুঁকো কিনে নিয়ে যাবার হুকুম।

হাসল খানিক হি-হি করে। গগনের হাত ধরে টানে: চল না, পছন্দ করে দেবে একটা ভাল জিনিস।

হুঁকো ওদিকে কোথা?

নিতাইয়ের হাসি বেড়ে যায়: কতকগুলো মাল দেখাব। চলে এস।

প্রথমটা বুঝতে পারে নি, সোজা পথ ছেড়ে ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ঢুকতে যায় কেন। খারাপ পাড়া—এই সন্ধ্যাবেলাতেই পাড়াগাঁয়ে রথের মেলার মতো ভিড়। চাদরে মুখ ঢেকে হনহন করে গলিতে ঢুকে পড়ছে অনেকে। একটা পানের দোকানের কাছে পাঁচ ছ'টা মেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, কোন মজাদার কথায় হি-হি করে হাসছে। এদের দু-জনকে দেখছে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে।

নিমাই ফিসফিসিয়ে বলে, বামুনঠাকুর রাত্রে বাসায় যায়। সে বাসা এই পাড়ায়। গোলাপীর বাড়ি। টাকাপয়সা ঠাকুর কীই বা দিতে পারে—গোলাপীর সে পিরীতের মানুষ। সন্ধ্যেরাত্রে গোলাপী তাই যদ্দূর পারে রোজগার করে নেয়। এতক্ষণে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, দেখিয়ে দেব।

কিন্তু গোলাপীর বাড়ি যাওয়ার আগে আর এক আশ্চর্য দেখা হল। পাকা দালান, বাড়িটা নতুন। রোয়াকে জোরালো পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে। আর যত দেখে এল, সে তুলনায় এ বাড়ির মেয়েগুলোর ধরন কিছু আলাদা। বেশভূষায় বোঝা যায় সচ্ছল অবস্থা।

চমক লাগে গগনের: তুমি পদীবালা না?

পদীবালা চোখ তুলে দেখে। এক মুহূর্তে ছাই মেড়ে দেয় তার মুখের উপর। পালিয়ে যাচ্ছে ভিতরে।

থুড়ি, পদীবালা তুমি কেন হতে যাবে—পদ্মিনী। এই তোমার হাসপাতাল, নার্সগিরি এই গলির ভিতরে?

পদীবালা মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠে: মর মুখপোড়া! কাকে কী বলছিস?

পাক দিয়ে পিছন ফিরে ফরফর করে সে চলে গেল। উজ্জ্বল পেট্রোম্যাক্সের আলো পড়ে মুখের উপর। তিলমাত্র আর সন্দেহের হেতু নেই।

নিমাই হাসছে: চেনাজানা বুঝি—আপনার লোক? চল না,

ভিতরে গিয়ে আলাপ-সালাপ করে আসি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আচমকা অমন ডাকতে নেই। লজ্জা পেয়ে যায়।

ঘৃণায় রি-রি করছে গগনের সর্বদেহ। বলে, উঁহু, ভুল করেছিলাম। কতকটা এই রকম দেখতে সে মেয়েটা। চল, বেরিয়ে পড়ি।

কোন রকমে গলিটুকু কাটিয়ে বাজারের মধ্যে পড়লে যে বাঁচে! ভবসিন্ধুর সঙ্গে একদিন চারুবালার কথা হয়েছিল। নার্সের কাজে ঢোকানো যায় কিনা। ভবসিন্ধু বললেন, নার্স হওয়া কি চাট্টিখানি কথা! ঐটুকু বিদ্যেয় কী হবে? কত বলে পাশ-করা মেয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে।

সেই সময় পদীবালার কথা মনে এসেছিল। তার তো অক্ষর-পরিচয়ও ছিল না। উকিলবাবুই কিছু করতে চান না—হাবিজাবি বলে পাশ কাটাচ্ছেন। কিন্তু পদীবালাকে দেখবার পর আজ ভাবছে, লম্বা লম্বা বলে গাঁয়ের মানুষের কাছে যারা পশার বাড়ায়, না জানি তাদের কতজনার রোজগার এমনিধারা পদীবালার গলিতে!

•

ক'দিন পরে বোধ করি অন্তঃপুরের তাড়া খেয়ে ভবসিন্ধু গগন গগনকে কাছারিঘরে ডেকে পাঠালেন।

কী হল তোমার?

গগন ভবসিন্ধুকে পালটা প্রশ্ন করে, সেই কাজটার কী হল উকিলবাবু? আশায় আশায় দিন গণছি।

ভবসিন্ধু বলেন, বার লাইব্রেরির সেইটা তো? এখন বিশ বাঁও জলের নীচে। সে কাজ তোমারই হবে, তার কোন স্থিরতা নেই। হবেই না, ধরে নিতে পার। মনোহর ডাক্তার বলে গেছে—আমি বলি, মিছে ঘোরাঘুরি না করে তার সেই কোকিলবাড়ি গিয়ে পড় তুমি।

গগন বলে, আপনি কিন্তু বড্ড ভরসা দিয়েছিলেন।

তখন কি জানি এত দূর? কুড়ি টাকা মাইনে, তার জন্য দু-কুড়ি তিন-কুড়ি দরখাস্ত পড়ে গেছে। হাকিমরা অবধি সুপারিশ করে

পাঠাচ্ছেন। এই পোড়া দেশে কোন রকমের পিত্যেশ রেখো না। দুটো টাকা আমার ফী—তা দেখ, কাছার খুঁটে টাকা বেঁধে মক্কেলে হাত চিত করে আধুলি বের করে।

গগনেরও বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। কী দরকার পরের গলগ্রহ হয়ে শহর জায়গায় পড়ে থাকা! বোনেরও সুরাহা হচ্ছে না। বরঞ্চ গাঁয়ে-ঘরে মুখ থুবড়ে মরুক, এমন শহুরে রোজগারের ধান্দায় কোন মেয়ে বেরিয়ে না আসে!

ভবসিন্ধু বলেন, এখানে এই দেখছ, আর উত্তর অঞ্চলে—অনেক উত্তরে আছে কলকাতা শহর। শহরের রাজা কলকাতা। যত বড় জায়গা, তত মানুষের কষ্ট। মানুষ কিলবিল করে পোকা-মাকড়ের মতো। মাথার উপর আচ্ছাদন নেই, পথে পড়ে রাত । দিনমানে টেড়ির বাহারে কিন্তু টের পেতে দেবে না। হরি-মটর খাবে আর লারেলাপ্পা গাবে। তাই বলি, উত্তর মুখো নয়—যাবে তো দক্ষিণে মুখ ফেরাও। নাবালের ভাঁটি অঞ্চলে আছে কিছু এখনো। যত নামবে তত ভিড় কম। খাটো নজর মানুষের, ঐসব দূরের জায়গা দেখতে পায় না। যাতায়াতের কষ্ট, তাতেই আরও মঙ্গল। মুখের অন্ন এদেশ-সেদেশ চালান হয়ে যেতে পারে না। উপস্থিত একটা জায়গা তো পেয়ে যাচ্ছ—মনোহর ডাক্তারের কোকিলবাড়ি।

তিন

কতদূর সেই কোকিলবাড়ি, কতক্ষণ লাগবে না জানি পৌঁছতে!

রেলের পথ দু-ঘণ্টার। তারপর থেকে পায়ে হাঁটা চলেছে। হাঁটছে অবিরত। গাঙ-খালের ঠাসবুনানি। দশ পা ডাঙায় হাঁটে তো বিশ পা জলে। কোথাও পায়ের পাতা ডোবে, কোথাও হাঁটু-জল, আবার কোনখানে সাঁতার কাটতে হচ্ছে দস্তুরমতো। ভরটা

জলে নয়, কাদায়। নোনা কাদা —প্রেমকাদা যার নাম। আঠার মতো চটচটে। পায়ে লেপটে যায়, এক একখানা পা ওজনে আট-দশ সের হয়ে দাঁড়ায়। জলের মধ্যে অনেকক্ষণ রগড়ে রগড়ে সেই পা আবার সচল করে নিতে হয়। নতুন জায়গায় যাচ্ছে বলে গগন পরনের কাপড়-জামা ধবধবে ফর্সা করে এনেছে। সতর্ক হয়ে চলেছে তবু জলে ভিজে কাদা মেখে এখন চিত্রবিচিত্র অবস্থা।

কোকিলবাড়ি কোন্ পথে, ও ভাই ?

একজনে বলে ডাইনে। পরক্ষণে যাকে পাওয়া গেল, সে বাঁ-দিক দেখিয়ে দেয়। পথ মানে ঘাসবনের মধ্যে মানুষ-গরুর অস্পষ্ট চলাচলের চিহ্ন—ঠাহর করে দেখতে হয়। জ্যোৎস্না পেয়ে তিন পহর রাতে হাঁটনা শুরু করেছে। তখন থেকে এমনি চলছে।

একজনে ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কে জানে বাপু, কোথায় তোমার কোকিলবাড়ি ? হাত পঞ্চাশেক বন হাসিল করে খান পাঁচ-সাত চালাঘর তুলে দেদার গ্রাম বসিয়ে গেছে। নামের তো মা-বাপ নেই—কাক-কোকিল যা হোক একটা নাম গছিয়ে দিলেই হল।

কী করে খোঁজ পাই, উপায় বাতলে দাও ভাই। ঘুরতে ঘুরতে পায়ে ব্যথা ধরে গেল।

ভেবেচিন্তে লোকটা এক বুদ্ধি দিল: এদ্দূর এসে পড়েছ তো সটান কুমিরমারি গিয়ে ওঠ। এক মুশকিল, চিন্তাখালির কাদা ভেঙে উঠতে হবে।

কাদা তো সারা পথ ভাঙছি।

সে কাদা আর চিন্তাখালিতে আসমান-জমিন তফাত। বলি, চিন্তাখালির নাম শোন নি? চিন্তাখালির মাটি, দুই ঠ্যাং আর লাঠি। শুধু দুখানা ঠ্যাঙে হয় না, লাঠির ঠেকনো লাগে। কিন্তু তা বলে উপায় কি ? এদিগরের যত মানুষ হাটঘাট করতে কুমিরমারি যায়। হাটের দোকানীরা কোকিলবাড়ির খোঁজ দিতে পারবে।

বলেছে ভাল। কুমিরমারি গিয়ে পড়লে নির্ঘাত উপায় হবে।

ক্ষিধে পেয়েছে, জল-টল খেয়ে খানিকটা জিরিয়ে নেবে হাটখোলায় বসে। হনহন করে চলেছে গগন। বেলা ছুপুর হতে চলল। সামনে প্রকাণ্ড বিল। বিল-পারে সাদা টিনের ঘরের মতো দেখা যায় বটে।

উৎসাহ ভরে আরও জোরে চলল। বিলের মধ্যে দূরত্বের সঠিক আন্দাজ আসে না। হাটখোলা কাছেই মনে হচ্ছে, অথচ যত হাঁটে পথের আর শেষ নেই। পথ বেড়ে যাচ্ছে যেন পায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আলপথে যেতে যেতে এক সময়ে আলের শেষ হয়ে গেল। ছুস্তর কাদা। যত দূর নজর চলে, কালো ক্ষীরের সমুদ্র হয়ে আছে। এরই নাম চিন্তাখালি? লেখাপড়া-জানা গগনের মনে সহসা এক গবেষণার উদয় হয়ঃ কাদা পার হওয়ার সমস্যা ছাড়া মন থেকে অন্য সকল চিন্তা খালি হয়ে যায়,তাই কি জায়গার এই নাম?

থমকে দাঁড়াল সেই নিঃসীম কাদার কিনারে। পাশে খাল— খালের ধারে ধারে চলে এসেছে অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ কে-একজন বলে উঠল, হুজুর হেঁটে হেঁটে চলেছেন—কী সর্বনাশ!

গগন খালের দিকে তাকাল। রংচঙে বোট একটা। বোট কিংবা সবুজ রঙের টিয়াপাখি। বোটের গলুইটা লাল করেছে, টিয়াপাখির ঠোঁটের যে রং। উড়ছে না সবুজ টিয়া, খালের জলে ভেসে ভেসে যাচ্ছে। ভাসতে ভাসতে কখন কাছে এসে পড়েছে।

আসুন হুজুর, চটের মুখে বোট ধরছি। উঠে আসুন।

গগন অবাক হয়ে বলে, আমায় বলছ?

আপনি ছাড়া আবার কাকে! পথের মানুষ চৌধুরি বাবুর বোটে ডেকে তুলব?

নিতান্তই পথের মানুষ গগন হকচকিয়ে যায়। খালি বোট যাচ্ছে। ছুই মাথায় ছুটি মাত্র প্রাণী—একজন হালে বসেছে, বোঠে অন্যজনের হাতে। ঘস্‌স্ করে বোট কিনারায় লাগল।

কাছে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে গগন বলে, তোমাদের তো চিনতে পারছি নে বাপু।

হালের লোকটা জবাব দিল। বিনয়ের অবতার। ঝুঁকে পড়ে যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে বলে, অধীনের নাম জগন্নাথ বিশ্বাস। ও হল বলাই—বলাইচন্দ্র কয়াল। আমরা কি চিনবার মতো লোক! সে হলেন আপনারা—ত্রিভুবন একডাকে চিনে ফেলে।

ভুল করে কোন খাজে-খাঁ ভেবে বসেছে গগনকে। মজা মন্দ নয়। হাঁপিয়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে। শামুকে পা কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে। আর চিন্তাখালির কাদা—সামনে যতদূর দেখা যাচ্ছে, অনন্ত অপার। এই নৌকো নিশ্চয় ঠাকুর মিলিয়ে দিলেন। উঠে পড়া যাক তো এখন, চিন্তাখালি পার হওয়া যাক। কাদা পার হয়ে তখন নেমে পড়া যাবে।

উঠতে গিয়ে একটা কথা মনে হল। খালি বোট যাচ্ছে—হয়তো মোটা রকম ভাড়ার প্রত্যাশা রাখে। ভাড়া ধরবার সময় এই রকম আমড়াগাছি করে থাকে মাঝিরা। কথাবার্তা আগেভাগে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। বাড়ি থেকে সামান্য যা-কিছু এনেছিল, ভবসিন্ধুর বাসায় খোরাকি না লাগলেও এটা-সেটায় ফুঁকে গেছে প্রায় সমস্ত। নামবার মুখে দুই মরদে যদি চেপে ধরে, বিভুঁই জায়গায়, তখনকার উপায়টা কি?

হেসে রসিকতার ভাবে গগন বলে, পকেটে বকেয়া সেলাই কিন্তু ভাই। ভাড়া-টাড়া দিতে পারব না।

জিভ কেটে জগন্নাথ বলে, ছি-ছি, এটা কী বললেন হুজুর! ভাড়া খাটতে যাবে অনুকূল চৌধুরি মশায়ের শখের বোট! ভাড়া কি বলেন—বখশিশ বাবদ সিকি পয়সা হাত পেতে নিয়েছি, টের পেলে ছোট চৌধুরি মশায় কেটে কুচি কুচি করে ফেলবেন। বিষম একরোখা। টাকাপয়সা কিছু নয়—একটা নিবেদন শুধু হুজুর, দেখা তো হবেই, দেখা হলে আপনার ছোট মামাকে বলবেন, চিন্তাখালি থেকে জগা বিশ্বাস তুলে নিয়ে এসেছিল। মনিব শুনে খুশি হবেন।

বোটে উঠে একগাল হেসে গগন বলে, বলব—নিশ্চয় বলব।

যে সে লোক নয় এখন গগন—অনুকূল চৌধুরি নামে বাদা অঞ্চলের কোন লাটবেলাট, তারই সাক্ষাৎ ভাগিনেয়। চলুক তবে তাই যতক্ষণ না চিত্তাখালি পার হয়ে যাচ্ছে। আরও বেশি চলে তো কুমিরবাড়ি অবধি চলুক। ভুলটা তার পরে প্রকাশ হয়ে গেলে আর তখন ক্ষতি হবে না। গগনের কী দোষ, সে কোন কথা বলতে যায় নি। ওরাই দেখে বড়লোকের ভাগনে বলে ধরে নিয়েছে। নিজ অঙ্গের দিকে একবার তাকাল—চেহারাটা ভাল সত্যিই। তবু তো সেই শেষ রাত থেকে জলে কাদায়, মাথার উপরের কড়া রোদে হটর-হটর করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

জমিয়ে বসে, গগন গল্পগুজব করছে: ছোট হোক যা-ই হোক—বোটখানা কিন্তু খাসা হে!

একগাল হেসে জগন্নাথ বলে, এই দেখুন, আপনিও ধরতে পারেন নি হুজুর। এই নৌকো নিয়ে সেবারে আঠাশ নম্বর লাটে আপনারা হরিণ মারতে গিয়েছিলেন। রং করে ভিতরে কুঠুরি বানিয়ে চেহারা আলাদা হয়ে গেছে।

আবার বলে, আমিও তো সেবারে ছিলাম। দেখুন দিকি আর একবার ঠাহর করে, চেহারার আদল পান কিনা।

নিয়ে যাচ্ছে এ রকম তোয়াজে, মনে সন্দেহের ভাঁজটুকু রেখেও কাজ নেই। জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে গগন বলে ওঠে, তাই তো বটে! হ্যাঁ ঠিক। ছোটমামার সবচেয়ে পেয়ারের মানুষ ছিলে তুমি। এখনো সেইরকম নাকি?

জগন্নাথ হাতজুটো যুক্ত করে হেঁ-হেঁ করে: তা হুজুর বলতে নেই—নেকনজরে আছি বটে একটু। তিনি কিন্তু চৌধুরিগঞ্জে নেই, বাড়ি চলে গেলেন। ফুলতলায় পৌঁছে দিয়ে এই ফিরে যাচ্ছি।

হেঁটে হেঁটে এতক্ষণ গগন এই সব আবাদ-জায়গার বাপান্ত করছিল, নৌকোর উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে এবারে মনে হচ্ছে—না, জায়গা ভালই বটে। মা কালী সকল দিক আটঘাট বেঁধেই করুণা

করছেন। মুখে চুকচুক করে গগন বলে, ইস, বড্ড মুশকিল হল তবে তো! কী করা যায়? কোকিলবাড়ি চলে যাই তবে কোকিলবাড়ি জান তোমরা—মনোহর ডাক্তারের আস্তানা ডাক্তারের সঙ্গে বড্ড খাতির আমার।

বলাই নামে সেই দাঁড়ের ছোকরা বলে ওঠে, বুঝতে পারলে জগা, রাঙাবড়ি বেচে বেচে লাল হয়ে গেল—মনোহর ডাক্তার সেই বটে। তাদের বাড়ির মাদাটা—হ্যাঁ, কোকিলবাড়িই বটে।

জগন্নাথ সগর্বে বলে, কোকিলবাড়ি খুব জানি হুজুর। জগা বিশ্বাস জানে না, এ পাইতক্কে এমন জায়গা নেই।

গগন বলে, তবে আর কি! কোন্ পথে যাবার সুবিধা, ভাল বুঝিয়ে দাও। কুমিরমারি নেমে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব।

জগন্নাথ প্রবল ঘাড় নেড়ে বলে, সে কেন, কুমিরমারি কি জন্য ছাড়তে গেলাম? হাতে কুড়িকুষ্ঠ-মহাব্যাধি হয় নি তো—গাঙে খালে দিনরাত ঘুরি। একেবারে সেই কোকিলবাড়ির ঘাটে নামিয়ে দিয়ে আসব। হুজুরের খাতিরের ডাক্তার। এদিগরে ডাক্তার বড় কম—আলাপ-সালাপ করে আসব ডাক্তার মশায়ের সঙ্গে।

গগন আপত্তি করেঃ না জগন্নাথ, অত কষ্ট কেন করতে যাবে, কোন দরকার নেই। এতখানি পথ চলে এসেছি—দিব্যি ওটুকু যেতে পারব।

তা বলে হেঁটে যাবেন আপনি—আপনার ছোটমামা মশায় তবে পুষছেন আমাদের কোন্ কর্মে?

ফিক করে হেসে জগা বলে, হাঁটবার ইচ্ছে হয়েছে হুজুরের, বুঝতে পেরেছি। অমন যে চিন্তাখালি সেখানেও পা দিয়ে পরখ করতে যাচ্ছিলেন। নৌকোয় পাল্কিতে ঘুরে ঘুরে অরুচি ধরেছে।—তা হয় ও-রকম, সন্দেশ খেয়ে খেয়ে শেষটা একদিন মুড়ি খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভাগনেকে পথের উপর নামিয়ে চলে গেছি—ছোটবাবু জানলে তো আস্ত রাখবেন না। তার কোন্ উপায়?

নাছোড়বান্দা। মনিবের বিষম অনুগত জগন্নাথ বিশ্বাস—কোকিলবাড়ি অবধি নিয়ে সে যাবেই। গগন নানারকমে নিরস্ত করবার চেষ্টা করছে। কথাবার্তার মধ্যে কুমিরবাড়ি এসে গেল। দূর থেকে যে কয়েকটা টিনের ঘর দেখা যাচ্ছিল—বাদাবনের কলকাতা হয়েছে যেখানকার নাম।

গগন চেঁচিয়ে ওঠেঃ ঘাটে লাগাও। এইখানে নেমে পড়ি।

জগন্নাথ বলে, নামতে হবে তো বটেই। বেলা চড়ে গেছে—চাট্টি সেবা নিতে হবে। উৎকৃষ্ট হোটেল খুলেছে গদাধর ভটচাজ্জি।

ভাতের হোটেলের কথা মনোহর ডাক্তারও বলেছিল বটে। শেষরাত্রি থেকে হেঁটে হেঁটে গগনের ক্ষিধে পেয়েছে। ভাতের নামে নাড়ির মধ্যে চনমন করে ওঠে। কিন্তু সম্বলের বিষয়ে চিন্তা করে মুখ শুকায়। পয়সাকড়ি যা আছে, চার পয়সার মুড়ি-বাতাসা চিবানো যায় বড় জোর। কিন্তু অত বড়লোকের ভাগনে হয়ে মুড়ি খাবে কেমন করে এদের চোখের সামনে? ছিনেজোঁকের মতো লেপটে আছে—হাত ছাড়িয়ে সরে পড়বে, তারও কোন উপায় দেখা যায় না।

গগন ঘাড় নেড়ে বলে, কোকিলবাড়ি খবর দেওয়া আছে। কোন না দশখানা তরকারি রেঁধে বসে রয়েছে তারা। এখানে হোটেলের হাঙ্গামা করতে গেলে তাদের আয়োজন বরবাদ হয়ে যাবে।

জগন্নাথ বিপন্ন কণ্ঠে বলে, সে তো বুঝলাম হুজুর। কিন্তু অত পথ উপোস করিয়ে নিয়ে গেলে ছোট চৌধুরি মশায় আমায় কি বলবেন? খালি পেটে অতখানি পথ পেরেও উঠবেন না আপনি। শিকারের সময় দেখেছি তো—রান্নাবান্নার একটু এদিক-ওদিক হলে মূর্ছা যাবার গতিক হত।

আরও জোর দিয়ে বলে, সে হবে না হুজুর। যা হোক দুটো মুখে দিয়ে যেতে হবে। বাজারের হোটেল শুনে ঘাবড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যে লোকের ভাগনে আপনি, গদাধর আলাদা বন্দোবস্ত করে দেবে।

নিরুপায় গগন স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলে এবারে : বুঝতেই পারছ জগন্নাথ। বাড়ির সঙ্গে ইয়ে মানে ঝগড়াঝাঁটি করে তো আসা। তৈরি হয়ে বেরুই নি।

জগন্নাথ হেসে বলে, এই জন্যে হুজুর বুঝি তা-না না-না করছিলেন। এ আমাদের ফুলতলা নয় যে পাতা ছেড়ে উঠেই পয়সা গণতে হবে! রাস্তা বাঁধার লোকজন বিস্তর এসে পড়ল তো গদাধর শালা গলায় পৈতে ঝুলিয়ে হোটেল খুলে দিয়েছে। কী খাতিরটা করবে, দেখতে পাবেন। আচ্ছা, এক কাজ হোক। দিতে যাবেন তো গদাধর ভটচাজ্জিকে পাঁচটা টাকা বকশিশ বলে। বল্লেই দেখবেন না! সব বেটার টিকি বাঁধা চৌধুরি বাবুদের কাছে। তাঁর ভাগনেকে খাইয়ে টাকা নেবে, এত বড় তাগত এদিগরে কারো নেই।

ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে জগন্নাথ হোটেলের দিকে ছুটল। গদাধরকে গিয়ে বলে, কী দরের লোক এসে পড়েছেন, ঘাটে গিয়ে দেখ। চৌধুরিগঞ্জের মালিক মশায়দের সাক্ষাৎ ভাগনে। মাতুলগোষ্ঠী যেমন, ভাগনেরাও তেমনি—হাত ঝাড়লে পর্বত। হোটেল খোলা তোমার সার্থক হল ভটচায। যাও, খাতিরযত্ন করে এনে বসাও।

হাটবারে জমজমাট, অন্য দিন কুমিরমারির হাটখোলায় মানুষজন নিতান্তই গোণাগুণতি। বাঁধা দোকান পাঁচ-সাতখানা। এই নাবাল অঞ্চলে চৌধুরিগঞ্জের নাম কে না শুনেছে? কোন এক মেছো-চকোত্তি নিজ হাতে বোঠে বেয়ে মাছের কারবার করে রাজ্যপাট বানিয়ে রেখে গেছেন ছেলেপুলেদের জন্য। অতুল ঐশ্বর্য। সবুজ বোট চেপে তাঁদের আত্মীয় কুমিরমারির মতন জায়গায় নামলেন। আহারাদিও আজ এখানে। বাদা অঞ্চলের চাষাভুষো ফকির-বাওয়ালি ব্যাপারি-মহাজনের চলাচল। রাস্তার কাজে ইদানীং কুলি-মজুরও এসে পড়েছে অনেক। সেইখানে এবারে—আসল বড়মানুষের পা পড়তে শুরু হল। রাস্তা বাঁধা শেষ হবার আগেই। শুধু গদাধর ভটচাজ কেন, যে শুনছে সে-ই চলে যায় গাঙের ঘাটে।

কাপড় ও ছিটের কামিজের কাদা গগন ইতিমধ্যে খানিকটা জলে ধুয়ে নিয়েছে। কিন্তু কামিজের কাঁধের কাছটায় ছেঁড়া। গামছার পুঁটলিতে চটিজুতা ও ধোপদস্ত উড়ানি। উড়ানি কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে দিল। চটিজোড়া পায়ে পরেছে। ব্যস, ষোলআনা ভদ্রলোক। অনুকূল চৌধুরির ভাগনে নেহাত বেমানান নয় এখন। ভদ্রলোক হয়ে গগন গলুয়ের কাছে বোটের পাটাতনের উপর বসে পা নাড়ছে।

জগন্নাথ ফিসফিস করে ঘাটের মানুষদের বলছে, বড়লোকের খেয়াল রে ভাই। বউঠাকরুনের সঙ্গে ঝগড়া করে একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছেন। শোন, ইয়ে হয়েছে—মিহি বাদশাভোগ চাল যে চাই। তার নীচে হুজুর হজম করতে পারেন না।

অনেকেই সায় দেয়ঃ বটেই তো! কত বড়লোকের ভাগনে!

সত্যি, ভাবনার ব্যাপার। ভাবনাটা একলা গদাধরের নয়, কুমিরমারি যত জন আস্তানা গড়েছে, দায় এখন সকলের। চিনিবাস রাখিমালের কারবার করে,নতুন গোলা বেঁধেছে হাটখোলার পাশে। থাকে তো তারই কাছে থাকবার কথা। কিন্তু সে ঘাড় নেড়ে দিলঃ কটা বাদশা আছে এ মুলুকে যে বাদশাভোগ গুদামজাত করে রাখব? মেয়েটা পেটরোগা বলে দু-চার সের পুরানো সীতাশাল রেখে দিই। অতে চলে তো বল।

জগন্নাথ চুপচাপ ভাবে, হাঁ-না কিছু রায় দিচ্ছে না।

গদাধর সকাতরে বলে, কষ্টেসৃষ্টে নাও চালিয়ে একটা বেলা। চালটা না হয় একটু বেশী করে ফুটিয়ে দেব।

অনুরোধে পড়ে রাজী হতে হয় জগন্নাথকে। বলে, তাই না হয় হল। কিন্তু তোমার হোটেলের বারমিশালি তরকারিতে হবে না। বাছাগোছা জিনিস হুজুর একটু-আধটু মুখে দেন। একাদশীর যোগাড় গোন—গাঙে তো এখন ভাল গলদা-চিংড়ি পড়ছে।

গদাধর তটস্থ হয়ে বলে, জেলেপাড়ায় এখুনি লোক যাচ্ছে। চিংড়ি ছাড়া মোটা ভেটকি-ভাঙান যদি পাওয়া যায়, ছেড়ে আসে না যেন।

নথ-পরা আদরমণি আধঘোমটা টেনে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। হাত নেড়ে গদাধরকে কাছে ডেকে বলে, গোয়ালারা এসে রাখান দিয়েছে। তোমার ঐ লোকের কাছে ফেরো দিয়ে দিচ্ছি, ঘি-মাখন যা পায় একটু নিয়ে আসুক।

ঘরোয়া পরামর্শ হলেও আদরের কথা জগন্নাথের কানে গেছে। বলে, গব্যটা শুধু আগে হলে চলবে না তো—আগে পিছে উভয় দিকে চাই। বাথানে যাচ্ছে তো ফেরো নয়, বড় দেখে ঘটি দাও একটা। দুধও নিয়ে আসবে। দুধ মেরে ক্ষীরের মত করবে। ঘন-আঁটা না হলে হুজুর বমি করে ফেলেন।

কণ্ঠস্বর নীচু করে, বোটের উপর গগন অবধি না গিয়ে পৌঁছয় এমনি ভাবে বলে, দামের জন্য কিছু নয়—জিনিস সাচ্চা হয় যেন। এসব মানুষের কি এখানে পা পড়বার কথা? বউঠাকরুনের সঙ্গে বচসা করে নিতান্ত যাকে বলে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস—

গদাধর ইতস্তত করে কেশে একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে, আমাদের নিজেদেরও ভাল ভাল চার-পাঁচ খানা পদ—তার উপরে এতগুলো হচ্ছে। বলি, নষ্ট হবে না তো? বড়লোকেরা আমাদের মতন নন, ওঁদের পেটে জায়গা কম—

জগন্নাথ হেসে বলে, পেট ওঁর কি একার—আমাদের নেই? পথে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে বড়লোকেরা যেখানে যাবেন, আর দশ-বিশটা পেট সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছে। পেটগুলোর নয় তো চলবে কিসে? যা বললাম, তাড়াতাড়ি করে ফেল ভটচাজ। জিনিস পড়ে থাকলে গুনাগারি তোমায় তো দিতে হচ্ছে না।

তা বটে—বলে গদাধর নির্ভাবনায় আয়োজনে চলল।

নদীর খোলে বোটের উপরের গগনকে এবারে জগন্নাথ ডাকছে: হোটেলওয়ালা তো কোমর বেঁধে লেগে গেল। নামবেন নাকি হুজুর? ভাঁটা শুরু হয়ে গেছে, এর পরে কিন্তু বিষম কাদা ভাঙতে হবে। নেমে এসে ঘুরে ফিরে দেখে বেড়ান জায়গাটা।

হেলতে দুলতে—বড়লোকের যেমনধারা হওয়া উচিত—গগন

বোট থেকে ডাঙায় নামল। উদারভাবে বলে, কেন এত সব হাঙ্গামায় গেলে জগন্নাথ? কোকিলবাড়ি তো রান্নাবান্না হয়ে

শোনে না যে! গদাধর ঠাকুর একা নয়—গঞ্জের সবসুদ্ধ এক-জোট হয়েছে।

মজা যখন জমেছে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত। গগন বলে, পরিচয় দিতে গেলে কি জন্যে?

আমি কিছু বলি নি। বোট দেখে ধরে ফেলল। সবুজ বোটে বাজে মানুষ কী আর চড়ে বেড়ায়?

হাসতে লাগল জগন্নাথ। আবার বলে, কথা ঠিক, বাড়াবাড়ি করছে ওরা। কিন্তু এখন আর বলে কি হবে? না খেয়ে ছাড়ান পাবেন না। তাই বলি, আপসে চান-টান করে তৈরি হয়ে নিন।

গদাধর-হোটেল। গদাধর শানার মুড়ি-বাতাসার দোকান ছিল কুমিরমারিতে, ফুলতলার ছোটবাবু খোদ অনুকূল চৌধুরি হোটেলের মতলবটা মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। চৌধুরি গঞ্জে যাবার পথে রাত্রিবেলা বেগোনে পড়ে এইখানে নৌকো চাপান দিয়েছিলেন। গদাধরের দোকানে উঠে পাথরের থালায় চিঁড়ে ভিজিয়ে কলা ও বাতাসা সহযোগে ফলার করছেন। আর দেখছেন চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। হাটবার—হাট তখন ভেঙে গেছে। অনুকূল বললেন, চিঁড়ে-বাতাসা ছেড়ে ভাতের হোটেল করলেই তো বেশ হয় গদাধর।

বছর চার-পাঁচ আগেকার কথা। সেই তখনই কুমিরমারির ওদিকটা পুরোপুরি হাসিল হয়ে গেছে। এক ছিটে জঙ্গল দেখা যায় না কোন দিকে কোথাও। গঞ্জ দ্রুত জমে উঠছে। একটা পুকুর হয়েছে—মিঠা জল। জলের নাম দূরদূরন্তর ছড়িয়ে গেছে। এই পুকুরই বড় আকর্ষণ গঞ্জ জমে ওঠার। দেখতে দেখতে পাঁচ-ছখানা বাঁধা দোকান হয়ে গেল গাঙের কূল ঘেঁষে। সপ্তাহে দু-দিন

হাট—রবিবার আর বুধবার। সেদিন ঝাঁকা ভরতি মালপত্র আরও অনেকে দোকান সাজিয়ে বসে। বাদা অঞ্চলের লোকজন আসে হাট করতে, এবং খাবার জল নিয়ে যেতে। বিস্তর ধান-চাল ওঠে, এবং হাঁসের ডিম। ডাঙা অঞ্চলের পাইকারে কিনে বোঝাই করে নিয়ে যায়। মাছও ওঠে অল্প-স্বল্প।

গাঙের জোয়ার-ভাঁটা অনুসারে চ ল—কোন্ হাটবারে এসে পৌছতে হবে, ঠিক-ঠিকানা নেই। বিকালবেলা হাট—ভোর থেকে এ-দল সে-দল এসে পড়ছে গাঙের গোন-বেগোন অনুযায়ী এক প্রহর রাত্রে হাট ভাঙে, তার পরে সারা রাত্রি কারো কারো নৌকো বেঁধে বসে থাকতে হয় গোনের অপেক্ষায়। হাটের আগে ও পরে দেখা যাবে, তিনটি মাটির ঢেলার উনুন বানিয়ে এদিকে ওদিকে ভাতের হাঁড়ি চেপে গেছে, কলাপাতায় ফেনসা-ভাত ঢেলে লোকে হাপুস-হুপুস করে খাচ্ছে। গদাধরের দোকানে বসে চিঁড়ে খেতে খেতে অনুকূল চৌধুরি হাটুরে মানুষের রান্না-খাওয়া দেখছিলেন।

কুমিরমারি থেকে নতুন রাস্তা যাবে দুর্গম বাদাবনের দিকে। মাপজোপ হয়ে গেছে, ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে এইবারে ঠিকাদার ও লোকজন এসে পড়ল। রাস্তাটা হয়ে গেলে আর কি—কুমিরমারি ষোলআনা শহর। গদাধর শানাও রাস্তার ঐ দলবলের সঙ্গে এসেছে। সঙ্গে স্ত্রীলোক। আদর বলে তাকে ডাকে—আদরমণি কখনো-সখনো। এমন অনেক আসে। সমাজের তাড়া খেয়ে এই সব নতুন জায়গায় জোড়ে এসে ঘর বাঁধে। হাতে কিছু পয়সাও আছে—রাস্তার কাজে না খেটে গদাধর চিঁড়ে-মুড়ি-বাতাসার দোকান করে বসল। গদাধর বাতাসা কাটে, আদর মুড়ি ভাজে বালির খোলায়। অল্পস্বল্প বিক্রি—জমছে না, যা আশা করা গিয়েছিল তেমন কিছু হল না। এমনি সময় একদিন অনুকূল চৌধুরি এসে বুদ্ধি দিলেন—হোটেল খোল গদাধর। ভাল চলবে। মুড়ি-বাতাসা লোকে জলখাবার হিসাবে খায়। কটা নবাব-বাদশা আছে কুমিরমারিতে যে দু-বেলা দু-পাতড়া ভাতের উপরে আবার মুড়ি

চিবোতে বসবে। মুড়ি না ভেজে ভাত-তরকারি রান্না কর। অতগুলো উনুন বসবে না আর তখন, সবাই এসে হোটেল থেকে তৈরি ভাত খেয়ে যাবে।

গদাধরও যে দু-একবার ভাবে নি এমন নয়। ইতস্তত করে বলে, জাত-বেজাতের মানুষ রয়েছে, আমার রান্না খাবে কে? মাইনে দিয়ে রসুই-বামুন নিয়ে আসব, সে হল অনেক কথার কথা।

তা সত্যি, বামুন আনতে গেলে পোষাবে না। অনুকূল বলেন, তুমি কি জন্যে আর শানা থাকতে যাবে? ভটচাজ্জি—গদাধর ভটচাজ্জি। বাদা জায়গা—বামুন হবার খরচা মবলগ এক আনা। এক ফেটি পৈতের দাম। চারটে পয়সা খরচ করে বামুন হয়ে যাও। মানষেলার মতন কেউ এখানে তোমার গাঁইগোত্রের খবর নিতে আসবে না।

ভেবেচিন্তে তার পরে গদাধর হোটেল খুলেছে। পৈতে ঝুলিয়ে আগেই বামুন হয়ে গিয়েছিল। মালিক ও পাচক গদাধর, এবং ঝি হল আদর। বসতঘরখানা রান্নাঘর; খাওয়ার জায়গার অসুবিধে নেই, হাট-খোলায় অনেক চালা। ঠিক হাটের সময়টা কে আর খেতে আসছে? তেমন যদি কারো তাড়া থাকে, রান্নাঘরের দাওয়ায় মানুষ-টাকে বসিয়ে দেবে। বুদ্ধিটা সত্যি ভাল। রাঁধা ভাত-ব্যঞ্জন পেয়ে হাটুরে মানুষ বর্তে যাচ্ছে। রাঁধাবাড়ার আলস্যে কেউ কেউ চিঁড়ে-মুড়ি খেত গদাধরের দোকান থেকে। এখন পয়সা ফেললেই ভাত—ভাতের বড় কিছু নেই—সেই সব মানুষ মনের আনন্দে পাতা পেতে বসে। হাটবার দুটোয় হোটেল খুব ভাল চলে। গোড়ার দিকে তো যোগান দিয়ে পারত না, ভাত ফুরিয়ে যেত, তাই নিয়ে মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামার গতিক। এখন উনুন বাড়িয়েছে, বড় হাঁড়ি কিনেছে।

নিত্যদিনের বাঁধা-খদ্দেরও হয়েছে কিছু। তারা দোকানদার। হাত পুড়িয়ে রান্না করা কী ঝকমারি—হোটেল চালু হয়ে সে দায়ে বেঁচে গেছে। খেতে খেতে উচ্ছ্বাস ভরে হাসেঃ আর কি, কুমিরমারি

সত্যি এবারে শহর-জায়গা হয়ে উঠল। পয়সা ফেললেই হাতে-গরম ভাত-তরকারি। একটা কেবল বাকি আছে—লম্বা টিনের ঘর তুলে বায়স্কোপ চালিয়ে দেওয়া। তা হলেই চৌধুরি বাবুদের ফুলতলা। সেটাও বাকি থাকবে নাকি? রাস্তাটা হয়ে যাক, খোয়া ফেলে পাকা-রাস্তা হোক, মোটরগাড়ি চলাচল করুক, তখন দেখতে পাবে।

গদাধরের মনে মনে ভয়। রাস্তা যেদিন হয় হোকগে, তাড়াতাড়ি নেই—বরঞ্চ যত দেরি হবে ততই ভাল গদাধর হোটেলের পক্ষে। ধীরেসুস্থে দীর্ঘ ছন্দে চলুক রাস্তার কাজ। দশ বছর বিশ বছর জন্ম জন্ম কেটে যাক। রাস্তা হয়ে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা হয়ে গেলে আরও কত ভাল হোটেল খুলবে, তার মধ্যে গদাধর ভটচাজ্জির কি দশা হবে বলা যায় না। আপাতত এই বেশ আছে ভাল।

পাকা মাথা ছোটবাবু অনুকূল চৌধুরির—মোক্ষম বুদ্ধি দিয়ে গিয়েছিলেন, গদাধর দু-পয়সা করে খাচ্ছে। এত দিন পরে—তিনি না হন তাঁর ভাগনে মশায় হাজির হলেন সবুজ বোট চড়ে। বড়-লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে গদাধর-হোটেলে। খাতিরযত্ন করতেই তো হবে।

খাওয়া সমাধা হল। আয়োজন অতিশয় গুরু। দক্ষিণে গাঙের দিকে রান্নাঘরের দাওয়া আছে একটা। চাদর ও তাকিয়া দিয়ে বড়লোক-মানুষের জন্য বিশেষ ভাবে ফরাস করে দিয়েছে। আহারান্তে গগন সেখানে গড়িয়ে পড়ল। গাঙে পুরো ভাঁটা তখন। বোট অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে রেখেছে। বিস্তর কাদা ভেঙে সেখানে পৌঁছতে হয়। সে তাগত নেই এখন গগনের। দাওয়া অবধি আসতেই কষ্ট হচ্ছে, খাওয়ার আসনের উপর গড়াতে পারলে ভাল হত। ফরাস পেতে দিয়ে গদাধর পরিপাটী করে তামাক সেজে আনল। দুটো টান দিতে না দিতে চোখ জড়িয়ে আসে। তাড়া কিছু নেই—ভাঁটা গিয়ে জোয়ার আসবে, তবে তো রওনা। জোয়ারে কূলের উপর বোট এসে লাগবে, জগন্নাথ এসে ডাকবে সেই

সময়। জুতো খুলতে হবে না, চটি পায়ে ফটফট করে গগন সোজা গিয়ে নৌকোয় উঠবে। ততক্ষণ আরামে ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

সবুজ বোট ওদিকে খুলে দিয়েছে। ভাঁটা তো ভাঁটাই সই। টেনে দাঁড় মার রে বলাই, বাঁক ঘুরে ওই বানতলার কাছ বরাবর গিয়ে পড়ি।

কুমিরমারি দেখতে দেখতে আড়াল হয়ে গেল। এই বারে এতক্ষণে তারা হাঁপ ছাড়ে। জগন্নাথ বলে, দুপুরটা নিরম্বু উপোস যাবে ভেবেছিলাম। তা বেশ জবর জুটে গেল। কপালে আছে ঘি না খেয়ে করি কি!

হেউ-উ বলে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে আবার একটা পান মুখে দিল। হোটেল থেকে একমুঠো খিলি তুলে এনেছে আসবার সময়।

বলাই বলে, আক্কেল বলিহারি ছোট চৌধুরির। উজোন টেনে এত কষ্ট করে ঘাটে পৌঁছে দিলাম, তা দু-আনার পয়সাও হাতে দিয়ে গেল না যে মানুষ দুটো অবেলায় চাট্টি মুড়ি কিনে খাবে।

জগন্নাথ বলে, চাকরিই যে আমাদের নৌকো বাওয়া। মুড়ির পয়সা বাড়তি দিতে যাবে কেন রে?

বলাই বলে, বয়ারখোলার তৈলক্ষ মোড়লকে দেখেছিস—জোতদার মানুষ, হটহট করে ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়ায়। সে-ও, দেখেছি, দূর-দূরন্তর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এনে তার পরে দানাপানি দেয়, ডলাইমলাই করে।

জগন্নাথ সংক্ষেপে বলে, ঘোড়া আর মানুষ!

যা-ই বলিস জগা, ছোট চৌধুরি মশায়ের টাকা থাকলে কি হবে—লোকটা আস্ত চামার।

জগন্নাথের এখন ভরা পেট। বলাই যত রাগ করে, তত তার মজা লাগে। বলে, অনুকূল চৌধুরি না হোক ভাগনে এসে তো আকণ্ঠ খাইয়ে দিল। তবে আর রাগ পুষে রাখিস কেন?

বলাই বলে, আর এটাই বা কী হল। নতুন মানুষ আসছে,

তার কোন্ দোষ? মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়। ক্ষিধের নাড়িতে পাক দিচ্ছিল, বলি-বলি করেও তোকে তখন বলতে পারলাম না। গদাধর ওকে এমনি ছাড়বে না। ঘুম ভেঙে উঠে মানুষটা কী বিপদে পড়বে দেখ ভেবে।

জগন্নাথ নির্বিকার কণ্ঠে বলে, পড়ুক গে। জামা-জুতো চড়িয়ে বরপাত্তর সেজে আসছে। কাদায় পা ফেলতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। দু-পাঁচ বছর বাদে হয়তো দেখবি, এই নতুন মানুষ আবার এক অনুকূল চৌধুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাবালে নামছে তো এইটুকু আক্কেলসেলামি দেবে না?

বলাইর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে হেসে ওঠে। বলে, সেঁটেছিস বড্ড বেশী। হাত খেলাবার জো নেই বুঝতে পারছি—দাঁড় তুলে বসে ধর্মকথা শোনাচ্ছিস। কুমিরমারির কেউ এসে পড়তে পারে। আর খানিকটা টেনে দে, তার পরে ওসব শুনব।

চার

আসার মুখটায় যেমন হয়েছিল, এই বিদায়-বেলাতেও গদাধর ভটচাজের একলার ব্যাপার রইল না। কুমিরমারি গঞ্জের তাবৎ বাসিন্দাই প্রতারিত হয়েছে, এমনি ভাব। সকলেই মারমুখ। অশেষ কান্নাকাটি করে এবং চটিজুতা ও গায়ের ছিটের কামিজ বন্ধক দিয়ে তবে ছাড় হল। তবে কোকিলবাড়ির সঠিক খোঁজ পাওয়া গেল বটে। এবং রাঙাবড়ি-খ্যাত মনোহর ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে বলেই এত অল্পে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। কড়ার রইল, টাকা প্রতি মাসিক এক আনা হারে সুদ সহ ঋণ শোধ করে এক বছরের মধ্যে জুতা-কামিজ খালাস করে নিয়ে যাবে। নয় তো অন্যের কাছে বিক্রি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

উঃ, কোকিলবাড়ি কি এখানে! আবার শেষ রাত্রে বেরিয়েছে—

হেঁটে হেঁটে কূল পায় না। অবশেষে পৌঁছানো গেল। যা বলে ছিল মনোহর—পুরো মানষেলা এলেকা। বাদাবন সরে গিয়ে দেড়-দু-দিনের পথ এখান থেকে। মানুষ এসে পড়ে বন একেবারে শেষ করেছে।

হাত ঘুরিয়ে মনোহর দেখাচ্ছে: পুকুর কাটবার সময় মোটা মোটা খুঁতুরগাছের গুঁড়ি উঠেছিল। অনেক পোড়ানো হয়ে গেছে, আরও গাদা-করা রয়েছে ঐ দেখ।

পশার করেছে বটে ডাক্তার মনোহর। গোড়ায় হোমিওপ্যাথি মতে দেখত, এখনও তাই। তবে, রাঙা বড়ি বের করার পর থেকে এদেশ-সেদেশ নাম পড়ে গেছে। জ্বর সারবে অব্যর্থ। জ্বরের ওষুধ আরও অনেক আছে—কিন্তু রাঙা বড়ির বিশেষত্ব, সেবনান্তে আপনি ভাত তো খাবেনই, আচ্ছা করে স্নান করবেন, ডাব ও তেঁতুল-গোলা খাবেন—জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে পালাবে। তবে সব অবস্থায় রাঙা বড়ি চলবে না, ডাক্তারের দেখেশুনে বিধান দিতে হয়। জ্বর ভিন্ন আরও নানান ব্যাধি রয়েছে। মনোহর ডাক্তারের তাই আহারনিদ্রার সময় নেই। নিয়ম করেছে, তিরিশটা করে রোগী দেখবে সকালবেলা। আর, পুরানো রোগী তো আছেই—তাদের বাদ দেওয়া যায় কেমন করে? রাত থাকতেই রোগীরা লাইন দেয়। শীত নেই, বর্ষা নেই। শেষ রাতে ঘুম ভাঙলে দেখতে পাবেন, উঠানে নেবুতলায় পুরুষের ভিড়। মেয়ে-রোগীরা দাওয়ার উপর উঠে বসেছে—তাদের আলাদা ব্যবস্থা। কম্পাউণ্ডার হরিদাস দাঁতন করে মুখ ধুয়ে এই মোটা খেরো-বাঁধানো খাতা নিয়ে এসে বসে: যে যেমন এসেছ, পর পর নাম বলে যাও। রোগীর নাম টুকে তাদের একে একে ডাক্তারের কাছে হাজির করে দেবে। শিশি হাতে করে এসেছে সকলে—ডাক্তার কাগজে ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছে, সেই মত ফোঁটা ফেলে জল ঢেলে শিশির গায়ে দাগ কেটে বিদায় করবে। আর রাঙা বড়ি হলে তো কথাই নেই, প্রকাণ্ড কৌটো রাঙা বড়িতে ভরতি—চারটে-ছটা করে দিয়ে দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে প্রজাপাঠক দু-চারজন এল তো তাদের নিয়ে বসতে হবে। ডাক্তারের হাত খালি হলে এর উপর ডাক্তারি বিদ্যার পাঠ নেওয়া আছে। হরিদাস নিশ্বাস ফেলার ফুরসত পায় না।

গগনের খাতির-যত্ন বিশেষ রকমের। সকলের পাশাপাশি ঠাঁই—তার মধ্যে মনোহর আর গগনের কেবল ভাত মোচার মতন সূঁচাল করে বাড়া, বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন। খেতে খেতে দেমাক করে মনোহর বলে, দেখছ ব্যাপার। আমার বিদ্যের ছিটেফোঁটাও যদি নিতে পার, টাকা বাক্সপেঁটরায় ধরবে না। দালান দিচ্ছি, জান। এই সব কাঁচা-ঘর একটাও থাকবে না, দোতলা পাকা দালান উঠবে। কত করলাম এই কটা বছরের মধ্যে! জমি-জিরেত বিষয়আশয়। সুমুখ-দুয়ারে পাছ-দুয়ারে দুটো পুকুর। পৈতৃক কী ছিল—আড়াই বিঘের ভিটেবাড়ি। আর কিছু নয়। দুটো তালগাছ চোদ্দ সিকেয় বিক্রি করে হোমিওপ্যাথি বাক্স কিনলাম। সেই বাক্স বগলে নিয়ে ভিটের মুখে লাথি মেরে ডিঙি ভাসিয়ে দিলাম। এইখানটা এসে চড়ায় ডিঙি আটকে গেল। আটকেছে তো নেমে পড়ি এখানে। যত-কিছু দেখতে পাও, সেই চোদ্দ সিকের বাক্স থেকে সমস্ত। মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম কর তুমি, দিয়ে দেব বিদ্যের খানিকটা। হরিদাস যেমন ডাক্তার হয়ে চলে যাচ্ছে। আরে, পাতে ভাত নেই—এই লতিকা, চাট্টি ভাত দিয়ে যা গগনকে। দুধ-কাঁঠাল রয়েছে, ভাত না হলে কি দিয়ে খাবে?

বড় মেয়েকে ডাকল। কিন্তু ভাত নিয়ে এল মেয়ে নয়—মনোহরের বউ। মনোহর খিঁচিয়ে ওঠে: কেন, সে গেল কোথায়? সেই নবাবনন্দিনী? তুমি যাও, তোমায় কে ডেকেছে?

বউ থমকে দাঁড়াল একটু। তার পরে ফিরে গেল ভাতের থালা নিয়ে। দীর্ঘ ঘোমটা। গিন্নীবান্নি মানুষের এতদূর ঘোমটা—গগনের কী রকমটা লাগে। এদিকে রেওয়াজ হয়তো এই। তখন মেয়ে এসে ভাত দিল—কালোকোলো মেয়ে, মোটাসোটা গড়ন।

কাজে ডাকলে সাড়া দিস নে কেন? কোথায় থাকিস?

নতুন লোকের সামনে খিঁচুনি খেয়ে মেয়ে চটে গেছে: বুঝব কেমন করে যে আমায় ডাকছ?

হরিদাস বলে, লতিকা বলে কখনো তো ডাকেন না ডাক্তারবাবু। সেইজন্যে বুঝতে পারে নি।

মনোহর বলে, মেয়ের ডাকনাম ভুতি। ওর দিদিমা দিয়েছিলেন। তা বিয়েথাওয়ার বয়স হল—ভুতি-ভুতি ভাল শোনায় না। লতিকা বলে ডাকবে তোমরা, বুঝলে? হরিদাস, তুমিও ডাকবে।

খাওয়ার পরে ডাক্তারখানা অর্থাৎ বাইরের ঘরে গিয়ে মনোহর বসল। গগনকে খাতির করে ডাকে, এস—

ডিবেয় করে পান দিয়েছে, কপ-কপ করে গোটা কয়েক মুখে ফেলে দিল। গগনের দিকে ডিবে এগিয়ে দেয়: খাও, পান খাও। গড়গড়ার উপর কলকে বসিয়ে দিয়ে গেছে, ভুড়ুক-ভুড়ুক করে টানছে। একটা বেঞ্চিতে রোগীরা বসে, সেটার উপর গগন বসে পড়েছে।

মনোহর বলে, ওই তক্তাপোশ হরিদাসের। এখানে শোয়। প্রায় সে ডাক্তার হয়ে উঠেছে। তুমিও হবে। সোনাব্যাং ঐ যে থপ-থপ করে লাফায়, গোড়ায় ছিল ব্যাঙাচি। গোড়ায় সকলে কম্পাউণ্ডার থাকে, আমিও ছিলাম। তুমি হলে সজাতি— আমার ঘরের ছেলে বললে হয়—তোমার জন্য সব করব। কিন্তু তার আগে গোড়ার কাজকর্মগুলো শিখে নাও মন দিয়ে।

গগন কৃতার্থ হয়ে বলে, যেমন-যেমন বলবেন তাই আমি করব। দোষ-ঘাট হলে মাপ করে নেবেন। ঠিক আমি শিখে নেব।

বাইরের ঘরের এক পাশের দাওয়া বেড়ায় ঘিরে কামরা বানিয়েছে। মনোহর বলে, ঐ ঘরে থাক আপাতত। হরিদাস ষোলআনা ডাক্তার হয়ে চলে যাবে। তখন তুমি খাস ডাক্তারখানায় গিয়ে উঠবে ওর ঐ তক্তাপোশে। সে যাক গে, পরের কথা পরে। কষ্ট করে এসেছ, খানিকটা গড়িয়ে নাওগে। কাজকর্ম আস্তে আস্তে বুঝে-সমঝে নিও।

ডাক্তারের ঘোড়া উঠানের ধারে ঘাস খেয়ে বেড়ায়। সামনের দু-পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে ছাঁদা, ছোটবার উপায় নেই, বেশীদূর যেতেও পারবে না। বিকালবেলা মনোহর বলে, এদিকে রাস্তাঘাট নেই, ঘোড়া বিনে ডাক্তারের এক মিনিট চলে না। ডাক্তারি করবে তো ঘোড়ায় চড়া শিখে নাও, ঘোড়ার সঙ্গে ভাব-সাব কর। ভারী বজ্জাত ঘোড়া, ভাবের লোক না হলে মানুষের মতন খাড়া দাঁড়িয়ে পিঠের সওয়ার ফেলে দেয়। কী রোগা হয়ে গেছে দেখ। এই কটা মাস ঘোড়ার বড় কষ্ট, ক্ষেতখামারে নামতে দেয় না। ধান কাটা হয়ে গেলে তখন আর হাঙ্গামা নেই, ঘাস খেয়ে খেয়ে গতরে ডবল হয়ে যাবে। এখন এমন অবস্থা, প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা শক্ত।

দূরের দিকে আঙুল দেখায়। বিলের নীচু অংশে জল জমে থাকে বারমাস, চাষবাস হয় না; চেঁচোঘাস আর কলমি দামে ছেয়ে আছে। ওখান থেকে এক বোঝা দু-বোঝা করে যদি কেটে নিয়ে এস বাবা, অবোলা জীব খেয়ে বাঁচবে। আর ঐ যা বললাম, কী রকম অনুগত হয়ে পড়বে দেখো ক'দিনের মধ্যে।

পাঁচ

অতএব ডাক্তারি-শিক্ষার সর্বপ্রথম ধাপ হল, এক-কোমর জলে দাঁড়িয়ে বোঝা বোঝা চেঁচোঘাস ও কলমির দাম কেটে এনে ডাক্তারের ঘোড়ার সঙ্গে ভাব জমানো। তাই সই। কষ্ট নইলে কেষ্ট মেলে না। গগন ভেবেচিন্তে দেখছে, ডাক্তারি কাজই সব চেয়ে ভাল তার পক্ষে। শিখে নিতে পারলে আবার গিয়ে বাড়িতে চেপে বসা যায়। চেনা জানা যত প্রতিবেশী—বিনিবউ চারুবালা। বাড়ির উপর বসে স্বাধীন ব্যবসা—গোলাম নই কারো। ইচ্ছে হল বেরুলাম—নয়তো বলে দিলাম, আজ হবে না, রোগীকে চেল্লাচেল্লি করতে মানা করে দাও, কাল-পরশু যেদিন হোক যাব।

একেবারে নতুন অঞ্চল। বাড়ি ছড়ে বেশী দিন বাইরে থাকা অভ্যাসও নয়। প্রথম রাত্রে গগনের ঘুম হচ্ছে না ভাল, ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে। বিনির কথা মনে পড়ে। কি করছে এখন—এই নিশিরাত্রে? কী আবার—অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে ননদ-ভাজে। চারুর মনটা সত্যি ভাল, অন্যের ব্যথাদুঃখ বোঝে। আসার আগের রাত্রে, দেখ না, কী কাণ্ডটা করল—চালাকি করে বিনি-বউকে ঢুকিয়ে দিল ঘরে। বড্ড বেহায়া কিন্তু, দাদা-বউদিকে নিয়ে মস্করা করতে বাধে না। আহা, এমন আমুদে মেয়ে—তার এই কপাল! বোনের কথা ভাবলে চোখে জল এসে যায়। আচ্ছা, বিনি-বউ একবার যা বলে ফেলে-ছিল—এই রকম দূর-অঞ্চলে চারুকে এনে কুমারী মেয়ে বলে বিয়ে দিলে হয় কেমন? চারুর ঘরবর হল, সুখশান্তি হল—এর চেয়ে আনন্দের কথা কী! চারুর জন্যই যা, নইলে বিনি-বউয়ের জন্য একটুও সে ভাবে না। অমন নিষ্ঠুর মেয়েমানুষ যে চুলোয় ইচ্ছে যাক—চুলোয় যাবার অবশ্য কোন আশঙ্কা নেই, বেজুত বুঝলে গিয়ে উঠবে বড়লোক ভাইদের বাড়ি।

হঠাৎ চমক লাগে। পাতা খড়খড় করছে বেড়ার ওদিকে। আমতলায় শুকনো পাতা পড়ে কাঁড়ি হয়ে আছে, তার উপরে কী যেন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। শেয়াল ঠিক—ঘর-কানাচে রাত্রিবেলা শেয়াল এসেছে কোন-কিছু খাবার লোভে। শেয়াল না কেঁদো, না অন্য কোন জন্তু? ফাঁক-ফাঁক বাখারির বেড়া—উঠে বসে গগন বেড়ায় চোখ রাখে। জন্তু নয়, মানুষ—খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে যাচ্ছে। হলে কি হবে—শুকনো পাতায় পা পড়লেই খড়মড়িয়ে ওঠে। দু-তিনটা আমগাছ ওদিকে, তার আড়ালে মানুষটাকে আর দেখা গেল না। নতুন জায়গায় এসেছে—ভয়ে গলা কাঠ, আওয়াজ বেরোয় না। আওয়াজ করেই বা কী হবে—অনেকক্ষণ জেগে রইল, আর কোন শব্দসাড়া নেই।

পরদিন সেই গল্প করছে হরিদাসের সঙ্গেঃ ঘুম ভেঙে গেল কম্পাউণ্ডার বাবু! আমতলায় কী চলাচল করছে। ভাবলাম শেয়াল—

হরিদাস আরও ভয় ধরিয়ে দেয়ঃ শেয়াল কী বলছ ভায়া, জায়গা খারাপ, এই শীতকালে বড়-শেয়াল অবধি ধাওয়া করে। আসল মানুষখেগো। সুন্দরবনের তল্লাট থেকে মানুষের গন্ধে গন্ধে চলে আসে গাঙ-খাল পার হয়ে।

গগনের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আরে সর্বনাশ, এ কোন্ জায়গায় এসে পড়ল কাজের ধান্দায়! খানিকটা যেন নিজেকেই সাহস দেবার জন্য ঘাড় নেড়ে বলে, জন্তু-জানোয়ার নয়, সে আমি ঠাহর করে দেখেছি। মানুষ।

তবে চোর। ডাকাতও হতে পারে। ঐ যে বললাম, সর্ব রকম গুণ আছে এই পোড়া জায়গার। ডাক্তারের টাকাপয়সা আছে, খুব রটনা কিনা—বদ লোকে তাই হাঁটাহাঁটি করে। সেইজন্যে, দেখ না, রোগী মাথা ভেঙে মরলেও সন্ধ্যের পর ডাক্তার বেরোয় না কিছুতে।

গগনও তাই ভাবছে, যে লোক এসেছিল, মন্দ মতলব নিশ্চয় তার। লোক যদি সাচ্চা হবে, তবে পা টিপে টিপে আলগোছে অমন চলবে কেন?

নতুন লোক গগনকে হরিদাস উপদেশ দিচ্ছেঃ একটা কথা শুনে রাখ। রাত্রিবেলা কখনো ঘরের বাইরে যাবে না। জন্তু হোক মানুষ হোক, কে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কিছু বলা যায় না।

গগন বিষম দমে যায়। একটু চুপ করে থেকে ভয়ে ভয়ে বলে, এমন যদি ঠেকে যাই না বেরিয়ে উপায় নেই? অসুখবিসুখ হয়েছে ধর, বেরুতেই হবে—

তেমন ক্ষেত্রে ডাকহাঁক করে আলো-টালো নিয়ে—কিন্তু দুয়োরে খিল এঁটে লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে থাকাই ভাল মোটের উপর।

গগন বোঝা বোঝা ঘাস কেটে আনে। ঘোড়ার পিঠে চড়ছেও দু-এক কদম। ডাক্তারির অভ্যাস করে নিচ্ছে এমনি ভাবে, ঘোড়ার সঙ্গে ভাব জমছে। ডাক্তারের ছেলেমেয়ের সঙ্গে এবং গিন্নীর সঙ্গেও

ভাব জমাবার চেষ্টায় আছে। পৌষ-সংক্রান্তির মেলার সময় কুমির-মারি গিয়ে সামান্য সম্বল যা আছে তাই থেকে চুলের ফিতে, টিনের বাঁশি, গোটা দুই পুতুল এবং গিন্নীর পানে খাওয়ার জন্য এক পোয়া মতিহারি তামাক কিনে আনল। কেউ কিছু বলবার আগেই শুকনো বাঁশ চেলা করে রান্নাঘরের দাওয়ায় রেখে আসে, রাঁধতে বসে গিন্নী ভিজে কাঠের জন্য কষ্ট না পায়। ফলও দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু। মনোহর এক-দিন এই মোটা ডাক্তারি বই বের করে দিল, তার পরিশিষ্টে পাতা কুড়িক ধরে ওষুধের তালিকা। ছাপা বাংলা অক্ষরেই বটে, কিন্তু বিদ্ঘুটে যত নাম। মনোহর বলে, ওষুধের নামগুলো জলের মতন মুখস্থ করে ফেল দিকি। তার পরে শিখিয়ে দেব কোন্ অসুখে কোন্টা খাটে।

উঠে পড়ে লাগল গগন। হরিদাস মিটিমিটি হাসে। সুবিধে করতে পারছে না, হাসিটা তাই ব্যঙ্গের মতো ঠেকে গগনের কাছে। দুপুরবেলা না গড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেঁচিয়ে দশ-পনেরটা নাম মুখস্থ করে ফেলল—খানিক বাদে ছাপার উপর হাত চাপা দিয়ে ধরে দেখে, সমস্ত বেমালুম সাফ হয়ে গেছে মন থেকে। মনোহরকে এ সমস্ত জানাতে সাহস হয় না—হয়তো বলবে, তোমার দ্বারা ডাক্তারি হবে না, সরে পড় তুমি। হরিদাসের সঙ্গে খাতির হয়েছে—চুপি চুপি তাকে বলে কী করা যায় কম্পাউণ্ডার বাবু, মাথায় যে কিছু রাখা যাচ্ছে না? ইপিকাক-বেলেডোনা-একোনাইট—এত সমস্ত যদি মনে থাকবে, তবে তো জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যেতাম।

হরিদাস হেসে বলে, কদ্দিন হল? মাঘে এসেছ, আর এটা হল গে বোশেখ। সবে চার মাসে পড়েছে। বিদ্যেটা এত সোজা হলে কেউ আর রোগী থাকত না, ঘরে ঘরে সব ডাক্তার হয়ে যেত।

গগন বলে, চার মাস বলে কি, যা ব্যাপার, চার বচ্ছরেও তো ওর একটা পাতা মুখস্থ হবে না।

হরিদাসের হাসি বেড়ে যায়: তবে শোন, আমি এই আড়াই বছর সাগরেদি করে করে শেষটা সার বুঝে নিয়েছি। চিকিচ্ছে

দু-রকমের—এক হল পড়ে শুনে লক্ষণ বিচার করে ওষুধ দেওয়া আর এক রকম—বাক্সের ভিতর ফুটোয় ফুটোয় ওষুধের শিশি সাজানো, রোগী দেখে তার পরে বাক্সের ডালা একটুখানি তুলে মহাত্মা হ্যানিম্যানের নাম ভক্তিভরে স্মরণ করে হাত ঢুকিয়ে দেবে বাক্সের ভিতরে। যে ছিপির উপরে আঙুল পড়ল, সেই শিশি থেকে ফোঁটা দাও। ঠিক লেগে যাবে। তোমার কিছু ভাবতে হবে না, যে মহাপুরুষের নাম নিলে ভাবনা-চিন্তা বিচার-বিবেচনা তিনি সব করছেন। এইটেই খুব চালু আজকাল। যত দেখতে পাও, বেশির ভাগ এই মতের ডাক্তার।

সহসা চারিদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বলল, ওষুধ বটে রাঙা বড়ি! ওরই ধান্দায় ঘুরছি রে ভাই, নয়তো কবে এদ্দিন ডাক্তার হয়ে বসতাম। কি কি সব গাছগাছড়া দিয়ে বানায়—কুনিয়ানটা মেশায় জানি। কিন্তু ভারী ঘড়েল, কাউকে কিছু বলবে না। নিজের হাতে সমস্ত মিশাল করে, ভূতি বেটে দেয়। ঘরের দুয়োর-জানলা এঁটে ওষুধ বানায়। কাউকে ঢুকতে দেয় না, বউকেও না—ঐ এক ভূতি। ভূতিটা জানে সমস্ত।

রাঙা বড়ির তত্ত্ব মনোহর সদয় হয়ে শিখিয়ে দেন তো ভালই—কিন্তু হোমিওপ্যাথির যে দ্বিতীয় পদ্ধতি শোনা গেল, তার পরে গগন আর ডরায় না। জয় মহাত্মা হ্যানিমান,—এটা সে খুব পারবে। আড়াই বছরে হরিদাস কিন্তু অঢেল শিখে ফেলেছে। মনোহর নাম বলা মাত্র এক বাক্স ওষুধের মধ্যে দরকারী ওষুধটা বের করে ফোঁটা ফেলে দেয়—চট করে বের করে, তিলেক দেরি হয় না। এর উপরে আছে হোমিও-বিজ্ঞান বই। হরিদাস অতএব প্রথম পদ্ধতিতেও অপারগ হবে না। কোন্ ডাক্তার এর অধিক জেনে চিকিৎসায় নামে?

গগনেরও কিছু উন্নতি হয়েছে ইতিমধ্যে, দু-চার পয়সা হাতে আসছে। মনোহর ভারী সদয়। আষাঢ়-শ্রাবণে তাবৎ অঞ্চল জলে ভরে যায়। ঘোড়ার চেয়ে নৌকার চলাচল বেশী সেই সময়টা, রোগীর বাড়ি থেকে নৌকো আসে ডাক্তার নিয়ে যাবার জন্য। মনোহর একা

যায় না কখনো। একা না বোকা—কত রকমের বিপদ ঘটতে পারে। কম্পাউণ্ডার সঙ্গে নিয়ে যায়। আগে হরিদাসকে নিত, এখনো নেয়—মাঝে মাঝে এখন হরিদাসের বদলে গগনকে নিয়ে যায়। হরিদাস রাগ করেঃ ওকে নিয়ে যাচ্ছ, ও কি করবে ডাক্তারবাবু?

মনোহরের উপর কথা বললে সে খুব চটে যায়। বলে, তুমিই বা কি করে থাক? শিশি বের করে ফোঁটা ফেলা—সেটা আমিই করে দেব। দু-আনা চার-আনা না পেলে ও-ই বা পড়ে থাকে কোন্ আশায়? ষোলআনা লোভ করতে নেই, কিছু ভাগ ছাড়তে হয়।

হরিদাসও সেটা বুঝে দেখেছে বোধ হয়—তার পর থেকে আর কিছু বলে না। গগন অতএব যাচ্ছে মাঝে মাঝে কম্পাউণ্ডার হয়ে। কম্পাউণ্ডারের কাজ ঘাট থেকে রোগীর বাড়ি অবধি ওষুধের বাক্স পৌঁছে দেওয়া, এবং ফেরত নিয়ে আসা। নিজের ভিজিট নেবার পরে ডাক্তার বলে, কই, কম্পাউণ্ডারের ভিজিট? এক সিকি—বাঁধা রেট। এমনি ভাবে যা আসে, সেটা নিতান্ত হেলাফেলার নয়।

ছয়

পয়সা বড় খারাপ জিনিস। যেন পোকা—মুঠোর মধ্যে কুটকুট করে কামড়ায়। মুঠো খুলে ছুঁড়ে না দেওয়া পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। গগনের অন্তত সেই রকম মনে হয়।

অঞ্চলের মধ্যে পয়সা খরচের জায়গা একমাত্র কুমিরমারি গঞ্জ এবং বাইরের অচেনা অজানা মানুষজন দেখবার জায়গা। পরিচিত জায়গাটুকুর মধ্যে ঘোরাফেরা করে এক এক সময় মন তার হাঁপিয়ে ওঠে। হাটবার দেখে কোন এক হাটুরে নৌকোয় চেপে

বসে তখন। হাটুরে নৌকো একরকম উড়িয়ে নিয়ে কুমিরমারি হাজির করে

হল জনপদের মানুষ আবাদের মানুষের মোলাকাতের

আবাদের মা: কাপড়চোপড় ডালকলাই ও শখের দশটা জিনিস সওদা করতে। আর গাঁ-গ্রামের মানুষ এসে জোটে আবাদের ধানচাল ও মাছ—এবং জঙ্গলের গোলপাতা, গরানকাঠ, মধু ইত্যাদি আমদানি হয় বলে। এই কুমিরমারিতে গগনের দুর্গতি—জামা-জুতো বন্ধক দিয়ে বেরুতে হল। বন্ধকী জিনিস পড়ে আছে আজও গদাধরের কাছে। সেদিককার ছায়াও মাড়ায় না গগন। হোটেলের পাওনা সেই চার টাকা ছ আনা সুদে-আসলে এতদিনে বোধ হয় টাকা দশেকে দাঁড়াল। চেষ্টাচরিত্র করে গগন শোধ যে না করতে পারে এমন নয়। কিন্তু জুতো-জামা নিতান্তই বাহুল্য এ অঞ্চলে। বর্ষায় একহাঁটু কাদা, শুকনোয় একহাঁটু ধূলো—জুতো পরে ঘোরে কোন জায়গায়? জুতো এক আপদ বিশেষ—বাঁ হাতটা আটক থাকে জুতো বওয়ার কারণে। জামা পরলেও মুশকিল—লোকে চোখ বড় বড় করে তাকায়, হাসি-ঠাট্টাও করে অনেক সময় মুখের উপর। টাকাপয়সায় ধনী বয়সে প্রবীণ মনোহর ডাক্তারের মত কেউ হলে অবশ্য আলাদা কথা। সাধারণ লোকের আদুল গা, শীতের সময় একটা গায়ের কাপড় কিংবা কাঁথা-কম্বল যা-হোক কিছু। অকারণে জুতো-জামার বোঝা বয়ে বেড়ানোয় মানুষ বড় নারাজ।

কুমিরমারি গিয়ে গগন হাটের মধ্যে চক্কোর দিয়ে বেড়ায়। জিনিসপত্তর দরাদরি করে। চার-পাঁচটা ফড়খেলার দল আসে, তাদের ওদিকটা ভিড় খুব। গগনও তার মধ্যে গিয়ে বসে পড়ে। খেলায় হেরে যায়, দু-চার আনা জেতেও কচিৎ-কদাচিৎ—ফূর্তিতে সেই পয়সায় এটা-ওটা কিনে আনে। একবার আলতা এনে দিল ভূতিকে। ভূতি কার সঙ্গে বলছিল যেন আলতার কথা—বর্ষা কেটে গেল, চারিদিক খটখটে হবে, পায়ে কাদা লাগবে না, আলতা

পরে বেড়ানোর সময় এইবার। তাই এক শিশি আলতা কিনে আনল।

রোগীর বাড়ি যাওয়ার দরুন কটা হাট কামাই গেছে। তার পরে গগন গিয়ে শুনল, ফড়ের আড্ডায় কোথাকার এক জোয়ান-ছোকরা এসে তাজ্জব খেলা খেলছে। আগের হাটে এসেছিল, এ হাটেও এসেছে। সে এমন খেলা, চোখে পলক ফেলবার উপায় থাকে না। কোন্ ঘরে গুঁটি ধরলে অবধারিত জয়, গুঁটিই যেন কানে কানে বলে দেয় তাকে। জিতছে, জিতছে—সকলের গাঁটের কড়ি একাই প্রায় জিতে নেয়। গুণজ্ঞান জানে ঠিক।

দূর! গুণজ্ঞান না হাতি—হাতের কায়দা-কৌশল। দেখতে হয় তো ব্যাপারটা কি!

বিষম ভিড়। ভিড় ঠেলে বিস্তর কষ্টে কাছাকাছি গেল। গিয়েই বেরিয়ে চলে আসে। সেই শয়তানটা—জগন্নাথ। খাতির করে সবুজ বোটে তুলে এনে এই কুমিরমারির উপরে বোকা বানিয়ে রেখে গেল। কম নাকালটা হতে হয়েছে! আজকে হয়তো হাসবে জগা ফ্যা-ফ্যা করে। জগার নজরে না পড়ে—ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে হাটুরে নৌকোয় চড়ে বসল। যখন ছাড়বার ছাড়ুকগে নৌকো। ছইয়ের মধ্যে সে লুকিয়ে বসে আছে।

সেদিন নয়, কিন্তু দেখা হয়ে গেল তিন-চার হাট পরে। কুমির-মারি হেন জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বায়স্কোপের দল এসেছে। টিকিট কেটে গগনও ঢুকে পড়ল। খেলা ভাঙল, হাট তার অনেক আগে ভেঙে গেছে। গাঙের ঘাটে এসে দেখে—সর্বনাশ, সাথীদের এত করে বলে গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও গোন পেয়ে নৌকো নিয়ে তারা চলে গেছে। একলা মানুষের ভাড়া-করা নৌকো নয়—একের জন্য সকলে অসুবিধা ভোগ করবে কেন?

শেষ চেষ্টা হিসাবে তবু সে ঘাটের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। যত নৌকো বাঁধা রয়েছে, সকলকে জিজ্ঞাসা করে, কখন ছাড়বে—কোন কোন্‌দিকে যাবে তোমরা মাঝি? অন্ধকারে নৌকোর

কাড়ালের দিকে কে-একজন বসে গোপীযন্ত্র সহযোগে দেহতত্ত্বের গান ধরেছে। শোনবার মত গলা বটে! ঘরে ফিরবার এত উদ্বেগ—তা সত্ত্বেও থমকে দাঁড়িয়ে শুনছে গগন।

গান থামিয়ে গায়ক ডাক দিল, দাঁড়িয়ে কেন বড়দা, উঠে এসে ভাল হয়ে বস।

চিনেছে এবার—জগন্নাথ। শয়তানটার ক্ষমতাও অনেক। মরি মরি, কী গান গাইছে! মন হরণ করে নেয়। কিন্তু ক্ষমতা যা-ই থাকুক, ও-লোকের সঙ্গে আর নয়। মুখ ফিরিয়ে গগন হনহন করে চলল। জগাও নাছোড়বান্দা। গোপীযন্ত্র ফেলে এক লাফে ডাঙায় পড়ে পিছু নিয়েছে।

কী হল ও বড়দা? দাঁড়াও। সেদিন ফড়খেলার ওখানে এক নজর দেখলাম। বেরিয়ে চলে গেলে। আজও ছুটেছ। আমায় চিনতে পারছ না?

গগন দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, চৌধুরির ভাগনে হলাম আমি। হুজুর বলে ডাক ছাড়বে। বড়দা বললে চিনি কেমন করে?

জগা বলে, উঁহু, বড়দাই তুমি। পয়লা দিন সাজগোজ দেখে ভেবেছিলাম কে না কে। গায়ের জঞ্জাল ফেলে হালকা হয়ে আজকে কেমন ঘোরাফেরা করছ। এখন আপনার মানুষ, আর কোন গোল-মাল হবে না।

এক গাল হেসে বলে, ছোটভাইয়ের বজ্জাতি মনে বুঝি গিঁঠ দিয়ে রেখেছ! পেটের ক্ষিধেয় লোকে মানুষ খুন করে ফেলে। সেদিন কিন্তু খাইয়েছিল বড্ড ভাল। কিছু মনে কর না বড়দা।

খপ করে হাত জড়িয়ে ধরল। টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। গগন আপত্তি করে না। শীতের অন্ধকারে নিরাশ্রয় ঘুরে বেড়াচ্ছে, নৌকোর উপরে এর চেয়ে মন্দ হবে না।

কোথায় যাচ্ছ এখন বড়দা? হাটে কি করতে এসেছিলে?

গগনের কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনে বলে, আমাদের নৌকো ঘাট ছেড়ে নড়বে না এখন দশ-বারটা দিন।

গগন রাগ করে বলে, নড়লেও যাচ্ছি কিনা তোমার নৌকোয়! মরে গেলেও না। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।

জগন্নাথ বলে, কেন লজ্জা দাও বড়দা। বললাম তো, বড়দা বলে চিনতে পারি নি তখন। কোন হুজুর-টুজুর ভেবেছিলাম। আপন বলে বুঝি নি—ভেবেছিলাম পর-অপর কেউ। কী করলে রাগ যায়, সেইটে বল। পা জড়িয়ে ধরব?

সত্যি সত্যি পা ধরতে যায়। লোকটা পাগল। বলে, সেদিন খালি বোট ছিল—ষোলআনা নিজের এক্তিয়ারে। চৌধুরিগঞ্জে নেমে ছোট-চৌধুরি বোট ছেড়ে দিল। ফুলতলায় ওদের বাড়ি—বলে, বোট বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়। তাই যাচ্ছিলাম। চৌধুরির কাজ ছেড়ে দিয়ে এবার বাদাবনের কাজ ধরেছি। বাদা থেকে আসছি। কোথাও নড়বার জো নেই—এক হাট দু হাট এখন এই ঘাটে বসে থাকতে হবে। গোলপাতা কেটে এনেছি, আধাআধি তার বাকি। মধুও আছে কিছু। এইগুলো সারা হয়ে গেলে সোজা দক্ষিণে আবার বাদায় পাড়ি ধরব। তা নৌকোর গরজ কি বড়দা, পথ তো আট-দশ ক্রোশ—সকালে উঠে চরণতরী চালিয়ে দিও, পহর খানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে!

নৌকোর কর্তাব্যক্তি কেউ নয় জগন্নাথ—হালে বসে, বাদায় নেমে কুড়াল হাতে জঙ্গলে ঢুকে যায়। কাজের গুণে তার খাতির খুব, সকলে কথা শোনে। বাসন ধুচ্ছিল বলাই গলুইতে বসে, জগার সেদিনের সেই সঙ্গী। তাকে ডেকে বলল, হাঁড়িতে ভাত আছে বলাই, বড়দার জন্যে হবে চাট্টি? হুঁ, ভাত রেখে দেবে এরা তেমনি পাত্তর বটে! যা-কিছু রসুই হয়, পেটে পুরে নিশ্চিন্ত। মাটির জিনিস বলে হাঁড়ি-মালসাগুলো শুধু বাদ রেখে দেয়। বড়দা, রাঁধাবাড়া আসে তোমার—ভাতে-ভাত দেবে চাপিয়ে?

গগনের রাগের শান্তি হয়েছে। বলে, এই রাতে উনুন ধরিয়ে এখন কি হবে—রান্নার ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই।

তবে মুড়ি মধু আর ঘটি দুই জল খেয়ে গড়িয়ে পড় একখানে।

নৌকোর পাটাতনে জগন্নাথের পাশাপাশি শুয়ে সে রাত্রে অনেক কথাবার্তা হল। ছোকরার মাথায় পোকা আছে—এমনি কিন্তু ভাল, সদালাপী। বলে, বড়দার কী করা হয়, সেটা তো শুনলাম না।

ডাক্তারি শিখছি। লিখতে পড়তে জানলে এই বিপদ—ঘরবাড়ি ছেড়ে চাকরির তল্লাসে বেরুতে হয়। তখন আর লাঙলের মুঠো ধরা যায় না। লাঙলে পেটের ভাত জোটেও না আজকাল, সঙ্গে এটা-ওটা করতে হয়।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল গগন। বলে, আমি ভেবেচিন্তে এই পথে এলাম ভাই। স্বাধীন ব্যবসা। ডাক্তার হতে পারলে আবার গিয়ে ভিটেয় চেপে বসব—বিদেশ-বিভূঁয়ে হা-পিত্যেশ করে বেড়াতে হবে না।

জগন্নাথ হেসে বলে, দাদা বলেছি, গুরুলোক তুমি এখন। বলাটা ঠিক হচ্ছে না—কিন্তু খুঁটোয় বাঁধা গরু তোমরা। ভিটে বেড় দিয়ে চক্কোর মার। আরে, বেরিয়েছ তো আবার কেন সেই খোপে ফিরবে? ডাঙারাজ্যে মানুষ কিলবিল করে। জায়গাজমি টাকা-পয়সা সকলে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। একটা রোগী হল তো আট ডাক্তার আট দিক থেকে শকুনের মত খুবলে খুবলে খাচ্ছে—কী করবে তার মধ্যে গিয়ে? বুদ্ধি শোন বড়দা, ডাঙার দেশ নয়—ভাঁটি ধরে তরতর করে নেমে যাবে গাজির নাম নিয়ে। এইটুকু মাত্তর এসেছ—আরও নাম। অনেক দূর নেমে যাও। কত বড় দুনিয়া! মানুষজন এখনো সেদিকে জমতে পারে নি—তুমি গেলে তুমিও দিব্যি জমিয়ে নেবে। ভাত-কাপড়ের ভাবনা ভাবতে হবে না।

গল্প করছে সেই বাদা অঞ্চলের। ক্ষুধার্ত মানুষ গিয়ে পড়ে জঙ্গলে। জঙ্গল ভরা ভরে দেয়। সুঁদুরি পশুর বাইন গরান—কাঠ কত রকমের! গোলপাতা। ঘষা কাচের রঙের মধু-ভরা চাক। জলে জাল ফেলেছ তো মাছের ভারে টেনে তুলতে পারবে না।

বাদাবন মায়া জানে। দু বার চার বার গিয়েছ কি নেশা ধরে যাবে। তখন আর রোজগারের ধান্দায় নয়—যেতেই হবে

তোমাকে, না গিয়ে উপায় নেই। বুড়োথুখ্‌ড়ে বাওয়ালি—ঘর-উঠোন করতেও কষ্ট হয়—সেই মানুষটারও দেখবে বাদার নামে কোটরের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। এপারে ওপারে ঘন সবুজ বন, পাড় ভাঙছে, ঝপাঝপ কুমির নেমে পড়ছে জলে, চরের উপর হরিণ চরছে, ডালে ডালে বানর, বাঘ হামলা দিয়ে ওঠে কোথাও কোন দূরের বনান্তরালে, স্রোত ডেকে চলেছে কলকল আওয়াজে। সাদা লাল গেরুয়া নানান রঙের পাল ফুলিয়ে নৌকোর বহর যাচ্ছে—তারই একখানার সওয়ারী হয়ে যাবার জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করবে তোমার বুকের ভিতরে।

আর একদিন গগন এমনি কুমিরমারি গিয়েছিল। ফিরে আসছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। এমন আগেও হয়েছে—ঘাটে পৌঁছতে বেশী রাত্রি হয়ে গেল তো নৌকোয় পড়ে থাকে, সকালবেলা বাড়ি যায়। বড় গাঙে টান বিষম। তরতর করে ছুটছে হাটুরে নৌকো। বাঁক ঘুরে হঠাৎ এক স্টীমার এসে পড়ল একেবারে সামনে। স্টীমারের এটা নিয়মিত পথ নয়—কালে-ভদ্রে কদাচিৎ বাঁক ঘুরে গিয়ে ওঠে দোখালায় কোন কারণে জল খুব কমে যায় যদি। আজও তাই হয়েছে। নৌকো আরও সব যাচ্ছে—সার্চলাইট পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে দাঁড়ি-মাঝি সকলের। ঢেউ উঠল সমুদ্র-তরঙ্গের মত, সামাল-সামাল পড়ে গেছে, প্রাণপণে বাইছে দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টায়। এমনি সময় বিষম জোরে এক বোঝাই সাঙড়-নৌকোর সঙ্গে ঠোকাঠুকি। আলোয় ধাঁধা লেগেছে, কিছু দেখা যায় নি। হৈ-হৈ রব উঠল। তক্তার জোড় খুলে গেছে, কলকল করে জল উঠছে। তবু রক্ষা, মানুষজন জখম হয় নি কেউ। চরও আছে একটা অদূরে। খানিকটা বেয়ে কাছাকাছি নিয়ে এসে ঝপাঝপ সকলে জলে পড়ে নৌকো টেনেটুনে সেখানে নিয়ে তুলল।

জলকাদা মেখে ভিজে কাপড়ে দু ক্রোশ ভেঙে গগন নিশিরাত্রে বাড়ি চলে আসে। প্রাণ যেতে বসেছিল, তখন কেমন যেন ঘোরের

মধ্যে ছিল, বাড়ির কাছে এসে ভয়-ভয় করছে। কত জনকে বলল, বাড়ি অবধি এগিয়ে দাও—তা সবাই এখন নিজের ঘরে পৌঁছতে ব্যস্ত, পরোপকারে প্রবৃত্তি নেই। ঠাট্টা করে বলে, গাঁয়ে উঠে যে বরপাত্তর হয়ে গেলে! লণ্ঠন ধরে দিয়ে আসতে হবে নাকি?

বাড়ির উঠোনে আমতলার অন্ধকারে গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে মানুষ একজন। মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষের মতন কাপড়চোপড় পরা। রাতদুপুরে মেয়েমানুষ ওখানে কি করছে—পেত্নী? গায়ে কাঁটা দিয়েছে। কোন দিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সে দাওয়ায় উঠে পড়ল। তালা খুলে কামরায় ঢুকে আলো জ্বালল। ধড়ে প্রাণ আসে এতক্ষণে। বাইরের ঘরের বেড়ায় ঘা দিচ্ছেঃ ওঠ একবার কম্পাউণ্ডারবাবু, উঠে এস।

কী ঘুম রে বাবা! বেড়া ভেঙে ফেলবার মত করেছে, তবু সাড়া দেয় না।

তখন আলো নিয়ে নিজেই বেরিয়ে আসে। বাইরের ঘরের দরজা ঝাঁকাঝাঁকি করবে। হরিদাসকে ঘটনাটা বলার দরকার, না বলে সোয়াস্তি পাচ্ছে না। দরজা ভেজানো আছে—কী ব্যাপার, হাত দিতেই খুলে গেল। হরিদাস নেই, বিছানা খালি।

হরিদাস তক্ষুনি এসে পড়ল। দেখেছে নিশ্চয় গগনকে তার ঘরে ঢুকতে। কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় না। হরিদাস নিজে থেকে বলছে, দেখে ফেলেছ তাতে ক্ষতি নেই। নিজের লোক তুমি, তোমায় সব খুলে বলতাম। ভুতিকে আজ বাইরে ডেকে নিয়ে এসেছিলাম।

অতএব মেয়েটা হল ভুতি। এবং হরিদাসও ছিল, তাকে সে দেখতে পায় নি। খুব অন্তরঙ্গ সুরে হরিদাস বলে, ভুতিকে ধরে রাঙা বড়ি আদায়ের ফিকিরে আছি। মনোহর ডাক্তারের মতলব ভাল নয়, সে কিছু দেবে না। রাঙা বড়ির লোভে তিন বচ্ছর বেগার খেটে মরছি, নয় তো কোনকালে ডাক্তার হয়ে বসতাম। ইদানীং খুব তোয়াজ করছি ভুতিটাকে। আরে, তুমি যে মতলবে

তরল-আলতা চুলের কাঁটা কিনে দাও, ঠিক তাই। প্রায় পটিয়ে এনেছি। বলছে তো দিয়ে দেবে আমায় সমস্ত। কিন্তু খবরদার ভাই, কেউ টের না পায়, মুখাগ্রে আনবে না এসব ব্যাপার। আমি রাঙা বড়ি পেলে তোমাকেও শিখিয়ে দেব। একা খাব না, দিব্যি করে বলছি।

শুয়ে শুয়ে আজ আবার গগনের ঘুম আসে না। ভাবছে এইসব। রাত-দুপুরে মেয়েটাকে ঘরের বার করে এনেছে—শুধুমাত্র রাঙা বড়িই তার কারণ? ঐ কুরূপ-কুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে তা ছাড়া আর কী ব্যাপার থাকতে পারে! মতলব করে খাতির জমাচ্ছে। খাতির যে জমেছে, আমতলায় ঐ রকম আলসে বসে থাকার ভঙ্গিতে বোঝা গেল।

কী দায় পড়েছে, কাকে কি বলতে যাবে? কোন-কিছু দেখে নি গগন, কিছু জানে না, এই বেশ। হরিদাসকে মাঝে মাঝে তাগাদা দেয়, কম্পাউণ্ডারবাবু, কদ্দূর?

হরিদাস বলে, এখন না তখন করছে কেবলই। ঘড়েল মেয়ে—বাইরে ন্যাকা-বোকা দেখ, আসলে তা নয়। তবে আমিও ছাড়ন-পাত্তর নই।

রাতবিরেতে ডেকো না অমন করে। খারাপ দেখায়।

দিনমানে নিরিবিলি পাই কোথা? লোকের মধ্যে এসব কথা হয় না—

থেমে গিয়ে হরিদাস হঠাৎ খলখল করে হাসে: বলি, আর-কিছু ভাবলে নাকি? ঐ তো একরত্তি মেয়ে, কালকুটি পাথরের বাটি—আমি এক আধবুড়ো মানুষ তার সঙ্গে ভাব করতে যাব? তবে হ্যাঁ, অবরে-সবরে দেখাতে হয় একটু গদগদ অবস্থা। বলে দিক না ওষুধটা—যেদিন যক্ষুনি বলবে, তার পরে দেখতে পাবে হরিদাস আর নেই, হরিদাস হাওয়া।

বলেই কথা ঘুরিয়ে নেয়: তোমার সঙ্গে কথার খেলাপ হবে না—তোমায় বলে-কয়ে ফয়শালা করে তবে এ জায়গা থেকে নড়ব।

মনে সন্দেহ রেখো না তায়া। চোখ মেলে চুপচাপ তুমি শুধু দেখে যাও।

অধিক দেখবার সময় হল না। মাসটাও কাটে নি। মনোহর ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল কোন্ দিকে। খটাখট খটাখট জোর কদমে এসে উঠানে লাফিয়ে পড়ল।

ঘরে আছ হরিদাস? শোন এদিকে—

বেলা দুপুর। হরিদাস স্নান করে এসে ডাক্তারখানার ভিতর টেরি কাটছিল। রান্নাঘর থেকে ডাকাডাকি করছে, এইবারে খেতে যাবে। মনোহরের আহ্বানে চিরুনি ফেলে পুলকিত হয়ে বেরিয়ে এল। জরুরি ডাক আছে নিশ্চয় কোথাও, যেতে হবে ডাক্তারের সঙ্গে। প্রাপ্তিযোগ আছে অতএব।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হরিদাস বলে, যেতে হবে ডাক্তারবাবু?

হ্যাঁ, দূর হয়ে যেতে হবে—

ঠাঁই করে চড় কষে দিল তার গালে। বলে, এখনই—এই দণ্ডে।

তাজ্জব ব্যাপার। হরিদাস জোয়ান-পুরুষ—গায়ে-গতরে আছে দস্তুরমত। সেই লোককে চড় মারল এক তালপাতার সেপাই মনোহর। মার খেয়ে হরিদাস কেন্নোর মতো গুটিয়ে গেছে।

বেরিয়ে যা বলছি—জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, ফেরেব্বাজ—

তীরবেগে মনোহর ডাক্তারখানায় ঢুকে গেল। হরিদাসের টিনের তোরঙ্গ ছুঁড়ে দিল ঘরের ভিতর থেকে। ডালা খুলে কাপড়চোপড় উঠোনের ধুলোয় ছড়িয়ে গেল। বাবুমানুষ হরিদাস—কিন্তু বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করে না, একটি কথা বলে না, কুড়িয়ে আবার সমস্ত তোরঙ্গের ভিতর রাখে।

গগন আজ ঘাস কাটতে গিয়েছিল, বোঝা ফেলে ঘাম মুছতে মুছতে দাঁড়াল। সদর উঠান—এদিক-ওদিক থেকে আরও

লোক এসে জুটেছে। মনোহর হুঙ্কার দিয়ে উঠল: জটিরাম ভড় তোর মামা?

মাথা ঝাঁকিয়ে হরিদাস বলে ওঠে, না তো—

ফের মিথ্যে কথা?

ছুটে যায় মনোহর তার দিকে। তার পর এত মানুষ দেখেই বোধ করি সামলে দাঁড়ায়। সকলের দিকে চেয়ে বলে, সিরাজকাটি রোগী দেখতে গিয়েছি—লোকটা এসে খাতির জমায়। রোগীর কি রকম আত্মীয়, অর্ধেক ভিজিট দিতে চায়। বলে, হরিদাস এলে তাকে দিয়েই বলাতাম। আমার ভাগনে—আপন ভাগনে।

হরিদাস বলে, মিথ্যে কথা—

কিন্তু গলায় জোর নেই, মিন-মিন করে বলল। মনোহর বলে, মিথ্যে? থাক তবে সন্ধ্যে অবধি। সন্ধ্যের দিকে জটিরাম রোগীর খবরাখবর নিয়ে আসবে। দশের মধ্যে তখন মুকাবেলা হবে। তোর চোদ্দপুরুষের খবর বলে দিল—বেশ, মিথ্যে হয় তো বেঁচে গেলি। সত্যি হলে পিটিয়ে তক্তা করব বাড়িসুদ্ধ গ্রামসুদ্ধ মিলে।

গগনকে বলে, আটকে রাখ বাবা, শয়তানকে যেতে দিও না। গোলমাল করে তো খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখবে। আসুক সেই জটিরাম।

কিন্তু হরিদাসের কানেই গেল না আর কোন কথা। তোরঙ্গ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। জটিরামের আসা অবধি থাকবে কি— রান্নাঘরের দাওয়ায় ভাত বেড়ে দিয়েছে, তারও দু-গ্রাস খেয়ে গেল না। নিরম্বু বিদায় হল ঐ অত বেলায়।

মনোহর হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে: জাত ভাঁড়িয়ে ছিল আমার কাছে। আমি যেমন সোজা মানুষ, যে যা বলে বিশ্বাস করি। রান্নাঘরে উঠেছে, একসঙ্গে খেয়েছি-দেয়েছি, হুঁকো টেনেছে— জাতজন্ম একেবারে নিকেশ করে দিয়ে চলে গেল।

তখন সকলে বোঝাচ্ছে: বুঝদার লোক তুমি ডাক্তার, জাত নিয়ে অমনধারা কর কেন? বামুনের ছেলে মুরগি মেরে বেড়াচ্ছে,

পৈতে খুলে ধোপার বাড়ি কাচতে দেয়—জাতজন্ম ক'জনের আছে জিজ্ঞাসা করি।

মনোহর অধীর হয়ে বলে, কারো না থাক আমার আছে, আমি ষোলআনা মানি। গঙ্গায় ডুব দিয়ে পাপ ধুয়ে আসব, গোবর খাব, ঠাকুরমশায়রা যে বিধান দেন সেই মত প্রাচিত্তির করব।

হরিদাস বিদায় হল। আরও কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে মনোহর গগনের দিকে চেয়ে বলল, রোগীর নাম লিখতে লেগে যাও কাল সকাল থেকে। আমায় তো জান, অত ভোরবেলা উঠতে পারি নে। নামগুলো লিখে তুমি চলে যেও, পরের যত কিছু আমি করব। পারবে না ?

গগন ঘাড় নাড়ল। কী ভেবেছে মনোহর তার সম্বন্ধে, কটা নাম লিখতেও পারে না ! অদৃষ্ট ভাল, দেখা যাচ্ছে। ধাঁ করে উন্নতি। এর আগে যারা এসেছে, হরিদাসের কাছে শোনা, ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে এগুতে হয়েছে তাদের।

নাম লিখে রোগীর খাতা ডাক্তারের হাতে দিয়ে গগন ছুটোছুটি করে নাবালে নামল। বেলা হয়ে গেছে, রোদ চড়চড়ে হয়েছে এর মধ্যে। ফাঁকা বিলে রোদের ভিতর দাঁড়িয়ে ঘাস কাটতে কষ্ট হয়। ধান কাটা হয়ে গেছে, ডাল-কলাই তোলাও প্রায় শেষ, আর কয়েকটা দিন গেলে এড়াকাল—অর্থাৎ গরু-ছাগল (ঘোড়া ক'জনেরই বা আছে !) ইত্যাদি ছেড়ে দিতে পার। মাঠে মাঠে অবাধে তারা চরে বেড়াবে, ঘাস কেটে মাথায় বয়ে এনে খাওয়াতে হবে না। এই কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে মাস কতকের মত নিশ্চিন্ত।

সেই প্রথম দিনই। মুঠো খুলতে দেরি হয় তো কপাল খুলতে দেরি হয় না।

ঘাসের বোঝা ফেলে ঘাম মুছতে মুছতে গগন দাওয়া এসে উঠল। বাইরের রোগী দেখে মনোহর সেই মাত্র ফিরেছে। গগনের দিকে চোখ তুলে সবিস্ময়ে বলে, খাসা হাতের লেখা হে তোমার। আমরা অমন পারি নে। কদ্দূর পড়েছ?

গগন বলে, মাইনর ইস্কুলে তিনটে ক্লাস পড়েছিলাম। তারপরে আর হয়ে উঠল না।

ভাল লেখাপড়া জান তুমি। হাতের লেখা মুক্তোর মত, একটা বানান ভুল নেই। হরিদাসের হিজিবিজি পড়তে কালঘাম ছুটে যেত। তা শোন, ঘোড়া দেখতে হবে না আর তোমায়। মাহিন্দার রাখব। হরিদাসের কাজকর্ম পুরোপুরি নিয়ে নাও। যেটা না পারবে, বুঝিয়ে দেব। করতে করতেই মানুষে শেখে।

কপাল ছিল পাথর-চাপা—পাথরখানা হঠাৎ সরে গেছে। আবার ক'দিন পরে মনোহর বলে, লতিকাকে একটু আধটু পড়িয়ে দিও। বেশ লিখতে পড়তে পারে, নিজের চেষ্টায় শিখেছে। নতুন পাঠশালা হয়েছে—কিন্তু অত বড় মেয়ে যায় কি করে, গেলে নিন্দে হবে। তোমায় পেয়ে ভাল হল, বানান-টানানগুলো দেখে দিও। তাতেই হবে।

সন্ধ্যার পরে একেবারে কাজ থাকে না। হেরিকেন হাতে ঝুলিয়ে ভুতি এল। নিজে আসে নি, ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিয়েছে। হেরিকেন মাটিতে রেখে মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। গগন অস্বস্তি বোধ করে। বলে, বইটই কোথা? খাতা লাগবে দুটো—একটায় [illegible], আর একটায় হাতের লেখা।

অত বড় মেয়েকে 'তুমি' বলতে বাধো-বাধো ঠেকে, আবার ছাত্রীকে 'আপনি' বলাও চলে না। মহা মুশকিল। খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভূতি বসে পড়ল তক্তাপোশের এক পাশে। মুখে কথা নেই। খানিকক্ষণ কাটল। লণ্ঠনের আলোয় ভূতিকে নেহাত মন্দ দেখায় না। আধ-অন্ধকার ঘরে সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে কাঁহাতক ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকা যায়! লোকেও তো ভাল দেখবে না।

গগন বল্লে, বইটই কী আছে আনা হোক। শুধু শুধু কি পড়া হবে?

বার দুই-তিন এমনি বলল তো ভূতি উঠে চলে গেল। সেদিনের পড়া এই অবধি।

পরের দিনও প্রায় এই। তার পরের দিনও। একে পড়াবে কী মাথামুণ্ডু! আরও ক'দিন পরে হাঁ-না এই গোছের একটা দুটো কথা বেরুল। হচ্ছে—আশা হয়েছে। পাতা ভরে হাতের লেখাও নিয়ে এল একদিন: কয়ে র-ফলার আঁকড় উপরমুখো—ওটা তো তয়ে র-ফলা হ্রস্ব-উ করে এনেছ। আঁকড় উল্টো করে দাও লতিকা।

বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছে। তবু মাথায় ঢোকে না। ফের ভুল করে লিখবে। মাথায় ঢুকছে না, না অন্য কোন ব্যাপার? এত বার বলার পরেও ঠিক একই ভুল।

সারা দিনের খাটনির পর ক্লান্ত ডাক্তার বড়-ঘরে শুয়ে পড়ে, একজনে গা-হাত-পা টিপে দেয় এই সময়। ছেলেপুলেরা সব ঐ দিকে, গিন্নী রান্নাঘরে। হঠাৎ দেখল, ভুল করে ফেলে ভূতি টিপে টিপে হাসছে গগনের দিকে চেয়ে।

বড় মেয়ে ভূতি, তার নীচে পঞ্চানন অথবা পঞ্চা। পরদিন গগন পঞ্চাকে ধরে জিজ্ঞাসা করে, পাঁচ-তেরোং কত বল্ দিকি? পাঠশালে গিয়ে দু-বার ক-ব-ঠ করলেই হল? তোর দিদি এসে পড়তে পারে, তুই পারিস নে? ধারাপাত নিয়ে আসবি।

পঞ্চার কিছু হচ্ছে না, সামান্য তেরোর ঘরের নামতাও জানে না—মনোহরের কাছে এই সব বলে ব্যবস্থাটা পাকা করে নিল। ভূতি

একা নয়, ভাই-বোন একসঙ্গে আসে। তার পরে চঞ্চল এই পঞ্চার ছোট দুর্যোধন—প্রথম ভাগ নিয়ে বসল সে একদিন। পঞ্চা বলে, অ-আ ক-খ শিখছে—মা বলল, একবার-দু'বার পড়িয়ে দিলেই হয়ে যাবে। দুর্যোধনের পরে হল মেয়ে—শঙ্করী; স্লেট-পেন্সিল নিয়ে সে এল। যা কিছু বলবার পঞ্চাই বলে, ভূতি মুখ ফিরিয়ে থাকে। বলে, শঙ্করী হাঁড়ি-কলসি আঁকবে স্লেটে, ওকে কিছু বলতে হবে না মাস্টার মশায়। খানিক লেখালেখি করে খেতে যাবে তার পরে। শঙ্করীর পর নারাণ। পঞ্চা বলে, বসে থাকবে এখানে। মা তাই বলেছে। রান্নাঘরে বড্ড জ্বালাতন করে।

গগনের ধৈর্য থাকে না। বলে, আর আসবে না?

এর নীচেও আছে। ঠিক কতগুলো, এত দিনের মধ্যেও গগন হিসাব বলতে পারে না। ভূতি মুখ ফিরিয়ে ছিল—তারই মধ্যে ঠাহর হল, মুখ টিপে টিপে হাসছে সে যেন। বোঝ ঠেলা এখন—ভাবখানা যেন এই। আর এই নারাণ—চার বছরের বাচ্চা হলে কি হয়, তিলেক নিষ্কর্মা থাকা তার কুষ্ঠিতে লেখে না। শতরঞ্চিতে কালি ঢালছে, কলম দিয়ে খোঁচাচ্ছে গায়ে, বই ছিঁড়ে মুখে পুরছে—সামাল-সামাল পড়ে যায়।

একদিন পঞ্চাকে একলা পেয়ে গগন জিজ্ঞাসা করে, যত ভাইবোন তোমরা আসছ, তোমার মা-ই পাঠাচ্ছেন?

হ্যাঁ—

মিথ্যে বলছ। পাঠায় ভূতি। মায়ের নাম করে পাঠায়।

পঞ্চা বলে, দিদি লাগায় গিয়ে মায়ের কাছে। শঙ্করী বজ্জাতি করে, দুর্যু পড়ে না—মা তখন বলে, ধরে নিয়ে যা, পড়তে বসিয়ে দিগে।

তার পর পঞ্চা নিজের বেদনাও ব্যক্ত করে: আমার নামে মাস্টার-মশায়, দিদিই বোধ হয় আপনার কাছে লাগিয়েছিল।

গগন স্বীকার করে নেয়: হ্যাঁ, ভূতিই তো বলল, পঞ্চা নামতার কিচ্ছু জানে না। নইলে আমি কী করে টের পাব বল।

কারসাজি অতএব টের পাওয়া গেল। ছেলেপুলের পড়া হল না হল, গিন্নীর তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। মূলে রয়েছে ভূতি। ভাই-বোন এনে জোটাচ্ছে—তালগোল সময় কেটে যাবে, নিজের উপরে চাপ পড়বে না। আবার মনে হয়, শোধ নিয়ে নিচ্ছে না তো? পঞ্চাকে গগন এনে জুটিয়েছিল—তাই যেন জব্দ করছে: কত পড়াতে পার পড়াও, কতদূর ক্ষমতা দেখা যাক। নাঃ, অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলে কি হয়—শয়তানী বুদ্ধি ষোলআনা আছে। বিনির কথা মনে পড়ল। মেয়ে মাত্রেই শয়তান। চারুও—তার নিজের বোন বলে কি ছেড়ে কথা কইবে?

একদিন এক রোগী হরিদাসের কথা তুলল। দূরে যায় নি সে, গাঙের ওপারে এক গাঁয়ে ডাক্তার হয়ে বসেছে। লোকটা বলে, বড্ড খাঁই হরিদাস ডাক্তারের। এক টাকা নিয়ে মাস দুই ওষুধ দিল। জ্বর যায় না, আবার বলে টাকা। কী করা যাবে—পুরো টাকা নয়, আধুলি দিলাম একটা। চলল মাস খানেক। বিকাল হলেই নাড়িতে জ্বর পাওয়া যায়, বন্ধ হচ্ছে না। হদ্দমুদ্দ দেখে এই পার হয়ে এসেছি। জোলো ওষুধে কাজ হবে না ডাক্তারবাবু, রাঙা বড়ি দেন আপনি।

কথাবার্তা হচ্ছিল মনোহরের সঙ্গে। গগন ফোড়ন দিয়ে ওঠে: দেড় টাকায় তিন মাস চালাল, তাতেও তোমার মন ওঠে না। শিশিতে শুধু সাদা জল ভরে দাগ কেটে দিলেও তো পোষায় না।

মনোহর মৃদু হেসে গগনের দিকে তাকায়। রোগীরা চলে গেলে বলছে, হরিদাস ভাবে, বড্ড লায়েক হয়ে গেছে। কিছু না, কিছু না। বাজে-লোকের কাছে আমি আসল বিদ্যে ছাড়ি নে। ভুয়ো শিখিয়েছি, সব ভাঁওতা। ডাক্তার না কচু হয়েছে। চালিয়ে যাক আর কিছু দিন, তখন সবাই টের পেয়ে যাবে। যে রোগী এমনি ছ মাস বাঁচত, ওর ওষুধ পড়লে এক মাসও টিকবে না।

বলতে বলতে গগনকেই সালিশ মানে: তুমিই বল না, যা

ভাঙিয়ে রুজিরোজগার সেটা দানছত্র করে দিলে আমার দিন চলবে কিসে? নাবালক এক গাদা ছেলেপুলে, কবে তারা মানুষ হবে ঠিকঠিকানা নেই। এই যে খেয়াঘাট পার হয়ে গিয়েই ডাক্তার হয়ে বসেছে, খাঁটী বিদ্যে জানা থাকলে রক্ষে ছিল!

গগন ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক—

তখন মনোহর সমাদর করে পাশের জায়গা দেখিয়ে দেয়: দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, বস। তুমি হলে ঘরের ছেলে। রোগীর সামনে আমি ডাক্তার, তুমি কম্পাউণ্ডার। রোগীপত্তর না থাকলে তখন আবার কি! শোন, বুড়ো হয়ে গেছি, পট করে কবে মরে যাব—পেটের বিদ্যে নষ্ট হয়ে না যায়। শিখিয়েই যাব একজনকে। ছেলেরা বড় হয়ে শিখে নেবে, অত সবুর সইবে না। তবে কথা হচ্ছে, বিনা সম্পর্কের বাজে-লোকের জন্য আমি কিছু করি নে, আত্মীয় হতে হবে সেইজনকে। আমার জামাই হলে ডিস্পেনসারিটা তার হয়ে যাবে। আর দেশজোড়া এই এত বড় পশার।

আরও বিগলিত কণ্ঠে শুধায়, বড় ভাল ছেলে তুমি। হ্যাঁ বাবা, কে কে আছেন তোমার, বল দিকি শুনি?

এ সুযোগ গগন ছাড়বে না। বিনা দ্বিধায় সে বলল, কেউ নেই—

মনোহর উদার ভাবে বলে, তা হোক, আমার তাতে আপত্তি নেই। ছেলে দেখেই যখন মেয়ে দেওয়া। তবে বাবা, এই বড় সংসার টানতে হয়—তেমন কিছু রাখতে পারি নে। বাচ্চাকাচ্চা একপাল—আরও মেয়ে আছে, পার করতে হবে। ক'খানা ইট খাড়া করে যাব ভিটের উপর, আমি অন্তে ওরা যাতে মাথা গুঁজে থাকতে পারে। এই অবস্থায় বুঝতে পারছ নগদ পণ আপাতত দিতে পারছি নে।

গগন আপত্তি করে ওঠে: দিচ্ছেন বইকি! অমন সোনার বিদ্যে দিয়ে দিচ্ছেন, টাকা-পয়সা সোনা-রুপো তার কাছে ছার। আপনার রাঙা বড়ি বানানো শিখিয়ে দেবেন, আর মেয়ে দেবেন। আর আমি কিছু চাই নে।

মনোহর খুব হাসে : হাঁ, বলেছ ঠিক ! চিরজীবন ধরে বছর বছর পণের শতগুণ আদায় করবে। নগদ টাকা কদ্দিন থাকে ? আমার বাবা দশটা টাকাও নগদ রেখে যান নি। কথা পাকা রইল তবে। শুভ কাজ চোত্ত মাসে হবে না, তা হলে বোশেখে।

রান্নাঘরে পৌঁছে গেছে কথাটা। ভাতের পাতে এখন ঘন-আঁটা দুধ, এবং রাত্রিবেলা মাছের মুড়ো। ভূতি আজ পড়তে এল না, অন্যগুলো এসেছে। পঞ্চা আপনা থেকে বলে, দিদি আর পড়বে না। তার বিয়ে কিনা !

গগনের লজ্জা হল বোধ হয়। ছাত্রকে তাড়া দেয়, থাক থাক, ওসব কে জিজ্ঞাসা করছে তোমার কাছে? অঙ্কগুলো হয়েছে কিনা তাই বল।

কৌতূহলও জাগে—কী সব কথাবার্তা চলেছে না জানি ওদের নিজেদের ভিতরে ! কতক্ষণ পরে হঠাৎ বলল, বিয়ে কবে ?

কার সঙ্গে বিয়ে, সে-কথা স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করতে বাধে।

পঞ্চা বলে, বোশেখ মাসে। দিদি খুব কান্নাকাটি করছে, মার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি। বলছে কি জানেন মাস্টার মশায়—

বলতে বলতে সে থেমে গেল।

কি বলছে ?

পঞ্চা বলে, আপনি আমার উপর রাগ করবেন।

গগন বলে, সে কী, বলছ তুমি দিদির কথা—তোমার উপর রাগতে যাব কেন ? ভূতি যখন আর পড়ছে না, তার উপরে রাগ করেও কিছু করতে পারব না।

পঞ্চারও হয়েছে—কথাগুলো ফুটছে পেটের ভিতরে, না বলে সোয়াস্তি নেই : দিদি বলছে, ঘোড়ার ঘাস মাথায় করে বয়ে আনত—ঘাস্-কাটা বর আমি বিয়ে করব না। বড্ড কাঁদছে।

গগন মনে মনে আগুন হল। পৌরুষে ধিক্কার লাগে। আস্পর্ধা বোঝ, কালো-কটকটে এক মেয়ের ঢিবি—মানুষ যেন হা-পিত্যেশ

করে মরছে তোমার জন্য! অপ্সরী-কিন্নরী হলেই বা কি—ঘরজোড়া আমার বিনি রয়েছে। রাঙা বড়ি শিখে নিই আগে ডাক্তারের কাছে—আমার জবাব সেইদিন।

ঘাস কাটার জন্য আলাদা লোক রাখা হয়েছে, রান্নার কাঠকুটো সে-ই দেয়। ধোপদুরস্ত জামা গায়ে গগনের এখন কম্পাউণ্ডারের কাজ। তা-ও পুরোপুরি নয়। ভোরবেলা রোগীর ফর্দ করে রোগী-গুলো ডেকে ডেকে মনোহরের সামনে হাজির করে দেওয়া। ওষুধের ফোঁটা ফেলতে দেয় না মনোহর, সে কাজটা নিজে করে। নামই জান না—কোন্ ওষুধ দিতে কি দিয়ে বসবে বাবা, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কাজ তো এই। আর সন্ধ্যার পরে পড়ানোর নামে ছেলেপুলের দঙ্গল নিয়ে একটুখানি বসা। গগন বলে, কিছুই করতে দেবেন না তো জানব শিখব কি আকাশ থেকে? হরিদাস যা করত, তা-ও তো দেন না। শুয়ে বসে বাত ধরে গেল।

মনোহর অমায়িক কণ্ঠে বলে, হরিদাস আর তুমি! তোমায় হাতে ধরে শেখাব আমি বাবা। ঝেড়েমুছে সমস্ত দিয়ে দেব, আলাদা বলে কিছু রাখব না। রাঙা বড়ি অবধি। চোত মাসটা অকাল, এখন কিছু করতে নেই। জীবন ভোর তো খাটতে হবে, এই কটা দিন কাটালেই না হয় শুয়ে বসে।

বোঝা যাচ্ছে, সাত পাক ঘোরা সমাধা না হওয়া পর্যন্ত সেয়ানা ডাক্তার কিছুই দেবে না। হরিদাসকে যা দিয়েছে, তা-ও নয়। টালবাহানা করে কাটাবে। বৈশাখ পড়ল। নাছোড়বান্দা গগন মরীয়া হয়ে তাগিদ লাগিয়েছে: অকাল তো কাটল। ওষুধ বলে বলে দিন, আমি ফোঁটা ফেলতে লেগে যাই।

উত্তরে মনোহরের মুখ-ভরা হাসি, এবং: বটেই তো! রোগ দেখে লক্ষণ শুনে শুনে আমি ওষুধ বলব, হাতে-কলমে তোমার শেখা হয়ে যাবে। হবে তাই।

সহসা সেই ভয়-দেখানো কথা: ওষুধের ক'পাতা মুখস্থ হল বল

দিকি ? কাল ধরব। সবই তো সাদা জল—নাম না শিখলে ওষুধে ওষুধে তফাত ধরবে কি করে ?

তার পরেই মোলায়েম কণ্ঠে বলে ওঠে, বোশেখ তো পড়ে গেল বাবা। পাঁজি দেখিয়ে একটা তারিখ ঠিক করে ফেলা যাক। কি বল ?

গগন বলে, বোশেখ আমার জন্ম-মাস।

মনোহর ঘাড় নেড়ে বলে, জন্ম-মাসে তো বিয়ে হবে না। তবে জষ্ঠি। এক মাসে কী যায় আসে! দিন দেখে এখন থেকে উয্যুগ-আয়োজনে নামা যাক। তুমিও ইদিকে ওষুধ-ওষধ করে ব্যস্ত হয়ে পড়ছ।

গগন বিরস মুখ করে বলে, জষ্ঠিতেও হবে না। জ্যেষ্ঠ ছেলে আমি কিনা বাপের।

মনোহর মুখ তুলে তাকাল। মুখে তাকিয়ে কী যেন পড়ছে। কঠিন কণ্ঠে বলল, হবে। গোড়ার বার দিন বাদ দিয়ে নিতে হয়। মেয়ে অরক্ষণীয়া হয়ে পড়ছে—বোশেখে না হল তো জষ্ঠিতেই আমি পাত্রস্থ করব।

বারটা দিন বাদ দিয়ে, তেরই নয়—চোদ্দ তারিখে মধ্যম রকমের দিন বেরুল। শুভকর্ম ঐ দিনে। আর ঐ তাড়া খাওয়ার পর থেকে গগনের এমন ভাব, দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যাওয়ায় কৃতকৃতার্থ হয়েছে সে যেন। বৈশাখে বাধা হওয়ায় মরমে মরে ছিল, চোদ্দই জ্যৈষ্ঠ কবে আসবে, যেন সে আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।

মনের সঙ্গেও গগন বোঝাপড়া করে নিচ্ছে। কেন, দোষটা কিসের ? এক বউ থাকতে বিয়ে করা ঠিক নয়, এ নিয়ম আজকালই শুধু উঠছে। ঘর-বাড়িতে যাদের কায়েমী বসবাস, তাদেরই পোষায় এসব। ঘর-উঠোন বাক্স-তক্তাপোশ জমিজিরেত গরুবাছুর সমস্ত যেমন ঠিক থাকে,তেমনি থাকে বউ। চাষবাস খাওয়া-ঘুম এক-বউ, বউয়ের পরিচর্যা—সমস্ত ধরা-বাঁধা, সকাল বেলার আকাশে সূর্য ওঠার মত। বিনি-বউ আছে ঘরবাড়ি জুড়ে, বাড়ি যখন যাবে তখন

তার কথা। এত দূরে এখানে ভূতি, রাঙা বড়ি এবং মনোহর ডাক্তারের পশারের খানিকটা—এই সমস্ত নিয়ে সে জমজমাট হয়ে থাকবে।

বিয়ের আয়োজন চলছে। জামাতা বাবাজীবনের রোগীর ফর্দ এবং ওষুধের নাম মুখস্থ তো আছেই—অবরে-সবরে কৌটা ফেলে রোগীর ওষুধ দিতেও দিচ্ছে। ভূতি পড়ে না, সামনেই আসে না, এক বাড়িতে থেকে ক্বচিৎ-কদাচিৎ তার দেখা মেলে।

হঠাৎ একদিন বিকেলের দিকে এদিক-ওদিক চেয়ে চুপিসাড়ে ভূতি ডাক্তারখানায় ঢুকল। হরিদাস যাবার পরে তক্তাপোশে গগনের জায়গা। দুপুরের লম্বা ঘুম দিয়ে সবেমাত্র গগন চোখ মেলেছে—

মাস্টারমশায়!

মাস্টারমশায় বলে ডাকছে দেখ ন্যাকা মেয়ে। বলে, আপনার চিঠি এসেছে মাস্টারমশায়।

চিঠি, অ্যাঁ—আমার নামে?

ভূতি বলে, তাই তো বলছি। আপনার কেউ কোথাও নেই, চিঠি তবে কে দিল বলুন তো?

কথার ধরন ইঙ্গিতপূর্ণ। গগন থতমত খেয়ে বলে, দেখি—

খামের চিঠি হাতে দিল। বিনি-বউর চিঠি, না পড়েই বুঝেছে।

গগন বলে, খাম ছিঁড়ল কে?

বাবা। পিওন তাঁকে এনে দিল—পড়ে তিনি বিছানার নীচে রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলেন। আমি চুরি করে এনেছি। আপনার বউ দিয়েছে চিঠি। কী অন্যায়, খবরবাদ দেন নি কেন? এ-বাড়ি থেকে লেখা যায় না, কেউ দেখে ফেলবে—তা কুমিরমারি গঞ্জে তো যান, সেখানে গিয়ে চিঠি ছাড়তে পারতেন।

মনোহর শুধু নয়, মেয়েটাও আদ্যন্ত পড়ে এসেছে। বলে, আহা, কম কষ্ট করেছে ঠিকানার জন্য! কোন্ ভবসিন্ধু উকিলের কাছে লিখে লিখে—শেষটা তিনি ঠিকানা জানিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে চিঠির উপর ভাসা-ভাসা দৃষ্টি বুলিয়ে গগন দেখছে, ব্যাপার ঠিক তাই। উকিল ভবসিন্ধুর নাম অবধি ঠিকঠাক বলছে, চিঠি পড়ে পড়ে ভূতি মুখস্থ করেছে নাকি? এখন সে আর ছাত্রী নয়—ফিক করে হেসে বলে, বউ আপনাকে বড্ড ভালবাসে। নামটাও ভাল—বিনোদিনী। আপনি কিন্তু পাষাণ—জলজ্যান্ত অমন বউ, তাকে একেবারে মুছে দিলেন। বউ রয়েছে বোন রয়েছে—আর বাবাকে বলে দিলেন, আপন-জন কেউ নেই।

গগন সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, চিঠি পড়ে কিছু বললেন তোমার বাবা?

বলবার সময় হল কোথা? রোগীর এখন-তখন অবস্থা—লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে ছুটলেন। যা বলবার বলবেন ফিরে এসে। জাত ভাঁড়িয়ে ছিল বলে হরিদাসের খোয়ারটা দেখলেন না? মিথ্যে কথায় বাবা ক্ষেপে যান।

স্বজাতি জেনে ভূতির সঙ্গে হরিদাসের বিয়ের কথা হচ্ছিল। হরিদাস খুব রাজী। অর্থাৎ বিয়ের নামে রাঙা বড়ি আদায়ের ফিকির। গগন আগে এতসব জানত না, হরিদাস চলে যাবার পরে এর তার কাছে শুনেছে। গগনেরও ঠিক তেমনি ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে—জলজ্যান্ত বউয়ের কথা বেমালুম চেপে গিয়ে জামাইভোগে আছে। মনোহর ফিরে এলে কী কাণ্ডটা হবে, ভাবতে দেহরক্ত হিম হয়ে যায়। অঞ্চলের মানুষ ভিড় করে এসে দেখবে—হরিদাসের তো চড়চাপড়ের উপর দিয়ে গেছে, তার কদ্দূর কি হয় কে জানে। বিনি-বউর শত্রুতা এখানেও তাড়া করে এসেছে। 'বহুদিন যাবৎ সংবাদাদি না পাইয়া আমি পাগলিনীপ্রায় হইয়াছি—' ওহো-হো, উথলে উঠেছে প্রেম-দরিয়া! সংবাদ শব্দের অর্থ ধরে নিতে হবে এখানে টাকা। টাকা না পাইয়া পাগলিনীপ্রায়। বিদেশময় যেন টাকা ছড়ানো—কুড়িয়ে কুড়িয়ে মনিঅর্ডার করলে হল। হত অবশ্য তাই, রাঙা বড়ি কোন গতিকে যদি জানা যেত। হরিদাস পারল না—গগনেরও কপালে নেই, বোঝা যাচ্ছে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, ভূতির চোখ দুটোয় হাসি। বড় বড় দু-চোখে হাসলে ভারী সুন্দর দেখায়। হেসে হাত নেড়ে নেড়ে বলছে, মিছে কথা, মিছে কথা—পিওন চিঠি দিয়ে গেছে আমার হাতে, আমি পড়েছি, বাবা দেখেন নি এখনো। বউয়ের নাম-ঠিকানা টুকে নিয়েছি। বাবা এলে বলব, নিজে একবার গিয়ে দেখে এস, বউ ঐ একটাই—না আরো দু-চারটে আছে।

গগন ব্যাকুল হয়ে বলে, ঐ একটা। উঁহু, তা-ও নয়, ত্যাগ করে চলে এসেছি। সেই জন্যে কিছু বলি নি। এখন তুমিই শুধু ভূতি। চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলছি, ডাক্তার বাবুকে কিছু বলো না।

খপ করে তার হাত জড়িয়ে ধরল। বলে, সে বউ হল রাক্ষুসী। টাকা ছাড়া জানে না। তুমিই সব, দুনিয়ার মধ্যে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই লতিকা।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভূতি খর-খর করে চলে গেল। এমন ভাল ভাল কথার ফলটা কি হল বোঝা যায় না। ভয় ঘোচে না। জিনিসপত্র সামান্য যা আছে, বোঁচকা বেঁধে ফেলে তাড়াতাড়ি। গোলমাল বুঝলেই দেবে দৌড়। হরিদাসের মত মার খাবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যাবেই বা কোথা? বিনি-বউয়ের উপর ইদানীং মনটা নরম হয়েছিল। কিন্তু চিঠির যা সুর, খালি হাতে গিয়ে সুবিধে হবে না সেখানে। হায় রে, এই হয়েছে দুনিয়ার গতিক। তাড়া খেয়ে খেয়ে পথের কুকুরের মতন ঘোরা। নিজের বউ-বোনেরও মন কিনতে হবে টাকা বাজিয়ে। এ-ও এক সওদার ব্যাপার। জগৎময় সওদা।

যাই হোক, ভূতি খুব ভাল—সে বলে দেয় নি। মনোহর যথারীতি হেসে হেসে কথা বলছে।

গগন একদিন বলে, আচ্ছা লতিকা, রাঙা বড়ি জান তুমি সত্যি?

ভূতি বলে, দুজনে শুধু জানি—আমি আর বাবা। আর

জানতেন বাবা যে গুরুর কাছ থেকে শিখেছিলেন। তিনি মারা গেছেন।

গগন বলে, বোশেখের অর্ধেক হয়ে গেল, পুরো মাসও নেই। উঃ, এক একটা দিন এক বছর বলে ঠেকছে। নড়তে চায় না।

ভূতি হেসে বলে, দিন একেবারে পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে। মোটে দাঁড়ায় না। কত তাড়াতাড়ি যে এসে গেল!

দুজনায় হঠাৎ বড্ড ভাব জমে গেছে। ফাঁক পেয়েছে কি এক জায়গায় জুটেছে। ফিসফিস-গুজগুজ—হেসে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। শহুরে নায়ক-নায়িকাকে ছাড়িয়ে গেল ওরা যে!

হেনকালে ওলাবিবি হাজির হলেন গ্রামে। অনুগ্রহ ছড়াতে শুরু করেছেন। ওলাউঠা অর্থাৎ কলেরা। এর বাড়ি ভেদবমি, ওর বাড়ি ভেদবমি—মরলও দু-একটা। বড্ড দেরি পৌঁছুতে—অন্যান্য বছর ফাল্গুন শেষ না হতেই জমে যায়। নতুন ধানচাল ওঠায় খাওয়ার অত্যাচার আছে, তার উপর মাঠঘাট শুকিয়ে মিঠাজলের টান পড়ে। ডাক্তার-কবিরাজে অবশ্য এই কারণ দেখান—লোকে কিন্তু জানে, ওলাবিবি এই সময়টা রাজ্যপাট ঘোরার মানসে বেরিয়ে পড়েন। এবারে ফাল্গুনে চুপচাপ, পুরো চৈত্রটা কেটে গেল, বৈশাখেরও এতদিন হয়ে গেছে—মনোহর দস্তুরমত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল: এ তল্লাটের কথা ভুলে মেরে দিলেন নাকি বিবিঠাকরুন? অবশেষে দুটো-পাঁচটা খবর আসে। নিতান্তই ছিটেফোঁটা—তবে আশা করা যাচ্ছে, মরশুম আস্তে আস্তে জমবে। ডাক্তার-কবিরাজ-ফকির-গুণীনের দিন আসছে, দু-হাতে তখন রোজগার। ক্ষেতের ধান উঠে গিয়ে গোলা-আউড়ি ভরতি—পয়সা খরচায় আপাতত মানুষের কৃপণতা নেই। গুজবও উঠছে নানা রকম। যাত্রা শুনে ফিরছিল কারা গ্রামান্তর থেকে। চাঁদের আলোয় দেখল, ঝাঁকড়ামাকড়া-চুল অস্থিসার-চেহারা এক বুড়ী কুঁজো হয়ে লাঠি ঠুক-ঠুক করে বাঞ্ছারাম হাজরার বাড়ির হুড়কোর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সাড়া পেয়ে বুড়ী ঘাড় তুলে তাকাল। একটি লহমা—তারই মধ্যে দেখা

গেল, আগুনের গুলির মত চোখের ঢেলা দুটো বিঘূর্ণিত হচ্ছে তাদের দিকে। বুড়ী যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। আর ভোর রাত্রেই বাঞ্ছারামের ভেদবমি, সন্ধ্যার আগে শেষ। বুঝে নাও তবে। তিনি এসে গেছেন।

গ্রাম খুব জেঁকে ওঠে ক'দিনের মধ্যে। সন্ধ্যার পর হরি-সংকীর্তনের দল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। এবাড়ি-সেবাড়ি থেকে আগে এসে জানিয়ে যায়, হরিরলুঠ আজকে আমাদের ওখানে। সংকীর্তনের দল গ্রাম পাক দিয়ে এসে সেই সেই বাড়ি আসর করে বসে। অনেক রাত্রি অবধি হরিনাম করে হরিরলুঠ কুড়িয়ে দল ভেঙে যে যার বাড়ি যায়। আবার পরের সন্ধ্যায়। গুণীনের দল এসেছে, তাদের প্রক্রিয়া ভিন্ন, গভীর রাত্রে অদ্ভুত ভয়াবহ কণ্ঠে মন্ত্র আউড়ে গ্রাম-বন্ধন করে বেড়ায়। হাতে বড় বড় ধুনোচি—ধুনো ছুঁড়ে দেয় ধুনোচির আগুনে, আর দপ-দপ করে জ্বলে ওঠে। ওলাবিবি কিংবা অন্য যে-কেউ হোক, সাধ্য কি চুপিসাড়ে গাঁয়ে ঢুকবে! মন্ত্র পড়ার চেঁচামেচিতে আর কিছু না হোক লোকের সাহস বেড়ে গেছে। প্রথম কটা দিন বড্ড মুষড়ে পড়েছিল, সে ভাব এখন আর নেই।

ঢাকঢোল বাজিয়ে গাঁওটি-পূজো হল ঠাকরুনতলায়। যে যেমন পারে চাঁদা দিয়েছে, কেউ বাদ পড়বে না, তাহলে তার উপরে দোষ রয়ে গেল। আর এক গোপন পূজো নিশিরাত্রে হাজরাতলায়—কোন্ তারিখে সেটা হবে, কেমন তার উদ্যোগ-আয়োজন, কাকপক্ষী কাউকে জানতে দেওয়া হয় না। দু-চারটি মাতব্বর মাত্র জানে, জিজ্ঞাসা করলে সাফ বেকবুল যাবে: ক্ষেপেছ, অন্যের সর্বনাশ করে গ্রাম বাঁচাব? সেই গ্রামের লোক যেদিন উল্টো শোধ নিয়ে যাবে তাদের হাজরা-পূজো দিয়ে? না না—ওসব কিছু নয়। কেউ কিন্তু বিশ্বাস করে না, চোখ টেপাটেপি করে—সঠিক তারিখটা জানা যায় কেমন করে?

এমনি দিনে মনোহরের ডাক্তারখানা-ঘরে এক আজব মানুষের

আবির্ভাব। দীর্ঘদেহ মানুষটি, মাথায় জটা। শতেক লোকের মধ্যেও আলাদা ভাবে নজরে পড়বে। অন্য কিছুতে না হোক, পোশাকের জন্য। লাল চেলি পরনে, উড়ানিও লাল রঙের। এক গাদা কড় ও রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ও বাহুতে। কপালে বুকে ও বাহুতে সিঁদুরের ফোঁটা। চোখও রক্তবর্ণ। কথা বললে ভকভক করে গাঁজার গন্ধ আসে। সেই মানুষ হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

সিকি দাও একখানা।

ভিক্ষুক নয়। আধেলা, বড় জোর এক পয়সায় ভিক্ষুক তুষ্ট। বলতে হবে তা হলে রাজ-ভিক্ষুক। পুরো সিকি অর্থাৎ আট গণ্ডা আধেলা তার দাবি। এমন হুঙ্কার দিয়ে বললেন যে না বলতে সাহস হয় না।

বলেন, আমার আজকের দিনের সেবা। সেবার ভাগ্য যার তার হয় না। তোমার উপর আজ কৃপা করলাম।

হাত নেড়ে তাড়া দিচ্ছেন: শিগ্‌গির দাও। পুজোআচ্চা বিস্তর, দেরি করিয়ে দিও না।

অসহায় গগন হাতবাক্স হাতড়ায়। এ-কোণ ও-কোণ খুঁজে পেতে শুষ্ক মুখ তুলে বলে, হল না ঠাকুর মশায়।

কত হল ?

গগন বলে, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সাতটা পয়সা এই—

তাই তো!

একটুখানি ভেবে ঠাকুর বলেন, দশ দুয়োরে মাঙি নে আমি। একদিন একটা জায়গায়। এক কাজ কর—ভাণ্ডার খালি থাকতে নেই—একটা রেখে ছ-পয়সা আমায় দিয়ে দাও। ঐ ছ-পয়সার মতন সেবা হবে।

পয়সা হাতে নিয়ে হঠাৎ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, অভাবের মধ্যে আছ—কাজের সুবিধা হচ্ছে না বুঝি ?

সমবেদনার আভাস পেয়ে গগন ঘাড় নাড়ল: ডাক্তারবাবুর সাগরেদি করি। দুটো-চারটে পয়সা যে হয় না, তা নয়।

ঘর কোথায় তোমার?

গগন গ্রামের নাম বলল। ঠাকুর প্রশ্ন করে অঞ্চলটার পরিচয় নিয়ে নিলেন। তার পর খিঁচিয়ে ওঠেন: মানষেলা ছেড়ে সরে এলে তো মাঝপথে গিঁঠে আটকে আছ কেন? আরও নাম, নেমে চলে এস নাবালে।

সে কোথায়?

দরিয়ার কাছে, বাদার জঙ্গলে। মা-লক্ষ্মী ভাণ্ডার জমিয়ে রয়েছেন। বাক্স হাতড়ে একটা সিকি পাও না, আর সে জায়গায় এক পাক দিয়ে এলে আঁজলাভরা টাকা। দু-হাতের আঁজলা ভরে ছাপিয়ে যাবে।

মনোহর এসে পড়ে। ঠাকুরকে দেখে দৃষ্টি প্রখর হল: কী মহেশ ঠাকুর, এসে গেছ তক্কেতক্কে? গগনের সঙ্গে কি তোমার? সিকি দিচ্ছি, চলে যাও। এদিকে নজর দিতে এস না।

বলে সিকি বের করে এগিয়ে ধরল। মহেশ তাকিয়েও দেখেন না: আজ নয়, আজকের সেবার যোগাড় হয়ে গেছে। আগে পেলে তোমাকেই কৃপা করতাম ডাক্তারবাবু।

বেরিয়ে চলে গেলেন। মনোহর বলে, সেবা হল গাঁজার, ভাত জুটুক না জুটুক নেশাটা চাই ঠাকুরের।

গগন জিজ্ঞাসা করে, কে উনি?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মনোহর দু-এক কথায় পরিচয় দিল: মহেশ নাম। শুধু মহেশ কেউ বলে না—ক্ষ্যাপা মহেশ। বাউলে মানুষ। কোথায় থাকে কি বৃত্তান্ত কেউ জানে না। কিন্তু পুজোর ঢাকে কাঠি পড়লে ঠিক এসে যাবে। এই যেমন এসেছে। নাকি কালী-সাধনা করে, অন্তর্যামী—

সঙ্গে সঙ্গে দু-হাতের বুড়োআঙুল আন্দোলিত করে বলে, কচু—কচু! হাটে হাটে সুলুকসন্ধান নিয়ে ফেরে। বোকাসোকা

মানুষ পেলে ভুজুংভাজাং দিয়ে বাদায় নিয়ে যায়। একেবারে কাঁচা-বাদায়। যেসব মানুষের পনের আনা আর ফেরে না। নরবলি দেয়, না বাঘের মুখে নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরে, বলা যায় না। আজকে বুঝি তোমার কানে ফুসমন্তর দিচ্ছিল? খবরদার, ওকে আমল দিও না।

ডাক্তার-কবিরাজের ওষুধ, হরি-সংকীর্তন, গুণীনের কেরামতি অথবা ক্ষ্যাপা মহেশের গাঁজা পোড়ানো ও তড়বড় করে মন্ত্র পড়া—যে কারণেই হোক, ওলাবিবি বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। রোগী কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ওলাওঠার ক্ষেত্রে মনোহর কখনো একা যাবে না। পাড়ার মধ্যে হলেই বা কি! গগন সর্বদা সঙ্গে। ভিজিট ডবল। এই ক'দিনে গগনেরও হঠাৎ কপাল খুলে যায়। দিনে চার-পাঁচ টাকা—লাট সাহেবের রোজগার আর কি! কিন্তু স্থায়ী হল না—খড়ের আগুন একটুখানি দপ করে উঠে যেমন নিভে যায়।

বড়-গুণীন দেমাক করে, যায় কি এমনি-এমনি, গুঁতোয় পড়ে বিদেয় হল। বললাম, না যাস তো হারামজাদী জিওলগাছে বেঁধে জল-বিছুটি দেব। চলে যাবি একেবারে গাঙ পার হয়ে, ফাঁক বুঝে আবার ফুড়ুৎ করে ঢুকে পড়তে না পারিস।

কিন্তু অনেকেই ভাবছে, ওসব কিছু নয়—আসলে বোধ হয় হাজরাপূজোর গুণ। গ্রামের বাইরে পোড়ো জায়গায় নানান গাছ-গাছালির মধ্যে হাজরা ঠাকুরের নামে এক সাঁড়াগাছ—গাছের গোড়ায় সদ্য সিঁদুর-লেপা, এদিক-সেদিক কলার খোলা ছড়ানো—এইসব থেকে বোঝা যায়, হয়ে গেছে গোপন পূজো। এ পূজো চুপিসাড়ে হয়—দু-চার জন উদ্যোক্তা ছাড়া কাউকে জানতে দেওয়া হয় না। ভিন্ন গাঁয়ের লোক কানাঘুষো শুনে তক্কেতক্কে ঘোরে, পূজো পণ্ড করে দেওয়া—অন্ততপক্ষে, উৎসর্গের পাঁঠা তাদের তল্লাটে না যায় সেই ব্যবস্থার জন্য। পূজোর শেষে কালো পাঁঠার গলার খানিকটা কেটে তাড়িয়ে দেওয়া হয়—পাঁঠা ছোটে, রক্তের ফোঁটা

ঝরতে ঝরতে যায়। মন্ত্রের জোরে ওলাবিবিকেও ছুটতে হবে পাঁঠার সঙ্গে সঙ্গে। গাঙ দক্ষিণে—সেই গাঙ পার করে পাঁঠা তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি এবার। শুকনো ধানক্ষেত ভেঙে পাঁঠা নৈর্ঋত কোণ বরাবর গেছে। শোনা গেল, মহামারীতে উজাড় হচ্ছে সেদিক।

মনোহর কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, ভালই হল, অল্পের উপর দিয়ে সরে গেলেন। আমার মেয়ের বিয়ে, বিস্তর খাটাখাটনি—এই তালে পড়ে থাকলে হত কেমন করে? চলে গেছেন বলে তো চিরকালের মত ছেড়ে যান নি! বছর বছর আসছেন—এবারের শোধ সামনের বারে পুষিয়ে নেবেন। রোগপীড়ে আছে, আমরাও আছি—কিছুই বাপু চুকেবুকে যাচ্ছে না। চিরকাল ধরে চলেছে, চলবেও। এবারে সংক্ষেপ হয়ে সুবিধাই হল আমার পক্ষে।

গগনকে বলে, কাজকর্ম কমে গেল যখন, চল বাবা একদিন হাটবার দেখে কুমিরমারি গঞ্জে যাই। জামাই যা, ছেলেও তা। কুমিরমারি কতবার গিয়েছ তুমি, সমস্ত জানাশোনা, দেখেশুনে ওখানে যদ্দুর পাওয়া যায় সওদা করা যাক। সেই ভাল হবে, চল।

মনোহর ডাক্তার হাটুরে নৌকোয় যাবে না, তার আলাদা নৌকো। কুমিরমারি গিয়ে এক দোকানে গদিয়ান হয়ে বসল। হাট করতে এসে পুরনো রোগী অনেকে ভিড় জমিয়েছে। পরিচয় পেয়ে দোকানদার মুহুর্মুহু পান-তামাক যোগাচ্ছে। গল্প জমে গেছে খুব।

দেরি হয়ে যাচ্ছে, অথচ লোকের হাত এড়িয়ে ওঠা যায় না। মনোহর তখন গগনকে বলে, তা আমায় আর লাগছে কিসে? তোমাদের পছন্দে আমার পছন্দ। ফর্দ রয়েছে, দেখেশুনে কেনাকাটা করে নৌকোয় তোলগে।

কিন্তু বিয়ে হেন শৌখিন ব্যাপারের জিনিসপত্র আবাদের হাটে কে আনতে গেছে, আর কী দেখাশোনা করবে তার মধ্যে গগন! ঘুরে ঘুরে সওদা হল ভোজের আটটা মিঠাকুমড়া, ছ-জোড়া লাল-পাড় শাড়ি-ধুতি, কম্বলের আসন ও টোপর। কী রকম যোগাযোগ—

জগন্নাথও সেদিন কুমিরমারির হাটে। টোপর দেখে বুঝে ফেলল।

বর তুমি বড়দা ? কী সর্বনাশ গো ! এক বউ আছে বলছিলে যেন !

চুপ, চুপ ! এদিক-ওদিক তাকিয়ে গগন বলে, এসব কথা মুখের আগায় এনো না। সে বউ মরে গেছে।

জগা বলে, ভালই তো ! শিঙের দড়ি ছিঁড়েছে, দেদার চরে খাও এবারে। না বড়দা, তোমার বিদ্যে আছে—ভেবেছিলাম, বুদ্ধিসাধ্যিও আছে। মন খারাপ হল তোমার গতিক দেখে।

হাট থেকে ফিরতে বেশ অনেকটা রাত্রি হয়েছে। গরম পড়েছে বিষম। চোর-ডাকাত জন্তুজানোয়ার কোথায় না আছে—হরিদাস মিছামিছি তার কাছে শতখান করে শুনিয়েছিল। উদ্দেশ্যও জলের মত পরিষ্কার—যাতে সে বাইরে না বেরোয়। জায়গাটার সম্বন্ধে এখন গগনের ভয় ভেঙেছে। শুধু এই জায়গা কেন, অদেখা তাবৎ দুনিয়ার মধ্যেই বা ভয়ের কি আছে ? বড্ড গরম সেদিন—খাওয়া-দাওয়া অন্তে ডাক্তারখানার দাওয়ায় কাঠির মাদুর বিছিয়ে গগন শুয়ে পড়ল। এই অবধি সকলে জানে···

সকালবেলা দেখা গেল, গগন নেই।

আট

গোড়ায় ভাবা গিয়েছিল আম কুড়াতে বেরিয়েছে শেষ রাত্রে। রাতে একটু ঝড়ও হয়েছিল। তলায় তলায় পাকা আম। বিধু কয়ালের বাগানে ফুলতলা থেকে কলমের চারা এনে পোঁতা। বাগানের ভারী নাম। বোল হওয়ার সময় থেকে বিধুর সতর্ক নজর বাগানের দিকে। বাগান কাঁটা-তারে ঘেরা, তার উপর পাহারা

মোতায়েন থাকে রাত্রিদিন। তবু পারবে তারা গগনের সঙ্গে? কাঁটা-তার হোক কিংবা পাহারাদার হোক, গগন মন করলে কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না। ভাবা গিয়েছিল, গেছে সেই কয়ালের বাগানে—কোঁচড় ভরতি আম নিয়ে ফিরবে। কিন্তু রোদ উঠে যায়, রোগীরা চেঁচামেচি লাগিয়েছে, গগনের দেখা নেই। বাড়ির হবু-জামাই কম্পাউণ্ডারি কাজ আপাতত না-ও যদি করে, ফিরে আসবে তো বাড়িতে! একবার মনে হল, আংটি গড়ানোর ব্যাপারে স্যাকরা-বাড়ি গেছে হয়তো। সে আবার ক্রোশ তিনেক। কথাও ছিল বটে, স্যাকরা নানা রকম পাথর এনে রাখবে, গগন গিয়ে পছন্দ করবে। মলিন মুখে মনোহর তাই বলছে সকলকে, দেখ কাণ্ড, সাতসকালে স্যাকরার কাছে গিয়ে বাবাজি বসে রয়েছে।

সেই স্যাকরার গ্রাম এবং আশপাশের পাঁচ-সাতটা গ্রামে খোঁজ নেওয়া হল—কেউ কিছু বলতে পারে না। প্রথম দিনটা চেপেচুপে রেখেছিল—পরের দিন চাউর হয়ে গেল, পাত্র পালিয়েছে। পড়শীরা শুধায়: বরের কথা তো শোনলাম—ভূতিকেও দেখা যাচ্ছে না, সে কোথা গেল?

মনোহরের বউ বলে, আমার বাবা এসেছিলেন, তিনি নাতনীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। বোঝ না দিদি, হঠাৎ সমস্ত উল্টোপাল্টা হয়ে গিয়ে মেয়ের লজ্জা হয়েছে। বাবা তাই বললেন, চল্ আমার সঙ্গে—গিয়ে দিন কতক থেকে আসবি।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? বিয়েথাওয়া করে দিব্যি গদিয়ান হয়ে ডাক্তারি চালাবে, রাঙা বড়ি লিখে নেবে—এত সমস্ত সুযোগ সত্ত্বেও হঠাৎ কেন সরে পড়ল, ভেবে পাওয়া যায় না। হতে পারে, শত্রুতা সেধেছে কেউ। হরিদাস হতে পারে, তার বাসনা ছিল মনোহরের জামাই হয়ে জাঁকিয়ে বসবার। দলবল জুটিয়ে মুখ বেঁধে ফেলে গুমখুন করল না তো মানুষটাকে? কিন্তু গগন দুর্বল নয়—টানাহেঁচড়ার চিহ্ন নেই, একেবারে টুঁ শব্দটি করল না, এতবড়

একটা কাণ্ড কাকপক্ষীতে জানল না। পাড়াগাঁ জায়গায় এমনধারা হতেই পারে না।

কে-একজন বলল, পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এটা বরঞ্চ হতে পারে। বন থেকে নদী-খাল সাঁতরে মাঠ পাড়ি দিয়ে বাঘ এতদূর আসতে পারে তো বাতাসে পাখনা ভাসিয়ে সোঁ-সোঁ করে জিনপরী চলে আসবে, কত বড় কথা! পরীর নজর পড়ার কথা শোনা যায় মাঝে মাঝে। সেবারে হল কি—সোনাটিকারির মাঠে আসগর গাছি (খেজুরগাছ কেটে রস আদায় করে, আপনারা তাদের বলেন শিউলি; আমাদের এদিককার নাম গাছি) গাছে উঠে জিরানের রস পাড়ছে। নীচে ভাইপো দাঁড়িয়ে। হাতে রসের ভাঁড়, সেই অবস্থায় আসগর উধাও। ভাইপো উপর মুখো তাকিয়ে আর দেখতে পায় না: চাচা, চাচা গো! কোথায় কে? কাঁদতে কাঁদতে ছোঁড়া একলা বাড়ি ফিরে এল। ঠিক একটি মাস পরে তেমনি এক সকালবেলা পরীর কবল থেকে আসগর ছাড়া পায়। উড়িয়ে নিয়ে এসে—ঘর-বাড়িতে নয়—যে-খেজুরগাছ থেকে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই গাছের মাথায় আবার তাকে রেখে গেল। পুরো মাস পরে আসগর রসের ভাঁড় হাতে গাছ থেকে নেমে এসে বাড়ি ঢুকল। হরেক দৃষ্টান্ত আছে এমন। অতএব, বিয়ের তারিখ এসে যাচ্ছে, হেন অবস্থায় রাত্রিবেলা ভালমানুষ ঘুমিয়েছে, সকালবেলা আর নেই—কাউকে কিছু বলল না, কেউ টের পেল না—নিঃসন্দেহে এ জিনপরীর ব্যাপার। পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বিশেষ রকমের দোষ-অপরাধ না হলে পরীরা কারো মন্দ করে না—খেলায় একটুকু। আশা করা যায়, আবার কোন সকালে দেখা যাবে, দাওয়ায় কাঠির মাদুরের উপর গগন অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে। ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙাতে হবে। বিয়ের তারিখের মধ্যেও সেটা হতে পারে। মেয়েকে অতএব দাদামশায়ের বাড়ি ফেলে রেখো না ডাক্তার, বাড়ি নিয়ে এসে তৈরি হয়ে থাক।

এক হিসাবে বলা চলে, খানিকটা তাই। কালোকোলো মোটাসোটা ভূতিকে পরী বলা মুশকিল, কিন্তু উড়িয়েই নিয়ে গেল সে গগনকে। গগন ঘুমিয়ে আছে, ভূতি পা টিপে টিপে এসে ঝাঁকুনি দেয়ঃ আচ্ছা মানুষ আপনি মাস্টারমশায়! ঘুম আসে কেমন করে বুঝি নে।

বোঁচকা তো বেঁধেই রেখেছে, ডাক্তারখানা থেকে সেটা বের করে এনে দরজা ভেজিয়ে নিঃশব্দে বেরুল। গগন আগে যাচ্ছে, ভূতি পিছনে। আমতলা দিয়ে যায় না, শুকনো পাতা পায়ের নীচে খড়মড়িয়ে উঠছে। কৃষ্ণপক্ষ, অন্ধকার বেশ ঘন—ভেবেচিন্তেই আজকের রাত ঠিক করেছে তারা।

গাঙের ধারে এসে গেল। ধর্মখেয়া। অর্থাৎ পয়সাকড়ি নেবে না পারাপারের জন্য। দশের হিতার্থে চকদার বড়লোক কেউ নৌকো কিনে পাটনী মাইনে করে রেখে দিয়েছে। এই নিশিরাত্রে পার করবার জন্য পাটনীর বসে থাকবার কথা নয়। কিন্তু খেয়ানৌকোটাও তো এপারে দেখা যাচ্ছে না। ঘাটের অন্ধিসন্ধি খুঁজে দেখে, বোঝাই নৌকো কয়েকটা আছে। তারা পার করে দেবে না। পার করে দেবার কথা বলাও যায় না—মনোহর এদিককার জানিত লোক, পরিচয় টের পেয়ে গেলে বিপদ।

উপায়?

ভূতি কেঁদে বলে, উপায় একটা বের করুন মাস্টারমশায়। বেরিয়েই যখন পড়েছি, দেখাশুনো না করে ফিরব না। নৌকো না পাই, ঝাঁপ দিয়ে পড়ব এই গাঙে।

গাঙ বললে বেশী মান দেখানো হয়, আসলে বড় খাল একটা। তবে টান খুব, বিশেষ করে কোটালের কাছাকাছি এই সময়টা। কলকল করে জল ছুটে চলেছে। গগন থমকে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল ভেবে নিল। বলে, ঝাঁপ না হয় আমিই দিচ্ছি। খেয়ানৌকো ওপারে—সাঁতরে পার হয়ে গিয়ে নৌকো নিয়ে আসি। যদি অবশ্য জোয়ারের টানে ভেসে না যাই, কুমির-কামটে না খেয়ে ফেলে।

আশঙ্কা মিছা নয়। ভূতি শিউরে ওঠে, তবু 'না' বলতে পারে না। যেতেই হবে ওপারের ঘাটে নৌকোর খোঁজে। নৌকো চাই। পার না হয়ে উপায় নেই।

রাঙা বড়ি দেবে তো আমায়? তোমার কথার উপরে বেরিয়ে এলাম। গা ছুঁয়ে বল ভূতি, যেমন হরিদাস পাবে আমিও পাব তেমনি। মা কালীর দিব্যি করে বল। দেখ, এমনিই তো আমি পেয়ে যেতাম। রাঙা বড়ি শিখে, বিবেচনা কর, শ্বশুরের পুরো পশারটা নিয়ে রাজার হালে থাকতাম।

ভূতি বাধা দিয়ে বলে, থাকতে পারতেন না। বিয়ে হত না, বাবাকে বলে দিতাম আপনার বউয়ের কথা। জোচ্চুরি ধরা পড়ত। হরিদাসের দশা হত, হরিদাসের চেয়ে বেশী মারগুঁতোন খেতেন।

গগন, অন্ধকারে যতটা নজর পারা যায়, ভূতির দিকে চেয়ে বলে, যাকগে—সে পথ তো ছেড়েই এসেছি। আমিই বা কেন ঘর করতে যাব তোমার মন যখন হরিদাসের উপর? এই দেখ, জীবনের মায়া করছি নে—তুমিও ধর্ম বুঝে কাজ করো।

নেমে পড়ল গাঙে, এবং জলস্রোতে পলকে অদৃশ্য। হাত-পা দাপাদাপির শব্দ আসছিল—দূরে চলে গিয়ে তারপর জলের ডাকের সঙ্গে সেই শব্দ মিলেমিশে গেল। ভয় করছে ভূতির। মানুষটা সত্যি মরণপণ করেছে। এত লোভ ওষুধটা জানবার, এবং পয়সা রোজগারের? অন্ধকারে দূরের কিছু দেখা যায় না—পৌঁছল ওপারে কিংবা টানের মুখে ভেসে গেল, বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ কেটে গেছে—ভূতি এক নজরে তাকিয়ে ওপারের দিকে। এমনি সময় দেখে, অন্ধকারে ছুঁচাল কি-একটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। আরও স্পষ্ট হল। নৌকোর আগা। খেয়ানৌকো নিয়ে এসেছে গগন।

নৌকোয় উঠে বসে ভূতি হাত বাড়িয়ে বলে, এই নিন মাস্টার-

মশায়। মুখে কি বলব, রাঙা বড়ির যত কিছু বকাল, সুমস্ত লিখে নিয়ে এসেছি। আপনি যা করলেন, জীবনে ভুলব না।

ভূতির হাতের মুঠোয় কাগজ। এতক্ষণে স্থির হয়ে বসে গগন বিড়ি ধরাল, দেশলাইয়ের আলোয় দেখে নেয় কাগজটুকু। লাল কালিতে লেখা দীর্ঘ একটা ফর্দ—এই এই মাপের এই সব জিনিস দিয়ে রাঙা বড়ি তৈরি হয়।

ভূতি বলে, হরিদাসকে বলবেন না কিছু। সে রাগ করবে।

হরিদাস বলেছে বটে গগনকে শিখিয়ে দেবে—সেটা মুখের কথাই। কোন্ সুবাদে দিতে যাবে? কী এমন খাতির! মনোহর আর ভূতি ছাড়া তুনিয়ার মধ্যে আর যে জানবে সে হল হরিদাস। আর একজনকে শিখিয়ে কেন অকারণ প্রতিযোগী বাড়াবে? কিন্তু আছ কোথা কম্পাউণ্ডার বাবু, তোমার আগেই সে বস্তু এই দেখ মুঠোয় এসে গেছে।

গাঙ পার হয়ে চলেছে তুজনে। ফাঁকা মাঠে পড়ল। আকাশে তারা। আঁধারে এতক্ষণে চোখ রপ্ত হয়ে গেছে, দিব্যি পথ দেখা যায়। না দেখলেও অসুবিধা নেই, ভূতির সব মুখস্থ। আগে যাচ্ছে সে এখন। আর মুখে বলে বলে যাচ্ছে, আধক্রোশটাক গিয়ে, মাস্টারমশায়, গাঙ থেকে খাল বেরিয়েছে। খালের কিনারা ধরে যেতে হবে দক্ষিণমুখো। বাঁশের সাঁকো পড়বে।

গগন বলে, গিয়েছ নাকি সেখানে?

ভূতি ঘাড় নাড়েঃ গাঙ-পারে এই আমি প্রথম এলাম। যেতে কেন হবে? হরিদাস একরাত্রে পার হয়ে গিয়েছিল—

শিউরে উঠে গগন বলে, বল কি, অত মারধোরের পরেও আবার?

তাই বুঝুন। না দেখে থাকতে পারে না।

হরিদাস যেমন বলেছে, ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। খালের উপর সাঁকো। গ্রাম এদিকটায়—দত্তগাঁতি—কোন দত্ত জমিজমা নিয়ে প্রথম ঘরবসত করেন বোধহয় এখানে। তেমাথার উপর খড়ে-

ছাওয়া দোচালা ঘর। হরিদাস ডাক্তার হয়ে নতুন এই ডাক্তারখানা বেঁধেছে। অদূরে এক সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ি—চালের টিন ঝকমক করছে। আপাতত ঐ বাড়িতে আছে হরিদাস, ঐ টিনের ঘরে শোয়। ভূতি তেমাথা পথে ঘাসবনের উপর বসে পড়ল। গগন গিয়ে ও-বাড়ি থেকে হরিদাসকে ডেকে আনুক।

হরিদাসের সজাগ ঘুম। রোগী মনে করে ধড়মড় উঠে এল বাইরে। গগনকে দেখে অবাক।

রাত দুপুরে তুমি হঠাৎ?

এখানে নয়। চলে এস, ব্যাপার আছে।

খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, ভূতি এসেছে।

হরিদাস অবাক হয়ে যায়ঃ সে কি! সোমত্ত মেয়ে কোন্ বিবেচনায় এমনি সময় নিয়ে এলে?

তুমিই তো গোপনে গিয়ে পথঘাট বলে দিয়ে এসেছ।

গজর-গজর করতে করতে এল, কিন্তু ভূতির সামনে হরিদাস আর এক মানুষ। কণ্ঠ অতিশয় মোলায়েম করে বলে, কোন দরকার আছে লতিকা? খবর পেলে আমিই তো যেতে পারতাম।

ভূতি বলে, কুল ছেড়ে এলাম তোমার কাছে।

সে কি, কেন? ভাল ঘরের মেয়ে তুমি—আমিই বলে পরের বাড়ি মাথা গুঁজে আছি—থাকবে কোথা? খাবে কি?

ভূতি গোঁ ধরে বলে, ওসব আমি জানি নে। তুমি যেখানে আমি সেইখানে। আর আমি ফিরব না।

গগনকে ভূতি মাস্টারমশায় বলে, এসব প্রণয়ের কথা অতএব কানে শোনা উচিত নয়। ধাঁ করে সে খানিক পিছিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। আকাশ-পাতাল ভাবনা এসে গেল হঠাৎ মনে।

হরিদাস ডাক্তারখানার তালা খুলল। ভিতরে গেল ভূতিকে নিয়ে। কতক্ষণ কথাবার্তা—তার পর একা হরিদাস বেরিয়ে আসে।

ও যাবে না। তা থাকুক দু-চারটে দিন। মনোহর ডাক্তার নতুন এখন ভদ্রলোক হচ্ছে। মানীলোক হচ্ছে। মেয়ে আমার কাছে, খবর জানতে বাকি থাকবে না। মানের দায়ে সে-ই ছুটে এসে পড়বে।

গগন চিন্তিত ভাবে বলে, দেখ, মামলা-মোকদ্দমা করবে হয়তো। আমি সঙ্গে করে এনেছি, আমাকেও জড়াবে। ডেকে দাও ভূতিকে একবার—থুড়ি, লতিকাকে। একবার একটু দেখা করে আমার সঙ্গেই আবার ফিরে যাবার কথা। থাকতে চায় কিজন্য এখন।

যাবে না তো ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়াব নাকি?

হাসে হরিদাস হি-হি করে। বলে, ভয় কিসের? মান খুইয়ে মনোহর ডাক্তার ঘরের কেলেঙ্কারি কখনো থানায় বলতে যাবে না। যায় তো আমারও সমুচিত জবাব আছে।

হাসি থামিয়ে বলতে লাগল, জাতের বড়াই খুব। ভিনজাত হয়ে মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তাই অপমান করে তাড়াল। কিন্তু মনোহর নিয়ে এসেছিল ঐ যে ভূতির মা—সেই বা কোন্ ভটচাজ্জির মেয়ে শুনি? পরের বউ ফোসলানি দিয়ে নিয়ে এল, বিয়েও তো করে নি, পালিয়ে বাদা অঞ্চলে এসে উঠল। এতকাল পড়ে ছিলাম—কোন্ খবরটা না রাখি? হাটে-হাঁড়ি ভাঙতাম সেদিন—কিন্তু ভূতির মুখ চেয়ে কিছু করি নি। রাঙা বড়ির লোভে।

একটু থেমে আবার বলে, ওসব কিছু ভাবি নে। কিন্তু তুমি কি করবে এবার গগন? গাঙ পার হয়ে ফিরে যাবে? টের পেলে ডাক্তার কিন্তু ছেড়ে কথা কইবে না। আমার মতন হবে। সেই সব ভেবেচিন্তে যাও।

গগনের হাতের মুঠোয় রাঙা বড়ির ফর্দ। হরিদাস জানে না। কাকে সে এখন পরোয়া করে! ঘাড় নেড়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমারও ঐ লতিকার কথা। বেরিয়ে পড়েছি তো আর যাচ্ছি নে। ডাক্তারি করব এবার, যা তুমি করছ। আচ্ছা, নৈঋত হল কোন্‌টা? দিক

ঠিক থাকে না রাত্রিবেলা। ওলাবিবি নৈর্ঋতে গেলেন, আমিও যাই। মওকা ছাড়া হবে না।

হরিদাস সঙ্গে সঙ্গে চলল, বাঁধের উপর তুলে ভাল করে তাকে নৈর্ঋত কোণ দেখিয়ে দেবে। ভূতির মায়ের কথা চলছে। ব্রাহ্মণ-ঘরের বউ—কুল ছেড়ে মনোহরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। মনোহর তাই পুরুষমানুষের সামনে বউয়ের ঘোমটা খুলতে দেয় না। প্রায় তো বুড়ী হয়ে গেছে এখন—তবু সেই পুরানো অভ্যাস। পিরীতের ঝোঁকে ভূতিই সব পারিবারিক কথা বলে দিয়েছে হরিদাসকে।

হরিদাস বলে, অবাক হচ্ছ কেন, বাদার এই রীত। ঘরবসত ছেড়ে সহজে কে বনে আসতে চায়? আসে পেটের জ্বালায়। ফাটকের দুয়োর থেকে পিছলে এসে পড়ে কেউ কেউ—পুলিসের হাত এড়িয়ে। কেউ আসে সমাজের তাড়া খেয়ে। যতদিন বন থাকে ততদিন বেশ ভাল। পড়শী বাঘ-কুমির—জাত-জন্মের কথা কিসে উঠবে? বসত জমলে তখনই যত রকম বায়নাক্কা।

হাত তুলে দূরের পথ দেখিয়ে দেয়। ফিরে যাবে এবার হরিদাস। গগনের পিঠে থাবা মেরে সে তারিফ করেঃ বেশ করেছ ভাই। খপ্পরে এনে ফেলেছ, রাঙা বড়ি না দিয়ে এবারে পারবে না। ওর বাপ শয়তানটা তিন বছর আশায় আশায় ঘুরিয়ে শেষটা ছুতোনাতায় তাড়িয়ে দিল। তোমা হতেই উপকারটা হল গগন। আমার যে কথা—ফাঁকি দেব না, রাঙা বড়ি তোমাকেও বল্লব। খবরবাদ নিও মাঝে মাঝে।

গগন বলে, নেব বই কি! একদিন এসে তোমাদের সংসারধর্ম দেখে যাব।

সংসারধর্ম? একটু চুপ করে থেকে অন্ধকারে হরিদাস হেসে উঠল: আলকাতরার পিপের সঙ্গে সংসারধর্ম হয় না। বাজে ভাঁওতা তোমার কাছে দেব না। বেজাত বলে আমায় মারধোর করল। বলি, আমারও জাতজন্ম আছে একটা। জাতের দায় আজকে না

থাক হবে তো একদিন। টাকাপয়সা হলে তখন হবে। সমাজ হবে, আত্মীয়কুটুম্ব সমস্ত হবে। সংসারধর্ম জমিয়ে বসে শেষটা ঐ মনোহর ডাক্তারের মত আঁকুপাকু করে মরি! বয়ে গেছে—অমন হ্যাকাচৈতন পাও নি আমায়।

গগনের কিন্তু ভাল লেগে গেছে ভূতিকে। একটু আগে ঐ যে যাত্রার ঢঙে বলছিল হরিদাসকে, তাতে যেন বেশী ভাল লাগল। বলে, ছি-ছি, এই যদি মতলব রাতবিরেতে কি জন্য তবে পার হয়ে যাও? না দেখে থাকতে পার না—এই সব বলে বোকা মেয়েটাকে পাগল করে তোল?

হরিদাস হাসতে হাসতে বলে, কাজ হাসিল হয়ে যাক, তখন আবার ভিন্ন কথা বলব। বলাবলি কি—যেখানকার মেয়ে গাঙ পার করে রেখে আসব সেই জায়গায়।

ঘরে নেবে ওর বাপ?

আমারই বা কোন্ দায়! আমি আসতে বলেছি? বকুনি দিলাম, শুনলে তো নিজের কানে। মনোহর ডাক্তার অপমান করল আমায়, হাতে ধরে মারল, তার শাস্তি হবে না? ভগবান আছেন বুঝতে পারলে? দশের মধ্যে মুখ পুড়বে। এপার থেকে শুনতে পাব আমি, মজা দেখব।

এর পরে গগনের প্রবৃত্তি হয় না হরিদাসের সঙ্গে কথা বাড়াতে। হন হন করে এগিয়ে চলল। হাতের মুঠোয় ভূতির দেওয়া কাগজের টুকরো। চলল নৈর্ঋতে—বলির পাঁঠার রক্তচিহ্ন ধরে ওলাবিবি যে তল্লাট উজাড় করতে করতে চলেছেন। ওলাবিবির পিছন ধরে চলল। সে-ও কি কম ফ্যাসাদ! কত জায়গায় গিয়ে শোনে, হ্যাঁ—চলেছিল মহামারী একদিন দুদিন, এখন থেমে গেছে। ওঝা-বৈদ্য ইদানীং এমন করে লেগেছে, বিবিঠাকরুনকে এক জায়গায় তিষ্ঠাতে দেয় না, তাড়িয়ে তোলে। ওলাবিবি ছোটেন, মন্ত্রতন্ত্র ও ওষুধপত্র সহ তারাও ছোটে পিছনে। গগনও সেই দলের একজন। যাবে কদ্দূর? কিছু ঠিক নেই—দক্ষিণে যত নাবালে মানুষের

বসতি পৌঁচেছে। ওলাবিবি যেখানে গিয়ে স্থির হয়ে দুটো দিন থাকবেন—এবং গগন হেন মানুষদের কিছু রোজগারের উপায় হবে। সে জায়গা যত দূরে হোক, যেতেই হবে।

খবরবাদ নিয়ে দেখছে, ওলাবিবি চলেছেন কিন্তু নৈর্ঋত কোণ কিংবা কোন বাঁধা পথ ধরে নয়। এগোন আবার পিছিয়ে আসেন, ডাইনে ঘোরেন কখনো, কভু বা বাঁয়ে। ইচ্ছে করে লুকোচুরি খেলছেন যেন। কিন্তু নতুন ডাক্তার গগনও হার মেনে ফিরে যাবার মানুষ নয়।

নয়

মাস কয়েক পরে গগনকে দেখতে পাচ্ছি কুমিরমারি গঞ্জে।

ডাক্তার হয়ে চেপে বসেছে। ঘুরে-ফিরে সেই কুমিরমারি—বাদার কলকাতা। ওলাবিবির পিছন ধরে এসে পড়েছে। বিবি-ঠাকরুনের আশীর্বাদও ছিল গোড়ার দিকে। নতুন ধানচালের সময়, ডাক্তার ডাকতে মানুষ দৃকপাত করত না। গোলপাতার ঘর বেঁধে ফেলল গগন, তক্তাপোশ কিনল। এবং এক ওষুধের বাক্সও আনাল কলকাতা থেকে ভি-পি করে। ডাক্তারির কায়দাকানুন এবং ওষুধ আনানোর ঠিকানা জেনে এসেছে মনোহরের বাড়ি থেকে। শুধুমাত্র বাক্সই, ওষুধের আপাতত গরজ নেই। সে ব্যবস্থা করে এসেছে মনোহরের ডাক্তারখানা থেকে—পুঁটলিতে ভরে একগাদা হোমিওপ্যাথি শিশি এনেছে মূলধন হিসাবে। ওষুধের বাক্সের ছিদ্রে ছিদ্রে শিশি—ছিদ্রগুলো ফাঁকা রেখে আসে নি, মনোহর তবে তো টের পেয়ে যাবে। খালি শিশিতে দেদার জল ভরতি করে ঢুকিয়ে এসেছে। নিজের বাক্সেও সেই ব্যাপার। কতক খাঁটী ওষুধ, কতক সাদা জল। গোড়ায় কিছুদিন হাত পুড়িয়ে নিজে রান্না করে খেয়েছিল। একটু জমে যেতেই গদাধরের হোটেলে খায়। যেখানে সেই পয়লা

দিন নাজেহাল হয়েছিল। এখন গলায় গলায় ভাব গদাধরের সঙ্গে। চোখ টিপে গদাধরকে জিজ্ঞাসা করে, পয়সা দেদার পিটছ। ক'ঘটি জমল, বল দিকি ?

বিরস মুখে গদাধর ঘাড় নাড়েঃ ঘটি দেখ তুমি। একটা পয়সা থাকে তো বাপের হাড়। দুটো হাটে চাল-ডাল আনাজপত্তর কিনি—সেই হাটখরচা জোটাতেই প্রাণান্ত।

সে কি ? কাতারে কাতারে খদ্দের এসে খেয়ে যায়—

সত্যি কথা ডাক্তারবাবু। হাটবারের দুপুরে শুধু ভাতই রাঁধতে হয় পাঁচ-ছ বার।

হঠাৎ কথা থামিয়ে গদাধর বস্তার চাল দাঁড়িপাল্লায় মেপে ধামায় ঢালতে লাগল। এইগুলো হাঁড়িতে দেবে এখন।

গগন বলে, বলি মাংনা তো কেউ খায় না। খেয়ে পয়সা দিয়ে যায়। তবে অনটন হবে কেন ?

গদাধর ঘাড় লম্বা করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নেয়। বাসনের কাঁড়ি নিয়ে আদরমণি খালে নেমে গেছে। দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, নচ্ছার মাগী সব পয়সা খদ্দেরের কাছে হাত পেতে নিয়ে নেয়। হাটের সময় পয়সা চাইলে কৌটো সামনে এনে উপুড় করে, যত খদ্দেরই আসুক হাট-খরচা কিছুতে আর জমতে চায় না।

গগন বলে, হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না। রাত্রে কাজকর্ম চুকিয়ে সমস্ত দিনের সব জমাখরচটা লিখে রাখলে পার। এমন ফলাও ব্যবসা, তা কাগজের উপরে কোন দিন একটা কালির আঁচড় কাটতে দেখলাম না।

হুঁ—বলে গদাধর চুপ করে থাকে।

বলি লিখতে পড়তে পার তো ভটচাজ্জি ?

পারি খানিকটা। ক্ষণপরে আবার বলে, ক-ব-ঠ এক গাদা অক্ষর—হেরফের হয়ে যায় ডাক্তার, সমস্ত মনে থাকে না।

গগন হেসে বলে, বুঝতে পেরেছি। রাত্রে খেতে এসে আমি

রোজ হিসাব ঠিক করে দিয়ে যাব। খাতা বেঁধে রেখো। তখন ঠাহর হবে টাকা যায় কোথায়। আদরকে বলতে পারবে।

কিন্তু এদিকে কী হল!

ওলাবিবি অল্প কিছুদিন কেরদানি দেখিয়ে একেবারে উধাও এবারে কোন্ দিকে, পাত্তা মেলে না। লোকে বলে, মিলবেও না আর এখন, আগামী সনে নতুন ধান-চাল উঠলে আবার দেখা দেবেন। আপাতত ঠাণ্ডা।

গগনও ভাবছে, কাঁহাতক অমন রোগের পিছু তাড়িয়ে বেড়ানো যায়! রোগপীড়া একটা নয়। ওলাওঠা গেল তো আরও কত সব রয়েছে। আপাতত মন্দা বাজার হলেও দেখা দেবে সবাই সময়ক্রমে। স্থায়ী হয়ে বসেছে ডিস্পেনসারি সাজিয়ে, আর এখন নড়ছে না। কালে কালে মনোহর ডাক্তার হবে উঠবে গঞ্জের ভিতর। টাকাটা সিকেটা যা-কিছু পায়, কায়ক্লেশে নিজের খরচা চালিয়ে বাদবাকি বিনি-বউয়ের নামে মনিঅর্ডার করে। চিঠিও লেখে, মনের আশা চিঠিতে ব্যক্ত করে: কষ্টেসৃষ্টে থাক কটা দিন, পশার জমে উঠুক, বেশী করে পাঠাব। হাতে কিছু জমলেই বাড়ি গিয়ে চারুবালা আর তোমাকে নিয়ে এইখানে ডিস্পেনসারির লাগোয়া বাসা করব।

আশার কথা লোকেও বলছে, সবুর কর কিছু দিন, আষাঢ়ে বর্ষাটা চেপে পড়তে দাও, জ্বরজ্বারির ঠেলাটা দেখো। ক্রোশ তিনেক দূরের গাঁয়ে এক ফকির আছে, পোস্টাপিস সেখানে, গগন সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছে। পাঁচ পয়সা দক্ষিণায় ফুল-পড়া ও জল-পড়া দেন ফকির, সন্ধ্যাবেলা কুড়িয়ে এক ঘটি তামার পয়সা হয়ে যায়। কুমিরমারি ভাল হয়ে যাচ্ছে, ভদ্রলোকেরাও এসে বসত করবেন ক্রমশ। ভদ্রলোকের দেখাদেখি সভ্যভব্য হবে অঞ্চলের যাবতীয় মানুষ। হাতের কাছে বিচক্ষণ গগন ডাক্তার থাকতে তখন আর

ফকিরের জল-পড়া নিতে যাবে না, ওষুধপত্র খাবে। এই সমস্ত ভাবে গগন। আর কি, সেই যেমন লিখেছিল বিনি-বউকে--কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়ে যাও কিছুকাল, দিন এসে যাবে।

কিন্তু সুদিনে যে অবস্থাই ঘটুক—আপাতত ডিস্পেনসারিঘরে বিড়াল-ইঁদুর-আরশুলারই শুধু গতিগম্য। বিনি-বউর নামে টাকা গেল না এ মাসে। টাকা কি পাঠাবে, গদাধর-হোটেল না থাকলে দুবেলা খাওয়াই জুটত না। এমন হয়েছে, এক ছিলিম তামাক খেতে হলেও হোটেলে চলে যায়। হোটেলের হিসাবপত্র ঠিক করে দেয় রোজ রাত্রে, ঐ সঙ্গে নিজের খোরাকি বাবদ যা পাওনা হচ্ছে তারও একটা আলাদা হিসাব লিখে রাখে। বলে, কিচ্ছু ভেবো না গদাধর, পাইপয়সা অবধি শোধ করে দেব। এইসা দিন নেহি রহেগা। দুটো মাস যেতে দাও—এক রাঙা বড়ি এক সিকে—তোমাকেই তখন দু-মাস ছ-মাসের আগাম টাকা দিয়ে দেব।

এখন থেকেই রাঙা বড়ি বানিয়ে রাখলে হয় শিশি ভরতি করে। মনোহর ডাক্তার যেমন করত। বর্ষাকাল কেটে গিয়ে আশ্বিন—তখন তো আরো মজা। নতুন হিম পড়বে, খানাখন্দের আবদ্ধ শেওলা-পচার দুর্গন্ধ, গায়ের উপর হাতটা বুলিয়ে আনলে কাদার মত মশা লেপটে আসবে। কম্প দিয়ে জ্বর আসবে তখন ঘরে ঘরে। তেমন-তেমন হলে কোথায় লাগেন মা ওলাবিবি! কোকিল-বাড়ি এলাকার মধ্যে দেখেছে, গৃহস্থঘরে এক ঘটি জল এগিয়ে দেবার মানুষ থাকে না, কোঁকাচ্ছে সব কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

ভুতির দেওয়া কাগজের টুকরো অতএব বের করে ফেলল। কন্টিকারি, বচ, হাতিশুঁড়া, ভাদলার মুথা, স্বর্ণসিঁদুর—এমনি বাইশ-চব্বিশ দফা। এতগুলো বস্তু জোটানো সোজা নয়, নগদ পয়সার কেনাকাটাও আছে। নিজের হাতে-গাঁটে যা আছে তাতে কুলায় না, তিন-চার টাকা হাওলাত হল গদাধরের কাছে। ওষুধটা কোন রকমে একবার উৎরাতে পারলে তখন তো পায়ের উপর পা চাপিয়ে

পয়সা লোটার ব্যাপার। ঝঞ্ঝাট ও খরচপত্রের হাজার গুণ উশুল হয়ে আসবে।

কিন্তু রঙই আসে না মোটে। মনোহরের রাঙা বড়ি টকটকে জবাফুলের মত—রং দেখেই রোগী মেতে যায়, গালে তোলবার সবুর সয় না। আর এই বড়ি গগন রোদ্দুরে শুকাল, আগুনে সেঁকে দেখল—পোড়া মাটির মত চেহারা। হাঁদা মেয়ে বকালের নাম-গুলো দিয়েছে, পরিমাণ লেখে নি। সেই দোষেও হতে পারে। গুণাগুণ কি দাঁড়াল, জ্বরো রোগীর উপর পরখ না করে বলা যাবে না। এমন হতভাগা জায়গা—না-ই বা হল আষাঢ় মাস, এত লোকের মধ্যে কারো কি একটু গা গরম হতে নেই?

ভেবেচিন্তে একদিন দত্তগাঁতি-মুখো বেরিয়ে পড়ল, মুঠোখানেক বড়ি নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে করে, ভূতিকে দেখাবে। ভূতি কি বলে শোনা যাক। লোকসান নেই—আর কিছু না হোক, দুটো বেলার হোটেলের দেনা অন্তত বাঁচবে। ভূতি-হরিদাসের কী ভাবে চলছে, খবর নেওয়া কর্তব্যও বটে। ওষুধ বাগিয়ে নিয়ে বিদায় করে দিয়েছে নাকি ভূতিকে? যেমন লোক হরিদাস, তা-ই হয়তো করে বসেছে ইতিমধ্যে।

রাত্রিবেলা সেই একদিন ডাক্তারখানার দোচালা ঘর দেখে গিয়েছিল, তার পিছনে নতুন এক দাওয়া জুড়েছে। ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়ায় দাওয়া পরিপাটী করে ঘেরা। গগন গিয়ে ডাকে, কম্পাউণ্ডার বাবু আছ?

বলে ফেলেই মনে হল, কম্পাউণ্ডার নয় এখন। সংশোধন করে নেয়: ডাক্তারবাবু—

পিছনের দাওয়া থেকে সাড়া আসে, বসো। রোগী দেখতে বেরিয়েছেন। এখুনি এসে যাবেন, বসতে বলে গেছেন।

ভূতি বলছে। গগনকে সে এক সাধারণ রোগী ভেবে বসেছে।

গগন ডাক দেয়, এদিকে এস তুমি। চিনতে পারছ না, আমি মাস্টারমশায়।

উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে ভূতি সামনে এল। গগন বলে, আছ কেমন? সেই তো জুড়ে-গেঁথে দিয়ে গেলাম। সুখশান্তি কেমন হল, দেখতে এসেছি।

ভূতি ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল: সুখ আর শান্তি। তেমনি লোকের হাতে দিয়ে গেছেন কিনা! সুখশান্তি কপালে থাকবে তো এই চুলোয় মরতে আসব কেন?

এ তো জানা কথা। হরিদাস হয়তো রাঙা বড়ি আদায় করে নিয়েছে ইতিমধ্যে, নিয়ে তার নিজমূর্তি ধরেছে। গগন বলে, ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে বুঝি? তা দেখ, তুটো হাঁড়ি এক জায়গায় রাখলে ঠোক্কর লেগে খনখন করে, তুটো মানুষের ঘরসংসারে খটাখটি বাধবেই কখনোসখনো।

এই সব নাকে-কাঁতুনি শুনবার জন্য এতদূর হেঁটে আসে নি, কাজের কথা সকলের আগে। হরিদাস বেশী দূর যায় নি, এক্ষুনি এসে পড়তে পারে—জরুরী কথাবার্তা তার আগে সারতে হবে।

বলে, রাঙা বড়ি বানালাম ভূতি, কিন্তু রঙ আসে না।

ভূতি মুখে আঙুল ঠেকিয়ে বলে, খবরদার, খবরদার! ও-মানুষ টের না পায়। তবে আমায় আস্ত রাখবে না।

হরিদাস ডাক্তারকে দাও নি আজও?

না। একটু থেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, ওকে চিনি নে? যেটুকু বাকি ছিল, এর মধ্যে চিনে ফেলেছি। যেদিন দিয়ে দেব, তার পরদিনই চুলের মুঠি ধরে আমায় রাস্তায় তুলে দিয়ে আসবে। কাজ ফুরলে তখন ও-মানুষ কারো নয়।

হরিদাসের মনোভাব ভূতির কাছেও তবে অজানা নেই। ঝানু মেয়ে—লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে হাতের মুঠোয় রেখেছে। কিন্তু এই খেলানো কত কাল চলবে? মরীয়া হয়ে উঠবেই এক সময়। চকিতে এত সব ভেসে যায় গগনের মনে। চুলোয় যাক, ওদের কথা ওরা

ভাবুক গে—গগন যার জন্য এসেছে। বলে, অনেক রকম করে দেখলাম। রাঙা বড়ি হলদে-হলদে থেকে যায়। তোমাদের বড়ি ঘোর রঙের, তেমনটি কিছুতে হয় না। তাই ভাবছি, মাপের যদি হেরফের হয়ে থাকে —

ভূতি দৃক্‌পাত না করে বলে, রাঙা বড়ি না হল তো হলদে বড়িই বলবেন। কাজ কী রকম হচ্ছে তাই বলুন।

পরখ হল কোথা? পোড়া জায়গায় মানুষগুলোর যেন পাথরের দেহ। হাঁচেও না কেউ ভুলে। সবাই বলছে, আষাঢ় থেকে নাকি কিছু কিছু হবে। আশায় গোছগাছ করছি।

ভূতি বলে, তাই করে যান। সময়ে দেখতে পাবেন। ম্যাজেণ্টা মিশিয়ে বাবা রং করত। কী দরকার, আপনার ওষুধের আলাদা নাম মাস্টারমশায়। ফিক করে হেসে বলে, গগন ডাক্তারের হলদে-বড়ি। বেশ শুনতে।

হরিদাস ফিরল। গগনকে দেখে ভারী খুশী। বলে, এসেছ তুমি? প্রায়ই ভাবি তোমার কথা।

ইঙ্গিতে টাকা বাজিয়ে দেখায়। চাপা গলায় বলে, ছাড় দিকি একটা। দুধ নিয়ে আসি।

গগন হকচকিয়ে গেছে।

লতিকাকে সেই দিয়ে গেলে। বাসা করেছি দেখ, রান্নাঘর বেঁধে ফেলেছি। আর এই হল ডাক্তারখানা ও বৈঠকখানা। রাত্তিরবেলা ঝাঁপ ফেলে দিয়ে পাশাপাশি তিনটে বেঞ্চির খাট পড়ে এখানে। পেয়ারের মানুষ এসেছ, তোমায় পায়েস খাওয়াব। দুধ নিয়ে আসি বুনোপাড়া থেকে। এর পরে গোয়ালা এসে মাপ করতে বসবে। তখন আর মিলবে না।

পায়েস আমি ভাল খাই নে।

হরিদাস বলে, আমি খাই। কুটুম্ব এসেছ, লতিকা যত্ন করে রেঁধেবেড়ে দেবে। তোমার নাম করে আমরাই সব খাব।

কলসি নিল হাতে, কলসি ভরতি করে দুধ আনবে। গগনকেও সঙ্গে নিয়ে বের করল। গেল বুনোপাড়াতেই। আবাদের মধ্যে বুনো নামে পরিচিত এই জাত সকলের চেয়ে পরিশ্রমী। লক্ষীমন্তও বটে—উঠানে গোলা, গোয়ালে মহিষ-গরু। আরও হত মেয়েপুরুষ তাড়ি ও কাজিয়ার নেশায় অতিরিক্ত রকম আসক্ত না হত যদি। এক বাড়ি গিয়ে দুধ নয়, চাল কিনল গগনের টাকাটা দিয়ে।

বলে, দুধ না ঘোড়ার ডিম। অমনি বলতে হয়—খালি কলসি ফিরিয়ে নিয়ে বলব, দুধ পাওয়া গেল না। একটা রোগী নেই বিশ দিনের মধ্যে। ভূতির কাছে এসব ভাণ্ডি নে, বুঝলে, পেটের ভাত জোটাতে পারে না, সে মরদকে মেয়েমানুষ মানবে কেন? দেখ ভগবান তোমায় পাঠালেন, নয়তো বিনি-অসুখে লঙ্ঘনে থাকতে হত আজ। আজকাল বাড়ি বাড়ি ফিরি করতে শুরু করেছি: জ্বরজারি হয়েছে কারো—মাথা-ধরা, গা বমি-বমি? বাড়ির উপর ডাক্তার পেয়েও কেউ রা কাড়ে না। এক ঝোঁক যা আশ্বিন-কার্তিকে পেয়েছিলাম। তোমাদের ওদিকে গতিক কি রকম বল দিকি?

গগন বিরস মুখে বলে, একটা মরশুম তুমি যাহোক কিছু করে নিয়েছ। আমার ওলাঠাকরুনের পিছনে ছোটাছুটি সার। ঠাকরুন খেলাতে লাগল। খবর শুনে ছুটলাম এক জায়গায়। গিয়ে দেখি ফুসফাস। নাকে-দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। না পেরে এখন চেপে বসেছি কুমিরমারিতে। আষাঢ়ের ভরসায় আছি।

একটুখানি চুপ করে থেকে হরিদাস বলল, দেখ ডাক্তারি ব্যবসা এ দিগরে জমবে না। বাড়ন্ত লাউয়ে পোকা ধরে না। জঙ্গল কেটে মানুষের টাটকা ঘরবসত। পুরানো হয়ে খানিক হেজেপচে যাক, রোগপীড়ে তখন। রোগপীড়ে দেখগে ডাঙা অঞ্চলে, শহর-বাজারে। যতগুলো মানুষ, ততগুলো রোগ।

গগন বেজার মুখে বলে, ডাক্তারও তার দুনো। মারেও কেমন পটাপট। মানুষ না মশা—চটাপট যে যত মেরে ফেলবে, তত

তার কাছ ঘেঁষবে। তত তার পশার। সেই জায়গায় মাথা ঢোকানো তোমার আমার কর্ম নয়।

কয়েক পা গিয়ে নিরীহ ভাবে আবার বলে, আমায় রাঙা বড়ি বলে দেবে, মনে আছে সে কথা? সেইজন্যে এলাম। মরশুম কি রকম দাঁড়াবে জানি নে, তবু তৈরী হয়ে থাকা।

আমায় বলে দিলে তবে তো বলব! কিছু বের করতে পারি নি এদ্দিনে।

বল কি গো?

খেলাচ্ছে। ঐ যা তুমি বললে—খেলানো হল ঠাকরুনদের রীত। কী তোমার ওলাঠাকরুন আর কী তোমার এই ভূতি-ঠাকরুন। আজ দেব কাল দেব করে কাটায়। বলে, এসে যাক মরশুম—ওষুধ বলতে আর বানাতে এক দিনের ওয়াস্তা। আসলে হল, আমার অসাক্ষাতে বাপের বাড়ির চর এসে ফুসলানি দিচ্ছে। টের পাই। মনোহর ডাক্তারের পয়সাকড়ি আছে, ছিলও আরামে। মন তাই টলমল করে।

গগন বলে, মেয়ে ঘরে নেবে মনোহর ডাক্তার?

হরিদাস বলে, কেন নেবে না, মেয়ের হয়েছে কি! বয়সের দোষে একটু-আধটু পাকছাট সবাই দিয়ে থাকে। আবাদ জায়গা —খোঁজ নিয়ে দেখ, কোনও ঘরে বাদ নেই। এ তো কিছুই না—বনঘেরির কেদার আশের মেয়ে রঙ্গিণী পেটের বাচ্চা বাপ-মার কাছে রেখে ধুয়ে-মুছে আবার ফের বরের ঘরে গিয়ে উঠল। গোময়-গঙ্গাজলে শুদ্ধ হয়ে সমাজের দশজন ডেকে পাতা পেড়ে খাইয়ে দিল—ব্যস! ভূতির বেলা তা-ও তো নয়।

গগন বলে, সেই যে বলেছিলাম—ভয় ছিল, মনোহর মামলা-মোকদ্দমা জুড়ে দেবে। আমি জড়িত আছি কিনা আবার! দেখছি, তোমার কথাই ঠিক।

হরিদাস ভ্রূভঙ্গি করে বলে, নিজের কুলের কথা সদরে নিয়ে ঢাক পেটাবে! ওরকম বেহায়া-বেলেল্লা ডাক্তার মানুষ হতে পারে—

আবাদ অঞ্চলে হয় না। মুশকিল হল, ছুটো মন্তোর পড়ে ফুল ফেলে কাজটা পাকা করে নেব, সেটা কিছুতে হয়ে উঠছে না। বিয়েটা হয়ে গেলে নড়ানো আর সোজা হবে না।

গগন অবাক হয়ে যায়। কী কথাবার্তা এখন হরিদাসের মুখে! বলে, ষোলআনা বিয়ে করে ফেললে তুমি নিজেও তো আটক হয়ে গেলে। রাঙা বড়ি নিয়ে দূর করে দেবে—তখন সেটাও আর সহজ হবে না।

উপায় নেই, শয়তান মেয়েটা আন্দাজে ধরে ফেলেছে। তা না না-না করছে, বুঝলে না, পাকা সম্পর্ক না হওয়া পর্যন্ত মুখে রা কাড়বে না। ডাক্তার হয়ে বসেছি—এমন ওষুধটা মুঠোর ভিতর এসে ফসকে যাবে, সে-ও তো হতে দিতে পারি নে। পোড়া আবাদে বামুন পাওয়া যায় না। ধান-রোওয়া ধান-কাটার জনকিষেন আসে ডাঙা অঞ্চল থেকে, দোকানদার আসে, গুরু আসে, ডাক্তার আসে—বামুন-পুরুত একজন কেউ আসে না। বিয়ের মন্তোর তা হলে আটকে থাকত এদ্দিন?

হরিদাসের মুখে আজ এই কথা! গগনের কৌতুক লাগে। আর এই মানুষটাই কী বলেছিল সেই রাত্রে। তার মানে রাঙা বড়ি হাত করবার জন্য উতলা হয়েছে। ডাক্তারির গতিক দেখে বুঝেছে, ঐ বস্তু ছাড়া উপায় নেই। তারই জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত।

গগন বলে, আমাদের কুমিরমারিতে গদাধর বামুন আছে বটে, কিন্তু খাঁটী বামুন হবে না। শানা থেকে ভটচাজ্জি।

হরিদাস পরমোৎসাহে বলে, আছে নাকি? আগমবাগীশ-নিগমবাগীশ কোথা পাচ্ছ বুনো দেশে? পৈতে আছে তো? অং-বং ছুটো-চারটে ছাড়তে পারলেই হল।

পৈতেটা নিয়েছে, নয় তো হোটেল চলে না। মন্তোর পড়তে পারে না, হোটেল চালাতে মন্তোর-তন্তোরের গরজ কি?

হরিদাস এতেই রাজী। বলে, আহা, দু-চার কথা শিখে নিলেই হল। নিত্যকর্মের বই রয়েছে। উপরি রোজগার। পুজো-

আচ্ছা ব্রতসিদ্ধি কত জনে করতে চায়, পুরুতের অভাবে হয় না। একটা দিনের তরে পাঠিয়ে দিও তোমার বামুনকে। ভালমন্দ কত জাত হোটেলে খেয়ে যাচ্ছে, বামুন বলে সবাই মেনে নিয়েছে। বামুন ছাড়া কী তা হলে? গিয়েই পাঠাবে।

দত্তগাঁতি থেকে গগন ফিরে এল। লোকসান। একবেলা যেমন ওখানে খেয়েছে, হরিদাসকেও দিয়ে আসতে হল পুরো একটি টাকা। রাঙা বড়ি সম্বন্ধে ভূতি যা বলল, সেটাও কতদূর খাঁটি বোঝা যায় না। রাঙা বড়ি নয়, চলুক তবে হলদে বড়ি—গগন ডাক্তারের হলদে বড়ি। টাকাটা সিকেটা যা যেখানে পায়, হলদে বড়ির বকাল্স কিনে জড়ো করছে। আষাঢ় মাস আসবে কবে—আকাশের দিকে তাকায় চাতক পাখীর মতো, কবে নবীন মেঘোদয় হবে। জলে চতুর্দিক টইটম্বুর। কুমুদকহ্লার ফুটে আলো হয়ে আছে, কিন্তু শোভা দেখবার মানুষ কোথা? ঘরে ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে সবাই কোঁকাচ্ছে। ডাক শিগগির গগন ডাক্তারকে। আহার-নিদ্রার সময় নেই গগনের। এ-গাঁয়ে ও গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে হলদে বড়ি প্রয়োগ করছে।

দশ

শুভ আষাঢ় এসে গেল। বৃষ্টিবাদলা হচ্ছে। জ্বরজারিও দেখা দিল। তেমন-কিছু নয় এখনো, গোণাগুণতি দুটো-পাঁচটা। আশা করা যাচ্ছে, জমে যাবে অচিরে। আশার বশে মানুষ ঘোরে, আশা না থাকলে বাঁচে কি নিয়ে? জ্বরের খবর পেলে গগন ডাক্তার উপযাচক হয়ে ওষুধ দিয়ে আসে। এমনি কায়দায় পশার জমাতে হয়। মনোহরের কাছে শুনেছে, তারও গোড়ার ইতিহাস এই। সে আবার, শুধুমাত্র ওষুধ নয়, পথ্যও মাংনা যোগাত।

পথ্যের লোভেই বেশী রোগী আসত। ডাক্তারী ওষুধ তখন লোকের ধাতস্থ নয়, ডাক্তারের ব্যবস্থার ওষুধ সহজে কেউ খেতে চাইত না—এলোপ্যাথি ওষুধ বলত বিষ, হোমিওপ্যাথি জল। অনেক রোগী, শোনা গেছে, মনোহরের দেওয়া পথ্য খেয়েছে—ওষুধ ফেলে দিয়েছে গোপনে। তারপরে দিন ফিরল—গগন নিজ চোখেই দেখে এসেছে, রোগীকে অন্তর্জলিতে নামাচ্ছে, ডাক্তার ওদিকে ফীয়ের টাকা গণে বাজিয়ে নিচ্ছে। পাইপয়সার ছাড় নেই। পসার একবার জমে গেলে তখন ঐ মূর্তি। এমন যে হলদে বড়ি, তাই গগন মাংনা দিয়ে বেড়াচ্ছে—দামের জন্য কিছু নয়, পরখ কর আগে। এক বড়িতেই বাপ-বাপ বলে জ্বর পালাতে দিশা পাবে না। ওঝার মন্ত্রে যেমন ভূত-পেত্নী পালায়। রোগীরাও মোটামুটি বিশ্বাস করে এইরকম। ভাত বন্ধ করা এবং উৎকট তিতো ওষুধের ব্যবস্থা—এ সমস্ত যেন রোগকে বিপাকে ফেলে বিতাড়নের প্রক্রিয়া। রাঙা বড়ি বা হলদে বড়ির ব্যাপারে তা নয়।

দু-হাতে হলদে বড়ি বিলিয়েও কিন্তু কাজ দেখানো যাচ্ছে না। এক রাঙা বড়িতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, সেখানে এক গণ্ডা হলদে বড়ি দিয়েও মাথা ধরাটা যায় না। বড় বড় কথা আগে বলে ফেলে বেকুব হয়েছে। বদ্‌নাম রটে যাচ্ছে—গগন লোকটা কিছু জানে না, ডাক্তারির ভাঁওতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। পাঁচ ক্রোশ দূরে ফকিরের থান অবধি খবর চলে যায়, গগনের ফেরত রোগী অতদূর গিয়ে পড়ে। ফকির হাসেন খুব, হেসে উদার ভাবে বলেন, গগন ডাক্তার বলে কেন, সদরের সাহেব ডাক্তার এসেও পারবে না। সে জ্বর নয় তোমাদের বাপু! শহরে-বাজারে বাবুভেয়েদের জ্বর হয়, দু-চার দাগ ডাক্তারী ওষুধ আর সেই সঙ্গে দশ রকম ভালমন্দ পথ্য খেয়ে মুখটা বদলে আবার খাড়া হয়ে বসেন। আবাদের এই যত বুনো-ওলের জন্যে চাই বাঘা-তেঁতুল। তোমাদের এ জ্বর আজকের নয়। রোদে পুড়ে জলে ভিজে ধান রুয়েছ,—জ্বর এসেছিল সেই সময়। আমি চেপেচুপে রেখেছিলাম, নয় তো ক্ষেতের কাজ বন্ধ হয়ে যেত। কাজ

অন্তে এখন ফুঁড়ে বেরুচ্ছে। কি করব বল, চিরকাল কথা মানবে কেন? এবারে চিকিচ্ছেপত্তোর কর।

কেরামতি আছে কিছু সত্যিই। স্বচক্ষে দেখেছে অনেকে—বিচক্ষণেরা কার্য-কারণ ভেবেচিন্তে দেখুন। লাঙল ছেড়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ক্ষেত থেকে সোজা গিয়ে উঠল ফকির-বাড়ি: জ্বর এসেছে, বন্ধ করে দাও। ফকির খিঁচিয়ে ওঠেন: বন্ধ করব কী রে, মামার বাড়ির আবদার? তা আবদারই চলে ফকিরের থানে। কখনো বা রীতিমত কলহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়: জ্বর বন্ধ করবে কেন, ক্ষেতখামারই তবে ঘাসবন হয়ে পড়ে থাকুক। সবসুদ্ধ উপোস করে মরি। তোমার কি—ফুল ফেললেই পাঁচ পয়সা—খাবেদাবে আর চোখ মেলে দেখবে লোকের দুর্গতি।

এতবড় অভিযোগে ফকিরও চটে গেছেন। চটেমটে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: বেশ—নিয়ে আয় তবে পানি। জ্বর তাড়িয়ে দিচ্ছি। একটা মাসের কড়ার। চাষবাস যত কিছু চুকিয়ে ফেলবি একমাসে। তারপরে ঠেসে ধরবে—জ্বরের চিকিচ্ছে সেই সময়।

জ্বরের কাঁপুনির মধ্যে ফকিরের ঘাট-বাঁধা পুকুরে ডুব দিয়ে শুচি হয়ে ঘটি ভরে জল এনে রাখল, মন্ত্র পড়ে একটা ফুল ফেলে দেন ফকির। সকাল-বিকাল একশ-এক ভাঁড় জলে স্নানের ব্যবস্থা, স্নানের পর এক ঢোক ঐ ফুল-পানি। পথ্য পান্তাভাত ও তেঁতুল-গোলা। আগুনের মতো জ্বর ঘাম দিয়ে শীতল হয়ে গেল। পরের দিন আর জ্বর আসে না। এমন একটা-দুটো ব্যাপার নয়—রোজ রোজ ঘটছে, ফকিরের দালানকোঠা বাগ্‌বাগিচা গাঁতি-তালুক এমনি হয় না। জ্বরের কিন্তু চিকিৎসা হল না, শুধুমাত্র তোলা রইল। ধান রোয়া অন্তে বর্ষাটা ভাল রকম চেপে পড়লে তখন জ্বর শোধ তুলে নেবে। ঘরে ঘরে রোগীর কাতরানি, জলটুকু মুখে দেবার মানুষ নেই। সেটা ভালই। মাঠের কাজকর্ম চুকেছে, বাড়িতে শুয়ে বসে থাকত—না হয় জ্বর হয়ে পড়ে রইল বিছানায়। ফকিরের চিকিৎসার নিয়মে ভাত খাওয়া যায়। ধান এখন গোলা-

আউড়ির তলায় এসে ঠেকেছে, ভাত বন্ধের ব্যবস্থা হলেই বরঞ্চ ভাল হত।

এইসব দিনের জন্যে গগন ওষুধ বানিয়ে রেখেছে। কোন-কিছু কাজে এল না। ধোঁকাবাজি করল ভূতি। মেয়েটাকে চাক-চাক করে কাটলেও রাগ যাবে না। তাকে আশ্রয় ধরে পেয়ারের মানুষের কাছে চলে এল—ভেলায় চড়ে নদী পার হবার মতন। আসল রাঙা বড়ি দিয়ে দেবে হরিদাসকে। দেবে কেন, দিয়েছে এত দিনে। এমন ভরভরন্ত মরশুমে হরিদাস টালবাহানা শুনবে না, আদায় করে নিয়েছে নিশ্চয় এতদিনে। একদিন গিয়ে দেখে এলে হয় গতিকটা কি। ভূতিকেও দু-চার কথা শুনিয়ে আসা যায়। কিন্তু হলদে বড়ির দরুন না হোক, হোমিওপ্যাথির কৌটা-ওষুধের কল্যাণে এক-আধটা রোগী আসে অবরেসবরে। মরশুমের মধ্যে মোকাম ছেড়ে যায় কেমন করে?

যেতে হল না, একদিন হরিদাসই নিজে এসে উপস্থিত। চেহারা কী হয়েছে—কতদিন যেন খায় নি ঘুমোয় নি, খুব এক শক্ত ব্যাধিতে ভুগছে। ক-মাস আগে দেখে এসেছিল একেবারে ভিন্ন রকম। বাড়ি বাড়ি ঘুরেও রোগী পায় না, তবু তখন রীতিমত তেল-চুকচুকে চেহারা। মনোহরের বাড়ি যা ছিল, তার যেন ডবল ফেঁপে উঠেছিল হরিদাস অভাব-অনটনের ঐ কয়েকটা মাসে। সেই মানুষ ধুঁকতে ধুঁকতে এসে উঠল।

ক্ষণকাল অবাক হয়ে তার মুখে চেয়ে গগন বলে, কী মনে করে হঠাৎ? খবর কি?

হরিদাস বলে, খবর খুব ভাল। নির্ঝঞ্ঝাট হয়েছি—জান, শয়তানী বিদায় হয়ে গেছে।

ছাঁৎ করে গগনের মনে পড়ে যায়, সেই যা বলেছিল হরিদাস—রাঙা বড়ি বানিয়ে নিয়ে ভূতিকে গাঙ পার করে ছেড়ে দিয়ে আসবে। তাই উচিত, যে রকমের বজ্জাত মেয়ে। বলে, আপনি বিদায় হল, না বিদায় করে দিলে?

করতে হত তাই শেষ অবধি। চালাক মেয়েমানুষ তো—বুঝে-সমঝে আগে থেকে সরেছে। রাঙা বড়ি জানেই না, মনোহর শালা কাউকে কিছু শেখাবার পাত্তোর! বুড়োর সঙ্গে সঙ্গে ও-জিনিস লয় পাবে। মেয়েটা ভাঁওতা দিয়ে এসেছে এতকাল। মিথ্যে বলে ঠকিয়েছে। শেষে একদিন সমস্ত বলে ফেলল। সামলাতে না পেরে আমিও তম্বি করলাম খানিকটা।

গগন জানে, মুখের তম্বিই নয় শুধুমাত্র—চুলের মুঠি ধরে কি আর ঘুরপাক দেয় নি, ভূতির গায়ের উপরেও পড়ে নি কি দু-পাঁচটা? এসব না হলে জুয়াচুরির শাস্তিটা কী হল!

হরিদাস বলে, মেজাজটা আমার আমার চড়ে গিয়েছিল। তবু একটা জবাব দিল না। নড়ে না চড়ে না, গুম হয়ে রইল পড়ে। সকালবেলা দেখি, নেই।

এবারে ভয় হল গগনের: গেল কোথা? বেঁচে আছে তো?

পাতিকাকের পাঁচটা প্রাণ। কাক কখনো সহজে মরে শুনেছ? যাবে আর কোন্ চুলোয়? বাপের বাড়ি গিয়ে উঠেছে। নতুন অট্টালিকা বানাচ্ছে। অমন সুখ আর কোথা!

বলতে বলতে এই দুঃখের মধ্যেও হি-হি করে হেসে উঠল: আবাদ জায়গায় গঙ্গাজল মেলে না। তা বোধ হয় তুলসীপাতায় নোনা জল ছিটিয়ে বাড়ির মেয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছে।

হাসির চোটে কথাই যেন শেষ করতে পারে না। গগন মনে মনে সোয়াস্তি পায়। যাকগে যাক, নিজের জায়গায় গিয়ে উঠেছে—বাপ-মা ভাই-বোনের সঙ্গে মিলমিশ হয়েছে। মেয়েটার মুখের কথায় হুট করে রাত দুপুরে তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল—ভারী অন্যায় কাজ, এই নিয়ে পরে বিস্তর ভেবেছে। মনোহর জেলে পুরতে পারত এই অপরাধে। এতদিনে অপরাধের মোচন হয়ে গেল। আর এক আনন্দ, হরিদাসও পায় নি রাঙা বড়ি। ঠকেছে দুজনেই।

তখন গগন অন্য কথা তোলে: অট্টালিকা বানাচ্ছে বললে—শোনা কথা, না দেখে এসেছ গাঙ-পারে গিয়ে? হায় হায় হায়,

মনোহরের এত সুখ, ডাক্তারি-পয়সায় দালানকোঠা তালুক-মুলুক—আর এই কুমিরমারি দেখ মানুষজনে ছেয়ে গেল, পোড়া রোগপীড়েই কেবল পথ চিনে পৌঁছতে পারল না! একটা-দুটো ছিঁচকে রোগ—দশ-বিশ ভাঁড় ফকিরের পানি মাথায় পড়তেই গা ঠাণ্ডা।

হরিদাস বলে, রাস্তা বানাচ্ছে—হয়ে যাক আগে রাস্তাটা। আরও লোকজন আসুক, ব্যাপারবাণিজ্য হোক, টাকাপয়সা জমুক লোকের হাতে। রোগ না থাকলেও চিকিচ্ছের বাহার দেখো তখন। পয়সা থাকলে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। জায়গাটা সত্যি ভাল বেছেছ তুমি। চেপে বসে থাক মনোহরের মত, ছুটোছুটিতে কিছু হবে না।

বলতে বলতে এক কথার মধ্যে ভিন্ন কথা: গিয়ে একদিন দেখে এস মনোহর কত বড় বাড়ি ফেঁদেছে। স্বজাতি বলে তোমার সাত খুন মাপ, আমার মতন নয়। জীবনপাত করে খাটাখাটনি করলাম, জাতের দোষে সব নষ্ট।

গগন বলে, স্বজাত না কচু। যখন ছিল, তখন ছিল। মতলবের খাতির, সে তো জান সমস্ত। ঘর-জোড়া আমার সোনার বউ, ঐ মেয়ে যাচ্ছি আমি কাঁধে নিতে!

হরিদাস বলে, কেন, খারাপ কিসে মেয়েটা! এই তোমাদের হয়েছে—রং একটু চাপা বলে সকল গুণ অমনি গোল্লায় চলে গেল!

চাপা কি বল? আলকাতরার পিপে, তোমারই কথা—

কিন্তু ভিন্ন কথা আজকের হরিদাসের। বলে, তা সে যাই হোক, বিধাতাপুরুষ দিয়েছেন, মানুষের কোন হাত আছে তার উপরে? গায়ের রংটাই সব-কিছু নয়।

ঠক মিথ্যেবাদী নচ্ছার মেয়ে, তোমায় আমায় কাউকে তো রেহাই করে নি। রাঙা বড়ির লোভ দেখিয়ে নাকে-দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে।

হরিদাস এবারে রীতিমত রাগ করে ওঠে: তোমার তো ঘর-জোড়া বউ—খারাপ হোক, ভাল হোক, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা

কিসের? রাত-দুপুরে একটা মেয়ে একলা চলাচল করতে পারে না, মাস্টারমশায় বলে ডাকে তোমায়—না হয় করেই ছিলে একটু উপকার, আমার কাছে পৌঁছে দিলে।

চুপ করে মুহূর্ত একটু ভাবল। আবার বলে, তার দিকটাও ভেবে দেখ। রাঙা বড়ির লোভ না দেখিয়ে কি করবে? রাঙা চেহারার হলে কত মানুষ ঢলে পড়ত। আমাদের পুরুষজাতটাই যে এমনি! এতদিন একসঙ্গে থেকে আমায় অবধি সন্দেহ করল মেয়েটা—যেন ওষুধের আশায় আশায় তার সঙ্গে ঘর-সংসার করেছি।

গগনের হাত চেপে ধরল ব্যাকুল ভাবে।

শোন, একবার এনে দিয়েছিলে, আর একবার দাও তাকে এনে। বলো, কিচ্ছু দরকার নেই, খালি হাত-পায়ে চলে আসুক। আমার যাবার জো নেই, ওপারে গেলে ঠ্যাং খোঁড়া করবে মনোহর। জাতের ঘরে ছাড়া মেয়ে দেবে না। তাই দেখ না—গাঁ-গ্রাম ছেড়ে অজঙ্গি আবাদে এলাম, পোড়া জাত-বেজাতও সঙ্গে সঙ্গে এসে জুটেছে। ঝাঁটা মার। ভূতিকে এবারে পেলে, এই বলে রাখছি গগন, মানষেলার মধ্যে আর থাকব না। বাদাবনে পালাব। মানুষ নেই তো জাতের ঘোঁটও নেই সেসব জায়গায়।

সেই হরিদাস এমনি করে বলছে। সে দিনটা হরিদাস কুমিরমারি থেকে গেল। সারাক্ষণ মুখে এই সব কথা। অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে—বাড়া-ভাত ছাড়া মুখে রোচে না। নতুন দাওয়া বানিয়ে বেড়া ঘিরে দিল, ভূতি রাঁধাবাড়া করবে—দাওয়া হা-হা করছে, সেখানে ঢোকা যায় না।

গগন অবাক হয়ে হরিদাসের মুখে তাকায়। মেয়েমানুষ জাত কী মায়াবী! ধাপ্পা দিয়ে ভূতি এমন ঠকাল, তার নাম করে আধ-বুড়ো হরিদাস চোখ মুছছে। ধর না বিনি-বউয়ের কথা—গগনকে এক রকম তাড়িয়ে বের করল বাড়ি থেকে, তবু সেই বউয়ের কথা ভাবে। মনোহরের জামাই হতে হতে ভেবেচিন্তে সামলে নিল, সে ঐ বিনি-বউর জন্যেই।

বর্ষার সময়টা চারিদিকে জ্বরজারি। ফকিরবাড়ি দূরও বটে। গগন ডাক্তারের চলে যাচ্ছে যাই হোক মোটামুটি। ভবিষ্যতের বিশেষ আশা—কার্তিকের শেষে নতুন ধান-চাল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লোকে আকণ্ঠ ঠেসে খাবে, ওলাবিবির শুভ আবির্ভাব আবার ঘটবে সেই সময়। এবং সেই মচ্ছব মাস দুয়েক যদি টেনেটুনে রাখা যায়, তারপরেই মা-শীতলার অনুগ্রহ, বসন্তর মরশুম এসে যাচ্ছে। একটা-দুটো বছর তালেগোলে চালিয়ে জনবসতি ঘন হয়ে পড়লে আর তখন রোগের অভাব থাকবে না।

কিন্তু ওলাওঠা চুলোয় যাক, সামান্য পেটের অসুখটাও হল না তিনটি কি চারটি প্রাণীর বেশী। সারা শীতকালটা মানুষজন এমন বেয়াড়া রকম কুশলে থাকল যে পানি-পড়ার সেই ফকির অবধি কুটুম্ববাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। রোগীপত্তোর নেই তো থান আঁকড়ে বসে থেকে কী মুনাফা! শীতকালের এই গতিক—গ্রীষ্মের সময় মানুষ এমনিতেই ভাল থাকে, আবার সেই বর্ষা অবধি হাঁ করে বসে থাকা। দু-দশ জনকে সর্দিজ্বরে ধরে যদি সেই সময়। তাহলে এই ক'মাস কি খেয়ে বাঁচে ডাক্তারে? কি খাবে তার পরিবার-পরিজনে? বাতাস খেয়ে তো বাঁচতে পারে না। কোন বিধাতার কাছে এই সব নালিশ জানানো যায়?

আরও মুশকিল, বার কয়েক টাকা পাঠিয়ে বাড়ির লোকের লোভ ধরিয়ে দিয়েছে। চিঠির পরে চিঠি আসে বিনি-বউয়ের কাছ থেকে। হস্তাক্ষর নগেনশশীর—মুশাবিদাও তার, কথা সাজানোর কায়দা দেখে ধরা যায়। গগনের কুশল-সংবাদের জন্য আকুলি-বিকুলি। মোক্ষম কথাটা অবশ্য চিঠির সর্বনিম্নে—অবিলম্বে টাকা পাঠাও। বোনের নামের চিঠিতে সাড় পাওয়া গেল না তো শেষটা নগেনশশী নিজেই সোজাসুজি চিঠি ছাড়তে লাগল। ধাপে ধাপে সুর চড়াচ্ছে। বিয়ে-করা পরিবারের সকল দায়ঝক্কি ভাইদের উপর চাপিয়ে এ-বাজারে মানুষ চুপচাপ থাকে কেমন করে? তার সঙ্গে ফাউ স্বরূপ কড়ের'াড়ী বোনটা—চাল নেই চুলো নেই তা

সত্ত্বেও দুনিয়ার মানুষকে কেন্নো-কেঁচোর মতন যে বিবেচনা করে। নিত্যদিন এই ঝক্কি কে সামলাবে, কার এত ধৈর্য ?

চিঠি পড়তে পড়তে গগন নিশ্বাস ফেলে : বুঝি তো ভাই সব। গদাধরের হোটেলটা আছে তাই, নয়তো স্রেফ উপোস দিতে হত। বিদেশ-বিভুঁই অথই দরিয়া—একটু কূলের রেখা আজ অবধি নজরে ঠেকে না।

শেষ চিঠিখানায় শ্যালক মশায় ভয় দেখিয়েছেন : এমনিধারা নীরব থেকে রেহাই পাবে না। কুমিরমারি যত দুর্গমই হোক, পৃথিবীর বাইরে নয়। গগন চলে এসেছে তো তারাও আসতে পারে। হুড়মুড় করে সবসুদ্ধ এসে পড়বে একদিন।

সেই এক মহা আতঙ্ক। তার চেয়ে মাসে মাসে না হোক মাঝে মাঝে কিছু থোক টাকা পাঠিয়ে ও-তরফ ঠাণ্ডা রাখা উচিত। উচিত তো বটে, কিন্তু টাকা যেন ডুমুরের ফুল। একেবারে চোখে দেখা যায় না। দুনিয়াদারি ফাঁকা, সারবস্তু টাকা।

গদাধর শানা লোকটা ধারাপাতের শতকে জানত না। হাতে ধরে তাকে টাকা-আনা-পয়সার জমাখরচ রাখতে শেখাল গগন। গগনের শিক্ষায় খানিকটা বুঝসমঝ হয়েছে। হাটখরচার জন্য এখন দায়ে ঠেকতে হয় না। আগে যেমন কাতর হয়ে বলত—আর দুটো টাকা বের কর আদর। নয়তো আর হাটবার পর্যন্ত খদ্দের ঠেকানো যাবে না।

আদর ঝঙ্কার দিত : কোথায় পাব, টাকা আমি গড়াব নাকি ?

একটা টিনের কৌটোয় আদর পয়সাকড়ি রাখে। গদাধর বলত, দেখ খুঁজে পেতে কৌটোটা। তিন দিনে এত খদ্দের খেয়ে গেল, চারটে টাকাও হবে না ?

রাগে গরগর করতে করতে আদর কৌটো নিয়ে এসে সামনের উপর উপুড় করত : চোখ মেলে দেখ শানার পো। তোমার টাকা চুরি করে খেয়েছি নাকি ?

রাগ হলে তখন আর ভটচাজ নয়—পিতৃপুরুষের উপাধি শানা-শানা করে চেঁচায়। আবাদ জায়গা তাই রক্ষা—ডাঙা অঞ্চলে কোন উঁচু শ্রেণীর খদ্দেরের কানে গেলে গদাধরকে মেরে পৈতে ছিঁড়ে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিত।

এখন সঙ্কটের অবসান হয়েছে। আদরের মুখ চেয়ে থাকতে হয় না—টাকাকড়ি সমস্ত লেখাজোখা থাকে। গদগদ হয়ে কত-দিন গদাধর বলেছে, তোমারই বুদ্ধিতে ডাক্তার-দাদা। শুভক্ষণে এই জায়গায় পা পড়েছিল।

গগন রসিকতা করেঃ সেই পয়লা দিনের কথা বলছ নাকি ভটচায? অনুকূল চৌধুরীর ভাগনেকে খাতির করে খাইয়ে তারপর সাঁজের ঘোরে কষে দাম আদায় করে নিলে—

জিভ কেটে হেসে গদাধর বলে, পুরানো কথা তুলে কী জন্যে লজ্জা দাও ভাইকে!

কিন্তু জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের অমায়িক সম্পর্ক ইদানীং চাপা পড়ে গেছে। মুখ কালো গদাধরের। কলিকালের মানুষ—সুসময়ে সব ভুলে মেরে দিয়েছে। হোটেলের ভাত এদ্দিন কবে বন্ধ হয়ে যেত, কিন্তু শুধুমাত্র ডাক্তারী বিদ্যার সুচিন্তিত প্রয়োগের গুণে দুবেলা পাত পেতে মান-ইজ্জতের সঙ্গে খেয়ে যাচ্ছে। মুখ ফুটে গদাধরের কিছু বলবার তাগদ নেই, গগনই বরঞ্চ দু-চার দিন অন্তর বলে, না:, যাই চলে এখান থেকে। ভাল লাগে না।

আদরমণি অমনি করকর করে ওঠেঃ শানার বেটা কিছু বলেছে বুঝি? দেখছে, ভাল আছি কদিন, খাচ্ছি-দাচ্ছি, অমনি চোখ টাটাচ্ছে। ডাক্তার চলে গেলে আমিও সঙ্গে সঙ্গে মরে যাব। ঐ যে মুক্তো হারামজাদী বাসন-মাজার নামে মুখ ঘুরিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে হাসে, ওকে তখন রান্নাঘরে এনে বাটনায় বসাবে। সেটা হচ্ছে না। সেরে দাও দিকি ডাক্তারবাবু, আগের মতন গতর হোক—ওদের কী খোয়ারটা করি, দেখে নিও তখন।

ভাগ্যিস আদর রোগী হয়েছে! এমনি নয়, ভেবেচিন্তে কায়দা

করে ডাক্তার ওকে রোগী বানিয়ে নিয়েছে।

শুকনো চেহারা কেন গো? চোখ রাঙা। জ্বরটর হয় নাকি?

গোড়ায় আদর উড়িয়ে দিত: দূর! সাতটা কুমিরে খেয়ে পারে না, শুকনো দেখলে তুমি কোন্ চোখে?

হুঁ, জ্বর হয়ে থাকে ঠিক তোমার। মুখের চেহারায় বলে দিচ্ছে। দেখি বাঁ-হাত। ঘুসঘুসে জ্বর ভাল নয় গো। ওষুধ খাও, ভাল হয়ে যাবে। জ্বর পুষে রাখতে নেই। কত কি হতে পারে—বদহজম, বুকে-পিঠে ব্যথা, শেষটা যক্ষ্মায় গিয়ে দাঁড়ায়, ভকভক করে রক্ত ওঠে মুখ দিয়ে।

ঠিক সেইসব উপসর্গই দেখা দিতে লাগল, যেমন যেমন ডাক্তারের মুখে বেরিয়ে গেছে। হজমের গোলমাল, রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, বুকের মধ্যে দপদপানি, পিঠেও—হ্যাঁ, ব্যথা-ব্যথা করে। গগন ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে। রোগিণী কখনো ভাল থাকে, কোনদিন বা নিজেই ডান-হাত দিয়ে বাঁ-হাতের নাড়ি টিপে হাজির হয়: দেখ ডাক্তারবাবু, আজকেও বেগ হল একটু। এত জায়গায় চিকিচ্ছে কর, বাসন-মাজার একটা ভাল লোক যোগাড় করে দাও দিকি, মুক্তো মাগীটাকে ঝেঁটিয়ে দূর করি। নয়তো আমায় তাড়াতাড়ি সেরে তোল—হাতে আমার কড়া পড়ে নি, আমি বাসন মাজব।

এমনি চলছে চিকিৎসা। গদাধর পাওনার তাগিদ করতে সাহস করে না, গগনের তবু ভয় ঘোচে না। কতদিন চালাবে এমন? আদরমণিই তো শেষটা অধৈর্য হয়ে উঠবে: এ ডাক্তার কোন কর্মের নয়, অন্য ডাক্তার আন। হয়তো বলবে, দত্তগাঁতির হরিদাসকে নিয়ে এস। কিংবা অনেক দূরের আরও বড় ডাক্তার,—মনোহর। আর সেই সঙ্গে গদাধরের মুখে বচন বেরুবে: হাতে ধরে আমায় হিসাবপত্র শেখালে, নিজের হিসাবটা কর এইবারে ডাক্তার। এই ক'মাসে কত দাঁড়িয়েছে—ছোট্ট কারবার আমার চলে কি করে?

পৌষ থেকে তিন-চারটে মাস হাট বড় জমে। এক রবিবার অমনি হাট লেগেছে। গগন তীর্থকাকের মত ডাক্তারখানার ঝাঁপ তুলে বসে। যতগুলো দোকানঘর, লোক গিসগিস করছে সর্বত্র। খদ্দের ঠেকিয়ে পারে না। গগনের ঘর ফাঁকা।

এমনি সময় দুটি ছোকরা-মানুষ ঢুকে পড়ল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল একটি অপরের কাঁধে ভর দিয়ে। বলে, ডাক্তারবাবু, পাখানা ভারী জখম হল—নাড়ানো যায় না। দেখ দিকি, কী হয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অকারণ কেরোসিন পোড়াতে মন যায় না, সেই জন্য আলো জ্বালে নি। গগন অন্যমনস্ক ছিল, ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর অঞ্চলে নোনাজল খেয়েও কোন দিকে সুরাহা হচ্ছে না—ভাবছিল এই সমস্ত কথা। মুখ ফিরিয়ে অবাক! জগন্নাথ আর বলাই। খোঁড়াচ্ছে যে লোক, সে-ই হল জগন্নাথ। তারাও চিনল এবার। জগন্নাথ বলে, বড়দা তুমি ডাক্তার হয়ে বসেছ? তবে আর কি! বলাইটা শোনে না, নাছোড়বান্দা হয়ে নৌকো থেকে টেনে নামিয়ে আনল। চিকিচ্ছে করে দাও দিকি তাড়াতাড়ি।

পয়সাকড়ি দেবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। দিলেও হাত পেতে নেওয়া হয়তো উচিত হবে না—তা সে যাই হোক, রোগী বটে তো! অনেকদিন পরে নতুন রোগী পেয়ে গগন ডাক্তার বর্তে যায়। খাতির করে সামনে বসিয়ে লক্ষণাদি জিজ্ঞাসাবাদ করছে। একেবারে নাবাল অঞ্চলেও ধান কাটা শেষ। ধানের নৌকো বিস্তর আসছে এখন হাটে—দূর-দূরন্তরের পাইকারেরা এসে ধান কিনে কিনে পাহাড়প্রমাণ গাদা দেয়। এমনি এক-নৌকো ধান নিয়ে এসেছে জগন্নাথ আর বলাই। মহাজন আলাদা লোক—এরা শুধু নৌকো বেয়ে নিয়ে এসেছে, অন্য মরশুমে যেমন জঙ্গলের মালপত্র বয়ে বেড়ায়। জগন্নাথ হালে ছিল—নৌকো হঠাৎ ঘোলায় পড়ে গিয়ে বানচাল হবার দশা।

সাংঘাতিক ঘোলা—ঋষিদহ সেই জায়গার নাম। গাঙের নীচে

ঋষি ধ্যানে বসে আছেন, কার ক্ষমতা ঋষির মাথার উপর দিয়ে নৌকো নিয়ে যায়! কাছাকাছি গিয়ে পড়লেই জলের আবর্ত নৌকোর যেন কান ধরে শতপাক ঘুরিয়ে নদীর অতলে ঋষির পদপ্রান্তে নিয়ে ফেলবে।

জগন্নাথ বলে, ঋষিদহে গিয়ে পড়েছিলাম বড়দা—আঁধার রাতে ঠাহর করতে পারি নি। গিয়ে তখন ঋষির নামে মাথা খুঁড়ি নৌকোর গুড়োর উপরে: দোষঘাট নিও না বাবা। আর মরীয়া হয়ে প্রাণপণে হাল বাই। একেবারে তবু মাপ হল না। মড়াৎ করে হাল গেল দু-খণ্ড হয়ে, মুঠোর দিককার মাথাটা জোরে এসে পায়ে খোঁচা দিল। নেহাত পক্ষে চার আঙুল বসে গিয়েছিল, টেনে তুলতে রক্ত ফিনিক দিয়ে ছুটল। তখন নৌকো বাঁচানোর দায়, এত সব তাকিয়ে দেখার ফুরসত হয় নি।

কুমিরমারি পৌঁছনোর আগেই পা ফুলে ঢোল। ডাক্তারও বসেছে এখানে, ঘাটে এসে শোনা গেল। বলাই জোরজবরদস্তি করে নামিয়ে এনেছে: মিছে কষ্ট পাবার গরজ কি? ওষুধপত্তোর করে নাও। আবার তো এত পথ ফিরে যেতে হবে।

জগন্নাথ বলে, কতখানি কি হয়েছে দেখ বড়দা। ভাল মলম-টলম যা আছে, বের কর।

গগন ডাক্তার প্রণিধান করে বলল, এমনি কিছু নিচ্ছি না তোমার কাছ থেকে। ওষুধের দাম শুধু এক সিকি—নগদ পয়সায় যা কিনে আনতে হয়েছে। এক ডোজ আর্নিকা দিচ্ছি। খেয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চলে যাও, ব্যথা থাকবে না।

জগন্নাথ আশ্চর্য হয়ে বলে, পা কেটে গেছে তা মুখে খানিক ওষুধ গিলতে যাব কেন?

হেঁ-হেঁ—করে বেশ খানিকটা টেনে টেনে হাসে গগন: এই তো, হোমিওপ্যাথির মজা এইখানে। কাটা-ফোঁড়া নেই, মালিশ-ব্যাণ্ডেজ নেই—শুধুমাত্র এক দাগ ওষুধ। সে ওষুধ তিতো নয়, মিষ্টি নয়, ঝাল নয়—এক ঢোক জল খেয়ে নিয়েছ এমনিধারা মালুম হবে।

সেই জল ডেকে কথা বলবে, মহাত্মা হ্যানিম্যানের এমনি মহিমা।

জগন্নাথ বলে, এক ঢোক জল এক সিকি? তুমি বড়দা ফুক্কুড়ি করবার জায়গা পেলে না?

গগন বলে, গুণাগুণ হিসাব করে দেখ। এক সিকি খরচায় তোমার যাবতীয় ব্যথা নির্মূল হয়ে যাচ্ছে।

অধৈর্য হয়ে জগন্নাথ বলে, দুত্তোর গুণাগুণ! মলম থাকে তো দাও। নেই? চল্ রে বলাই—ঘাটে নামবার মুখে আমায় একটু ধরে দিস। নৌকোর উপর বসে যাব, হাঁটতে হচ্ছে না, খোঁড়া পা থাকলই বা দুটো-পাঁচটা দিন। তোর জন্যে ডাঙায় ওঠানামার এই ভোগান্তি।

বলাই বোঝাচ্ছেঃ ডাক্তারবাবু যখন বলছেন, খেলেই না হয় এক দাগ। জল বই তো নয়, খারাপ কিছু হবে না।

আরো চটে গিয়ে জগন্নাথ বলে, কষ্টের পয়সায় জল কিনব, জল বেচে বেচে লাল হবে আর একজনা। চল্, আমি এসব তালে নেই।

গগনও চটেছে। ভাবনার কূলকিনারা নেই, তার উপরে জল-বেচার বদনাম। বলে, কী রকম লাল হচ্ছি, চোখে দেখতে পাও না? সারা হাটে মানুষ থৈ-থৈ করছে, আমার ডাক্তারখানায় একটা মাছিও উড়ে বসে না। তা শোন, আশা করে তোমরা ডাক্তারখানায় ঢুকেছ—রোগী আমি কিছুতে ছাড়ব না। বড়দা বলে ডাক, সিকিপয়সাও লাগবে না, মাংনা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে যাও। উপকার পাও তো পরের হাটে কিছু দিও। যা খুশি দিয়ে যেও—দাম নিয়ে কথা বলব না।

তখন নরম হয়ে জগন্নাথ বেঞ্চির উপর বসে পড়ল। গগন পরম আনন্দে ওষুধের বাক্স পাড়ে। জগন্নাথ ঘাড় নেড়ে বলে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন বড়দা? ওষুধ আমি খাব না। সেজন্যে বসি নি। আমি বলে কেন, জোলো ওষুধ কেউ তোমার কাছে খেতে আসবে না। সে

এই হাটবারের দিনেই মালুম পাচ্ছ। মানুষের গাদাগাদিতে কোন ঘরে সেঁদুনো যায় না, তোমার এখানে পা ছড়িয়ে বসে জমিয়ে আছি। শোন, মাথায় মতলব এল। একটা কাজ আছে, সে তোমার এই শিশিতে জল ভরে হা-পিত্যেশ বসে থাকা নয়। দুটো পয়সা আসবে। রাজী থাক তো বল।

পরম আগ্রহে গগন বলে, পয়সা আসে তো বল শুনি কোন কাজ—

জগা তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বলে, তুমি বিদ্বান মানুষ—উঁ? ডাক্তারি করছ, বিদ্যে অঢেল নিশ্চয়। তা হলে চল আমাদের সঙ্গে বয়ারখোলার আবাদে। আরও নাবালে, বাদাবনের মুখে। ডাক্তারি ছাড়ান দিয়ে গুরুগিরিতে লেগে যাও। ভাল গুরু পেলে ওরা পাঠশালা বসিয়ে দেয়।

সবিস্তারে জেনে নেওয়া গেল। প্রস্তাবটা মোটের উপর ভেবে দেখা যেতে পারে। ভাল ফলন হয়েছে এবার বয়ারখোলায়। চাষীদের গোলা ভরতি, মনেও স্ফূর্তি বিষম। অতএব বিনা কাজের মরশুমে এখন খেয়াল হয়েছে, ছেলেগুলো বাঁদরামি করে বেড়াচ্ছে, তাদের পাঠশালায় জুতে দেওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত গুরু যদি এসে বসেন, প্রত্যেক গৃহস্থ ধান-দুধ-মাছ তো দেবেই, এমন কি নগদ এক সিকি এক দুয়ানি হিসাবে মাসমাইনে দিতেও রাজী।

গগন বলে, ভেবে দেখি। এক কথায় হুট করে ছেড়েছুড়ে বেরুনো যায় না। পরের হাটে আসছ তোমরা? ওষুধ খেলে না, ঐ পা নিয়ে আসবেই বা কী করে?

জগা বলে, ঠিক এসে যাব। পায়ে হেঁটে তো আসতে হবে না, হাতে নৌকো বাইব। পা যদি না-ই সারে, নৌকোয় আসতে বাধা কি? ভাবনাচিন্তা যা করবার, এর মধ্যে সেরে রেখো বড়দা। আসব ঠিক তোমার কাছে। ছোট ভাই হয়ে ভাল বই মন্দ যুক্তি দেব না।

এ হল রবিবারের কথা। বুধবারের হাটে ঠিক আবার ধানের নৌকো নিয়ে জগা-বলাই এসেছে।

পা কেমন ?

মন্দ থাকবে কেন ? বয়ারখোলার আবাদে ডাক্তার নেই, ডাক্তারখানাও নেই। পাতামুঠোয় সেরে উঠেছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে জগা বলে, কি গো বড়দা, যাবার লক্ষণ দেখছি নে। ভাবনাচিন্তা শেষ হল না বুঝি ?

গগন সংক্ষেপে বলে, হুঁ —

যাবে না ? মর পচে তবে এইখানে। দেখ্‌রে বলাই, ধান মাপা ওদিকে সারা হল কিনা। হলেই নৌকোয় উঠে পড়ি।

গগন এদিক-ওদিক চেয়ে বলে, জোয়ার হবে সেই দশ দণ্ডের পর। তখন নৌকো ছাড়বে। সন্ধ্যের সময় নৌকোয় উঠে কি করবে ?

গগনের দিকে চকিত দৃষ্টি মেলে জগন্নাথ বলে, নৌকো কখন ছাড়বে, তোমার অত সাত-সতেরো খবরে কি গরজ ? যাবে না ঠিক করেছ—ব্যস খতম !

গগন মৃদুকণ্ঠে বলে, যাব—

যাবে তো গোছগাছ করেছ কই ? আমি এক রকম ভরসাও দিয়ে এসেছি, সোমবার থেকে পাঠশালা বসবে। তা দেখিয়ে দাও কোথায় জিনিস-পত্তোর কি আছে। পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে আমরাই নৌকোয় তুলে নিচ্ছি।

গগন আঙুল তুলে ওদের চেঁচামেচি করতে মানা করে। জমিদারের দরোয়ান ঘরের ভাড়ার জন্য চেপে ধরবে এক্ষুনি। গদাধর ঠাকুর হোটেলের দেনার জন্য পথ আটকে দাঁড়াবে। জানাজানি হলে রক্ষে আছে, পঙ্গপালের মত ছেঁকে ধরবে সব। তার চেয়ে যেমন আছ, থাক চুপচাপ বসে। কাকপক্ষী না সন্দেহ করে। রাত দুপুরে নৌকা ছাড়বার মুখে হাতের মাথায় যা-কিছু পাও, সাপটে নিয়ে ভেসে পড়। সকালবেলা উঠে যত পাওনাদার মিলে বুক চাপড়াক আর হা-হুতাশ করুক—আমার এই কলা !

এগারো

ডাক্তারিতে ইস্তফা দিয়ে গগন গুরুমশায় হয়ে বসল। বয়ার-খোলার গগন-গুরু। কুমিরমারি ফুলতলা থেকে যত পথ, বয়ারখোলাও কুমিরমারি থেকে প্রায় তত। কত নাবালের দেশ—এই থেকে জুড়ে-গেঁথে বুঝে নাও। এর পরে আর আবাদ নেই, খালের ওপারে ছিটে-জঙ্গল। পুরোপুরি বনের এলাকা আরও কয়েকটা বড় গাঙ পার হয়ে গিয়ে।

এইখানে চতুর্দিকে ধানক্ষেতের মধ্যে উঁচু মাদার উপরে পাঠ-শালা। ঘর হয়ে ওঠে নি এখনো। কাঁচা গোলপাতা ও গরানের খুঁটি এসে পড়েছে—পাঠশালা বহতা হয়ে গেলেই ঘর তুলে দেবে। আপাতত ফাঁকার মধ্যে কটা বাইন-কেওড়ার একটু ছায়া মতন জায়গায় বিদ্যার লেনদেন হচ্ছে। শীতকাল বলে অসুবিধাও নেই। জগন্নাথ মোটের উপর কাজটা জুটিয়ে দিয়েছে মন্দ নয়। বাঁধা চাকরি—কারো মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হয় না—মাস গেলে মাইনে। তাই বা কেন, ঘরে ধান উঠেছে—চাষীর সচ্ছল অবস্থা, মাসের শেষ হতেই হবে তার কোন মানে নেই—অত কষাকষির তারা ধার ধারে না। ছেলের বিদ্যাভাসের দরুন যার এক কুনকে ধান দেবার কথা, আন্দাজ মত ধান ঢেলে দিয়ে গেল: হ্যাঁ- -গুরুর দক্ষিণা, তার আবার মাপামাপি করতে যাচ্ছি! ইচ্ছে হয় মেপে নাও গে তোমরা। গগনের দিক থেকেও মাপের তাগিদ নেই। চোখে দেখেই আন্দাজ হচ্ছে, মাপতে গেলে একের জায়গায় দেড়-কুনকে দাঁড়াবে। আর এই সাচ্ছল্যের দিনে বিয়েথাওয়া পালপার্বণ লেগে আছে—যখনই যা-কিছু হবে, গুরুমশায়ের জন্য ভারী মাপের সিধে। পালা-গানের যেমন আসরই হোক, গুরুমশায়ের বিশেষ এক চৌকি।

তার পরে পাঠশালা-ঘর হয়েছে, ঘরের বেড়াও হয়ে গেছে।

এবারে রান্নাঘর হবে গুরুমশায়ের জন্য, তার সাজপত্তোর বানাচ্ছে। সকালের দিকটা দেড় পহর দু-পহর অবধি পাঠশালা চলে। বিকালেও বসবার কথা, কিন্তু সেটা বড় হয়ে ওঠে না—ছেলেপিলে এসে জোটে না, বাড়ির লোকের চাড় নেই। হাকিম হবে না, দারোগাও হতে হচ্ছে না—প্রাণপণে দু-বেলা কসরত করার ফল কি? বিকালে আড্ডা বসে, দুটো-চারটে ছাত্র যা আসে তাদের লিখতে দিয়ে গল্পগুজবে বসে যায় গগন-গুরু।

এই পুরো পাতাটা আগাগোড়া শেলেটে লিখে দেখা। বেশ ধরে ধরে লিখবি। ভুলচুক না হয়, সাফাই লেখা হয় যেন।

বলে গগন জমিয়ে বসে। জগা বলাই প্রায়ই আসে, আরও সব মাতব্বররা আসে।—কী কসাড় জঙ্গল ছিল এদিকটায়! উই যে বাবলা-চারাটা দেখা যাচ্ছে, জঙ্গল-হাসিলের মুখে—ঐ জায়গাতেই হবে—বাঘ এসে পড়েছিল হাড়ো সর্দারের উপর। হাড়ো তোমার আমার মতন নয়—পেল্লায় এক দৈত্য বিশেষ। তাকে কায়দা করা বাঘের পক্ষেও সহজ হল না। বাঘের তখন গতিক দাঁড়িয়েছে, কায়দা পেলে ছুটে জঙ্গলের ভিতর পালিয়ে যায়। কিন্তু বাঘ ছাড়লেও হাড়ো ছাড়বে না, রাগে টগবগ ফুটছে—তেড়ে গিয়ে বাঘের গায়ে কুড়ুল মারে। বাঘও থাবা মারছে, কামড় দেবার সাহস পায় না। যত মানুষ বাদায় খাটছিল, সব এসে জুটেছে। খালি হাত কারো নয়—কুড়ুল তো আছেই—লাঠিসোটা বল্লম-সড়কি—বন্দুকও আছে একটা। কিন্তু কাজে লাগাতে পারছে না। বাঘে আর হাড়ো সর্দারে হুটোপাটি—বন্দুক কি বল্লম মারতে গেলে হাড়োরও গায়ে লাগে। ওরে হাড়ো, সর তুই—ছেড়ে চলে যা, আমরা দেখছি। কিন্তু কে বা শোনে কার কথা! বাঘও বিপদ বুঝেছে, হাড়োকে টেনে ধরে আরো। হুটোয় গড়াতে গড়াতে শেষটা খালের জলে পড়ল। জোয়ারের টান—এখন এই দেখছ গুরুমশায়—তখন এমন টান, কুটোগাছি ফেলে দিলে দুই খণ্ড হয়ে যায়। সেই টানের মধ্যে জল তোলপাড় করছে হুটোয় পড়ে।

সে এক দেখবার বস্তু। কাছাকাছি গিয়ে খুব সতর্ক ভাবে দেওড় করা হল। গুলি খেয়ে বাঘ এলিয়ে পড়ে। ডাঙায় উঠে হাড়ো সকলের উপর মারমুখী: এতক্ষণ ধরে এত কষ্টে আমি কায়দা করে আনলাম, কেন তোমরা শত্রুতা সাধলে? বাঘ-শিকারের নামটা হয়ে গেল তোমাদের। সকলে মিলে বোঝাচ্ছে: বাঘ তুই-ই মেরেছিস হাড়ো, আর কেউ কিছু করে নি। মরা বাঘ নিয়ে গিয়ে সরকার থেকে বখশিশ নিয়ে আয়—অন্য কেউ দাবি তুলতে যাচ্ছে না। হাড়ো ঠাণ্ডা হয় না। তার তৈরি রুটি ভিন্ন লোকে ফয়তা দিয়ে গেল, বখশিশের টাকায় সে দুঃখ যায় না। বখশিশ নিয়ে আসবার ফুরসতও হল না—

বাঘের নখে-দাঁতে বিষ। খুব কাঁপিয়ে জ্বর এল হাড়োর, ব্যথায় সর্বাঙ্গ টনটন করছে, সে আবোল-তাবোল বকতে লাগল। দশ-বারোটা দিনের মধ্যে মারা গেল হাড়ো সর্দার। কত কাণ্ড এই জায়গায় হয়ে গেছে গুরুমশায়, এখনকার চেহারা দেখে কে তা ধরতে পারে!

লোকজন কম হলে দাবায় বসে যায় এক-একদিন। এ তল্লাটে দাবার তেমন চলন ছিল না, গগনই দায়ে পড়ে শিখিয়ে নিচ্ছে। জগন্নাথকে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চুপচাপ অতক্ষণ এক ঠাঁয় বসে একটা চাল দেওয়া তার ধাতে পোষায় না। এমন একটা বস্তু দাবা—যাতে বসলে লোক আহার-নিদ্রা ভুলে যায়, ছেলেকে সাপে কামড়েছে শুনে প্রশ্ন করে, কাদের সাপ?—তার ভিতর ঢোকানো গেল না জগন্নাথকে।

জগন্নাথ বলে, ফড় খেলবে তো বল বড়দা। দুটো পয়সা লাভের প্রত্যাশা যাতে। আমি তা হলে ছক-ঘুঁটির যোগাড় দেখতে পারি।

ছি-ছি—বলে গগন জিভ কাটে। জুয়াখেলা সমাজের উপর বসে চলে না। শহরে-বাজারে গিয়ে টুক করে একবার-দুবার খেলে আসতে হয়।

জগন্নাথ রাজী নয় তো কী হবে? দাবার আসর তার

জম্মে আটকে থাকে না। একজন ঐ গগন, আর একটি প্রাণী জোটাতে পারলেই জমে যায়। আশেপাশে উটকো মানুষ বসে জুত দেয়—এ বলে, বড়ে এক ঘর এগিয়ে দাও; উল্টো তরফের হয়ে আর একজন বলে, নৌকো চেপে দাও দাবার মুখে। এ-তরফের উত্তেজিত কণ্ঠঃ দিয়েছ তো? হাত তোল। দেওয়া হয়ে গেছে, মেরে দাও নৌকো। গজ উঠবে না—কিস্তির চাপান। উঁহু, উঁহু—চাল ফেরত হবে না। তাই তো বললাম হাত তুলে নিতে। ঘুঁটি ছেড়ে দিলেই চাল পাকা—তারপরে ফেরত নেই।

এমনি সময় হয়তো কোন এক হতভাগা ছাত্র কাছে এসে দাঁড়াল। গগন খিঁচিয়ে ওঠেঃ রূপ দেখাতে এলি? খেলা দেখা হচ্ছে, উঁ—খেলার নেশা ধরেছে এই বয়সে? পিটিয়ে তক্তা করব। যা, মনোযোগ দিয়ে লেখ—

লেখা হয়ে গেছে গুরুমশায়। দেখাতে এসেছি।

কলম ধরতে না ধরতে হয়ে যায়, বেটা চতুর্হস্ত গণেশ হয়েছ? দেখি, কি হয়েছে—

রাগে গরগর করতে করতে ঐ খেলার মধ্যেই গগন-গুরু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। ছেলেটা পড়াশুনোয় মনোযোগী বলে ঠেকছে, উপর-উপর চোখ বুলিয়ে ত্রুটি ধরা মুশকিল। মনের রাগ মনের মধ্যে চেপে গগন বলে, হুঁ, দাঁড়িয়ে থাক, দেখছি।

আরও দু-চার চাল দেওয়ার পরে গগন অপর পক্ষকে বলে, রোসো, দেখে দিই, ছোঁড়া সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলে পাক দিয়ে এদিকে ফিরে শেলেট টেনে নিল। সত্যিই ছেলেটা ভাল। কিন্তু এমন তো হতে দেওয়া চলে না। লেখার আগা-গোড়া বার দুয়েক চোখ বুলিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ লাইন এঁকেবেঁকে যায় কেন রে? গরুর পাল জল খেতে যেন পুকুর মুখো চলল। ছেলেটার ঘাড় নিচু করে ধরে গুড়ুম করে পিঠের উপর এক কিল। বসে, আবার লেখ গিয়ে। ঠাণ্ডা মাথায় ধরে ধরে লিখবি। তাড়া নেই, লেখা নিখুঁত হওয়া চাই। যা—

ঐ একটা কিলেই পাঠশালা সুদ্ধ ছেলের শিক্ষা হয়েছে। নিঃশব্দে ধরে ধরে সবাই লিখছে। তাড়া নেই—একবার হয়ে গেলে আর একবার লিখতে পার আরও বেশীক্ষণ ধরে। না লিখলেও কেউ কিছু বলতে আসছে না। মোটের উপর শব্দসাড়া না হয়। কোন রকম ঝামেলা করো না, চাল ভুল হয়ে যাবে গুরুমশায়ের।

রাত্রে এ হাঙ্গামাটুকু নেই। গানবাজনার আসর পাঠশালা ঘরে। আসর কী আর—গগন জগা বলাই মোট এই তিন জন আর শ্রোতা একটি দুটি যা আসে। পালা-বিহীন ছুটো গান ও ঢোলকের বাজনা এমন কিছু নয় যার জন্যে কনকনে হিমরাত্রে মাঠ ভেঙে খাল পার হয়ে মানুষ জমবে। আসরেরও খুব যে বাঁধাধরা নিয়ম আছে, তা নয়। জগাদের নৌকো বাওয়ার কাজ, নৌকো নিয়ে বাইরে থাকল তো সেদিন আর হল না। তবে নেশা লেগেছে জগারও, ভর সন্ধ্যেয় না হোক দেড়-দু পহর রাতের মধ্যে সে গগনের ওখানে পৌছবার চেষ্টা করে, অন্তত রীতরক্ষার মত একটুকু যাতে একসঙ্গে বসা যায়। যাত্রার বিস্তর গান জগার জানা, গলাটুকুও চমৎকার। গগন সেই সব গান আদায় করবে জগার কাছ থেকে। কর্কশ হেঁড়েগলায় তার সঙ্গে তান ধরে। এ অত্যাচার জগা সহ্য করে পালটা গগনের কাছ থেকে ঢোলকের কিছু বোল তুলে নেবার লোভে। শিবচরণ বাইতির সাগরেদ নাকি গগন। শিবচরণ দেহ রেখেছে। বেশী কিছু নিতে পারে নি শিবচরণের কাছ থেকে—সামান্য দু-চারখানা গৎ, তার মধ্যে কোনটাই বাজার-চলতি নয়। সেই কটি জিনিস তুলে নিলে পারলে নিশ্চিন্ত। তখন কার পরোয়া! গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে কে তখন আর পাঠশালা-ঘরে হাজিরা দিতে আসছে! কিন্তু গগনও তেমনি ঘড়েল। ঢিপঢাপ করে ঢোলকে গোটা কয়েক চাটি দিয়ে ঘাড় নাড়েঃ না গো, জানি নে আমি কিছু। কালেভদ্রে কদাচিৎ ঢোলের চামড়ার উপর আলগোছে আঙুল বুলিয়ে কাকাতুয়ার মত কথা আদায় করে চমক দিয়ে যায়

একটুকু। তারপরে আবার সেই ন্যাকামির হাসি ঃ কিচ্ছু জানি নে ভাই। ইংরাজি-বাংলা গাদা গাদা বই নেড়েচেড়েই জনম গেল। ও বিদ্যেয় ঢোকবার ফাঁক পেলাম কখন ?

বাংলা বছর শেষ হয়ে বৈশাখ মাস এসে যায়। বৈশাখ পড়তে না পড়তে এবারে কালবৈশাখী। উঁহু, কালবৈশাখী কেন, সে হল ঘণ্টা কয়েকের ব্যাপার। সন্ধ্যার দিকে মেঘ উঠল, আকাশ ছেয়ে গেল দেখতে দেখতে। তারপরে ঝড়—চড়-চড় করে মোটা মোটা ফোঁটায় বৃষ্টি। দু-চারটে গাছ উপড়াল, ঘরের চাল উড়ে গেল, গাঙের জলে তুফান উঠল। চলল এই কাণ্ড দু-চার ঘণ্টা। রাত দুপুর নাগাত দেখা যাবে, নির্মল আকাশে তারা ফুটেছে, স্নান করে উঠে স্নিগ্ধ হয়েছে যামিনী—এই একটু আগের এত তড়পানি, তিলেক তার চিহ্ন নেই। কিন্তু তিনদিন ধরে অবিশ্রান্ত একটানা এই দুর্যোগের নাম কালবৈশাখী কখনো নয়। বৃষ্টি চলেছে অবিরাম—কখনও টিপটিপ করে, কখনও বা মুষলধারে। আর বাতাস। দিন ও রাত্রির মধ্যে ক্ষান্তি নেই। বড় গাছ ছোট গাছ এমন কি গাছ-তলার ঘাস-গুল্ম অবধি ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে—সেটা ঠিক পেরে উঠছে না বলে বারবার নুইয়ে ধরছে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখো। এই বাতাসের মধ্যে উপযুক্ত বেড়া না থাকলে ঘরের ভিতরও টেকা যায় না। ঝড়ে লণ্ডভণ্ড করে, বৃষ্টির ছাঁটে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। গগন-গুরুর ইতিমধ্যে ছোট্ট একটু রান্নাঘর বাঁধা হয়েছে, বেড়া দেওয়া হয়েছে তার, নইলে হাঁড়িকুড়ি শিয়ালে টেনে নিয়ে যায়। তাছাড়া খোলা মাঠের ফাঁকা হাওয়ায় উনুন ধরিয়ে রান্নাবান্নারও অসুবিধা। পাঠশালা-ঘরে বাইরের লোকের ওঠা-বসা—অনেকটা জায়গা লাগে। সে ঘরে বেড়া দেওয়া চলে না। দিলেও ছাত্র নামক হনুমানদলের দৌরাত্ম্যে সে বেড়া দশটা দিনও টিকবে না। ঝড়বাদলের মধ্যে গগন অতএব আশ্রয় নিয়েছে হাঁড়িকুড়ি ও উনুন বাদ দিয়ে ঐ রান্নাঘরের যে জায়গাটুকু বাকি থাকে সেখানটায়। কিন্তু মুশকিল

জগাদের নিয়ে। ভাবা গিয়েছিল, দুর্যোগে তারা এসে পৌঁছুতে পারবে না। ঠিক উল্টো, এমন অবস্থায় উন্মত্ত নদীর উপর নৌকো বের করা চলে না, ষোলআনা ফুর্তি এখন তাদের, অহোরাত্র গগনের অতিথি হয়ে পড়ে আছে। নির্ভাবনায় গান-বাজনা করছে। ক্ষিধে পেলে রান্নাঘরে ঢুকে, গগনের কাঁথা-মাদুর সরিয়ে উনুনে চাল সিদ্ধ চাপিয়ে দেয়। আধসিদ্ধ হলে নামিয়ে গোগ্রাসে গেলে সেই-গুলো। গগনকে বলে, দেখছ কি বড়দা, কাঁসরে চাট্টি ঢেলে নিয়ে তুমিও বসে পড়। ঘুম পেলে ছাত্রদের মাদুর-চাটকোল যা-হোক কিছু বিছিয়ে তার উপর গড়িয়ে পড়ে। একা নয় জগন্নাথ, সর্বক্ষণের সাথী বলাইটা রয়েছে যথারীতি সঙ্গে। নিজে অতিথি, আবার বগলে আর এক অতিথি ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। জগা মরলে বলাইটাও বোধহয় এক চিতায় ওর সঙ্গে সহমরণে যাবে।

সকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার নয়, তবে ভন্নাটা কমেছে একটু। বিকাল অথবা কাল সকাল নাগাত একেবারে ছাড়বে। গগন রান্নাঘরের অতি সঙ্কীর্ণ শয্যা ছেড়ে পাঠশালা-ঘরে এল। এসে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। হাঁকডাক করে ঠেলে তুলল জগাকে। বলাইও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে।

এই তোদের শোয়া হয়েছে?

জগা বুঝতে পারে না, ঘুম-চোখে এদিক ওদিক তাকায়ঃ মন্দটা কি হল বড়দা?

জলের সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে পাঠশালা-ঘরে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সারারাত্রি স্নান করেছে। তবু ঘুম ভাঙে নি, ঠাহর পাচ্ছে না কোন্ মন্দটা হল কোন্ দিকে।

গগন বলে, পারিসও বটে! পয়সাকড়ি তো আসে হাতে। কোন জায়গায় একটা ঘর তুলে নিলে পারিস। নেহাত পক্ষে আমার ঐ রান্নাঘরের মত।

ভ্রূভঙ্গি করে জগা বলে, বাজে খরচ আমি করি নে। নৌকোয় নৌকোয় কাজ—নৌকোর ছই থাকে। আমার নৌকোয় না-ই যদি

থাকল, যার নৌকায় ছই আছে সেখানে চলে যাব। তা ছাড়া ইয়ারবন্ধু তোমরা কত জনে ঘরদোর বেঁধে আছ। তবে আর নিজে ঝামেলায় যাই কেন? বছর বছর তখন ঘর ছাও, মাটি তুলে ডোয়াপোতা কর—দূর দূর! পিরথিমে এত মানষের ঘর, তার মধ্যে নতুন ঘর যে তুলতে যায়, সে হল আহাম্মক।

রাগে গরগর করতে করতে গগন বলে, তোরা মানুষ নোস, গরু। গরুও এমনভাবে থাকতে পারে না, দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। ঘুম আসে এর মধ্যে—বলিহারি ঘুমের!

জগা আমলে নেয় না, ফ্যা-ফ্যা করে হাসে। বলে, ঘুমোনো যাবে না, কী হয়েছে। অমন ক্ষীরোদ-সাগরের মধ্যে পদ্মপাতা মুড়ি দিয়ে নারায়ণ ঠাকুর ঘুমোন কি করে?

তাই, তাই। কলির নারায়ণ হলি তুই। জোড়েই আছিস—লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মী এবার কলিযুগে পুরুষ হয়েছেন। তোর ঐ বলাই।

দা-কাটা কড়া তামাক পর পর তিন-চার ছিলিমের পরে দেহ বেশ তেতে উঠেছে। গগন বাইরের দিকে ঠাহর করে দেখে বলে, আজকেও পাঠশালা বন্ধ। ছেলেপুলে আসবে না।

জগন্নাথ সায় দেয়ঃ এত বড় ভন্নায় আসে কি করে?

গগন উষ্ণ হয়ে বলে, ইচ্ছে থাকলে পারে। তোমরা এস কেমন করে বল দিকি?

জগন্নাথ বলে, আমরা ফুর্তির লোভে আসি। অ-আ ক-খ'য় কোন্ ফুর্তিটা আছে শুনি, কোন্ লোভে ছোঁড়াগুলো আসবে?

গগন হতাশ স্বরে বলে, তাই দেখতে পাচ্ছি। বৃষ্টিবাদলায় আসবে না। আবার রোদের সময়ও আসবে না—চড়া রোদে হুজুরদের মাথা ধরে।

বলাই এতক্ষণের মধ্যে এইবার কথা বললঃ গোড়ায় পাঠশালায় নতুন মজা পাচ্ছিল। ভেবেছিল বিদ্যে শিখে কী না জানি হবে। এখন পুরোনো হয়ে আসছে। মালুম হচ্ছে, লেখাপড়া অ-ত সোজা

নয়। সবাই তা হলে বাবু হয়ে যেত, হাল চষবার মানুষ থাকত না।

জগন্নাথ বলে, ভালই তো বড়দা। আমি বলি, ছেলেপুলে জুটে ঝামেলা না করে সে একরকম ভাল। বিচ্ছুগুলোর জ্বালায় দুপুর-বেলা চোখের পাতা এক করতে পারতে না, বিকেলে এক-বাজি একটু দাবায় বসবে তাতেও শতেক ঝামেলা। নির্ঝঞ্ঝাটে বেশ আছ এখন।

গগন বলে, কিন্তু থাকা যাবে কদ্দিন? তিন বেলা ভুজ্জি যোগাবে কে? ছেলেপুলে পাঠশালায় না এলে মানবে ক'দিন আর মাইনেপত্তোর দেবে? এমনই কত বাকি পড়ে গেছে।

জগন্নাথ ভয় ধরিয়ে দেয়ঃ ছেলেপুলে এলেও আর মাইনে দিচ্ছে না।

গগন চমকে ওঠেঃ কেন, কেন? শুনেছ নাকি কিছু? পড়ানো পছন্দ হচ্ছে না?

জগা বলে, কত বিদ্যাদিগ্‌গজ আছে যে পড়ানোর ভালমন্দ ওজন করে বুঝবে! ধান এখন গোলার তলায় এসে ঠেকল, ছেলে পড়ানোর পুলক ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ক'দিন পরে ক্ষেতে গোন পড়লে তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেও একটা ছেলে এনে বসাতে পারবে না। গরু-ছাগল চরিয়ে বেড়াবে তারা, ক্ষেতে ক্ষেতে পান্তা বয়ে নিয়ে যাবে। পাঠশালা আবার শীতকালে, ভুঁইক্ষেতে যদি ফলন হয়।

তবে? আমি কি করব তা হলে?

দাবা খেল। তার চেয়ে ঐ যে বললাম, ফড় খেল আর গানবাজনা কর। এত বড় আবাদে একটা মানুষের মতন দু-বেলা দু-মুঠো চাল জুটে যাবে। কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে দাও ক'টা মাস—কার্তিক-অঘ্রান অবধি।

উদ্বেগে গগনের মুখ শুকিয়ে যায়ঃ মানুষ একটা হল কিসে? তোদের মতন উড়ো-পাখি নয়—বউ আছে, ঘর-সংসার রয়েছে।

নিজে চাট্টি খেলে হল না, তারাও খাবে। বাড়িতে টাকা না পাঠালে কুরুক্ষেত্তোর বেধে যাবে।

চোখ বড় বড় করে জগন্নাথ বলে, এই মরেছে! কুমিরমারির সেই তাল ধরেছ? নাঃ, বউ তোমায় গুণ করেছে বড়দা। গুণদড়ি দিয়ে বেঁধে তারপরে বাইরে ছেড়েছে। এখানে এসেও চিঠিপত্তোর হাঁটাচ্ছ বুঝি?

আসে বইকি একটা-ছুটো চিঠি! আপন মানুষ থাকলেই আসবে। গোড়ায় গোড়ায় তো ভালই ছিলাম। টুকটুক করে পয়সা জমে যাচ্ছিল। ছু-দশ টাকা বাড়ি পাঠিয়ে হালকা হয়ে নিতাম। তখন কি বুঝেছি, এই গতিক হবে?

গতিকের দেখেছ কি বড়দা? বর্ষাকাল সামনে। এখন তো ডাঙার উপর চলে ফিরে বেড়াচ্ছ। তখন আর মানুষ নও, পাতিহাঁসের মতন জল সাঁতরে বেড়াবে।

ছুর্যোগের অবসানে জগন্নাথ ও বলাই খালে নেমে নৌকোয় চাপল। বিষম ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেল হতভাগারা। ভয় পাঠশালা বন্ধ হচ্ছে বলেই নয়, ভয় নগেনশশীর বোনকে। টাকা ঠিক মত পাঠালে মাস অন্তর চিঠি আসে, টাকার অনিয়ম হলে হপ্তায় হপ্তায়। আর বর্ষাকালের যে ব্যাপার শোনা গেল, তখন তো রোজ একটা করে চিঠি ছাড়বে। বোন অসমর্থ হলে ভাই নগেনশশী স্বয়ং কলম ধরবে। ছুর্ভাগ্যক্রমে লেখাপড়া শেখা আছে গগনের, চিঠি সে পড়ে ফেলে। চিঠির সারবন্দি অক্ষরগুলো ঝগড়ার মুখে গুল-মাজা কালো কালো দন্ত-কটমটির মতন। এমনিতে বিনি-বউ খারাপ নয়, চিঠি লিখতে বসেই মারমুখী হয়ে পড়ে। জগন্নাথ বিদ্রূপ করল বউয়ের কথা নিয়ে—কিন্তু গগনের সত্যি এক বিশ্রী স্বভাব, মনে সুখ এবং হাতে ছু-পয়সা এলেই বাড়ির পরিজনের কথা মনে পড়ে যায়। ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে টাকা পাঠায়, নিয়ে আসার প্রস্তাবও করে। কুমিরমারিতে ঐ রকমটা হল, তাতে শিক্ষা হয় নি

কিছুমাত্র। আবার যে রকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে—এই জায়গা থেকে বাস উঠিয়ে অপর কোন চুলোর সন্ধান নিতে হবে নাকি ?

আচ্ছা, বর্ষা তো এসে যায়। পাঠশালা না-ই চলল, বর্ষার সময়টা লোকের অসুখবিসুখ নিশ্চয় হবে—ডাক্তারি আরম্ভ করে দিলে হয় কেমন ? গগনের পুরোনো ব্যবসা। অসুবিধা আর কি, ওষুধের বাক্স সঙ্গেই আছে। এক টুকরো তক্তা যোগাড় করে নিয়ে তার উপর লিখে ফেলল ঃ ডাক্তারখানা—ডাক্তার শ্রীগগনবিহারী দাস। পরিপাটী করে লিখে সেই সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল পাঠশালা-ঘরের সামনে। লোকে দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে—কাছে এসে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, এটা কি লিখেছ গুরুমশায় ?

গগন বলে, পণ্ডিতি করি, আবার ভাল ডাক্তারও আমি গো। রোগপীড়ের চিকিচ্ছে করি। ওষুধ ডেকে কথা বলে। তেতো নয় ঝাল নয়—দামেও সস্তা। নমুনা স্বরূপ এক এক দাগ খেয়ে দেখতে পার।

বাদা অঞ্চলের মানুষ—বাঘ-কুমিরকে ডরায় না, কিন্তু ওষুধের নামে ভয়। নমুনা কেউ পরখ করতে আসে না। বর্ষা নেমে গেল। চারিদিক জলে ডুবে আছে। দিনকে দিন জল বাড়ছে, ধানগাছ পাল্লা দিয়ে আরও উঁচু হয়ে মাথা তুলছে জলের উপর। ঢালাও সবুজ ক্ষেত। সবুজ সমুদ্রের মধ্যে মানুষের বসতিগুলো এক একটা দ্বীপ যেন। গগনের পাঠশালা-ঘরও সকলের থেকে আলাদা দ্বীপ একটুকরো। ছাত্র আসবে না, কিন্তু এক-আধটা রোগী যদি ধুঁকতে ধুঁকতে জল ভেঙে এসে ওঠে! শেষটা এমন হল, রোগী চাই নে, সুস্থসমর্থ মানুষ কেউ এসে দু'দণ্ড গল্পগুজব করে তামাক খেয়ে চলে যাক। হপ্তাভোর মানুষের মুখ দেখি নি। কী রকম জায়গা রে বাপু, তোমাদের দশজনের ভরসায় তোমাদেরই ছেলেপুলের মঙ্গলের জন্য পাঠশালা খুলে বসলাম, লোকটা বেঁচে রয়েছে কিংবা ফৌত হল—একটা দিনের তরে কেউ এসে খোঁজখবর নেবে না ?

আসে কালেভদ্রে জগন্নাথ। এবং তার রাতদিনের সাথী বলাই। ধানের নৌকোর বড় চলাচল নেই, ধান সব উঠে গেছে মহাজনের গুদামে, চাষীর গোলার তলে চাট্টি চিটেভুষি—নতুন ধান না ওঠা পর্যন্ত ঐ চিটেভূষি ভেনে-কুটে আধেক খেয়ে কাটাবে। এখন জগন্নাথের এ তল্লাটে কাজ নেই। আরও নাবাল অঞ্চলে নেমে গেছে। একেবারে বনের ধারে। এমন কি বনের মধ্যেও বলা যেতে পারে—আসল বাদাবন না হলেও ছিটে-জঙ্গল তো বটেই। মাছের নৌকোয় কাজ জগন্নাথের। সে হল ষণ্ডাগুণ্ডার কাজ, রামা-শ্যামা রোগাপটকা মানুষে পারবে না। নৌকোয় মাছ তুলে দেবে প্রহর দেড়েক রাত্রে—তার আগে দেবে না। বাজারে মাছ গিয়ে উঠবে খুব তাড়াতাড়ি হল তো বেলা আটটায়। জলের মাছ বেশী আগে ডাঙায় তুললে পচে গোবর হয়ে যায়। গাঙের জোয়ার-ভাঁটা আছে, বাতাসের মুখড়-পিছন আছে। বেগোন হলে গুণ টানবে, মুখড় বাতাস হলে বোঠেয় দুনো জোর দিতে হবে বাতাসের শত্রুতা কাটিয়ে ওঠার জন্য। যদি দেখলে, নৌকো কোন-ক্রমে এগোয় না—তখন মাছের একটা ঝাঁকা মাথায় তুলে নিয়ে দাও ছুট ডাঙা-জল অপথ-কুপথ ভেঙে। ঘাম দরদর করে পড়ছে, কিংবা কাঁটাগাছে দেহ চিরে রক্ত বয়ে যাচ্ছে - তা বলে তিলেকের জিরান নেই। তোমার অসুবিধা শহরের বাবুভেয়েরা বুঝবেন না। সাতটায় বাজারে নামানো তো অসম্ভব এ জায়গার মাছ। আটটা নাগাত নামাতে পার তো জোর কপাল বলে জেনো। কিন্তু আর বেশী দেরী হলে দর তখন পড়তি মুখে। মাছ নরম হয়ে গেছে তখন, বাবুভেয়েরা হয়তো ডাল-ভাত খেয়ে যে যার কাজে বেরিয়ে গেছেন-- তোমার পচা মাছ শেষ অবধি কষ্টে সৃষ্টে সিকি দামে বিকোবে। কিংবা নর্দামায় ঢেলে দিয়ে খালি ঝাঁকা নিয়ে ফিরতে হবে। তোমার জীবন যাক বা থাকুক, মাছ কিছুতে নষ্ট না হয়। জগাই পারে সেটা, জগন্নাথকে ডাকাডাকি করে তাই ঘেরিদার সকলে।

মাছের কাজ-কারবার সম্পর্কে গগনের কোন ধারণা নেই। বুঝিয়ে দিলেও বুঝবে না। গগনের উপর জগার টান পড়ে গেছে। সেই প্রথম দিন কুমিরমারি গদাধরের হোটেলে নাস্তানাবুদ হবার পর থেকেই বোধ হয়। হয়তো বা মনের অজান্তে অনুতাপ। এদিক দিয়ে নৌকো ফেরত যাবার মুখে জগারা নেমে খানিক আড্ডা দিয়ে যাবেই। এক-আধ বেলা থেকেও যায় কাজের তাড়া না থাকলে। জগা হল চলন্ত বিজ্ঞাপন ডাক্তার গগনচন্দ্র দাসের। যাকে যেখানে পায় হাঁকডাক করে বলে, শোন শোন, গগন গুরুমশায় ডাক্তার হয়েছেন—খুব ভাল ডাক্তার। দায়-দরকার পড়লে চলে যেও। গোড়া থেকেই ডাক্তার উনি, আমি জোরজার করে পাঠশালায় বসিয়েছি।

যত বলাবলি হোক, ফলের ইতরবিশেষ নেই। রোগী আসে না। জ্বরজারি যে হচ্ছে না, এমন নয়। কিন্তু লোকে কিছুতে ডাক্তারের কাছে আসবে না। ডাক্তার যেন যম। দরকারও হয় না, দেখা যাচ্ছে। ক'দিন চুপচাপ শুয়ে পড়ে থেকে তড়াক করে উঠে আপাদমস্তক তেল মেখে খালের জলে পড়ে। স্নানান্তে ভাতের কাঁসর নিয়ে বসে। এতেই জ্বর চলে যায়, ওষুধ খাবার দরকার পড়ে না। খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠারই বা কী এমন দরকার? ক্ষেতের রোয়া নিড়ানো সারা হয়ে গেছে, কাজকর্ম নেই এখন, জলের ঠেলায় ঘরের বার হওয়া যাচ্ছে না মোটে। চুপচাপ বসে কোষ্টা-কাটা অর্থাৎ পাট-টাকুর দিয়ে পাটের সুতো পাকানো গরুর দড়ির জন্য, এবং তিন সন্ধ্যে তিন কাঁসর ভাত গেলা। ধান-চালের অনটন—রোগপীড়ের দরুন ঐ তিন সন্ধ্যে থেকে কিছু খাওয়া যদি বাদ যায়, সেটা ভাল বই মন্দ নয়।

দিন আর চলে না। অবশেষে জগা-ই আবার নতুন জায়গা বাতলায়। চল নাবালে, আরও নীচের দিকে। ভারী এক মজার ব্যবসা মাথায় এসেছে। ডাক্তারি গুরুগিরি কোথায় লাগে! ক-খ-ঠ শিখেছ যখন, তোমার গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে না বড়দা। আমরা সবাই আছি সঙ্গে। ভাতের দায়ে চলে এসেছি মানুষের

ছুনিয়া থেকে—নিঝ্ঞাট কোথায় চাট্টি ভাত মেলে, না দেখে ছাড়ব না। তার জন্ম যেখানে যেতে হয়, যাব। চল আরো নীচে।

গগন শুনল সবিস্তারে। এখন কোথায় কি—অন্ধকারের ভিতর ঢিল ছোঁড়ার শামিল। তবে, রোজগারের এক নতুন কায়দা বটে!

ঠেলতে ঠেলতে কোথায় নিয়ে চললি বল দিকি জগা? বনের দিকে এগোচ্ছি। আর এক বেলা গেলেই বোধ হয় কসাড় বাদাবন। মানুষের মুখ দেখব না সেখানে, জন্তু-জানোয়ারের বসত।

জগা বলে, জন্তু-জানোয়ার ভাল বড়দা। বাগে পেলে মুখে পোরে, মুখের গ্রাস কেড়ে খায় না। তা মানুষেও কি ছেড়ে দেবে ভেবেছ? সবুর কর ছু-চারটে বছর। এই যেখানটা আছ, কী ছিল বল তো আগে? আসবার মুখে কান্নাকাটি পড়ে যেত, বাড়ির লোকে খরচ লিখে রাখত। এখন দেখ, পোকার মতন কিলবিল করছে মানুষ। জমিজিরেত আগে মাংনা দিয়েছে, নগদ টাকা ধরে দিয়েছে বাদা হাসিলের বাবদ। এখন এক এক বিঘের সেলামি শুনলে পিলে চমকে যাবে। ছুনিয়ার উপর মানুষ এঁক কাঠা জমি ফালতু পড়ে থাকতে দেবে না। ভিড় না জমতে, তাই বলছি, আগেভাগে গিয়ে যদ্দূর পার বাগিয়ে নিয়ে বসো।

জগা চলে গেছে আবার নাবালে। ক'দিন ধরে খুব ভাবনাচিন্তা করল গগন। একলা মানুষ—না রোগী, না ছাত্র—ভাবনার অনন্ত অবসর। হাতে কোন কাজকর্ম নেই—এরই মধ্যে একদিন জগার নৌকোয় উঠে দেখেই আসা যাক না আরও নীচে একেবারে দক্ষিণ অঞ্চলের হালচাল।

ত্রৈলোক্যের বাড়ি গিয়ে বলল, মাইনেকড়ি কেউ তো কিছু দিচ্ছে না। দিন চালানো মুশকিল। আমার একলার শুধু একটা পেট নয়। ঘরবাড়ি আছে, বখেড়া আছে ঘরবাড়িতে।

ত্রৈলোক্য বেকুব হয়। তারই উদ্যোগে ইস্কুল, সে হল সেক্রেটারি। বলে, কাঁচা কাজ করেছ গুরুমশায়। পৌষ-মাঘের

দিকে একেবারে পুরো বছরের মাইনে টেনে নিতে হয়। নগদে সুবিধা না হল তো ধান। ভাল কাজে ধান চাইলে কেউ 'না' বলে না। সেই ধান কোন একখানে রেখে দিতে পারতে—খুঁচি মেপে আমার গোলায় রাখা যেত। তুমি যে শহুরে আইন খাটাতে গেলে, মাস অন্তর মাইনে। কাজ করে দিয়ে তার পরে টাকা। আবাদ রাজ্যে ভদ্দোর নিয়ম আমদানি করলে। বিপদ হল সেই।

হাঁক দিয়ে মাহিন্দারকে বলে, দু-খুঁচি ধান পেড়ে দিয়ে আয় পাঠশালে। গুরুমশাইর খোরাকি।

আবার বলে, ধান চিবিয়ে খাবে না তো! দু-খুঁচি আলাদা করে মেপে ধান-সিদ্ধ চাপিয়ে দিতে বল। ভেনেকুটে চালই দিয়ে আসিস পরশু-তরশু লাগাত।

গগন বলে, চাল তৈরি করে রেখে দাও তৈলক্ষ। ক'দিন পরে নেব। জগা বলছে, নাবালে কোথায় সব মাছের ঘেরি আছে, খুব নাকি মাছ পড়ছে। ঘুরে-ফিরে ক'টা দিন মাছ খেয়ে আসি।

বেশ, বেশ। ঘুরেই এস তাহলে। ফিরবার সময় খালি হাতে এস না, মাছ হাতে করে এস দু-চারটে।

বারো

দক্ষিণের নাবাল অঞ্চলে জল-নিকাশের ব্যবস্থা নেই। ধানের চাষ হবে না—হোক তবে মাছ। ধরণীর এক কাঠা ভুঁই মানুষ বাতিল বলে ছেড়ে দেবে না—যেখানে যা পাওয়া যায়, শুষে নেবে। জলকরে লাভও বেশী ধানকরের চেয়ে। মুশকিল হয়েছে, অত দূরের মাছ তাজা রাখা যায় না। শহরে নিয়ে তোলবার আগে নরম হয়ে যায়। তবে বেশী দিন নয়—টানা-রাস্তা হচ্ছে কুমিরমারি থেকে। রাস্তাটা হয়ে গেলে তখন লরী-বোঝাই মাছের ঝোড়া ফুলতলায় নিয়ে ফেলবে। নৌকোয় লড়ালড়ি করতে হবে না সারারাত্রি।

জগন্নাথ সেই তল্লাটে নিয়ে যাচ্ছে গগনকে। দেখে আসা যাক। তারপর সুবিধা হয় তো ছোটখাটো এক ঘেরি বানাবে। আগে যারা এসেছে, তারা সব ছোট থেকেই বড়। জগন্নাথের মাথা বড় সাফ। বিদ্যেসাধ্যি থাকলে শহরে সে জজ-ম্যাজিস্টর হয়ে বসত। অত বিদ্যে না থাক, যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগটাও ভাল মতন শেখা থাকত যদি! স্বাধীন ব্যবসায়ে ঐটে বড় দরকার। মুখের কথা মুখে থাকতে চটপট হিসেব বলতে হবে: দু-টাকা সাত আনা, এক টাকা চোদ্দ পয়সা আর পৌনে আট আনা—একুনে কত? তার থেকে সায়েরের খাজনা তিন ঝোড়ার দরুন তিন দুনো ছয় পয়সা বাদ দাও, দাঁড়াল গিয়ে কতয়? শ্লেট-পেন্সিল ধরলে হবে না। লহমার মধ্যে হিসাব মিটিয়ে খাতায় লিখে ফেলতে হবে। ছুটোছুটি করে ওদিকে মাছ তুলে ফেলেছে নৌকোয়। গোন বয়ে যায়, তীর হয়ে এখন নৌকা ছুটবে। হিসাবের জন্য বসে থাকলে হবে না।

গগন জগা আর বলাই চলল সেই বাদার প্রান্তে মেছোঘেরির তল্লাটে।

দূর কম নয়, পুরো একটা ভাঁটি—উঁহু, তারও কিছু বেশী। পুরো ভাঁটি বেয়ে গিয়ে তারপরে বড় দুটো বাঁক গুণ টেনে যায়। গুণ টানতে হয় বিশেষ ভাবে দেখে শুনে, জন্তু-জানোয়ারের চলাচল বুঝে। রাতের বেলা তো নয়ই। এক বুক জল ভেঙে এক হাঁটু কাদা মেখে বিস্তর দুঃখধান্দায় অবশেষে তারা কাঙালি চক্কোত্তির ঘেরিতে গিয়ে উঠল। নামে ভুল হল—কাঙালি চক্কোত্তির ঘেরি ছিল অনেক দিন—বছর আষ্টেক আগে। তার পরে হয়ে দাঁড়াল কাঙালি বাবুর ঘেরি। একেবারে হালফিলের নামকরণ চৌধুরিগঞ্জ। খোদ মালিকের নাম কাঙালিচরণ চক্রবর্তী। গোড়ায় রসুয়ে-বামুন হয়ে এসেছিলেন বনকরের এক কর্মচারীর সঙ্গে। মাইনে থেকে কিছু টাকা জমিয়ে ঘেরির বন্দোবস্ত নেন। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে ডিঙি বেয়েছেন, ভেসাল-জাল টেনেছেন। হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল এই সমস্ত কাজে। প্রাণ হাতে করে এত দুর্গম

অঞ্চলে ক'জনই বা আসত তখন! জনালয়ের বহু দূরে দুর্দান্ত নদীকূলে ক্রোশের পর ক্রোশ জঙ্গলে ভরা জমি। জোয়ারবেলা জলে ভরে যায়, ভাটায় জল সরে গিয়ে কাদার সর পড়ে। বড় বাদা থেকে হরিণের পাল বেরিয়ে গাছের ঝরা পাতা ও কচি ঘাস খুঁটে খুঁটে খেয়ে যায়। দিনের পর দিন এমনি কাটত। কাঠ ও গোলপাতার নৌকো মাঝে মাঝে মন্থর ভাবে ভেসে যেত জঙ্গলের পাশ দিয়ে। মোম-মধু ভাঙার মউলরাই শুধু মরশুমের সময় ডাঙায় উঠে ছুটোছুটি করত, অন্য কেউ বড়-একটা নৌকো থেকে নামত না।

কাঙালিচরণ খাজনা করে নিলেন ছিটে-জঙ্গলের হাজার খানেক বিঘে। সেলামি নেই—মাংনা দিলে কেউ নিতে চায় না, তার সেলামি! খাজনাও নামে মাত্র—বিঘা প্রতি ছ-আনা আট আনা। তা-ও আপাতত নয়, বছর পাঁচেক পরে জমাজমি কায়েম হয়ে যাবার পর। এমনি অবস্থায় কাঙালিচরণ এক হাজার বিঘে জমি নিয়ে বাঁধবন্দি করতে লাগলেন। লোকে নানান কথা বলে, 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে—মরে তাঁতি গরু কিনে'। হাঁড়ি ঠেলে চক্কোত্তি ঠাকুর কটা টাকা গেঁথেছিল, জঙ্গলে গ্রাস করে নিল সে-টাকা। জঙ্গল বন্দোবস্ত নিয়ে চক্কোত্তি ধান-চাষের ব্যাপারে গেলেন না অন্য দশজনের মত। মাছ জন্মাতে লাগলেন। চৈত্র-বৈশাখে বাঁধ কেটে নদীর জল তুলে দাও ঘেরের খোলে। নোনা জলের মাছ—ভেটকি ভাঙান পারসে চিংড়ি। বাঁধ বেঁধে ফেল তার পর। মাছ বড় হচ্ছে এবং বিক্রিও হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। পৌষ-মাঘ নাগাত ঘেরি শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাবে, দুটো চারটে খানাখন্দে কিছু জল—তার মধ্যে অল্পসল্প বাছাই মাছ রেখে দেবে বড় করবার জন্যে। ব্যবসায়ের মজা হল, যা-কিছু পাওনাগণ্ডা কটা মাসের মধ্যে ষোলআনা হাতে এসে যাচ্ছে। 'কয় শুভঙ্কর মজুত গোণো'—লাভ-লোকসান মজুত টাকা গুণে হিসাব করে নাও। কাঙালির লোকসান হয় না—নিজ হাতে সর্বরকমের কাজ

করে ঘাতঘোত বুঝে নিয়েছেন, নামই হয়ে গেছে মেছো-চক্কোত্তি। গোড়ায় যারা টিপ্পনী কাটত, দেখাদেখি তারাও অনেকে জঙ্গল জমা নিয়ে ঘেরি বানাচ্ছে। কিন্তু মেছো-চক্কোত্তির কাছে দাঁড়াতে পারে না। আগে যারা একবার জমিয়ে বসে যায়, পরবর্তী কালে এসে তাদের উপর টেক্কা মারা দায়। একটা বিশেষ অসুবিধা, ভোরবেলা অন্তত পক্ষে আটটা বাজবার আগে ফুলতলায় মাল পৌঁছে দেওয়া। সেটা হয়ে উঠল না তো ফুলতলার বাজারে দু-আনা সেরেও মাছ বিকাবে না। পচা মাছ নদীর জলে ফেলে দিয়ে বোঝা খালাস করতে হবে। কাঙালিচরণ একেশ্বর হয়ে ছিলেন অনেকদিন—ঝোড়া ঝোড়া পচা মাছ গাঙে ঢেলে দিয়েও চকমিলানো প্রকাণ্ড বাড়ি তুলেছেন ফুলতলা শহরের উপর, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, মেয়েদের ভাল বিয়েথাওয়া দিয়েছেন, ছেলেপুলে ইস্কুলে-কলেজে পাঠিয়েছেন, একটা-দুটো পাশও করেছে কেউ কেউ। বুড়ো কাঙালি বেঁচে আছেন এখনও, কুঁজো হয়ে পড়েছেন, চলে ফিরে বেড়াতে পারেন না, চোখেও ঝাপসা দেখেন। ফুলতলায় গাঙের ধারে মাছের আড়ত আছে ওঁদের নিজস্ব, ভোরবেলা ঘোড়ার গাড়ি করে তাঁকে আড়তে নামিয়ে দিয়ে যায়, গদির উপর চুপচাপ বসে থাকেন তিনি। ছেলেরা—এমন কি চৌধুরি-বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে দক্ষ ছোটবাবু অনুকূল চৌধুরি অবধি ও-পথ ভুলেও মাড়ায় না। আড়তের ভার কর্মচারীদের উপর। কাঙালিচরণের আমলের দক্ষ পুরনো কর্মচারী আছে দু-চার জন, তারাই দেখাশুনা করে। চালু ব্যবসা যন্ত্রের মতো চলে, তার জন্য বিশেষ বুদ্ধি-বিবেচনার আবশ্যক হয় না। চলে সেইজন্য। ছেলেরা এখন নামযশের জন্য পাগল। মেছো-চক্কোত্তি কাঙালির নাম, তারা সেজন্য কৌলিক চক্রবর্তী উপাধি ছেড়ে চৌধুরি হয়েছে। আদালতে এফিডেবিট করেছিল এই মর্মে। যা ছিল কাঙালি চক্কোত্তির ঘেরি, এবং পরবর্তীকালে অবস্থা ভাল হয়ে যাবার পর কাঙালিবাবুর ঘেরি,—এখন সেই জায়গা চৌধুরিগঞ্জ। প্রতিষ্ঠাতার নামে কাঙালিগঞ্জ

করবার কথা হয়েছিল, কিন্তু কাঙালি নামটার মধ্যেও সে-আমলের দুর্দিনের গন্ধ। কাঙালিগঞ্জ চলল না।

চৌধুরিগঞ্জের নিজস্ব অনেক নৌকো। তার কোনটা মেলে নি, কাছাকাছি অন্য ঘেরির ডিঙি চেপে এসেছে। বড় গাঙ থেকে খাল ঢুকে গেছে বাদায়—সেই এক খালের মুখে নামিয়ে দিয়ে ডিঙি চলে গেল। খালের ধারে ধারে হাঁটছে। জগা দেখিয়ে দেয়ঃ ঐ তো—ঐ যে আলাঘর। দেখতে পাচ্ছ না?

গগন তাকিয়ে তাকিয়ে ঘর দেখার চেষ্টা করে। কোথায়? সমুদ্রের মতন দিকহীন খোলা জল। হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে হয়তো বা হাত কয়েক দূরেই—ঠিক এ জায়গাটায় কিছু নেই। জলের উপর চড়বড় করে ফোঁটা পড়ছে। মনে হয়, বিস্তর মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে ওখানে। হঠাৎ—কী মুশকিল, বৃষ্টির পশলা গা-মাথা কাপড়চোপড় ভিজে জবজবে করে দিয়ে ছুটে পালায়। এক খেলা যেন।

এক-পেয়ে সরু আ'ল-পথ। ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলে গেছে, যেমন যেমন ফেলেছে তেমনি পড়ে আছে। জল আটকাবার জন্যে বাঁধ, জলের সঙ্গে মাছ যাতে বেরিয়ে না যায়। বাঁধের উপরে মানুষ হেঁটে বেড়াবে, এ ভাবনা কেউ ভেবে রাখে নি। অতএব হাঁটতে হলে দায়টা ষোলআনা তোমার নিজের। এঁটেলমাটি বৃষ্টিতে পিছল হয়ে আছে। দু-পায়ের দশটা আঙুল বাঁকিয়ে টিপে টিপে পথ এগুতে হয়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে—জনালয় হলে অন্ধকার হয়ে যেত এতক্ষণ। ফাঁকা বলেই আলো। কিন্তু এই আলো কতক্ষণই বা! বাঁধের শেষ দেখা যায় না—যত দূর নজর চলে, দীর্ঘ অজগরের মত এঁকে বেঁকে পড়ে রয়েছে।

ক্লান্ত গগন জিজ্ঞাসা করে, আর কদ্দূর?

জগা বলে, এসে গেলাম বড়দা। ঊই যে আলা।

গগন রাগ করে বলে, খালের মুখে মাটিতে পা ছোঁয়ালাম, তখন থেকেই এক কথা চলছে তোমার।

নির্লজ্জ জগা দাঁত বের করে হাসেঃ বড়দা বলে মান্য করি, তোমার সঙ্গে দু-কথা বলব কেন?

ঘোর হয়ে আসে। এখন তবু পা টিপে যাওয়া যাচ্ছে। একটু পরে নজর চলবে না—তখন?

বলাই ওদিকে সতর্ক করে দেয়ঃ বাঁ-দিকটাও নজর রেখো বড়দা। এমন-অমন বুঝলে ঝপাস করে ঘেরির খোলে লাফিয়ে পড়বে।

কেন, ওদিকে কী আবার? সভয়ে গগন বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে। জঙ্গল পুরো হাসিল হয় নি। বড় জঙ্গল নয়—ছিটে গাছপালা, গেঁয়ো-হেঁতালই বেশী। বড় জঙ্গলের আরম্ভ রশি দুই দূরে খালের ওপার থেকে। বিরক্ত হয়ে গগন বলে, চোখ তো সাকুল্যে একজোড়া। নজর বাঁধে রাখি, না জঙ্গলে।

বলাই হেসে বলে, আমি বলি কি জঙ্গলে রাখাই ভাল। কোটালে খালের পার ভেসে আছে। আঁধার হলে বড়-মিঞারা খাল সাঁতরে এপারের ডাঙায় বেড়াতে আসে। বাঁধে আর কী এমন —দু-পাঁচটা সাপ পড়ে থাকতে পারে। নোনা রাজ্যের সাপ বড্ড আলসে—গায়ে পা পড়লেও ফণা তুলবে না কষ্ট করে। তাগতই নেই।

গগন বলে, সাপে ছোবল না-ই দিল, পা হড়কে বাঁধের নীচে পড়ি তো হাড়গোড় ভেঙে দ হয়ে যাব। তার চেয়ে আপসেই নেমে যাই রে বাপু।

অপর দুজনে হি-হি করে হেসে ওঠে গগনের কাণ্ড দেখে। বাঁধ ছেড়ে ঘেরির খোলে গগন নেমে পড়েছে। ওপারের বাঘেরা বেড়াতে এসে উঁচু বাঁধের আড়ালে তাকে দেখতে পাবে না, তার আগে, পেরে ওঠে তো, জগা বলাই দুটোকে পেটে পুরে উদ্গার তুলবে। আলস্যে শয়ান সাপের পিঠে পা পড়বে না, পিছল বাঁধে পড়ে গিয়ে পা ভাঙারও শঙ্কা রইল না। হাসছে ওরা তো বয়েই গেল।

জগা বলে, জল ভেঙে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তোমার বড়দা। তা সাঁতরেই চল না এইটুকু পথ।

আর কদ্দূর গো?

জগার সেই এক উত্তর: ঐ যে আলা। সামনে।

সাঁতরে যাবারই গতিক বটে। কাপড়চোপড় আগেই ভিজেছিল বৃষ্টিতে, তাতে নতুন অসুবিধা কিছু নয়। হাঁটু-জল, কোমর-জল কোথাও, গলা-জলও এক জায়গায়। এই জায়গাটুকু সত্যিই সাঁতার দিয়ে উঠতে হল। জগা-বলাই বাঁধে বাঁধে চলেছে, গগন ঘেরের খোলে জলের ভিতর দিয়ে। চলল—কতক্ষণ ধরে চলেছে এমনিধারা।

হঠাৎ জগা চেঁচিয়ে ওঠে: আলা দেখতে পাচ্ছ না বড়দা? ঐ—ঐ—

গগন খিঁচিয়ে ওঠে: আর দেখাতে হবে না। অনেক হয়েছে। নিয়ে যাচ্ছ যমালয়ে তা জানি, চুপচাপ তাই নিয়ে চল। মড়ার উপরে খাঁড়ার খোঁচাখুঁচি করো না?

জগা বলে, আচ্ছা দেখই না চোখ তাকিয়ে। আমি মিথ্যেবাদী, কিন্তু আলো তো মিথ্যে নয়। আলা না হলে বাদার মধ্যে জলুসের আলো জ্বালিয়েছে কে?

গগন নজর তুলে দেখবার চেষ্টা করে। আলোর মতন বটে! অত নীচু থেকে ঠিক করে কিছু বলবার জো নেই। হ্যাঁ, আলোই।

জগা বলে, জল ভাঙছ কি জন্যে আর? হাঁক দিলে এবারে পঞ্চাশ মরদ এসে পড়বে। উঠে এস বাঁধে। এসে দেখ।

তাই বটে। জোরালো আলো অনতিদূরে—সাধারণ কেরোসিনের টেমি-হ্যারিকেন নয়, হ্যাজাক জাতীয় আলো। এতক্ষণে একটুখানি হাসি গগনের মুখে: এসে গেলাম তবে! আলা-আলা করছ সেই কখন থেকে! উঃ, মিথ্যে তোমার মুখে আটকায় না।

মিথ্যার জন্য জগা লজ্জিত নয়। আরও হাসে: কত পথ এসেছ, বুঝতে পার নি। আলা না দেখালে তোমায় কি আনতে পারতাম

বড়দা ? পথের উপরে বসে পড়তে। বিদ্যে শিখলে মানুষ বাবু হয়ে যায়। গায়ে পদার্থ থাকে না।

আলায় পৌঁছে গেল অবশেষে। 'আলা' নাম কি আলয় থেকে ? কিংবা আলোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে নামের ? একটা জোরালো আলো ঝুলবে আলার উঠানে। এই নিয়ম। বৃষ্টির জলে আলো খারাপ হয়ে না যায়, একটুকু আচ্ছাদনও আছে সেজন্য। অনেক দূর থেকে লোকে দেখতে পায় : ঐ যে আলার আলো জ্বলছে। রাত্রিবেলা ডিঙি ও শালতি-ডোঙায় জাল বেয়ে বেয়ে মাছ ধরে, ধরা হয়ে গেলে আলো লক্ষ্য করে সোজা পাড়ি ধরে—আলার উঠানে মাছ এনে ঢালবে। উঁচু জায়গার দরকার আলা বানানোর জন্য। যত বর্ষাই হোক, আলার জমিতে জল না ওঠে। জুত মতন জায়গা না পেলে মাটি তুলে উঁচু করতে হবে। দু-তিনটা পুকুর অতি-অবশ্য চাই আলার সীমানার মধ্যে। ঐ পুকুরের মাটিতে উঁচু করে নাও জায়গা। উঠান খুব প্রশস্ত—উঠানের সামনে দুই চালের প্রকাণ্ড ঘর। ঘর বটে কিন্তু দেয়াল নেই। এক সারি খুঁটি, খুঁটির মাথায় পাড়। চাল দুটোর এক মাথা ঐ সব খুঁটি ও পাড়ের উপরে, অন্য মাথা ভুঁয়ে গিয়ে পড়েছে। ফাঁকার মধ্যে ঘর। অনবরত হাওয়ার ঝাপটা লাগে। বাতাস মাঝে মাঝে অতি প্রবল হয়ে ঝড় হয়ে দাঁড়ায়। দিনরাত এমনি হাওয়ার অত্যাচার। উঁচু ঘর হলে ভেঙে পড়বার ভয়। আলা সেই জন্যে ভুঁইয়ের উপর মুখ থুবড়ে থাকে। মাচা তৈরি আছে —গেঁয়ো-গরানের শক্ত খুঁটি, তার উপর পুরোনো বাতিল পাটা, এবং তদুপরি পাঁচ-সাতটা মাদুরের অনন্ত শয্যা। যার যতটুকু ফুরসত হচ্ছে, গড়িয়ে নিচ্ছে মাচার মাদুরের উপর। বালিশ ইত্যাদির বাজে বিলাসিতা নেই। শীতকালে অথবা বৃষ্টিবাদলা থাকলেই ঘরে শোওয়া, নইলে বাইরের উঠানে খালি পাটা বিছিয়ে মরদ জোয়ানেরা টপাটপ চিৎ হয়ে পড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

এই হল আলা। তিনজনে আলার উঠানে দাঁড়াল। এতক্ষণ

ধরে জলকাদা ভাঙার পর শুকনো ভুঁয়ে পা দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। আলার লোকজন বড় ব্যস্ত এ সময়টা, মাছ এসে পড়ছে। মাছ এনে এনে ঢালছে উঠানের উপর। চারা-মাছ যেগুলো বেশ সজীব আছে, সেগুলো পুকুরে নিয়ে ফেলে। বাড়তে থাকুক এখন, শীতকালে ধরবে। অথবা এক-বছর দু-বছর পুকুরে রেখে বড় করবে। মাছ বাছাই হচ্ছে, মাছের গাদার চতুর্দিকে মরদেরা গোল হয়ে বসে। এক জাতীয় মাছ এক এক ঝুড়িতে। খাল অদূরে, মেছো নৌকো অনেক খালের ঘাটে। বড় নৌকো নয়, হালকা ডিঙি। ঝুড়ি পরিপূর্ণ হচ্ছে, আর ডিঙির উপর উঠে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। বোঠে হাতে চার-পাঁচ জন লাফিয়ে পড়ছে এক এক ডিঙিতে। বোঁও করে পাক দিয়ে তীরবেগে ডিঙি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঝপঝপ ঝপঝপ জোয়ানদের লোহার হাতে বৈঠা বাওয়ার শব্দ বাতাসে অনেকক্ষণ অবধি কানে আসে।

জগাকে দেখে সকলে কলরব করে ওঠে: এই যে জগা এসে গেছে। তবে আর কি! বড় ভেটকিগুলো বেছে এক ডালিতে তোল। জগা ঠিক নিয়ে পেঁছে দেবে সাতটার মধ্যে। লগনসার বাজার, ভাল দর পাওয়া যাবে।

বড় আলার লাগোয়া ছোট এক কুঁজি। রান্নাঘর। সেখান থেকে হাঁক আসে: ভাত নেমে গেছে জগা। খেয়ে যাবে তো বেড়ে দিই।

জগা ঘাড় নাড়ে: উঁহু—

অনিরুদ্ধ হল ম্যানেজার। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে, থাক থাক। খাটনি আছে, ভাত খেলে গতর ভারী হবে, বোঠে চলতে চাইবে না। না খেয়েই যাক, ফুলতলার ঘাটে সকালবেলা মিঠাই খাবে ভরপেট।

জগা প্রবল ঘাড় নেড়ে বলে, আজকে আমার বসা। কুটুম্ব সঙ্গে নিয়ে এলাম, আজ কোন খানে নড়ছি নে।

তাই তো, লগনসা যে কালকে! সাতটার মধ্যে ওরা কেউ

পৌঁছুতে পারবে না। সে তাগত নেই কারো। তুমি হলে ঠিক পারতে। বসার দিনটা বেছে নিলে একেবারে লগনসা মুখে!

জগা বলে, কি করব। বড়দা এল, তাঁকে দেখানো শোনানো হবে না? মাস ভোর খাটছি, আপন লোক এলে একদিন যদি জিরান না পাই, তবে আর মানুষ রইলাম কই? জোয়ালের গরু হয়ে গেলাম।

এ কথার উপরে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। অনিরুদ্ধ এক ছোঁড়ার দিকে হাঁক দেয়, বড়দা মশায় দাঁড়িয়ে রইলেন, পুকুরঘাট দেখিয়ে দে, হাত-পা ধোয়া হলে আলাঘরে নিয়ে বসা। তামাক সেজে দে, খাতিরযত্ন কর। জগার বড়দা তো আমাদেরও বড়দা। কুটুম্ব মানুষ।

তেরো

মাছের ডিঙিগুলো বিদায় করে দিয়ে তখন অবসর। মানুষজন ভাত খেয়ে নিচ্ছে। রান্নাঘরে দু-একজন—ভাতের কাঁসর নিয়ে ফাঁকায় এসে বসে প্রায় সকলে। খাওয়া আর কি—ভাত আর মাছ। তার উপর যেদিন ডাল পড়ল, সেদিন ফিস্টি-উৎসবের ব্যাপার। মাসে একদিন দু-দিন হয় এরকম। ডিঙি রওনা করে দিয়ে দেদার অবসর, রাতের ভিতর আর কাজকর্ম নেই।

উঁহু, ছিল না বটে কাজ, ইদানীং একটা হয়েছে। গাঁয়ে শহরে ছারপোকার মত মানুষ। জায়গা নেই, পেটের খাদ্যও নেই, মানুষ ছিটকে এসে পড়ছে দূর-দুরন্তর এই সমস্ত বাদাবনে। গগন এসে পড়েছে যেমন। ছ্যাঁচড়া মানুষও আসে অনেক। তারা চুরিচামারি করে। আলার মানুষ মাছ ধরা সেরে উঠে এলে, তারা চুপিসাড়ে জাল নিয়ে নামে সেই সময়। সেজন্য পাহারা দিতে হয়। জলের মাঝে মাঝে ছিটে-জঙ্গল, তারই আড়ালে, আবডালে চুপি চুপি

শালতি ঢুকিয়ে বসে থাকে চোর ধরবার মতলবে। পাহারার কাজে সারারাত্রি ঘেরির মধ্যে কিছু লোক রাখতে হয়। পালা করে মানুষ জাগে। বাকি সকলের ছুটি।

লেখাপড়া-জানা মানুষ গগন—গাঁজাটা অতিশয় ঘৃণা করে। তাকে তামাক দিয়েছে। দা-কাটা তামাক চিটাগুড়ে মাখা, সে তামাক গাঁজারই দোসর। জলে জলে বেড়ায়, বৈঠকখানায়-বসা বাবুভেয়ের আরামের তামাকে এদের চলে না। অতিরিক্ত রকমের তপ্তোক, শীত তাড়ানো যায় যাতে। তামাক ও গাঁজায় মিলে দশ-বারোটা কলকে ঘোরে আলার উঠানে। রাতটা সুমুখ-আঁধারি, আকাশে মেঘ করেছে। হাতে হাতে কলকে ঘুরছে, টানের চোটে কলকের আগুন জ্বলে জ্বলে ওঠে। ঘেরির জলার উপর থেকে দেখবে, যেন জোনাকির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে। মাছের উগ্র আঁশটে গন্ধ। কলকল শব্দে জল পড়ছে অদূরে কোথায়। জোরে হাওয়া দেয় এক-একবার, নিঃসীম ঘেরির জল আছড়ে পড়ে আলার উঁচু ভুঁইয়ের চতুর্দিকে। পাথরের মতো কালো-রং কঠিন-দেহ জোয়ান মরদগুলো তামাক খাচ্ছে ও গুলতানি করছে এখানে ওখানে ছড়িয়ে বসে। আলোর এক এক ফালি পড়েছে এর উপরে, তার উপরে। সমস্ত মিলে রহস্য-ভরা থমথমে ভাব। জনালয়ের বাইরে খাল-পারের নিঃশব্দ নিবিড় অরণ্যভূমির পাশে পরিচিত পৃথিবী থেকে পৃথক বিচিত্র এক জগৎ।

কলকে হাতে হাতে ঘোরে, আর আলাপ-পরিচয় জমে ওঠে। মানুষ পেয়ে ভারী খুশী, বাইরের মানুষের দুর্ভিক্ষ এখানে। অনিরুদ্ধ ম্যানেজার—চেয়ার-টেবিলের অফিস সাজিয়ে-বসা ম্যানেজার নয়। আলার ম্যানেজারকে দরকার মতন জাল বাইতে হবে শালতি-ডোঙায় ভেসে ভেসে, লোকজনের অভাব হলে রান্নার কাঠ কেটে আনবে জঙ্গল থেকে, কাঠ চেলা করবে, সময় বিশেষে রান্নার কাজেও লেগে পড়বে। এমনি ম্যানেজার। ম্যানেজার পদটা পেয়েছে কাগজে কলম বুলিয়ে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে মোটামুটি

এক একটা কথা দাঁড় করাতে পারে, সেই শক্তির জোরে। চালান লিখে দেয় কোন্ ডিঙিতে কত ঝোড়া কি রকমের মাছ যাচ্ছে। আলাতেও হিসাবের একটা নকল রাখে। আলার যাবতীয় খরচপত্র ম্যানেজারের হাত দিয়ে হয়, তার জমাখরচ রাখতে হয়। বাইরের মানুষ পেয়ে হঠাৎ আজ হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছে। জগা বড়দা বলে ডাকে, সেই সুবাদে গগন এখন সকলের বড়দা। ম্যানেজার বলে, তোমার পাঠশালা বন্ধ বড়দা, কিন্তু কাজকর্ম বন্ধ থাকলে আবাদের লোকে তো ফুলতলায় গিয়ে ফুর্তিফার্তি করে। তবু ভাল যে এই উল্টোদিকে অভাজন ভাইগুলোর দিকে পদধূলি পড়ল। কিন্তু একবার এসে শোধ যাবে না বড়দা, মাঝে মাঝে যেন দয়া পাই।

যত্নের ঠেলায় অস্থির। ক্ষিধেয় গগনের পেট চোঁ-চোঁ করে, রাঁধা ভাতও রয়েছে, কিন্তু খেতে দেবে না। আর সকলের যে ব্যঞ্জনে চলে, বিশেষ-অতিথি এই বড়দার সামনে শুধুমাত্র সেই বস্তু ধরা যায় কেমন করে? ডাল ঘরে নেই, তাহলে অবশ্য ভাবনার কিছু ছিল না।

ক্ষুধার্ত গগন বলে, কালকের দিনটাও আছি ম্যানেজার। কাল খাতির করো। কষ্ট হয়েছে, ঘুম ধরেছে আমার। যা রান্নাবান্না হয়েছে, তাই দিয়ে চাট্টি সেরে নিয়ে গড়িয়ে পড়ি।

সেটা কোন কাজের কথা নয়। সব কুটুম্বই বলে ঐ রকম। মাছের রাজ্য, ডাল না হল তো মাছই খাওয়াবে বেশী করে। ছোট মাছ কুটুম্বর পাতে দেবে কোন্ লজ্জায়? ঐ রাত্রে ঐ অন্ধকারের মধ্যে জাল নামিয়ে দিয়েছে আলার সংলগ্ন বড় পুকুরে। পাশখেওলা বাইছে তিনজনে। তিন-চার বছরে মাছ বেশ ওজনদার এখানে। নোনা মাছের রাজা হল ভাঙন—তৈলাক্ত মাছ, অতি সুস্বাদু। তারিফ করে বাবুরা ইলিশ খান, টাটকা ভাঙন খেয়ে দেখো—ইলিশ তার কাছে দাঁড়াতে পারে না। অনুকূলবাবুর বড় মেয়ের বিয়ে হবে এক-আধ বছরের মধ্যে, বড় পুকুরটায় ভাঙনমাছ জীইয়ে রাখা হচ্ছে—বিয়ের ভোজে শহুরে মানুষ পাকা ভাঙন খেয়ে তাজ্জব বনে যাবে। সেই পুকুরে ম্যানেজার জাল নামিয়ে দিল।

বলে, খাবে তো খাবে শহুরে বাবুরা। অনেক আছে। তা বলে আমরা পালন করছি—আমরা খেতে পাব না দুটো-চারটে ? কুটুম্বর পাতে দেব না ? পাঁচটা তুলবি রে গণে গণে। ছোট হলে ছেড়ে দিবি। দু-সের আড়াই সেরের কমে না হয়।

জগা বলে, অত কি হবে গো ? তোমাদের সকলের খাওয়াই তো প্রায় হয়ে গেল।

অনিরুদ্ধ বলে, সকলের হয়ে গেছে, খেতে পাঁচজন বাকি আমরা। পাঁচটার কমে হয় কি করে ? এই তোমরা তিনজন, আমি রয়েছি। আর রান্না করছে কালোসোনা, তারও ভালমন্দ খেতে শখ হয় বটে তো ! সে বাদ পড়বে কেন ?

অবাক হয়ে গগন বলে, হলামই না হয় পাঁচ জন। জন প্রতি আড়াই সের মাছের বরাদ্দ, শুধু মাছ খেলেও তো অতদূর সাপটানো যাবে না।

রহস্যময় ভাবে অনুরুদ্ধ বলে, চোখেই দেখতে পাবে। দেখতে পেলে কেউ শুনতে চায় না। কিন্তু দেখেই যাবে বড়দা, মুখে কদাপি রা কাড়বে না।

পাঁচটা বাছাই মাছ উঠানের উপর আলোর সামনে এনে ফেলল। পুষ্ট চেহারা—লালচে আভা গায়ে, কাঁচা মাছ দেখেই মৎস্য-রসিকের জিভে জল ঝরে।

অনিরুদ্ধ কালোসোনার দিকে চোখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, আবার কি—বন্দোবস্ত করে ফেল তড়িঘড়ি। রাত হয়েছে, বড়দা খিদে-খিদে করছে।

গগন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ঐ বড় বড় ভাঙনমাছের মুড়োগুলো কেটে নিল, এবং তার সঙ্গে সামান্য কিছু মাছ। কেটে নিয়ে মাছের বাকি অংশ ছুঁড়ে ফেলে দেয় এক দিকে।

অনিরুদ্ধ হাঁ-হাঁ করে ওঠে : অমন ধারা করলে হবে না তো কালো। কোটনামির লোকের অভাব নেই। রোসো—

কোদাল নিয়ে এল নিজেই। বটের চারা রুয়েছে, ছায়া দান

করবে চারা বড় হয়ে। সেই গাছের গোড়ায় কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ফেলল। গর্তের ভিতর মুড়ো বাদে সেই পাঁচটা মাছ—একুনে সের আট-নয় হবে তো ওজন—গর্তের ভিতর ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিল।

বিস্ময়ে গগনের চোখ কপালে উঠে গেছে। বলে, ওটা কি হল ম্যানেজার ?

অনিরুদ্ধ বলে, ঐ তো শুনলে। পাঁচজন আমরা খাওয়ার মানুষ। কে মুড়ো খায়, কে ল্যাজা খায়--অত বাছাবাছির গরজ কি ? সবাই মুড়ো পেলে মনে কারো দুঃখ থাকবে না। সেই ব্যবস্থা হল।

কিন্তু অতটা মাছ নষ্ট না করে কাউকে দিয়ে দিলে তো হত। নিজেদের না লাগে, আশপাশের ভেড়ির মানুষ আছে—

অনিরুদ্ধ জিভ কাটেঃ সর্বনাশ, খবর বাইরে যেতে দিতে আছে! যাদের দেবে, তারা খাবে আর টিপ্পনী কাটবে। এক কান দু-কান হতে হতে শেষটা ফুলতলায় মনিববাড়ি চলে যাক! কান-ভাঙানি লোকের অভাব নেই। অত হ্যাঙ্গামে কাজ কি ? আমাদের রেওয়াজ হল, দরকারের বাড়তি কোন-কিছুর নিশানা থাকতে দিই নে।

কলকে শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনিরুদ্ধ নতুন করে সেজে আগুন দিয়ে আনল রান্নাঘর থেকে। কয়েকটা সুখটান দিয়ে গগনের দিকে এগিয়ে দেয়ঃ খাও।

হুঁকো দিয়ে ফিকফিক করে হাসছে। গগন বলে, হাসছ কেন ? কি হল গো ?

অনিরুদ্ধ বলে, শোন তবে বড়দা। শীতকালে ছোটবাবু এয়ারবন্দুক নিয়ে এলেন পাখি মারতে। শখের বোট নিয়ে এসেছেন, বোটেই থাকেন। সে ক'দিন বড় কষ্ট আমাদের। নুন-ভাত—কুচো-চিংড়ি কয়েকটা নমো-নমো করে ছড়িয়ে দেওয়া তার উপর। ছোটবাবু দেখে ফেললেনঃ এই খাও নাকি তোমরা ?—আজ্ঞে,

হুজুরের এক পাই লোকসান করে আমাদের মুখে ভাত উঠবে না। কুচো-চিংড়ি চালান যায় না, ভাতটা তাই আঁশটে করে নিই। ছোটবাবু বললেন, তা হোক তা হোক। আমাদের জন্যে পুকুর থেকে মাছ তুলছে, তারই দু-চার দাগা তোমাদের খোরাকি রেখে দিও। মনে মনে বলি, চক্ষুর আড়াল হও, গোটা পুকুর ডাঙায় তুলে ফেলব, টের পাও নি বাছাধন।

খুব খাওয়াদাওয়া হল। রাক্ষুসে খাওয়া। অনিরুদ্ধ জোড়-হাতে বিনয় করে: কিছু না, কিছু না—এক-তরকারি আর ভাত। এত পথ কষ্ট করে এসেছ, খাওয়ার ব্যাপারেও কষ্ট পেয়ে গেলে।

ভাজা ঝাল ঝোল ও টক—আগেকার রান্না ছিল, আর অতিথির নামে নতুন করে যা-সব রান্না হল। মাছেরই সমস্ত—অতএব তরকারি একখানা বই দু-খানা বলবে না। মাছ-ভাত। রাত আর বড় বেশী নেই। চাঁদ উঠেছে ঘন কালো অরণ্যানীর মাথার উপর। বিপুল নিঃশব্দতা, মরা ধরিত্রী—কোনদিকে একটা কোন প্রাণী বেঁচে আছে, এমন রাত্রে তা মনে হবে না। তেপান্তরের প্রান্তে দপদপে ঐ আলো—জঙ্গল থেকে বড়-খাল পার হয়ে বাঘ যদি বেরিয়েও আসে, আলো দেখে এদিকটা ঘেঁষবে না। বাঘ বড় ভীরু, মানুষের চেয়ে অনেক বেশী।

বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু মেঘে ভরা থমথমে আকাশ। গুমট গরম, তার উপর গুরুভোজনের ফলে গগনের ঘুম হচ্ছে না। মাদুরের উপর এপাশ-ওপাশ করছে। একবারের এই খাওয়াতেই সে মজে গিয়েছে। জগার কথাটা মনে হচ্ছে: নগদানগদি তেমন না-ও যদি হয়, পেটে যা খাবে কোন জন্মে অমন খাও নি বড়দা। কথা ঠিক বটে। পেটের ধান্দায় বাঁধা ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরুনো। তা পরিবারের জন্যে না-ই হল তো নিজের পেটটা ঠেসে ভরানো যাক আপাতত। বাবুরা শহরে মজা লোটেন, আমাদের মজা দুর্গম এই বন-বাদাড়ে।

রোদ উঠবার আগে গগনের ঘুম ভাঙল। আর এদের তো দেখা যাচ্ছে রাত দুপুর এখন। কড়া রোদের মধ্যেও আলোটা জ্বলছে—রাতের অত জোরালো আলো মিটমিটে দেখাচ্ছে এখন। গগন একা একটি প্রাণী জাগ্রত এত মানুষের আলার মধ্যে। যারা রাতের পাহারায় ছিল, তারাও কখন এসে উঠানে সারি সারি শুয়ে পড়েছে। ঘরে উঠানে ঘুমন্ত মানুষ গিজগিজ করছে। ঘরের ভিতরে ঘুমাক, সেটা কিছু অভিনব নয়। কিন্তু বাইরের রোদের ভিতর চেরা-বাঁশের পাটার উপরে নিঃসাড়ে পড়ে পড়ে আছে—দেখ তো নেড়েছেড়ে, ঘুমিয়ে আছে অথবা মরে গেছে কিনা!

ও জগা, ওরে বলাই—

ডেকেডুকে অসুর দুটোকে যদি তোলা যায়। তা হলে বেরিয়ে পড়বে। ঘোরাঘুরি আছে অনেক, শলাপরামর্শ আছে। কিন্তু জাগিয়ে তোলার ব্যাপার সহজ নয় মোটেই।

প্রহর দেড়েক বেলায় একে দুয়ে আড়ামোড়া ভেঙে উঠতে লাগল। এইবার ওদের সকাল হচ্ছে। মাছের নৌকো সমস্ত রওনা করে দেবার পরে খাটনির বিরাম। সেটা যদি সন্ধ্যাবেলা বলে ধরা হয়, সকাল তবে এমনি বেলাতেই হবে। অনিরুদ্ধ উঠে বসল। চোখ মেলেই তার প্রথম কথা—কালোসোনাকে ডেকে বলছে, কুটুম্ব বাড়িতে, ডালের যোগাড় দেখিস রে কালো। বরাপোতায় চলে যা। খাঁড়ি-মুসুরি কিনে নিয়ে আয়।

কালোসোনায় আলস্য ভাঙে নি। জড়ানো সুরে বলে, গাঙ পার হব কিসে?

অনিরুদ্ধ খিঁচিয়ে উঠল: জাহাজ নিয়ে আসবে তোকে পার করার জন্যে। বলি, গামছা পরে পার হওয়া যায় না? না, বরাপোতার মানষে বলবে, চৌধুরিগঞ্জের কালোসোনা বাবু গামছা পরেছে। মান খোয়া যাবে।

বকুনি খেয়ে কালোসোনা ঠাণ্ডা। বলে, যাব—এখন কী তার? ডাল তোমার কুটুম্বর পাতে পড়লেই হল!

গগন জগা আর বলাই বেরিয়ে পড়েছে। সকালের দিকে আলার কাজকর্ম থাকে না, বিকাল থেকে আস্তেব্যস্তে শুরু হয়, সন্ধ্যার পর হুড়োহুড়ি। অনিরুদ্ধ তাই সঙ্গে যেতে চেয়েছিল: নিয়ে চললে কোথায় বড়দাকে ? চল, দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসি।

জগা বলে, ঘাটে যদি নৌকো পাই, জঙ্গলের ভিতরটাও ঘুরিয়ে আনব। কখন ফিরি ঠিক নেই। তুমি ম্যানেজার মানুষ—আলা ছেড়ে অতক্ষণ থাকবে কি করে ?

অনিরুদ্ধকে নিরস্ত করে বাঁধের পথে তারা চলল। অনিরুদ্ধকে নেওয়া চলে না দলের মধ্যে। মতলবটা লেগে যায় তো চৌধুরিগঞ্জের স্বার্থহানি—অনিরুদ্ধ ম্যানেজার যেখানে। এদেরই নয় শুধু, যত ঘেরি আছে এ-তল্লাটে সকলের। কাঙালির উন্নতি দেখে অনেকে এসে এই কাজে লেগেছে। কিন্তু কাঙালি আগে এসে জমিয়েছে বলেই তার মতন কেউ নয়। এই সব কথা হচ্ছিল খাল আর নদীর মোহানার কাছে সীমানার বাঁধে দাঁড়িয়ে। জগা হাত ঘুরিয়ে এপার-ওপার দেখায়। বাদাবন ঠিক ওপার থেকেই—একটানা সবুজ, তলায় শুলো আর কাদা। এ-পারে বাঁধের লাগোয়া সাদা চরের ফালি, হুন ফুটে ফুটে রয়েছে। তার পরেই ঝুপসি গাছপালা, চাঁদাকাঁটার ঝোপ। বন এপারেও—ছিটে-বন, জন্তু-জানোয়ার থাকে না—

জগা হেসে বলে, তবে চোর-ছ্যাঁচোড় বসে থাকে গাছপালার অন্ধকারে ঘাপটি মেরে। সাঁইতলা-সাঁইতলা বলছিলাম—ঐ সে জায়গা। ঐ বড় কেওড়াগাছ যেখানে। নিমকির ভিটের উপরে কেওড়াগাছটা। খটখটে উঁচু জায়গা, দেবস্থান। বানে দুনিয়া ভেসে গেলেও ওখানে জল উঠবার হুকুম নেই। আলা তোলা যাবে ওরই আশেপাশে, দেবতার আশ্রয়ে থাকব। পছন্দ হয় কিনা বল এবারে।

গগন খুঁতখুঁত করে: এইটুকু জায়গায় কী রকম ঘেরি হবে রে ? ওরা যে এক এক সাগর ঘিরে রেখেছে।

বলাই বলে, ওরা কত কাল থেকে করছে, কত লোকজন, কত নৌকো। আড়তে ওদের গাদা গাদা টাকার কাজ-কারবার—

জগা বলে, আমরা হতভাগারা ওদের জাল টানি, নৌকো বাই, মাছের ঝোড়া মাথায় করে ছুটি, দোষঘাট হলে ঠেঙানি খাই, বেশি-কিছু হলে ঘাড় ধরে বের করে দেয় ঘেরির এলাকা থেকে। মানুষ এমন একজন দু-জন নয়। আর ঘেরিও শুধুমাত্র কাঙালি চক্কোত্তির একটি নয়—অগুন্তি বাদা এলাকা জুড়ে।

হাসতে হাসতে বলল, হয়ে যাক না—তখন গগন-গুরুর ঘেরিতে জুটবে এসে সকলে। টাকা না থাক, নাই বা হল মেলা জায়গা-জমি, মানুষ বিস্তর পাবে বড়দা। মানুষের হিম্মৎ পাবে। আলা বেঁধে ফেল দিকি তাড়াতাড়ি এসে। আলা ঘিরে যত হতভাগা মিলবে সাদা চরের উপরে। আগে এসে যারা জমিয়েছে তারাও তো ছিল এক এক হতভাগা। বড়লোক হয়ে এখন আগের কথা ভুলে গেছে।

জগন্নাথ মতলবটা যা বলে, শিউরে উঠতে হয়। বাইরের ঠাট মেছো-ঘেরিরই বটে—ঘেরির মনিব গগন, কাঙালি চক্কোত্তির দোসর। আসল কাজটা কিন্তু সাধুজনের যোগ্য নয়। রামো, রামো! লেখাপড়া-জানা গগন রাজি হতে চায় না।

জগা রেগে ওঠেঃ লেখাপড়া না কলা শিখেছ বড়দা। ধর্ম-ধর্ম করে তো মুখ্যুরাই। বিদ্যেবুদ্ধি থেকেও যখন ধর্মের বুলি ছাড়ে—তক্ষুনি বুঝে নেবে, কথাবার্তা শুনে মুখ্যুর দলে ধর্মে মতি হবে, মতলবটা সেই। মুখ্যুদের দফা সারবার সুবিধা হবে বলে। অনেক দেখেশুনে বড়দা নজর খুলে গেছে। আর বুঝে নিয়েছি—বিদ্বানগুলোই হল আসল পাজি।

জায়গা পছন্দ করে চতুর্দিক ঘুরে ফিরে দেখে তারা আলায় ফিরল। ইতিমধ্যে মুসুরির ডাল এসে গেছে বরাপাতা থেকে। এবং তৎসহ গোলআলু ও পোস্ত। সওদা করে এনে কালোসোনা পা ছড়িয়ে বসে তেল মাখছে। অনিরুদ্ধও একটু বেরিয়েছিল।

জলের তোড়ে এক জায়গায় বাঁধ ভাঙো-ভাঙো—মাটি দুর্লভ, ডাঙা-ডহর কেটে মাটি আনতে হবে নৌকোয় করে বয়ে। সে তো এক্ষুনি হচ্ছে না—পর পর দু-তিন সারি পাটা বসিয়ে এল জায়গাটায়। বাঁধ যদিস্যাৎ ভাঙে, মাছ বেরিয়ে যেতে পারবে না এতগুলো পাটার ফাঁক দিয়ে। আপাতত ঠেকিয়ে এল, পরে পাকাপাকি ব্যবস্থা। এই তাড়াহুড়োর মধ্যেও কুটুম্বর কথা মনে রয়েছে, ফেরার পথে পাড়া ঘুরে হাঁসের ডিম আনল কয়েকটা। কথা চলিত আছে—কুটুম্ব-বাড়ি গেলে যজ্ঞি, কুটুম্ব বাড়িতে এলেও যজ্ঞি। তা ধর—ডিম হবে, ডাল হবে, মাছ তো আছেই—যজ্ঞের আর খামতি রইল কোথায়? উঠানের উপর কালোসোনাকে দেখে বলে, এখনো রান্না চাপাস নি কালো?

কালোসোনা নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে বলে, চাপাব—এখন তার কি!

কতগুলো পদ হবে হিসাব করে দেখেছিস? উপর দিকে তাকিয়ে বলে, সূয্যি প্রায় মাথার উপরে। ঘড়ি থাকলে এগারোটা বারোটা বেজে যেত।

কালোসোনা আবার এক পলা তেল হাতে নিয়ে পেটে ঘষতে ঘষতে বলে, বাজুক গে। যে কটা বাজবার বেজে যাক, তার পরে ধীরেসুস্থে ঠাণ্ডা হয়ে রসুইতে বসা যাবে।

বলতে বলতে চটে ওঠে: সাত সকালে খেয়ে নিয়ে সন্ধ্যারাত্রে পেট যখন চোঁ-চোঁ করবে, দেবে তখন আবার এক কাঁসর? তুমি হলে ম্যানেজার, ঠিকঠাক জবাবটা দাও, তবে সকাল সকাল রান্না চাপাব।

জগা বলে, রেগো না কালোভাই, রান্না বেজুত হবে। বড়দা মাস্টার মানুষ, টাইম-বাঁধা কাজ ওঁদের। খাওয়া ঘুম সমস্ত টাইমে চলে। একদিনের তরে এসেছেন, রাত্তিরেই আবার মাছের নৌকোয় চলে যাচ্ছেন। কষ্ট কর একটা দিন, কী আর হবে!

অতএব টাইমের মর্যাদা রেখে কালোসোনা সকাল সকাল রাঁধতে গেল। দুপুরের খাওয়াও বেশ সকাল সকাল সমাধা হল—পশ্চিমের

জঙ্গলের মাথায় সূর্য তখনও জ্বলজ্বল করছে। গগনকে বিষম খাতির করল আলাসুদ্ধ সকলে। মাছের নৌকো নিয়ে জগা-বলাই কাল যায় নি, আজকে যাচ্ছে। গগন সেই নৌকোয়। পথের মধ্যে তাকে নামিয়ে দেবে, রাত পোহালে হেঁটে সেখান থেকে চলে যাবে তার পাঠশালায়।

জোয়ারে ছেড়ে দিয়েছে নৌকো—অনিরুদ্ধ ম্যানেজার তখনও ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছে, আবার আসবেন বড়দা। এমন ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এলে হবে না। এসে আট-দশ দিন থাকতে হবে কিন্তু এবারে।

আসবে তো বটেই। আট-দশটা দিন কেন—অনেকদিন, অনেক বছর। তখন কি এই রকম আপনি-আপনি করবে ওরা? খাতির করে খাওয়াবে? দাঁতে চিবাতে চাইবে বাগের মধ্যে যদি পেয়ে যায়।

মোহানার কাছে জগা একটুকু নৌকো রাখল: ঐ দেখে নাও বড়দা, সাঁইতলার কেওড়াগাছ। নিমকির ভিটে ওর নীচে। দেব-স্থান। বানে দুনিয়া ভেসে গেলেও ওখানে জল উঠবার হুকুম নেই।

বাইরের লোক আছে নৌকোয়, আর বেশী খুলে বলে না। জলের উপর থেকে জায়গাটা ভাল দেখা যাচ্ছে। আলা বাঁধবে ঐ নিমকির ভিটের উপর। আলা মানে আলয়—আলার পাশে থাকবে নিজের ঘর। বিনি-বউ আসবে, পোড়ারমুখী বোন চারু আসবে। বন কেটে বসত-ঘর। হেই ভগবান, সে ঘর ফেলে আর যেন কোথাও চলে যেতে না হয়।

চৌদ্দ

গাঙের নাম করালী। ভাঁটার সময়টা নিতান্ত লিকলিকে চেহারা। নিকানো আঙিনার মত লোনা কাদার উপর গাঙ যেন ঘুমিয়ে

পড়ে। জোয়ারবেলা সেই গাঙের চেহারাটা দেখ। ভয় করবে। পাশখালি জলে ভরভরতি। জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি অবধি জল। এপারে ওপারে লোকে যত বাঁধ দিয়েছে, ছলাৎ-ছলাৎ করে থাবড়া মারে তার গায়ে। বাঁধ কমজোরি হল তো ঘেরির ভিতর জল ঢুকে পড়বে।

করালী থেকে খাল বেরিয়েছে। মোহানায় এই জায়গায় নুন তৈরি হত। নিমকির মোহানা বলে তাই কেউ কেউ। খালের ওপারের বড়-বাদায় জন্তু-জানোয়ারের বসতি। এপারে চর, চরের লাগোয়া ছিটে-জঙ্গল। খলসি কাঁকড়া চাঁদাকাঁটা গেঁয়ো এই সমস্ত গাছ। তারই প্রান্তে একটুকু ডাঙার উপরে বড় কেওড়াগাছের নীচে নিমকির লোকে সেকালে ঘর বানিয়েছিল। তারই ভিটে ঐ উঁচু ডাঙা। সেই ডাঙায় হাঁড়িকুড়ি-ভাঙা চাড়া ছড়ানো বিস্তর। কেওড়াগাছও সম্ভবত সেই আমলের। নৌকোয় যেতে যেতে দু-চার বাঁক আগে থেকে গাছের মাথা নজরে আসে। মাঝি আঙুল তুলে নিশানা করে: ঐ যে, এসে গেলাম সাঁইতলা। ঐ সাঁই-তলা থেকে হতে হতে চর ও জঙ্গলের সমস্ত জায়গাটা এখন হয়ে গেছে সাঁইতলা। খালের নাম সাঁইতলার খাল। কিছু দূরে চৌধুরি-ঘেরির বাঁধের গায়ে গায়ে বাগদি-তিওর-কাওরা-বুনোরা ঘর বেঁধে আছে, দিব্যি এক গাঁয়ের মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারও নাম সাঁইতলা।

কাঙালি চক্কোত্তি জঙ্গল বন্দোবস্ত নিয়ে মেছোঘেরি করলেন। বাঁধ দিলেন করালীর কূল ঘেঁষে। ডবল করে বাঁধ দিলেন—জলের তোড়ে একটা ভেঙে যায় তো পিছনের বাঁধ থাকবে, ঘেরির মাছ বেরুতে পারবে না। মেছোঘেরির পাশে অপ্রয়োজনীয় ভিটের ডাঙাটুকু বাঁধের বাইরে রইল। দেবস্থান করবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু বড়লোক হয়ে ফুলতলায় ঘরবাড়ি বানিয়ে সেখানকার বাসিন্দা হয়ে যাওয়ায় দেবস্থানের মতলব চাপা পড়ে যায়। কোথা থেকে এক সাধু এসে আস্তানা করলেন কেওড়াগাছের নীচে। সাধনভজন হত। বাদায় যাতায়াতের সময় নৌকো বেঁধে মাঝিমাল্লারা সিকিটা দুয়ানিটা

প্রণামী রেখে সাধুর আশীর্বাদ নিয়ে যেত। কিন্তু বাঘে মুখে করে বোধ করি সাধনোচিত ধামেই নিয়ে গেল সাধুকে এক রাত্রে। সাধু বা সাঁইয়ের আসন বলে সাঁইতলা নাম।

ম্যানেজার অনিরুদ্ধ যাবার সময় বলেছিল, আবার আসবেন বড়দা। এমন ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এলে হবে না, আট-দশ দিন থাকতে হবে এবারে এসে। যা চেয়েছিল তাই—এসে পড়ল গগন সত্যি সত্যি। আট-দশটা দিন কেন—থাকবে অনেকদিন, অনেক বছর। অতএব চুকিয়ে বুকিয়ে আসতে হল বয়ারখোলার ওদিকটায়। মাঘ মাস অবধি দেরি হল সেই কারণে। বাড়ি বাড়ি তখন ক্ষেতের ধান উঠে গেছে, বয়ারখোলায় আবার সবাই বড়লোক। গগনগুরুর পোষাল না তো নতুন গুরু নিয়ে আসবে তারা—গোলা-আউড়িতে ধান বোঝাই, এখন কেউ পরোয়া করে না। ভাত থাকলে কাকের কোন অভাব আছে? যার কাছে যে মাইনে পাওনা, ত্রৈলোক্য মোড়ল মধ্যবর্তী থেকে সমস্ত মিটিয়ে দিল। কিছু বেশীও ধরে দিল—বর্ষার সময়টা গুরুমশায় বড্ড কষ্ট পেয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ।

লেখাপড়া-জানা মানুষ গগন, তায় উকিল ভবসিন্ধু গণের বাড়ি কিছুদিন থেকে এসেছে। অতএব উপরের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা না বলে হুট করে এসে পড়তে পারে না। চৌধুরিদের বাড়ি এবং সদর-কাছারি ফুলতলা। আধা-শহর জায়গা। রেল আছে, ইচ্ছে হল তো কলকাতায় রওনা হও রেলগাড়ি চেপে। অথবা তরতর বাদার দিকে নেমে যাও নৌকোয়। ফুলতলায় সব চেয়ে বড় বাড়ি মেছো-চক্কোত্তির। আরে দূর, কী বললাম—মেছো-চক্কোত্তি বললে তো ক্ষেপে যাবেন এখনকার চৌধুরিবাবুরা। ও নাম ছিল প্রথম যখন ব্যবসায়ের পত্তন হয়, কাঙালি যখন নিজ হাতে বোঠে বেয়ে মেছোনৌকো নিয়ে গাঙ-খাল করে বেড়াতেন। মেছো-চক্কোত্তি বলত তাঁকে সবাই। মেছো বিশেষণটা জুড়ে

ঘাওয়ায় চক্কোত্তি উপাধিটাও দূষ্য হয়ে গেছে এখন। চক্কোত্তি ছেড়ে চৌধুরি হয়েছেন হালের বাবুরা। এমন কি কাঙালি নাম-টার মধ্যে সেকেলে দারিদ্র্যের গন্ধ—ঐ নাম কদাপি উচ্চারণ করো না বাবুদের সামনে।

বাদায় যাবার আগে গগন ফুলতলায় চৌধুরিবাড়ি গিয়ে হাজির হল : ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

পড়ে গেছে তহশিলদার গোপাল ভরদ্বাজের সামনে। গোপাল বলেন, উটকো লোকের সঙ্গে বাবুর দেখা হয় না। দরকারটা কি, বল আগে শুনি।

সমস্ত শুনে নিয়ে বললেন, বুদ্ধি ঠাউরেছ ভালই। বসো দাস মশায়। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে নেই। ঐ একটুকু ছিটে-জঙ্গল—বাবু অবধি গিয়ে পোষাতে পারবে? আমার সঙ্গে কথা-বার্তা বলে নাও, আমি ঠিকঠাক করে দেব।

গগন কাতর হয়ে বলে, কী দরের মানুষ আমি, চেহারায় মালুম পাচ্ছেন। যার নেই মূলধন, সেই আসে বাদাবন। গায়ের এই জামাটা আগে কামিজ ছিল—হাতা ছিঁড়ে গিয়ে এখন হাত-কাটা ফতুয়ায় দাঁড়িয়েছে। পরনে এই ছেঁড়া-ত্যাকড়া—

লাটবেলাট কে তোমায় বলছে বাপু? ছোটবাবু অবধি খোঁজ করছিলে—তাই তো বলি, ষষ্ঠীপূজোর মুরোদ নেই, দুগ গি তোলার সাধ! ছেঁড়া-ত্যাকড়া থাকে তারই এক চিলতে দিয়ে যাও, সলতে পাকাব। পরে যেদিন শাল-দোশালা হবে, তারও একখানা গলায় জড়িয়ে দিও। দেওয়া তো একদিনে ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

হি-হি করে খানিকটা হেসে নিয়ে হঠাৎ হাসি থামিয়ে গোপাল বললেন, ছোটবাবুর নজরানা দশ আর এদিককার আমলান-খরচা কুড়ি—

তিরিশ? আরে সর্বনাশ, বার দশেক বিক্রি করে দেখুন আমায়, তাতেও তিরিশ উঠবে না।

ছোটবাবু অনুকূল চৌধুরির কাছে গোপাল গিয়ে বলেন, হুজুর,

আমাদের এক নম্বর ঘেরির বাইরে বন কেটে নতুন ঘেরি বানাবে বলছে। গুরুগিরি করে, খেত বাঁধ বাঁধার মজাটা জানে না। এক কোটালে বাঁধের সমস্ত মাটি ধুয়ে সাফ হয়ে যাবে। কাটিঘায়ে প্রাণটা দেবে, কিংবা বাঘের পেটে যাবে। সাধুমানুষ মন্তোর দিয়ে রুখতে পারলেন না, সেখানে ঐ লোক যাচ্ছে সাউখুরি করতে।

আরও গলা নামিয়ে বলেন, আমাদের পক্ষে ভালই। বনের এক-কাটা হয়ে থাকবে, ঘেরিটাও চিহ্নিত হয়ে যাবে। আখেরের কাজে আসবে।

অনুকূল বলেন, যা করে করুক গে। কিন্তু লেখাপড়ার মধ্যে যাচ্ছি নে।

বটেই তো! গণ্ডগোল বাধিয়ে গরমেন্টো শেষটা খেসারতের দাবি না তোলে, সেটা দেখতে হবে বইকি!

ছোটবাবু এসে দাঁড়ালে গগন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে পদতলে পাঁচ টাকার নোট একখানা রাখল। গোপালের আমলান-খরচার কদ্দূর কি হল, প্রকাশ নেই।

সাঁইতলার সত্যি মালিক কে, ঠিকঠাক বলা মুশকিল। কাঙালি চক্কোত্তি যখন বন্দোবস্ত নেন, নিমকির ভিটেটুকু ছাড়া বাকি সমস্ত গাঙের নীচে। চর পড়ে গিয়ে তার পরে ডাঙা বেরুল। জঙ্গল ভেকে উঠল সেখানে। গাঙ ক্রমশ দূরে গিয়ে পড়েছে, কোটালের সময় ছাড়া বাঁধের গোড়ায় জল পৌঁছায় না। দু-সারি বাঁধ নিরর্থক এখন। এই চরের উপর ভেড়ি বেঁধে গগন মেছোঘেরি বানাবে। চৌধুরিরা বাঁধ দিয়ে সীমানা ঘিরে নিয়েছিলেন, আর গাঙের মালিক হলেন খুদ গবর্নমেন্ট। নতুন চর কার ভাগে পড়বে? চৌধুরির না গবর্নমেন্টের—বুঝুন ওঁরা মামলা-মোকদ্দমা ও লাঠিবাজি করে। তত দিন হাত কোলে করে বসে থাকা চলে না। গগন তো ছোটবাবুকে বলে-কয়ে দখল নিয়ে বসল। দখলই হল স্বত্বের বারোআনা—

আইনে সেই রকম বলে। একবার চেপে বসতে পারলে, ব্যস, ওঠাবে কার বাপের সাধ্য ?

তাই হয়েছে। চরের কিনারে ঝাঁকড়ামাকড়া গেঁয়োর শিকড়ের সঙ্গে ডিঙি এনে বাঁধল। ডিঙি জগন্নাথের। কিনেছে না আর কোন কায়দায় পেয়েছে—ওসব গোলমেলে কথা জিজ্ঞাসা কর না। মোটের উপর, এই ডিঙির সম্বলে সে বাদার কাজকর্ম করে বেড়ায়। পোষা ঘোড়ার মত তার পোষ-মানা ডিঙি। বনকরের বাবুদের চোখের সামনে দিয়ে হাউইবাজির মতন সাঁ করে বেরিয়ে যাবে, অথবা ইঁদুরের মত জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়বে, ডিঙি যেন আপনা হতে তা বুঝতে পারে। সেই ডিঙি সাঁইতলায় এনে বাঁধল। বাদার কাজে যাচ্ছে না আপাতত। সে হোক গে, এ-ও এক কাজ বটে তো—নতুন জায়গায় বড়দাকে নিয়ে এল, খানিকটা তার স্থিতি করে দেওয়া।

কাজ অনেক—জঙ্গল কাটা, মাটি কেটে ভেড়ি বেঁধে চর ঘিরে ফেলা, আলা বানানো। সমস্ত শীতকালের ভিতরে। বর্ষা নামবার আগে তো নিশ্চয়ই—চ্যারিদিক ডুবে গিয়ে সারা অঞ্চলে তখন এক ঝুড়ি মাটি মিলবে না। চৈত্রমাসেরও আগে—ষাঁড়াষাঁড়ি বানের আগে বাঁধের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। লোক লাগাবে বেশী করে।

বেওয়ারিশ এক চালাঘর আছে পাড়ার একদিকে। এমন অনেক পড়ে থাকে বাদা অঞ্চলে। যে লোক বেঁধেছিল, তার নাম পচা। সুবিধা পেয়ে সে অন্য কোথাও সরেছে। লোকে বলে এক স্ত্রীলোকের টানে। ঘরের মায়া করে বাদার মানুষ এক জায়গায় পড়ে থাকে না। মায়া করার বস্তুও নয় এই সব ঘর। খুঁটির উপরে দু'খানা মাত্র চাল। সেই ঢের—আলাঘর যত দিন না হচ্ছে সকলে মিলে সেখানে গিয়ে উঠেছে। শীতকাল বলে তিনদিকে গোলপাতার বেড়া দিয়ে নিল, চালের উপরেও নতুন গোলপাতা ফেলল কয়েকটা। দিনমানে কাজেকর্মে বাইরে বাইরে থাকে, রান্নাবান্নাও ফাঁকার উপর। রাত

হলে কেউ ডিঙিতে, কেউ বা চালাঘরে ঢুকে পড়ে। নতুন এসে গগনের ভয়-ভয় করে, বিশেষ সাধুবাবার ঐ পরিণাম শুনে। সাধু হলেও বাঘে রেহাই করল না। শুকনো কাঠকুটো জড় করে উঠানের উপর আগুন ধরিয়ে দেয়, আগুন জ্বলে সারারাত্রি। দু-রকমের কাজ হয়—আগুনের তাপে শীত কম লাগে, আর আগুন দেখে ভয় পেয়ে খালপারে বাদার জন্তু জানোয়ার এ-মুখো এগোয় না।

নিমকির ভিটে দেবতার নামে আছে অনেক কাল থেকে, দেবস্থানই হোক তবে ওখানে। গগনদের গাঁয়ের জাগ্রত রক্ষাকালী ঠাকরুন গ্রাম রক্ষা করে আসছেন। চারু আর বিনি-বউকে তাঁর পাদপদ্মে সঁপে রেখে এসেছে। এখানেও এরা কালীমায়ের দৃষ্টির উপরে থাকবে। বট-অশ্বত্থ এ তল্লাটে নেই—ভিটের কেওড়া-গাছতলাই হোক তবে কালীতলা। ঐ কেওড়াতলায় ভক্তিভরে প্রণাম করে কিছু ছাঁচ-বাতাসা রেখে এসেছে। সুদিন আসে তো তখন নিরামিষ বাতাসা-ভোগ নয়, ঢাকঢোল বাজিয়ে পাঁঠা বলি দিয়ে তোমার পুজোর বন্দোবস্ত হবে মা-জননী।

•

আলার জায়গাও ঠিক হল। খালের কিনারে পাড়ার কাছাকাছি —চৌধুরির সীমানা পার হয়ে এসেই। মানুষের কাছেও থাকতে হয়, দায়ে-বেদায়ে মানুষ কাজে লাগে। আবার জলের কাছে থাকতে হয়, মালপত্র বওয়াবয়ির তাতে কম হাঙ্গামা। আলা তোলার কাজ হচ্ছে আস্তেব্যস্তে। ডিঙি নিয়ে জগা আর বলাই বাদায় ঢুকে গরানের ছিটে ও গোলপাতা কেটে আনল। গরানের ছিটে চেঁচে-ছুলে রুয়ো বানাচ্ছে। বন কাটতে লেগে গেছে অনেকে, বারো-চোদ্দ খানা কুড়াল পড়ছে। কুড়ালের কোপে মড়মড় শব্দে গাছপালা ভুঁয়ে পড়ে। সমারোহ ব্যাপার। শুধু সাঁইতলা বলে কেন, অঞ্চল জুড়ে সাড়া পড়ে গেছে। ঘেরি হচ্ছে একটা নতুন। বাদার কাঠুরে-বাউলরা খালের পথে যেতে আসতে কাণ্ডকারখানা দেখে। দাঁড় উঁচু করে তুলে দেখে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে।

উপর থেকে গগন হয়তো ডাকল, এস ভাই। নৌকো ধরে বসে যাও একটুখানি।

না দাদা, বড্ড তাড়া। আর এক দিন।

অথবা, পাড়েই ধরল নৌকো। কাদা ভেঙে উপরে উঠে এল। এই বাদা-জায়গা জনপদের মত নয়। নতুন লোক দেখলে স্ফূর্তি হয় হাতের মুঠোয় স্বর্গ পাওয়ার মত। আলাপ-পরিচয় করে জমিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

বসো। দাঁড়িয়ে রইল কেন? তামাক খাও। কি তামাক—বড়-তামাক চলবে তো?

গাঁজা নামটা যেখানে সেখানে বলা ঠিক নয়। ঘুরিয়ে এরা বড়-তামাক বলে। সেই লোকটার গাঁজা এখন পছন্দ নয়। ঘাড় নেড়ে বলে, আরে দাদা, যেমন বাস বেরিয়েছে তোমাদের ছোট-তামাকই তো বড়র বেহদ্দ।

খাটুনির মানুষরা খাটাখাটনি করে। আর গুলতানি করে বসে বসে অন্য একটা দল। চালাঘরের মালিক পচাও একদিন এসে পড়ল কোথা থেকে। কানাকানি চলে, স্ত্রীলোকটা নাকি ভেগে পড়েছে। বাদা-অঞ্চলে হামেশাই এমন ঘটে।

তোমার ঘরে আস্তানা নিয়েছি পচা।

আমাকেও নিয়ে নাও তবে।

পচা রয়ে গেল। আরও কত মানুষের আনাগোনা নতুন চরের উপর। মানুষ না লক্ষ্মী—মানুষের পায়ে পায়েই অর্ধেক জঙ্গল সাফসাফাই হল, সাপখোপ পালিয়ে গেল। কেউ হাসে: মাথা খারাপ এদের। একরত্তি চরের উপর কী ঘেরি বানাবে, আর কটা মাছ জন্মাবে! আবার কেউ বলে, হেস না, ছোট থেকে বড়। কাঙালি চক্কোত্তির কোন ধনসম্পত্তি ছিল গোড়ার দিকে? ব্যবসা না-ই জমল, একটা ওঠা-বসার জায়গা তো হবে খালের মুখটায়! মা-কালীর থান হয়ে তো রইল!

ঘেরি বাঁধা হল। এবং ঘেরির কাজের যে রকম বিধি—চৈত্রমাসে

বানের জল তুলে দিল ঘেরির খোলে। জলের সঙ্গে বালির মতন মাছের ডিম। ডিম ফুটে মাছ জন্মাবে, মাছ বড় হবে, সেই মাছ ধরে ধরে বিক্রি। ব্যবসাটা হল এই। জমতে কিছু সময় লাগে। অথচ কী আশ্চর্য, আষাঢ় পড়তে না পড়তে নতুন আলঘর বানানোর আগেই ভাঙা-চালার ভিতর টাকা বাজানোর টুংটাং আওয়াজ। শেষরাত্রে গগন দাস খেরো-বাঁধা খাতা খুলে রেজগি-পয়সা থাকে থাকে সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। বলি, কী ব্যাপার – আসল বাণিজ্যটা কি, ভাঙ দিকি একটু।

সমস্তটা দিন তুমি তাক করে আছ। কিছুই নয়। অলস নিষ্কর্মা কতকগুলো মানুষ জঙ্গল-কাটা চরের উপর আড্ডা দিচ্ছে, অথবা ঘুমুচ্ছে ছায়াচ্ছন্ন কালীতলায় পড়ে পড়ে। ভাত জোটায় কেমন করে, হ্যাঁ? আর সে ভাতও সামান্য ব্যাপার নয়—আহারের সময় একদিন নজর করে দেখো, বাড়া-ভাত বেড়ালে ডিঙিয়ে এপার-ওপার করতে পারে না।

দিনমানে এই। রাত্রিবেলা আলাদা এক চেহারা। যত রাত হয়, মানুষগুলো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ঝোপে-জঙ্গলে লুকানো খেপলাজাল নিয়ে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে যেন পাখি হয়ে কে কোন্ দিকে সরে পড়ল। পাড়ার ভিতর থেকেও বেরিয়ে পড়ছে অমনি। যত অন্ধকার, ততই মজা। মরদগুলোর জু-চোখের মণি ধকধক করে জ্বলে যেন। অন্ধকার-সমুদ্রে ডুব-সাঁতার দিয়ে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ওরা তো বেরিয়ে গেছে। আরও অনেকক্ষণ পরে মোটাসোটা চিকন চেহারার তিন-চারটে মানুষ কোথা হতে এসে মাদুর বিছিয়ে বসল। মাছের পাইকার। বৃষ্টিবাদলা হল তো চালাঘরের ভিতরে, না হলে খাল-ধারে নতুন বাঁধের উপর। তাড়াহুড়ো নেই—গল্পগুজব হচ্ছে, কলকে ঘুরছে হাতে হাতে। আকাশে পোহাতি-তারা উঠল, ফিরে আসে এইবার মাছ-মারা লোকগুলো। মাছ মেরে নিয়ে আসে। কেউ আনে খালুইতে, কেউ ডালায় ঢেলে। যে জালে

মাছ ধরেছে, কেউ বা সেই জালের সঙ্গেই জড়িয়ে নিয়ে আসে। গাছগাছালির আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, কিংবা গাঙের খোল থেকে মাথা তুলে উঁচু বাঁধের উপর এসে দাঁড়াল। আগে ছিল না বুঝি এরা কেউ—আকাশ থেকে পড়ে গেল অথবা পরীতে উড়িয়ে এনে ফেলল, এমনিধারা মনে হবে।

মাছ-ধরা ব্যাপারটা যেন লুকোচুরি খেলা ঘেরিওয়ালাদের সঙ্গে। চৌধুরিগঞ্জের সঙ্গে বিশেষ করে। পাশাপাশি পাঁচটা ঘেরি ওঁদের—অকূল সমুদ্রের মালিক হয়ে বসে আছেন। অন্যলোকের ছিটেছাটা এদিকে সেদিকে, ছোট ব্যাপার নিতান্তই। ছোট ঘেরির মালিক হয়তো বা নিজে আলায় চেপে বসে আছে, দরকার মত নিজ হাতেই মাছ বাছাই করে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ওজনে বসে গেল। পরের উপর নির্ভর নয় বলে বাড়াবাড়ি রকমের পাহারা ঐ সব জায়গায়। মুশকিলটা বেশী যেখানে। গাঙ-খাল গবর্নমেণ্টের—জাল ফেলার কড়াকড়ি নেই। তবু মানুষ সেদিকে বড় ঘেঁষে না। অনেক খেটে অনেকক্ষণ জাল ফেলাফেলি করে তবে হয়তো যৎসামান্য উঠল। আর ঘেরির ভিতরে, বলা যায়, জিইয়ে-রাখা মাছ। জো-সো করে ফেলে দিলেই হল। বিফলে যাবে না। জাল টেনে তোলা দায় হয় কখনোসখনো, মাছের ভারে জাল ছেঁড়ে।

চৌধুরিগঞ্জের আলায় সেই তো এক রাত্রির ব্যাপার দেখেছিলে। মাছের নৌকো রওনা করে দিয়ে লোকজনের ছুটি। দু-চার জনে ঘোরাঘুরি করে জলের উপর একটু নজর রাখে, এইমাত্র। গগনের দল ঘাঁটি করার পরে বন্দোবস্ত পালটে গেছে। রাত জাগতে হচ্ছে এখন দস্তুরমত, নানান দল হয়ে ঘেরিগুলো পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে। কাদা মেখে আছাড় খেয়ে বাঁধের উপর ঘুরছে কখনো। কখনো বা শালতি-ডোঙায় জলের উপরে।

ওই—ওই দেখ এক বেটা শয়তান—

সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে পাহারার শালতি সেইখানে এসে পড়ল। কা কস্য পরিবেদনা। গাছের ফাঁকে ঘোলাটে জ্যোৎস্না

পড়ে মনে হয়, একটা মানুষ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে এমন যে জায়গাটায় পৌঁছে শালতি থেকে নেমে এদিক-সেদিক ঘুরে দেখেও সন্দেহ যেতে চায় না। রাত দুপুরে জান কবুল করে ধ্বজি ঠেলা, সমস্ত বাজে হয়ে গেল। এর জন্যেও রাগ হচ্ছে মাছ-মারার উপর। কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে বসে থেকে এদের নিয়ে যেন খেলাচ্ছে।

সেটা নিতান্ত মিছা নয়, তক্কেতক্কে আছে মাছ-মারারাও। বেসামাল হয়েছ কি চমক লাগবে জাল ফেলার শব্দে। ছুটোছুটি করে পৌঁছবার আগেই খেওন তুলে সরে পড়েছে। মাঝে মাঝে দ্বীপের মত থাকায় জুত হয়েছে তাদের। কোন্ দ্বীপের জঙ্গলে ঘাপটি মেরে আছে, বুঝবে সেটা কেমন করে? পাশ কাটিয়ে হয়তো বা একেবারে দু-হাতের ভিতর দিয়ে চলে গেলে—গেছ বেশ খানিকটা—নিঃসীম স্তব্ধতার মধ্যে ঝপ্‌পাস করে আওয়াজ। আওয়াজের আন্দাজে ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবে, মাছসুদ্ধ জাল হাতে সেই লোক তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে হাসছে সীমানার বাঁধের নীচে গিয়ে। সীমানার ওপার গেলে আর কিছু করবার নেই—কলা দেখাবে ঐখানটা দাঁড়িয়ে। বাদা অঞ্চলের অলিখিত আইন এই। মানুষ খুন করেও এলাকার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে বোধ করি গায়ে হাত দেওয়া চলবে না।

রাত দুপুরে হুল্লোড় এমনি। চোরের সঙ্গে গৃহস্থ পারে কখনো? অত বড় জলাভূমির অন্ধিসন্ধি নখদর্পণে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। আর ও-পক্ষ ওৎ পেতে রয়েছে—কোন একখানে পাহারার কমজোরি দেখেছে কি অমনি গিয়ে পড়ল। ভোররাত্রি অবধি এমনি। হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল। পাহারাদাররা হাই তুলে আলায় ফিরল, শোবে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে। মাছ-মারারাও ফিরে আসে—গগন ও ব্যাপারীরা লণ্ঠন জ্বেলে পথ তাকিয়ে আছে তাদের। দর কষাকষি ব্যাপারীদের সঙ্গে। মোহানার মুখে জগা-বলাই-পচা ডিঙি নিয়ে আছে। জোয়ার এসে গেল—অস্থির

ডিঙি মাথা ঝাঁকাঝাঁকি করছে। টানের চোটে ডিঙি-বাঁধা দড়ি না ছিঁড়ে যায়। গোন বয়ে যায়, তাড়াতাড়ি কর হে তোমরা। —খুব তাড়াতাড়ি।

মাছ মারতে যে ক'জন বেরিয়েছিল, সবাই সব দিন যে ভরা জাল নিয়ে ফিরবে এমন কথা নয়। ঘেরির পাহারাদার ধরে ফেলেছে হাতেনাতে। চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একটা দিন তো বটে। ধরতে পারলে শাস্তিটা বড় বিষম। শাস্তি বাদারাজ্যের বিধান অনুযায়ী। মারধোর নয়, থানা-পুলিস নয়—জালগাছি এবং সেদিনের মাছ কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে। এদের কিন্তু আগের দুটো পছন্দ। মার দিলে গায়ের উপর দিয়ে গেল—একটু না হয় গা-গতর ব্যথা হবে, আবার কি! থানা-পুলিস হলে আরও ভাল—পাকা-ঘরে রেখে ভরপেট খাওয়াবে। এই সমস্ত না হয়ে পেটের ভাতে টান। জরিমানার পয়সা চুকিয়ে দিলে তবে জাল ফেরত মিলবে। রোজগার বন্ধ সেই ক'দিন। জরিমানার পয়সাই বা আসে কোথা থেকে? ধারধোর নেবে—কিন্তু বাদাবনে কটা খাঞ্জে-খাঁ বসত করে শুনি, নিজের খরচ-খরচা চালিয়ে তার উপর অন্যের সামাল দিতে পারে?

অতএব উপোস দাও, এবং হাত পেতে বেড়াও এর-তার কাছে। আগে ছিল এই ব্যাপার। গগন এসে পড়ায় দুর্ভোগের শেষ হয়েছে। গিয়ে মুখের কথাটি বল, খাতায় নাম লিখে সঙ্গে সঙ্গে অমনি জরিমানার পয়সা দিয়ে দেবে। জাল ফেরত এনে বুড়ো-হালদারের নাম নিয়ে আবার রুজিরোজগারে লেগে যাও। মাছ এনে তুলবে অবশ্য সাঁইতলায়—গগন যে খাতা খুলেছে, সেখানে। তুলবে নিজেরই গরজে—এমন দরদাম কে দেবে? কিনবার খদ্দেরই বা কোথা? নিয়মমাফিক বৃত্তির সঙ্গে এই আগাম-দেওয়া জরিমানার পয়সাও অল্পসল্প করে কেটে নেয়। মাছ-মারার গায়ে লাগে না।

বুদ্ধিটা দিয়েছিল জগা: ঘেরির মাছ বাড়তে লাগুক, কিন্তু ততদিনের উপায় কি বড়দা? চৌধুরিরা সিন্দুক খুলে রমারম খরচ

করে। তোমার তো গুরুগিরির ঐ কটা টাকা সম্বল। এক কায়দা বলি, শোন। এই পথ ধর—

আচ্ছা মাথা বটে! পেটে বিদ্যে থাকলে জগা দারোগা-হাকিম হয়ে যেত। গাঙ-খালের মুখটায় ভাল একটু জায়গা করে বসা কেবল। ভোরের সময় কিছু দাদন ছেড়ে সন্ধ্যাবেলা ষোলআনা উসুল করে নেওয়া। আপাতত অস্থায়ী চালাঘরেই শুরু করে দিল। জমে আসছে দিব্যি। আলাঘর বাঁধা হয়ে গিয়ে এর মুখে ওর মুখে দূরদূরস্তর চাউর হয়ে পড়লে আরও জমবে। মেছোঘেরিতে আগে লোকে জাল ফেলত খাবার মাছের লোভে, বিক্রির মতলবে নয়। বিক্রি করতে হবে মানবেলায় নিয়ে গিয়ে—যেখানে লোকে পয়সা দিয়ে মাছ কেনে। অনেক দূরের ফুলতলা না হোক, কুমিরমারি অন্ততপক্ষে। দুটো-চারটে মাছ নিয়ে নৌকো করে গিয়ে খরচা পোষাবে কেন? ঘেরিওয়ালাদেরও মাথাব্যথা ছিল না এই সব মাছ-মারা নিয়ে। পেটে আর কতই বা খাবে! দু-পাঁচবার হৈ-হৈ করে পাহারাদারে রীতি রক্ষা করত। গগন খাতা খোলবার পরে সেই শখের মাছ মারা এখন পুরাদস্তুর ব্যবসা। মাছ মারার মানুষও দিনকে-দিন বাড়ছে। সামাল-সামাল পড়ে গেছে সব ঘেরিতে। গালিগালাজ করে গগনের নামে। শুধু গালিগালাজে শোধ যাবে বলেও মনে হয় না, লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে পড়তে পারে। রোগা টিমটিমে পচা, চিঁ-চিঁ করে কথা বলে। ডিঙি বাওয়ার কাজে রোজ নগদ পয়সা পেয়ে তারও প্রতাপ খুব। সে তড়পায়: আসুক তাই। টের পেয়ে যাবে আদায় কেমন ঝাঁজ। আমরাও জানি লাঠি ধরতে। লাঠি কেন, বল্লম-সড়কি-কালা ধরব।

জগা আরও রোখ বাড়িয়ে দেয়: আর দেশী-বন্দুক। জালের কাঠি ভরে নিয়ে যার এক দেওড়ে, মানুষ কোন্ ছার, বড় বড় কুমির চার-পা মেলে চিত হয়ে পড়ে। বিলাতি ফঙ্গবেনে বন্দুক কি করবে দেশী-বন্দুকের কাছে? কামারের কাছ থেকে বন্দুক গড়িয়ে আনব—অ্যাঁ, পচা?

গোড়ায় খোশামোদ করে ব্যাপারী আনতে হল। হতে হতে এখন চার-পাঁচ জন এসে জোটে। নিলামের মতন ডাকাডাকি হয়। এক সিকি—দেড় সিকি—যাকগে বাপু, তুই। তাতেও ছাড়বি নে? পায়রা-চাঁদা—তা কি হয়েছে? চাঁদি রুপোও এত দামে বিকোয় না রে! আর আধখানা উঠতে পারি—এই শেষ। দিবি? অন্য এক ব্যাপারী এক পাশে হয়তো নিঃশব্দ ছিল এতক্ষণ। পুরোপুরি তিন বলে মাছগুলো নিজের ঝোড়ায় সে ঢেলে ফেলল। গগন খাতায় লিখে নিচ্ছে। প্রতি ব্যাপারীর আলাদা ঝোড়া। দরদামে পটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মাছ ঝোড়ায় ঢেলে নেয়। সমস্ত ঝোড়া তুলে ফেল এবার ডিঙিতে। তাড়াতাড়ি, সময় বয়ে যায়। ব্যাপারীরা কেউ কেউ ডিঙিতে উঠে পড়ল। এখন আর পাল্লাপাল্লি নেই। এ ওকে বিড়ি দিচ্ছে, পান খাওয়াচ্ছে—গলাগলি ভাব। যত কেনাবেচা হবে, টাকা-প্রতি এক পয়সা বৃত্তি গগনের। হিসাব করে দেখ, কতয় দাঁড়াল। ডাক্তারি ও গুরুগিরির চেয়ে ভাল। খাতা আর সাঁইতলার ঘেরি যত জমবে, তত আরো বেশী ভাল হবে।

বেচাকেনা সারা হতে পুবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। সাঁ-সাঁ করে জল কেটে তীরের মতন ছুটছে ডিঙি। জোরে—আরও জোরে। বারোবেঁকির খাল—বাঁকের সংখ্যা বারো, নিতান্তই বিনয় বশে বলা হয়েছে। গুণতি করলে পঁচিশ-ত্রিশের কম হবে না। কাঁচামালের কাজকারবার—যত তাড়াতাড়ি নিয়ে পৌঁছানো যায়। যে ঝোড়া-খানায় ছুটো টাকার কমে হাত ছোঁয়ানো যাবে না, পৌঁছুতে দু-ঘণ্টা দেরি হয়ে যাক—আট আনা পয়সা দিয়েও নিতে চাইবে না কেউ তখন। মাছ হল এমনি বস্তু। এতগুলো বাঁক মেরে ঠিক ঠিক সময়ে মাল পৌঁছে দেওয়া জগাই পারে শুধু। তাই তার খোশামুদি। তবু তো যাচ্ছে, বড় ঘেরিওয়ালালাদের মতো ফুলতলার বাজার অবধি নয়—তার অর্ধেক পথ কুমিরমারি। মনোহরের বাড়ি থেকে পালিয়ে গগন যেখানে ডাক্তার হয়ে বসেছিল। কুমিরমারির অনেক উন্নতি—

নতুন রাস্তার আগাগোড়া মাটি পড়ে গেছে। রাস্তা আরও খানিকটা টেনে শেষ হবে চৌধুরিগঞ্জ গিয়ে। খাল বাঁধা হচ্ছে দু-তিনটা। যেখানে বড় কাদা, ঝামা-ইটের খোয়া ফেলা হবে সে সব জায়গায়। বছরের কোন সময়ে মানুষজনের চলতে যাতে অসুবিধা না হয়। অনুকূল চৌধুরির তদ্বিরে সমস্ত হচ্ছে—ঠিকাদার তিনি। মাটি-কাটা কুলি বিস্তর এসে পড়েছে বাইরে থেকে, কুলি খাটানোর বাবুরা এসেছে। গদাধরের হোটেল ফেঁপে উঠছে দিন দিন—গদাধর নিজে ছাড়াও আলাদা এক রসুয়ে-বামুন রেখেছে, আর চাকর দু-জন। জগার ডিঙি ঘাটে লাগতে না লাগতে নিকারিরা এসে নগদ পয়সায় সমস্ত মাছ কিনে নেয়। খুচরো বিক্রি তাদের—কতক বেচে ওখানেই গঞ্জের উপর বসে। কতক বা ডালিতে ভরে মাথায় বয়ে নিয়ে যায় দূর-দূরন্তরের হাটে। ফুলতলার তুলনায় দর অবশ্য সস্তা। কিন্তু শেষ রাতে বেরিয়ে ফুলতলা পৌঁছতে, খুব তাড়াতাড়ি হলেও, সন্ধ্যা হয়ে যাবে। চৌধুরিগঞ্জের মতো সন্ধ্যারাত্রে বেরুবার উপায় তো নেই। তবে দর যতই সস্তা হোক, মাছ-মারাদেরও বিনি-পুঁজির ব্যবসা—লোকসান কিছুতে হবে না।

রাস্তার কাজ পুরোপুরি শেষ হতে দাও, এই কুমিরমারি গঞ্জই কী সরগরম হবে দেখো তখন। মোটরবাস চলবে—বাসের ভিতরে মানুষ, ছাতের উপরে মাছের ঝোড়া। সাঁ করে ছুট দিল, সকাল হবার আগেই কুমিরমারি। কুমিরমারি থেকে জলপথে মোটরলঞ্চে চাপিয়ে দাও। চৌধুরিগঞ্জ এবং আর পাঁচটা ঘেরিদার যা করছে। ফুলতলার বাবুভায়েরা দাঁতন করতে করতে বাজারে এসে দেখবেন, সাঁইতলা-ঘেরির মাছ এসে পড়েছে।

তিন পহর রাতে মাছ-মারাদের অপেক্ষায় ঝিমোতে ঝিমোতে গগন এই সমস্ত ভাবে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। দূর বলে তখন আর কিছু থাকবে না। জগাটা কাজ ছেড়ে দিয়ে যাব-যাব করে, জগা কিংবা কারও তোয়াক্কা করবে না আর তখন। হে মা কালী, বিস্তর লজ্বালজ্বির পর অভাগা সন্তান বনে এসে পড়েছে,

এইবারে স্থিতি হয় যেন। খেলিয়ে খেলিয়ে আর মজা করো না মা-জননী।

পনেরো

এখন বিনোদিনীর কষ্ট হয়, বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে রাত্রিবেলা।

চারুকে গোপন করে, সে যাতে টের না পায়। টের পেলে তামাশা করবে, তারপরে—বলা যায় না—নিজেই হয়তো কাঁদবে বউদিদির আড়ালে আবডালে। মানুষটাকে বাড়ি থেকে সরাবার জন্য কত হেনস্থা করেছে ননদ-ভাজে মিলে। যাবার ঠিক আগের রাত্রেও কথা শোনাতে ছাড়ে নি। চারুটা চালাকি করে তবু যা-হোক দক্ষিণের ঘরে নিয়ে পুরল। বিস্তর কৌশল পোড়ারমুখীর মাথার ভিতর। কোন্ মুলুকে মানুষটা উদাসীন হয়ে পড়ে আছে। আগে চিঠিপত্র লিখত। কত আশার কথা, ভালবাসার কথা। বিনিকে নিয়ে গিয়ে কোন এক দূরদেশের নতুন বাসায় তুলবে, সেই সব আনন্দের ছবি। চারুবালাকেও নিয়ে যাবে। কিছু জমি-জিরেত করে দেবে বোনের নামে—কারও প্রত্যাশী হয়ে যাতে না থাকতে হয়। ওই নাবাল অঞ্চলে জমিজায়গা প্রচুর, সেলামিও যৎসামান্য। কত এমনি ভাল ভাল কথা নিয়ে নাচিয়ে তুলত। আর ইদানীং 'ভাল আছি' এই খবরটুকু জানাতেও আলস্য। ভুলে গেছে একেবারে। ভাবতে ভাবতে বিনোদিনীর বড্ড খারাপ লাগে, পেঁটরার তলায় সেরে-রাখা গগনের পুরানো চিঠি বের করে দেখে সেই সময়।

বিনোদিনীর বাপ নেই, ভাইরা সব আছে। অবস্থা বেশ ভাল। ভুঁইক্ষেত আছে, আর রাখি-মালের কারবার। ভাইগুলো অসুরের

মতন খাটে—দিনের আলোর কণিকা থাকতে জিরান নেই, ঘোর হবে তবে বাড়ি ফেরে! তখন আর নড়ে বেড়ানো দূরের কথা—বসে থাকতেও মন চায় না, টান-টান হয়ে গড়িয়ে পড়ে। মেজ ভাই নগেনশশী হল খোঁড়া মানুষ, সে খাটনির কাজ পেরে ওঠে না। দেহের খুঁত ঈশ্বর কিন্তু আর এক দিক দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন—বুদ্ধির হাঁড়ি মাথাটা। বিষয়সম্পত্তি সে-ই দেখে। গ্রামের দশ রকম সমস্যায় নগেনকে সবাইকে ডাকে। জ্যেষ্ঠ রাজেনশশী বর্তমান থাকতেও নগেন কর্তা। ভালমানুষ রাজেন হেসে হেসে ভাইয়ের তারিফ করেঃ আর কিছু পারবে না তো করে বেড়াক মাতব্বরি। সেই জন্যে ছেড়ে রেখেছি। একটা মানুষকে দায়ে-বেদায়ে দশজনা ডাকছে, তাতে বাড়ির ইজ্জত।

নগেনশশী গগনের বাড়ি এসে প্রায়ই খোঁজখবর নেয়। কিছু ধানজমি আছে গগনের, গুলো-বন্দোবস্ত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষেতের ফলন যা-ই হোক, এই পরিমাণ ধান দিতে হবে বছর বছর। বেশী ফলন হলে বেশী চাই নে, কম হলেও নাকে কাঁদতে পারবে না এসে তখন। নগেন থেকে এই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে মধ্যবর্তী না হলে এত দূর হত না। এবং এখনো সে নিশ্চিন্ত নয়। কলিকালের মানুষ—লেখাজোখা যা-ই থাক, ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়ে না। বিশেষত অপর পক্ষে যখন অবলা দুই স্ত্রীলোক। ধমকধামক দেয় সে চাষীদের ডেকেঃ যেটা ভাবছ তা নয়। শুধু মেয়েলোক নয়, সর্বক্ষণ আমি রয়েছি পিছনে। সমস্ত জানি। ওদের কেন বলতে হবে, নিজে আমি দেখতে পাই। পিছনে পিঠের উপর ফতুয়ার নীচে বাড়তি একটা চোখ রয়েছে আমার। ছোট পালিতে ধান মেপে দিয়েছ তুমি ধনঞ্জয়, আর চিটে মিশিয়েছ। হ্যাঁ, পিঠের চোখে আমি সমস্ত দেখেছি।

লোকগুলো অবাক! জানল কি করে নগেনশশী, সে তো ছিল না সেই জায়গায়। মাপামাপি করে নিজেরা আউড়িতে তুলে দিয়ে এসেছে। বাড়ির লোকে রা কাড়ে নি, তারা কিছু সন্দেহ করে নি।

গুণজ্ঞান জানে নিশ্চয় এই নগেনশশী লোকটা, মুখে তাকিয়ে সমস্ত কেমন পড়ে ফেলতে পারে

নগেন বলে, আট পালি ধান মাপে কম দিয়েছ শ্রীমন্ত। দিনে ডাকাতি। জমিজমা খাস হয়ে যাবে কিন্তু, অন্য মানুষকে দিয়ে দেব। সেটা বুঝো।

গগনের বাড়ি জলচৌকি চেপে বসে হাসতে হাসতে নগেনশশী জাঁক করে। গল্প করে, আর কপকপ করে পান চিবোয়। একদিন অমনি পান খাচ্ছে: কে পান সেজেছে ?

চারু রান্নাঘর থেকে বলে, বউদি চান করতে গেছে। একশ গণ্ডা লোক নেই, সে আপনি জানেন। সময় বুঝে আসেন এবাড়ি। এত বুদ্ধি রাখেন, আর কে পান সাজল সেটা কি জিজ্ঞাসা করে বুঝতে হবে ?

চুনে যে গাল পুড়ে গেল—

গালের ভিতর দিকে পুড়েছে। সেটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। বাইরে পুড়তেই লজ্জা। লজ্জায় মুখ দেখানো যায় না।

শুনে নগেনশশী হা-হা করে হাসে। বলে, বলেছ ভাল। ভিতরে পুড়েছে। পুড়ছে অনেক দূর গিয়ে।

যা-ই ভেবে বলুক, চারু তা বুঝেও বোঝে না। জবাবে সে ভিন্ন দিক দিয়ে যায়: সেটা বুঝি। সেবারে সেই যে গরলগাছি গিয়ে জ্বালা নিয়ে এলেন, গরল শীতল হল না এতকালের ভিতর !

বাঁধুনি দিয়ে বলে এমনি চারু। কথার সুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে। নগেনের শ্বশুরবাড়ি গরলগাছি গাঁয়ে। বউ আনতে গিয়ে মুখ কালো করে ফিরে এল। বউ বলে, খোঁড়া বরের ঘর করব না। ভিতরে অন্য কোন ব্যাপার আছে, কে বলতে পারে ? আছে কিছু নিশ্চয়। যুবতী বউ বরের ঘর করে না—পাড়াগাঁয়ে নানান কথা বৌয়ের সম্বন্ধে।

চারু বলে, সে গরল আজও শীতল হল না। জ্বলুনিতে ছটফটিয়ে বেড়ান, পায়ের অবস্থা তখন মনে থাকে না।

নগেনশশী চোখ পাকিয়ে বলে, তুমি আমার পায়ের খোঁটা দিচ্ছ ?

এত ঘন ঘন কেন আসেন আমাদের বাড়ি ? খোঁড়া পায়ে কষ্ট হয়, সেই জন্য বলছিলাম।

বিনি হল মায়ের পেটের বোন—মন বোঝে না, তাই আসতে হয়। গগন হতভাগা খোঁজ নেয় না, আমরাও নেব না—একেবারে তবে ভেসে যাবে নাকি ?

এর পর আর জবাব আসে না। খুটখাট শব্দে চারু রান্নাঘরের কাজ করে যাচ্ছে।

নগেন গজর-গজর করে: খোঁড়া-খোঁড়া একটা রব তোলা হয়েছে। খোঁড়া মানে কি—বাঁ পাখানা একটু টেনে টেনে হাঁটি। সান্নিপাত বিকার হয়ে পায়ের শিরায় টান পড়ে গেল।

চারু হেসে ওঠে: আমি তো শুনেছি, কার পাছ-দুয়ারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ঢিল মেরে পা খোঁড়া করে দিল।

শুনবে বই কি ! হয়তো বা চোখেই দেখেছিলে। একটু দরদ থাকলে এ রকম ঠাট্টা মুখ দিয়ে বেরুত না।

চারু কণ্ঠস্বর মৃদু করে বলে, কী জানি, লোকে তো বলে তাই। কিন্তু যা হবার হয়েছে, একটা পা ঠিক আছে এখনো। সেটা নিয়ে সামাল হয়ে চলবেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরঘুর করে বেড়াবেন না। আবার একটা বিয়ে করে ফেলুন।

বিনোদিনী এসে কাঁখের কলসী রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাল। নগেনশশী দাওয়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, তোদের এখানে আর আমি আসব না বিনি। তোর ননদ যাচ্ছেতাই করে বলে। খোঁচা দেয়।

চারু বলে, বিয়ে করতে বলছি মেজদাকে।

বিনোদিনী বলে, তাতে কি অসাধ কারো ? কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু সেই দজ্জাল মাগী হতে দেবে না। গরলগাছি থেকে শাসানি দিল মেয়েওয়ালার বাড়ি: দিক না বিয়ে, ঝেঁটিয়ে নতুন

বউয়ের মুখ থ্যাবড়া করে দিয়ে আসব। সেই সব শুনে মেয়ের বাপ পিছিয়ে যায়।

ফিক করে হেসে চারু বলে, আমায় বিয়ে করুন না মেজদা। ঝাঁটাতে আসে যেন তখন। আমিও জানি ঝাঁটা ধরতে। কে হারে কে জেতে, দেখা যাবে।

স্তম্ভিত হয়ে যায় বিনোদিনী। বিধবা মেয়ে—মুখে আটকায় না কোন কথা!

ওরে হতচ্ছাড়ী, বিয়ের সাধ হয়েছে তোমার?

চারু আবার হেসে বলে, ঠাট্টা-বটকেরা। সত্যি কী আর বলেছি?

হাসছে, তবু কণ্ঠ কেমন ছলছল করে ওঠে। বলে, ঠাট্টার সম্পর্ক যে বউদি। কপাল পুড়েছে বলে একটা ঠাট্টার কথা বলতে দেবে না?

নগেনশশী চারুর পক্ষ নেয়ঃ বকিস কেন বিনি? ঠাট্টা বই আর কি! সত্যি হলেই বা অবাক হবার কি আছে? ঘর-সংসারের সাধ কাঁচা বয়সে কার হয় না শুনি?

বকুনি দিয়ে বিনিরও হয়তো মনে মনে দুঃখঃ পোড়াকপাল করে এসেছে যে! অমন খাসা নন্দাই আমার, ঘরবাড়ি জায়গা-জমি—অভাবটা কী ছিল। কী জন্যে আজ এমনভাবে পড়ে থাকতে হবে!

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছে নগেনশশী। চারুর দিকে আড়ে আড়ে তাকায়। মেয়ে বটে! এত কটুকাটব্য বলে পরক্ষণেই আবার বিয়ের কথা বলে তার সঙ্গে। ঠাট্টা হোক যা-ই হোক, বলল তো মুখ ফুটে! একটা জবাব না দিয়ে চলে যেতে পারে না। বলে, হচ্ছে না বুঝি এ রকম বিয়ে? কিন্তু আমাদের পোড়া জাতে হবার জো নেই। ধোপা-নাপিত বন্ধ হবে, সমাজে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাবে না। সমাজ না থাকত, তা হলে কিসের পরোয়া?

ষোল

মোহানার ধারে গগনের চালাঘর উঠে গেল। একরকম নিখরচায়। টাকা কয়েকের বাঁশ কিনে জলে ভাসিয়ে আনা হল পূবের ডাঙা অঞ্চল থেকে। এর উপরে আজে-বাজে খরচা দু-চার টাকা। মাছের খাতা আরও জমেছে, মানুষজনের যাতায়াত বেড়েছে খুব। রাত্রিবেলা কাজের মানুষ আর দিনমানের আড্ডা জমাবার মানুষ। বৃষ্টি হলে ছোট ঘরে জায়গা হয় না। জায়গা হলেও খুব যে বেশী লাভ তা নয়। বাইরের বৃষ্টি থেমে গেলেও ফুটো চালে টপ-টপ করে জল ঝরতে থাকে। সামনে ফের শীতকাল। রাত্রের কাজকর্ম এই-টুকু ঘরের মধ্যে অসম্ভব। তখনকার উপায় কি? ব্যাপারী ও মাছ-মারারা সমস্যার কথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। গতিক বুঝে গগন একেবারে চেপে গিয়েছে। কানেই যায় না যেন ওদের কথাবার্তা, কোন রকম উচ্চবাচ্য নেই।

জগা-বলাইর মুখ থেকে বড়দা ডাক চালু হয়ে গেছে। রাধেশ্যাম একদিন স্পষ্টাস্পষ্টি কথাটা তুলল: রুয়ো চেঁচে অর্ধেক সাজপত্তোর বানিয়ে অমনধারা ফেলে রাখলে বড়দা, আর কিছু হবে না?

খাতা লিখতে লিখতে গগন সংক্ষেপে বলে, হবে।

বর্ষা চলে গেল, খরার সময় এইবার। সাজপত্তোর শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে যাবে। উনুনে দিতে হবে, ঘরের কোন কাজে আসবে না কিন্তু।

গগন পাকা-হিসাবটা সতর্ক ভাবে এখন পাতড়া-খাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে, টোকার সময় ভুলচুক হয়েছে কিনা। কেনাবেচার ভিড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি পাতড়ায় টুকে রাখে, দিনমানে ধীরেসুস্থে পাকা-খাতায় তুলতে হয়। দায়িত্বের কাজ, দশের সঙ্গে দেনাপাওনার ব্যাপার, হেরফের হলে ঝামেলায় পড়বে। অধিক বাক্যব্যয়ের

ফুরসত কোথা এখন? তবু যা হোক একটু বিশদ করে গগন জবাব দিল, উনুনে দিতে হবে না, ঘরেই লাগাব।

হর ঘড়ুই একজন ব্যাপারী। গাঙপারে বরাপোতায় ঘর, হামেশাই পারাপার হওয়া মুশকিল। রাত্রিবেলা তো নয়ই। সন্ধ্যা-রাত্রেই তাই পার হয়ে এসে ফাঁকা চরের উপর বসে থাকতে হয়। ঘরের গরজ তারই সকলের চেয়ে বেশী। হর বলে, তুমি সাজসরঞ্জাম দিয়েছ, আমরা গায়ে গতরে খেটে দিই। বল তো আজ থেকেই কোমর বেঁধে লেগে যাই বড়দা।

রাধেশ্যাম মাছ মেরে খাতায় তুলে দিয়েই খালে নেমে যায়। মুখ-আঁধারি থাকতেই চান করে আসে। শৌখিন মানুষ। রাত্রে যে-মূর্তিতে জাল হাতে ঘেরি থেকে ওঠে, দিনের বেলা কাউকে তা দেখতে দেবে না। বউকেও না। সাঁইতলার পাড়ার ভিতরে বাড়ি। জাল নিয়ে বাঁধের পথে টিপিটিপি বেরুবার সময় একটা পুঁটুলি খাতার চালাঘরে ছুঁড়ে দিয়ে যায়। ফিরে এসে মাছ নামিয়ে রেখে পুঁটুলি নিয়ে খালধারে ছোটে। চান করে বাঁধের উপর উঠে পুঁটলি খুলে চওড়া-পাড় ধুতি পরে গেঞ্জি গায়ে দেয়। সভ্যভব্য হয়ে মাথার চুল চিরুনি দিয়ে ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে দু'ভাগ করে এলবার্ট-টেড়ি কাটতে কাটতে ফেরে। হর ঘড়ুয়ের তার কথা কানে গেল: চালাঘরটা উঠে যাক এবারে বড়দা। সকলে মিলে লেগে পড়ে তুলে দিই।

রাধেশ্যাম পরমোৎসাহে হাঁ-হাঁ করে ওঠে: তাই। ঘর শুধু বড়দারই হবে না, একা বড়দা সবখানি জায়গা জুড়ে থাকবে না। আমিও চৌপহর থাকব। জায়গা পেলে কে যাবে বাড়িতে মাগীর ক্যারক্যারানি শুনতে? এস, লেগে যাই। দশ জনের বিশখানা হাতে লাগলে কতক্ষণ?

গগনের ভারী মনোমত কথা। খাতা থেকে মুখ তুলে হাসি-হাসি মুখ চতুর্দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, বেশ তো!

হাত বিশখানা কেন, কোন কোন দিন একসঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ অবধি খাটছে। দেখতে দেখতে ঘর খাড়া হয়ে উঠল। বন ছাড়িয়ে

মাথা উঁচু হল ঘরের। গাঙের ছু-বাঁক আগে থেকে দেখা যায়। চৌধুরিগঞ্জের জলের উপর সালতিতে ভাসতে ভাসতেও সুস্পষ্ট নজরে আসে। বনের মধ্যে দেখা যায় ঐ ঘর—সাঁইতলার নতুন-আলা খাতা ও নতুন ঘেরি। চৌরিঘর, গোলপাতার ছাউনি—স্ফুর্তির চোটে একদিন জগা ধানকর-অঞ্চল থেকে এ-বছরের নতুন খড় কিনে ডিঙি বোঝাই করে আনল। খড়ে ঘরের মটকা মেরে দিল। কাঁচা রোদ পড়ে চিকচিক করে, ঘরের মটকা যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো।

এসব হল উপরের কাজ, দূর থেকে দেখা যায়। কাছে এসে দেখতে হয়—চরের জমির উপর পাহাড় বানিয়ে তুলেছে মরদেরা মাটি তুলে তুলে। বর্ষা যতই হোক—এমন কি ঘেরির বাঁধ ভেঙে বানের জল ঢুকে পড়লেও এই ভিটে ছাপিয়ে যাবে না। আস্ত আস্ত কাঠ পুঁতে একটা বেড়া দিয়ে দিয়েছে বন ও ঝোপঝাপের দিকটায়। গাঙ পাড়ি দিয়ে বাদাবনের বড় জানোয়ার না-ই আসুক, পিছনের ছিটে-জঙ্গলের মধ্যে কিছু থাকতে পারে তো!

বেড়া দেওয়ায় জগার ঘোরতর আপত্তি: আরে দূর, বড়দা যেন কী! ঘরের মধ্যে আমাদের সার্কাসের জন্তু বলে মনে হবে। কী জন্তু আছে এপারে—বনবিড়াল কি-বুনো শূয়োর। কিংবা বড় জোর গোবাঘা। তা আমরা কিছু কম নাকি তাদের চেয়ে? অত ভয় কিসের?

গগন তার উত্তরে একটা উচ্চাঙ্গের রসিকতা করে। লেখাপড়ার এই মজা—পেটে থাকলে ঝাঁঝ বেরুবেই সময়ে অসময়ে। বলে, বুঝিস নে জগা, জন্তুরাই লজ্জা পাবে মানুষ-জন্তুর কাণ্ডকারখানা দেখে। বেড়া দিয়ে তাই একটু অন্দর বানিয়ে নিচ্ছি।

মাছের খাতা নতুন-আলায় উঠে গেল, গগনের বসতঘরও সেখানে। জগা আর বলাই পুরানো চালাঘর দখল করে আছে। দিনমানের খাওয়া কুমিরমারিতে—গদাধর হোটেলের ভাত কিংবা চিঁড়ে-মুড়ির ফলার। রাত্রে চালাঘরের মধ্যে চাট্টি চাল ফুটিয়ে

খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে। ভোররাত্রে উঠে আবার গিয়ে মাছের নৌকোয় বসতে হয়।

চালাঘরের উপর চাল রয়েছে, কিন্তু ছাউনি তেমন কিছু নেই। শোওয়ার পরে মনে পড়ে সে কথা, শুয়ে শুয়ে দিব্যি আকাশ দেখা যায়।

বলাই বলে, জগা, বনে চল একদিন। চাট্টি গোলপাতা কেটে আনা যাক।

জগা বলে, যাব। পচাও বলছিল। চাক কেটে কলসিখানেক মধু নিয়ে আসব। চাকের মরশুম এটা।

শীতের শেষ। ফুল ফুটেছে চারিদিকে। ফুলে ফুলে আলো হয়ে আছে বনের এখানে ওখানে, মৌমাছি উড়ছে। কিন্তু মরশুম শেষ হয়ে আসে। কত মউল মধুর কলস ভরে বড় গাঙ বেয়ে চলে গেল। এদের যাওয়ার উদ্যোগ হয় না, ফুরসতও নেই।

এক রাতে খুব বৃষ্টি। যা গতিক, চালের আচ্ছাদনে না থেকে কোন গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালে বৃষ্টি কম লাগত।

বলাই বলে, কতদিন থেকে বনে যাবার কথা বলছি, তুই তা কানে দিস নে।

জগা মুখ খিঁচিয়ে বলে, এই যে ঘোড়ার ডিমের চাকরি—কুমির-মারি মাছ পৌঁছে দিতে হয়। চুলোয় যাক গে, কামাই করব কটা দিন।

সে কথা শুনে গগন রাগারাগি করেঃ বল কি, মাছ পচে গোবর হবে, অত ক্ষতিলোকসান করবে তোমরা? উঠতি খাতার বদনাম হয়ে যাবে, ব্যাপারী সব ভেগে পড়বে। তোমরা মতলব দিলে, সাহস দিলে, তবেই কাজে নেমেছি। যা বলেছ বলেছ, বারদিগর মুখে আনবে না অমন কথা। গোলপাতার গরজ, সে আর কঠিন কি! কুমিরমারি থেকে ফিরে এসেও দু-পণ দশপণ করে কেটে আনা যায়। না হয় কাউকে দিয়ে আমি কাটিয়ে এনে দেব।

বলছে কি শোন। অন্য মানুষ দিয়ে করাবে এই ছোট্ট একটু-খানি কাজ। বনে যাওয়াতেই মজা। বন আর এই নতুন বসত—একটা খাল আছে শুধু মাঝখানে। বন এদের ভাণ্ডার। রান্নার শুকনো কাঠ চাই—বনে গিয়ে মটমট করে ভেঙে আন। মাংস খাবার ইচ্ছে হল তো হাতে দেশী গাদা-বন্দুক, থলিতে বারুদ আর জ্বালের কাঠি নিয়ে ঢুকে পড় বনের ভিতর। কামারে লোহা পিটিয়ে তোফা বন্দুক বানিয়ে দেয়, বন্দুক এ তল্লাটে অনেকের ঘরে। পাশ-লাইসেন্স করতে বয়ে গেছে, এমনি রেখে দেয়।

মধুর সংগ্রহ আপাতত হচ্ছে না, চাক খুঁজে খুঁজে বনের মধ্যে অনেক দূর অবধি গিয়ে পড়তে হয়। কুমিরমারি থেকে ফিরে এসে রাতবিরেতে সে কাজটা হয় না। মরা গোনে একদিন জগা আর বলাই খানিকটা জল ভেঙে পায়ে হেঁটে আর খানিকটা সাঁতার কেটে ওপারের গোলঝাড়ে ঢুকে গোলপাতা কেটে রেখে এল। শুখোক পড়ে পড়ে, তার পরে একদিন নিয়ে আসা যাবে।

শুধু এই এক চালাঘর নয়, পাড়ার চেহারাটাই ফিরে গেছে। পোড়ো ঘর একটা নেই। নতুন ঘরও বাঁধছে ভিন্ন তল্লাট থেকে মানুষ এসে। মা-রক্ষাকালীর দয়া দেখা যাচ্ছে আশার অতীত। কাজের মানুষ বেড়েছে, অকাজের মানুষও আসছে ঢের। তামাকের খরচা হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে, কুমিরমারির হাটে হাটে তামাক কিনে আনে। এ ছাড়া অল্পসল্প বড়-তামাকেরও ব্যাপার আছে, তার জন্য ফুলতলা অবধি যেতে হয়। আগেও লোকে মেছোঘেরিতে জাল ফেলত চুরিচামারি করে। অল্প জলে অগুন্তি মাছ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, চোখের উপর দেখে কোন মানুষ স্থির থাকতে পারে! দু-এক খেওনেই যে মাছ উঠত, তাতে নিজেদের খাওয়া হত, আর অক্ষম পড়শীদের দান করে দিত বাকিটা। গগনের এসে চেপে পড়ার পরে মাছ মারা রীতিমত ব্যবসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাদের জাল ছিল না, জাল কিনে নিয়েছে। জাল ফেলতে জানত না, তারা শিখে নিয়েছে ইতিমধ্যে। শুধু কাঙালি চক্কোত্তির পাঁচটা ঘেরি

নয়, এ অঞ্চলের যাবতীয় ঘেরির লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাতের পর রাত এই মজা চলছে জলার উপরে। কাঁহাতক পেরে ওঠা যায়! রাত দুপুরের ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যে সালতি বাইতে বাইতে অথবা পায়ে হেঁটে হাঙরের দাঁতের মত তীক্ষ্ণ হিমেল জল ভাঙতে ভাঙতে আঙুল মটকে গালি দেয় গগন ও তার দলবলকে: কাঠি-ঘা হয় যেন হে মা বনবিবি! বাঘে যেন ওদের মুখে করে নিয়ে যায়। ডাকাতের দল গিয়ে যেন পড়ে ওদের ঐ নতুন বানানো আলায়।

চুপিসাড়ে একটা কথা চলছে ঘেরিওয়ালাদের মধ্যে: দিনকে দিন অবস্থা সঙ্গিন করে তুলল—যে রকম ব্যাপার, সকল ঘেরির সব মাছই তো তুলে নিয়ে চালান করে আসবে। সাপ বাঘ কিংবা ডাকাতের কবে সুমতি হবে, ঠিকঠিকানা নেই। দৈব ভরসায় না থেকে নিজেদের লোকজন পাঠিয়ে ঐ বাবুয়ের বাসা ভেঙে আগুন দিয়ে এলে কেমন হয়? সমস্ত ঘেরির সায় আছে, আপদবালাই উৎসন্ন হয়ে যাক এ তল্লাট থেকে।

এবারে এসে চেপে পড়ার পরেও গগন চৌধুরিগঞ্জের আলায় দু-একবার বেড়াতে গিয়েছে। সেই পয়লা দিনের মত না হলেও খাতির-যত্ন করত গোড়ার দিকে, পান-তামাক খাওয়াত। যত দিন যাচ্ছে, ভাল করে যেন কথাই কইতে চায় না চৌধুরির আলার মানুষ। গগনই বা কম যায় কিসে—যাতায়াত বন্ধ করে দিল।

হঠাৎ এক দিন অনিরুদ্ধ আর কালোসোনা পান চিবাতে চিবাতে এসে উপস্থিত। বিকালবেলা লোকজন বেশী থাকে না এ সময়টা। যারা আছে, তাজ্জব হয়ে গেল। নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন নয়, চৌধুরি-গঞ্জের মানুষ উপযাচক হয়ে চলে এসেছে। মতলবখানা কি—উৎকর্ণ হয়ে আছে সকলে।

কেমন আছ বড়দা? আগে তবু যেতে অবরেসবরে। সম্পর্ক ছেদন করে দিলে।

বেড়া ঘেঁষে মাচা বেঁধে নিয়েছে। হাতবাক্স ও খাতাপত্র নিয়ে

গগন তার উপরে বসে। বাক্স-খাতা এক পাশে সরিয়ে শোয়ও রাত্রিবেলা গুটিসুটি হয়ে। গগন খাতির করে অনিরুদ্ধকে মাচার উপর নিজের পাশে বসাল।

দুঃখিত স্বরে অনিরুদ্ধ বলে, বিদেশী মানুষ কটি একখানে আছি। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল, তাই আজকে চলে এলাম।

গগন বলে, সময় পাই নে কাজের চাপে।

তাই তো শুনতে পাই। সবাই সেই কথা বলে—রৈ-রৈ করে চলছে কাজকর্ম।

গগন হেসে বিনয় করে বলে, লোকে ভালবাসে। আমাদের ভাল চায়, বেশী করে তাই বলে বেড়ায়। পরের সম্পত্তি আর নিজের বুদ্ধি কেউ তো কম দেখে না। তোমার কাছে বলতে কি, চলে যাচ্ছে টায়েটোয়ে। তবে আশায় রয়েছি। আশার পিছনে জগৎ ঘোরে। ঘরবাড়ি মানুষ-মানষেলা ছেড়ে বাদাবনের নোনা জল খাচ্ছি, একদিন হয়তো ভাল হবে। কুমিরমারির রাস্তাটা হয়ে গেলে লরী চলবে, ফুলতলা অবধি মাল পৌঁছানোর ভাবনা থাকবে না। দরও পাওয়া যাবে। অনেক লোক ঝুঁকবে তখন মাছের কাজে।

ঘাড় নেড়ে অনিরুদ্ধ তারিফ করে : টায়েটোয়ে চলে যাচ্ছে, কী বল বড়দা! খুব ভালই তো চলছে। আরও কত ভাল চলবে এর পর।

তাকিয়ে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ গগনের মুখের চেকনাই দেখে। ভাল ঠেকে না। এখনই এই। রাস্তা হয়ে গিয়ে বেশী লোক মাছের কাজে ঝুঁকবার পর বেশী বেশী মাছ আমদানি হবে মাছের খাতায়। নাদুসনুদুস ভুঁড়ি দেখা দেবে তখন গগনের, তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকবে মাচার উপর, মাচা ছেড়ে ভুঁয়ের উপর নামবে না। সেই ভবিষ্যৎ সুদিনের কথা স্মরণ করে অনিরুদ্ধর প্রাণে জল থাকে না। ঘেরির সমস্ত মাছই তো তুলে নিয়ে আসবে গগনের দলবল। আলা সাজিয়ে বসে অনিরুদ্ধরা তবে কি করবে? আর সাঁইতলার

এই নতুন-ঘেরি বেঁধে গগন আচ্ছা এক কায়দা করে রেখেছে। শেষ-রাত্রে কেনাবেচার সময় হাতেনাতে এসে যদি ধর, এমন কি অনুকূল বাবু দারোগা-পুলিস নিয়ে এসে পড়েন, বলে দেবে আমাদের নিজস্ব ঘেরির মাছ। বলবে, গাঙ-খাল থেকে যা ধরে আনে সেই মাছ যোগ হয়েছে নতুন-ঘেরির মাছের সঙ্গে। মাছের গায়ে তো লেখা থাকে না, কোন্ ঘেরি থেকে কটা তুলেছে। কি করবে কর তখন ঐ কৈফিয়তের পর।

মনের মধ্যে এই সব তোলাপাড়া করছে। গগনের খাতির করে দেওয়া পান চিবাতে চিবাতে তবু একমুখ হেসে বলতে হয়, বড়দা, মনে পড়ে সেই বলেছিলাম, চলে এস, বাদাবনে কারো অচল হয় না। কথাটা খাটল কিনা দেখ।

গগন গদগদ হয়ে বলে, ভাল মনে কথাটা বলেছিলে—ভালই করেছি তোমার কথা শুনে।

তার পর যে জন্যে এসেছে তারা। হাসুক আর ভদ্রতা করে যাই বলুক, মনের মধ্যে রি-রি করে জ্বলছে। কাল রাত্রের ঘটনা। বলে, এক কাণ্ড হল বড়দা। শয়তান কতকগুলো মানুষ কাল বিষম নাজেহাল করেছে। মাছের নৌকো রওনা হয়ে গেছে, পাহারায় বেরিয়ে গেছে আর সবাই। তিনজন মাত্র আছি আমরা আলায়। আমি আছি, কালোসোনা আছে, আর আছে কানা-ন্যাপলা—মুখের আধখানা নেই, সেই লোকটা। দু'জনে শুয়ে পড়েছি, ন্যাপলা তামাক টানছে বটগাছতলায় বসে বসে। সেই কুমিরে ধরার পর থেকে ন্যাপলার ঘুমটুম হয় না, তামাক খায় বসে বসে। সে এসে আমার গা ঝাঁকায়ঃ উঠে এস। মাছ-মারাদের কী সাহস বেড়েছে, সাঁকোর মুখে আলো নিয়ে এসে মাছ ধরছে ঐ দেখ। সত্যি সত্যি দেখতে পেলাম বড়দা, আলো জ্বলছে। যা গতিক এগুতে এগুতে তবে তো একেবারে আলার ঘাড়ের উপরে এসে পড়েছে। ন্যাপলা নিল সড়কি; আমি আর কালো লাঠি। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি—মোটামোটা সলতে-জ্বালা মাটির পিদ্‌দিম, ডেলা

সাজিয়ে পিদ্‌দিম বেশ জুত করে রেখেছে। তাই বললাম ন্যাপলাকে, বুদ্ধি বটে তোর! আলো জ্বেলে কেউ কখনো মাছ চুরি করতে আসে? কনকনে শীতে তুই আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে এলি, কোন্ দিকে দাঁড়িয়ে ওরা মজা দেখছে। ফিরে এসে বুঝলাম, মজা দেখা নয়— বেকুব বানিয়ে কাজ গুছিয়ে গেছে তারা। আমরা সাঁকোর মুখে গিয়েছি, আলার খাসপুকুরে সেই ফাঁকে তারা জাল ফেলেছে।

গগন ফিকফিক করে হাসছিল। হেসে হেসে বলে, আন্দাজি ও-রকম বলা ঠিক হচ্ছে না ম্যানেজার। চোখে যখন কিছু দেখ নি।

কালোসোনা বলে, আমি দেখেছি। জাল নিয়ে দু-জন ছুটে বাঁধের এপাশে তোমাদের এলাকায় চলে এল। স্পষ্ট দেখলাম আমি। বাঁধে উঠলে তখন আর কী করা যায়! মাছ গিজগিজ করছে পুকুরে, তিন বছরের জিয়ানো ভারী ভারী মাছ। কত মাছ তুলেছে ঠিকঠিকানা নেই। ছোটবাবুর মেয়ের অন্নপ্রাশনে বড় মাছ পাঠাতে হবে, সে জন্যে পুকুরের পালা তুলে ফেলা হয়েছিল আজকে। বেটারা সকল খবর রাখে।

অনিরুদ্ধ বলে, কোন দিন আমি আলা ছেড়ে নড়ি নে। কাল কেমন মেজাজ চড়ে গেল। কাঁচা ঘুম ভেঙে আমি সুদ্ধ বেরিয়ে পড়লাম।

হর ঘড়ুইর আজ কেনা-বেচা খারাপ। ডাকে হেরে গেছে, বেশী দর দিয়ে অন্য ব্যাপারী মাছ কিনে রওনা করে দিয়েছে। মনে দুঃখ তাই। বলে, শুনলে বড়দা? ঐ বড় ভেটকি দুটো, বেটারা বলে, গাঙ থেকে ধরেছে। গাঙের সোঁতায় দু-বছর তিন-বছর ধরে অত বড় হল, কোনদিন কারো জালে পড়ল না! এ কী একটা বিশ্বাস হবার কথা? ভেটকি কোথায় ধরেছে বোঝ এইবারে।

কালোসোনা ফস করে প্রশ্ন করে, বেটাদের নাম বল দিকি, শুনে নিই। বাদাবনে এত ধড়িবাজ কারা?

হর ঘড়ুই কী আবার বলে বসে, গগন চোখ পাকিয়ে পড়ে তার দিকে। অনিরুদ্ধর নজর এড়ায় নি। কালোসোনাকে সে তাড়া

দিয়ে উঠল : তুই এক নম্বরের আহাম্মক। নাম বলতে যাবে কেন রে? ব্যাপার-বাণিজ্যের ভিতরের কথা কেউ বলে নাকি?

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে পান-তামাক খেয়ে অনিরুদ্ধ উঠল। গগন বলে, বাইরে যত শোন সেসব কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, আছি একেবারে খারাপ নয়। মানুষজন নিয়ে স্ফূর্তিফার্তির মধ্যে থাকা যাচ্ছে। সন্ধ্যার মুখে জগা-বলাই আর ব্যাপারীরা ফেরে। আরও সব এসে জোটে এদিক-ওদিক থেকে।

অনিরুদ্ধ হেসে বলে, আমরা সেটা আলা থেকেই মালুম পাই। গান আর ঢোলক-বাজনা—কী কাণ্ড রে বাবা! তবে একদিক দিয়ে ভাল হয়েছে, বাদার জন্তু আর গাঙ পার হতে ভরসা পাবে না। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সোয়াস্তি বড়দা।

গগন বলে, এত বলি, রাত না পোহাতেই তো লড়ালড়ি লেগে যাবে। চোখ বুজে দু-দণ্ড সব গড়িয়ে নে। তা নিজেরা ঘুমোবে না, আমাদেরও চোখের দু-পাতা এক করতে দেবে না। ঐ যে জগা ছোঁড়াটা দেখ, বিধাতা ওর চোখে এক লহমার ঘুম দেয় নি। বলাই বলে, কুমিরমারি যাবার পথে বোঠে বাইতে বাইতে মধ্যিগাঙে ঘুমিয়ে নেয়।

অনিরুদ্ধকে গগন নিমন্ত্রণ করে : চলে এস মাঝে মাঝে। বিকাল বেলা এই সময়টা ফাঁকা থাকে, এটা বাদ দিয়ে অন্য সময় এস। সন্ধ্যার পরে তোমাদের কাজ, তখন আসা চলে না। সকালের দিকে এস— তখনও মানুষ আসে, রাতের মানুষজনও থেকে যায় কিছু কিছু। জগারা থাকে না বলে গানবাজনা হতে পারে না। ফড়খেলা হবে, সকালবেলা এস তোমরা। নেমন্তন্ন রইল।

এলও একদিন অনিরুদ্ধ। ফড় খেলল। হরতন-রুইতন-ইস্কাপন-চিড়ে চার রঙের ছক আছে, তার উপরে পয়সা ধরতে হয়। আর এক চৌকো ঘুঁটি আছে ঐ চার রঙের ছাপ-মারা ; কৌটার মধ্যে সেটা নেড়েনেড়ে ছকের উপর চেপে ধরে। যে রঙটা উপরে পড়ল, জিত সেই রঙের। সেই রঙের ছকে যে পয়সা রেখেছে, তার

ডবল গণে দিতে হবে ; বাকি ঘরগুলোর পয়সা বাজেয়াপ্ত। এই হল মোটামুটি ফড়খেলা। পয়লা দিনই অনিরুদ্ধ পাঁচ আনা পয়সা জিতে গেল।

খেলা রাতের মানুষদের সঙ্গে—রাত থেকেই যারা আলায় পড়ে রয়েছে। রাতের মানুষ অর্থাৎ চোর, চুরি করে ঘেরিতে মাছ ধরে বেড়ায়। তবু কিন্তু চোর বলা চলবে না বাদা অঞ্চলের নিয়মে। ঘেরিদারদের পোষ্য এরা, দায়েবেদায়ে কাজে লাগে। শীতকালে বাঁধে নতুনমাটি দেবার সময় অনেক মানুষের দরকার। বর্ষার জলের চাপে বাঁধের নীচে ঘোগ হয়, জল চুইয়ে এদিক থেকে এসে ওদিকে বেরিয়ে যায়, অবহেলা করলে তলার মাটি ধুয়ে বাঁধ ধ্বসে পড়ে একদিন। মাটি মেলে না, তখন ডাকতে হয় এই সব মানুষ। নৌকো নিয়ে দূর-দূরন্তরের মাটি কেটে এনে ঘোগের মুখ আটকায়।

কিন্তু যখন মাটি-কাটার দরকার নেই, তখন কি করবে এরা? কি খাবে? আলার কাজকর্মে নিয়ে নেয় কয়েকটাকে। কিন্তু সে আর ক'জন? বাকি সবাই বাদা অঞ্চল ছেড়ে চলে যাক, ঘেরির মালিকরা তা-ও চায় না। দরকারের সময় হাঁক দিলে তবে মানুষ মিলবে কোথা? অতএব ঝড়তি-পড়তি যা মেলে, তাই খেয়ে থাকুক ওরা। স্পষ্টস্পষ্টি চোখের উপরে নয়, অগোচরে রাতের কাজে পারে তো নিজেদের উপায় করে নিক। ঘেরির পাহারাদার তাড়া করে ঠিকই, তাহলেও প্রশ্রয়ের ভাব খানিকটা—শুধুমাত্র জালগাছি রেখে মানুষটাকে ছেড়ে দেওয়ার নিয়মে মালুম। কিন্তু আগে যা শুধুমাত্র পেটের খোরাকির ব্যাপার ছিল, গগনের দল এসে পড়ে এখন দস্তুরমত ব্যবসায়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দিনকে দিন রোজগার বেড়ে যাচ্ছে মানুষের, লোভও বাড়ছে। সে বাড় এতদূর হয়েছে, আলার পুকুরে গিয়ে জাল ফেলল। হয়তো এদেরই ভিতরের কেউ, হেসে হেসে ফড় খেলছে যাদের দলে। হয়তো কেন, নিশ্চয় তাই। বাইরের লোকের বুকের পাটা হবে না আলার খাসপুকুরে গিয়ে জাল নামাতে।

পাঁচ আনা নগদ পয়সা জিতে নিয়ে অনিরুদ্ধ পরের দিন আবার এসেছে। তার পরের দিনও। দুটো দিন কামাই দিয়ে তারও পরে একদিন। সেদিন বলল, ছোট মনিব জরুরী তলব দিয়েছে কি জন্যে। রাতের বেলা মাছের নৌকোয় ফুলতলা সদরে চলে যাচ্ছি, ফিরে এসে দেখা হবে।

চলে গেলে গগনেরা হাসাহাসি করে। ভাগ্যিস তলব পড়েছে— শহরের আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করে শোকটা সামলে আসবে কতক। পয়লা দিনের মুনাফা পাঁচ আনা খেয়ে গিয়ে গাঁট থেকে আরও দশ-বারো আনা বেরিয়ে গেছে এই ক'দিনে। শোক সামান্য নয়।

ঠিক পরের দিন—দিন কেন, রাতই বলতে হবে, জগার ডিঙি ঘাটে বাঁধা তখনো—পাড়ার মধ্যে কলরব উঠল, অন্নদাসী ছুটতে ছুটতে এসে উঠল আলায়। অকথ্য গালিগালাজ করছে চৌধুরি-গঞ্জের আলার দিকে তাকিয়ে, আঙুল মটকে মটকে গালি দিচ্ছে। মুখের বাক্যে রাগের শোধ হয় না তো গোড়ালি দিয়ে দুম দুম করে লাথি মারছে মাটিতে। ঘরের মেজে যেন অনিরুদ্ধর মুণ্ড, তার উপরে লাথি ঝাড়ছে। লাথির চোটে গর্ত হয়ে গেল জায়গাটা, মুণ্ড হলে শতচূর হয়ে ছিটকে পড়ত।

গগন বলে, ঠাণ্ডা হও বউ। ধীরেসুস্থে বল, কি হয়েছে। রাধেশ্যামকে দেখলাম না, জাল কেড়ে নিল বুঝি? তার নিজের আসতে হবে, জাল ছাড়িয়ে আনার পয়সা আমি তার হাতে দেব। মারফতি এ সমস্ত হয় না।

বউ বলে, সে এল না। আমায় পেঠিয়ে দিল। লাজে মুখ দেখাবে না, গায়ে হাত দিয়েছে তার।

যে কজন হাজির আছে, তিড়িং করে লাফিয়ে দাঁড়াল। জগা ছিল ডিঙিতে—কানে গিয়েছে কি এক ছুটে ডাঙার উপর। হেন অপমান কে কবে শুনেছে? গায়ে লেগেছে একলা রাধেশ্যামের নয়, গগনের

ঘেরিতে যত লোকের আসাযাওয়া, সকলের। জগা বলে, চল তো যাই। কত বড় ঘেরিওয়ালা হয়েছে, দেখে আসি।

চুরি করে মাছ মারা যদি অন্যায়ও হয়, তবু হাতে মারার বিধি নেই। ভাতে মারে জাল আটকে রেখে। দু-চার বার ধরা পড়ার পরে শাস্তিটা বেশী—পুরো একদিন জাল আটক রাখবে, জরিমানার পয়সা দেওয়া সত্ত্বেও। এক দিনের রোজগার মাটি। এই তো অনেক—এর বেশী অন্য কিছু নয়। অতএব রাধেশ্যামকে যদি মেরে থাকে, অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে।

গগন কিন্তু গণ্ডগোল চায় না। বলে, হুটকো লোকের কাণ্ড। রাধেশ্যামেরও বাড়াবাড়ি বটে—মোটা মাছ পেয়ে লোভ লেগেছে, আলার পুকুরে আবার জাল ফেলতে গেছে। অনিরুদ্ধ তলব পেয়ে ফুলতলা চলে গেল। সে থাকলে অবিশ্যি এত দূর হত না। আসুক ফিরে, আমি গিয়ে যা হোক একটা বিহিত করে আসব।

অন্নদাসী করকর করে ওঠে: মারল তো অনিরুদ্ধ নিজেই। কোন চুলোয় তলব হয় নি, মিথ্যে বলে তোমাদের ভাঁওতা দিয়েছিল।

বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। অনিরুদ্ধ এখানে বলে গেল সদরে ছোট বাবুর কাছে যাচ্ছে। শব্দ-সাড়া করে সে আর কালোসোনা উঠল গিয়ে মাছের নৌকোয়। এক বাঁক গিয়ে চুপিসাড়ে নেমে পড়েছে। পায়ে হেঁটে টিপিটিপি ফিরে এসেছে আলায়। কী করে নাম পেয়েছিল বোধ হয় রাধেশ্যামের। অথবা সন্দেহ করেছে। কানা ন্যাপলা ক'দিন খুব আনাগোনা করছে: ম্যানেজার থাকবে না। ওই ফাঁকে জাল নিয়ে পড় রাধেশ্যাম, খোঁজদারির অর্ধেক ভাগ কিন্তু আমার। ন্যাপলাটা ঐ রকম কানে মন্তর না দিলে রাধেশ্যাম কক্ষনো আর যেত না। চক্রান্ত করে ফাঁদে নিয়ে ফেলল।

গগন বলে, আচ্ছা এক্ষুনি যাচ্ছি আমি। আমি গিয়ে জাল খালাস করে আনি। জগা, নৌকো ছেড়ে এলে কেন গো? জল থমথমা হয়েছে, রওনা হবার যোগাড় দেখ।

জগা ঘাড় নাড়ে: বলাই আর পচা যাক আজকে। হর ঘড়ুই

কী দরকারে যাচ্ছে, সে-ও দু-টান বোঠে টেনে দেবে। বজ্জাত লোকের সঙ্গে একা পেরে উঠবে না বড়দা, আমি সঙ্গে থাকব।

এই মুশকিল! গিয়ে তো গরম গরম বুলি ছাড়বে, অমনি বেধে যাবে দস্তুরমত। গগন বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছে: মাথা গরম করো না জগা। খবরদার! যে সয় সে-ই রয়। ঘটনার শতেক গুণ হয়ে বাবুদের কাছে রটনা যাবে। ওরা ছুতো খুঁজছে। ছুতো পেলে আদালত অবধি গড়াতে পারে। আমাদের উঠতি ব্যবসায়ে চোট পড়বে, যা বলবার আমি বলব, তোমার মুখ বন্ধ। বুঝলে?

চৌধুরিগঞ্জের আলায় গিয়ে বলে, এটা কী হল অনিরুদ্ধ? বাদার দত্যিদানোগুলো বিষম তড়পাচ্ছে, আমি যে আর সামাল দিয়ে পারিনে। পাকা লোক হয়ে এ তুমি কী করলে?

অনিরুদ্ধ বিচলিত নয়। যথারীতি খাতির করে মাদুর পেতে দিল: বসো বড়দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। জগন্নাথ, বসে পড়। তামাক খাও।

কালোসোনা কলকে ধরিয়ে আনে। তামাক খেতে খেতে কথা চলছে। গগন বলে, মারধোর করতে গেলে কেন? যদ্দূর নিয়ম আছে, তার উপরে যাওয়া কি ঠিক?

অনিরুদ্ধ শান্তভাবে বলে, নিয়ম দু-পক্ষের বড়দা। নিয়মটা খাটবে ভেড়ির খোলে যখন ধরা পড়ে। ওরাই বলুক না, জাল কেড়ে নেওয়া শুধু নয়, আলায় সঙ্গে করে এনে তামাক খাইয়ে গল্পগাছা করে তবে ছেড়েছি। পরের দিন হাসতে হাসতে এসে জরিমানার সিকি জমা দিয়ে জাল নিয়ে গেছে। তা বলে আলার খাসপুকুরে আসে কোন্ বিবেচনায়? এটা হল গে বাড়ির পুকুর—এখানে জাল নামানো চোর-ছ্যাঁচোড়ের বৃত্তিতে দাঁড়িয়ে গেল। তার বেলায় আমাদের নিয়ম নয়, থানা-দারোগার আইন।

জগা বলে, থানা নেই কোন্ মুলুকে। এর পর থানার দারোগা এসে ভেড়ি ঠেকাবে? খোলসা করে বল, আগাগোড়া শুনে যাই।

জগা গরম হচ্ছে দেখে গগন তাড়াতাড়ি বলল, যাকগে, যাকগে। কথায় কথা বাড়ে। জরিমানার সিকিটা নিয়ে জাল দিয়ে দাও অনিরুদ্ধ। আমরা চলে যাই।

জগা গর্জন করে উঠল : জরিমানা কিসের? রাধেশ্যামের গায়ে হাত দিয়েছে, সেটা মুফতে যাবে? এই জন্যে তোমার সঙ্গে এসেছি বড়দা, তোমায় আগলাব বলে। ঘেরি বানিয়ে তুমিও আস্তে আস্তে মেছো-চক্কোত্তিদের মতন হয়ে যাচ্ছ। সোজা কথাটা বলে দাও। ওদেরও জরিমানা। জরিমানায় জরিমানায় কাটাকাটি; জাল নিয়ে চলে যাচ্ছি। বারদিগর এমন হলে কিন্তু এত সহজে ছাড়ান পাবে না।

জগার এত কথার একটাও যেন অনিরুদ্ধর কানে যায় নি। গগনের দিকে তাকিয়ে বলে, জাল দেওয়া হবে না। সিকি কেন, আধুলি ধরে দিলেও দিতে পারব না। এত বড় একটা কাণ্ড—ছোট-বাবুর কাছে খবর যাক, তাঁর কোন্ হুকুম হয় দেখি।

জগা বলে, হাত-পা কোলে করে তদ্দিন রাধেশ্যাম বসে থাকবে?

জগায় কথার জবাব দেয় না অনিরুদ্ধ। গগন বলে, জাল আটকে রাখলে রুজি-রোজগার বন্ধ। খাবে কি তা হলে?

খাবে না। কাজটা করেছে কী রকম! উপোস দেবে।

উকিল ভবসিন্ধুর বাড়ি গগন থেকে এসেছে। এবারে সে একটু বাঁকা পথ ধরে : জালই ধরেছ তোমরা। মানুষ ধরতে পার নি। আলার বাইরে এসে রাধেশ্যামকে ধরেছ।

অনিরুদ্ধ বলে, মানুষ কি জালের দড়ি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকবে ধরা দেবার জন্য? দড়ি ফেলে দিয়ে মানুষ পালাল।

গগন কড়া হয়ে বলে, রাধেশ্যামকে বে-আইনি ভাবে মারলে। জাল ফেলেছিল অন্য লোক।

অনিরুদ্ধ আমল দেয় না। বলে, রাধেশ্যাম না হল তো পূর্ণ ফেলেছে। পূর্ণ না হয় মুল্লুক মিঞা। মোটের উপর দল নিয়ে

কথা। দুটো দল হয়ে দাঁড়াল—একটা চৌধুরি তরফের, একটা নতুন-ঘেরির। নতুন-ঘেরির লোক অপকর্ম করেছে, নতুন-ঘেরির লোকের উপরে তার শোধ গিয়ে পড়ল।

গগন তাড়াতাড়ি জিভ কাটে: ছি ছি, কী রকম কথাবার্তা! পোকামাকড় আমরা—আমাদের নিয়ে আবার দল! চৌধুরি-বাবুরা রাজা মানুষ, এক এক রাজ্যি নিয়ে তাঁদের ঘেরি। বনের মধ্যে দু-হাত জায়গার উপর এক টুকরো চাল তুলে ব্রাহ্মণের চরণাশ্রয়ে পড়ে আছি, তাঁদের সঙ্গে আমাদের নাম কোন্ বিবেচনায় করলে? নতুন-ঘেরির দলবেদল নেই, যে যাবে সে-ই বাপের ঠাকুর। কদিন গিয়েছ—আরও এস। আসাযাওয়া চলুক, তুমিও আমাদের।

এই বিনয়-বচন জগন্নাথের সহ্য হয় না। অধৈর্য হয়ে সে বলে, ধানাই-পানাই ছাড় দিকি বড়দা। কথায় চিঁড়ে ভেজে না। দল আছে বই কি! ওদের দল, আমাদের দল—দল দুটোই। চল—চলে এস। জাল যখন মনিবের হুকুম ছাড়া দিতে পারবে না, এখানে বসে বসে তামাক পুড়িয়ে কি হবে?

গগনের হাত ধরে একরকম জোর করে টেনে আলা থেকে বেরিয়ে পড়ল। অনিরুদ্ধ তখন সকলকে ডেকে বলে, কড়া নজর রাখতে হবে আলায়। সড়কিগুলো নতুন হাঁড়িতে ঘষে ধার দিয়ে রাখ। জগার ভাবভঙ্গি ভাল না। আগুনও দিয়ে যেতে পারে চুপিসাড়ে এসে। আমি বাপু একপাও আর আলা ছেড়ে নড়ছি নে। ঘেরির পাহারা কমজোরি হয় হোক, জন আষ্টেক তোমরা সর্বক্ষণ আলা ঘিরে চক্কোর দিয়ে বেড়াবে। কালোসোনা, তুই সদরে রওনা হয়ে পড়। নৌকোর জন্য বসে থাকিস নে, নতুন রাস্তার পথে হেঁটে হেঁটে চলে যা। ভিটের পাশের অশ্বত্থগাছ আর বাড়তে দেওয়া যায় না। বলবি সেই কথা ছোটবাবুকে। সময় থাকতে উপড়ে ফেলুন, নয় তো শিকড় বসিয়ে আমাদেরই একদিন উচ্ছেদ করবে।

সতের

কালোসোনা সদরে চলে গেছে। আর এদিকে সেই রাত্রেই অনিরুদ্ধ আর পাহারার আটজন লোক হন্তদন্ত হয়ে গগনের আলায় হেসে হাজির। অন্ধকার। গগন কেরোসিনের বাজে খরচ করে না। আলো জ্বলবে শেষরাত্রির দিকে আলার কাজকর্ম শুরু হবে যখন। আপাতত অন্ধকারের ভিতর সমারোহে গীতবাদ্য চলছে। জগার গলাটাই জোরদার—চপাচপ ঢোলের সঙ্গত হচ্ছে, বাদ্য ছাড়িয়ে অনেক উপরে তার গলা। আলাঘরের বেড়া মাত্র একদিকে। আগে একটা কৌতূহল ছিল, জঙ্গলের একেবারে কিনারে এমন নিঃশঙ্ক ভাবে কী করে থাকে এরা? গান শুনে লহমার মধ্যে প্রশ্নের জবাব মিলে যায়। এ হেন তান-কর্তবের পরে জঙ্গলের কোন জানোয়ার গাঙ পার হয়ে আসতে ভরসা পাবে না। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে মানুষই কানে নিতে পারে কেবল। গায়ক-বাদক ছাড়াও অন্ধকারে বহু লোক শুয়ে-বসে গীতরসে মজে আছে। রসাবেশে ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ কেউ। গীতবাদ্যের ক্ষণেক বিরতি হল তো নাসাগর্জন অমনি কানে আসবে।

অনেকগুলো মানুষ বাঁধ থেকে নেমে উঠোনের দিকে আসছে। গগন তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাঁক দিয়ে ওঠে, কারা?

অনিরুদ্ধ বলে, আমরা বড়দা। রাধেশ্যাম ওমুখো হল না। তাই জাল দিতে এলাম।

গান-বাজনা বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। জগা বলে, সে কী কথা? জাল কাঁধে নিজে চলে এলে অনিরুদ্ধ—বলি অত বড় চৌধুরিগঞ্জ, তার একটা মানমর্যাদা নেই?

শুষ্ক হাসি হেসে অনিরুদ্ধ পরিহাসটা পরিপাক করে নেয়। বলে, এক দিনের ক্ষতি-লোকসান হয়ে গেল। আবার একটা দিন পড়ে থাকলে গরিব মানুষ মারা পড়বে।

হর ঘড়ুই ও অন্য ব্যাপারীরা ভিতরের কথা জানে না। গদগদ হয়ে হর তারিপ করেঃ ভাল, ভাল। আজকেই হয়তো বউ-ছেলেপুলে নিয়ে উপোস দিচ্ছে হতভাগা! গরিবের দুঃখ ক'জনে বোঝে অনিরুদ্ধ? তুমি ভাল লোক।

জগা বিদ্রূপের কণ্ঠে বলে, সে কি, ছোটবাবুর হুকুম এসে গেল ফুলতলা থেকে? একটা বেলার ভিতরে এল কেমন করে?

হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙে চাটি মারবে তাতে নূতনত্ব নেই। অনিরুদ্ধ গায়ে মাখে না। বলে, বিষম মুশকিলে পড়লাম বড়দা, আমাদের নৌকোটা পাওয়া যাচ্ছে না। আগে অত ঠাহর করে দেখি নি, জানি ঠিকই আছে। নয় তো ঘেরির মাছ ধরা বন্ধ করে দিতাম। যাবতীয় মাছ ডাঙার উপর তুলে ঢেলে-বেছে ঝোড়া ভরতি করে যখন নৌকোয় তুলতে যাচ্ছে, দেখা গেল—ঘাটে নৌকো নেই।

গগন আশ্চর্য হয়ে বলে, বল কি! দুই দাঁড়-বসানো সেই নৌকো তো! ঘাটে নেই তবে গেল কোথায়?

তাই যদি জানব, তোমার এখানে আসতে গেলাম কেন বড়দা? যেমন বরাবর থাকে, শক্ত খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা—

হঠাৎ জগার গর্জনে থতমত খেয়ে অনিরুদ্ধ চুপ করে গেল। জগা বলে, তোমার নৌকোর খবর তুমি জানবে না—আমাদের কাছে জানতে এসেছ। কোনটা বলতে চাও শুনি—সরিয়েছি আমরা?

অনিরুদ্ধ বলে, রাগ কর কেন, আমি কি বলেছি তাই? যে জিনিস চাক্ষুষ দেখা নেই, তেমন ছেঁড়া কথা অনিরুদ্ধ ম্যানেজারের মুখে বেরোয় না। বলছিলাম যে, নানান জায়গায় ঘোরাফেরা তোমাদের—বলাই ঘোরে, হর ব্যাপারী মশায় ঘোরেন—বলছিলাম, যদি ওঁদের কারো নজরে পড়ে থাকে—

জগন্নাথ সটান জবাব দেয়ঃ নজরে পড়ে নি। তুমি যাও।

কিন্তু এক কথায় চলে যাবার জন্য এই রাত্রে এতখানি পথ জাল ঘাড়ে করে আসে নি। গগনকে উদ্দেশ করে কাতর হয়ে সে

বলে, মবলগ টাকার মাছ বড়দা। পচে গলে বরবাদ হবে। বারো ছ্যাঁচড়ার কাণ্ডকারখানা—পুটপুট করে ঠিক গিয়ে বাবুদের কানে পৌঁছে দিয়ে আসবে। মোটা ফাইন সঙ্গে সঙ্গে।

খপ করে গগনের হাত জড়িয়ে ধরে ঃ একেবারে শিরে-সংক্রান্তি। দেরির উপায় থাকলে অন্য কারো ভেড়ি থেকে চেয়েচিন্তে যা-হোক নৌকোর উপায় করা যেত। দিনমান হলে দূরস্তরে লোক পাঠিয়ে নৌকো ভাড়া করে আনতাম।

এরই মধ্যে চতুর্দিকে মুখ ঘুরিয়ে গলা তুলে একবার বলে নেয়, অন্ধকার ঠাহর করতে পারছি নে—ভালমানুষের ছেলেরা রয়েছেন হেথা অনেকে—গা তুলে একটু আপনারা খোঁজখবর করে দেন যদি। এতগুলো ধারালো চোখ—কারো না কারো নজরে আসবে।

গগন বলে, তোমরাও তো রয়েছ অনেকে, তোমাদের নজরে পড়ল না? বানে ভেসে গেছে, মালুম হয়। হয়তো বা মুলুকের মধ্যেই নেই।

অনিরুদ্ধ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, ভেসে যাবার জো ছিল না বড়দা। ভেসে যায় নি, তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি। ডাঙার খুঁটোর সঙ্গে কাছি করা। খালের মধ্যে বলাঝোপ—ঝোপের ভিতর নৌকো ঢুকিয়ে রাখা হয়। ঝড়-ঝাপটা যাতে না লাগে। দেখলাম, খুঁটো যেমন-কে-তেমন রয়েছে—

গগন বলে, বাঁধন তবে আলগা ছিল। কাছি কেমন করে খুলে গেছে।

আমিই বেঁধেছিলাম নিজের হাতে। অন্য কেউ হলে না হয় তাই ভাবতাম। খুলে যায় নি বড়দা, কেউ খুলে দিয়েছে।

জগা হি-হি করে হেসে ওঠে ঃ তাই নাকি? আহা, কাকে মতিচ্ছন্নে ধরল গো! কোটালের টান—তবে তো কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে গেছে তোমার নৌকো। কিংবা দহে পড়ে ডুবেছে। কালীতলায় পাঁঠা মানত কর—তিনিই যদি জুটিয়ে-পুটিয়ে দিয়ে যান।

কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে অনিরুদ্ধ বলে, পাঁঠার মূল্য পাঁচ সিকে।

মানত-টানত কি—নগদ ফেলে দেব। এখানেই নগদ দিয়ে যেতে পারি মা কালী যদি ঘাটের নৌকো ঘাটে হাজির করে দেন। কিংবা কোন্‌খানে আছে, সুলুকসন্ধান দিয়ে দেন একটা---

বলে জবাবের প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে থাকে। ওদিকে চুপচাপ। শলাপরামর্শ হচ্ছে অথবা কি করছে, অন্ধকারের ভিতর বোঝা যায় না কিছু। অবশেষে অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে, ও জগন্নাথ, শুনতে পেলে? আর দেরি হলে ফুলতলার বোট ধরা যাবে না। ওঠ। নিবেদনপক্ষে মুখে বলে দাও একটা কিছু—

ক্ষণবিরতির পর জগা হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে ঃ

শুনগো আয়ান দাদা, জলে যেতে করি বাধা,
এমন অবাধ্য রাধা তবু জলে যায়।
কুল-মজানি রাজার মেয়ে, দাদা তুমি করলে বিয়ে
ভাগ্‌নের বাসা কদমতলায় জাতি রাখা দায়।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঢোল-বাদ্য। আর কত্তালের খচাখচ আওয়াজ। অনিরুদ্ধরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। উত্তাল আনন্দে গান চলেছে। আপাতত থামবার লক্ষণ নেই। মাথায় আগুন জ্বলছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শোনার সময় কোথা? হন্তদন্ত হয়ে অনিরুদ্ধ বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত রাত্রি চৌধুরিগঞ্জে কেউ ঘুমোয় নি। ঝোড়া ঝোড়া মাছ—অত টাকার মাল—চোখের উপর পচে যাচ্ছে, কোন-কিছু করবার নেই নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া। এ বনরাজ্যে ভাড়ার নৌকো হুকুম মাত্রেই মেলে না—কুমিরমারি অথবা আরও আগে চলে যেতে হবে। সময় বিশেষে সেই ফুলতলা অবধি। গোলপাতা কিংবা কাঠ কাটতে অথবা চাক ভাঙতে যারা আসে, তাদের ভারী ভারী নৌকো। সে সব নৌকো ভাড়ার নয়।

অনিরুদ্ধ অস্থির হয়ে বেড়িয়েছে—খাল ও গাঙের ধার ঘুরেছে

বারংবার। গাছপালা জলের উপরে ঝুঁকে পড়েছে, চোখের ভুলে কী রকমটা মনে হয়েছে, ছুটে গিয়েছে সেই দিকে। নৌকো ভাসতে ভাসতে হয়তো বা এই জঙ্গলে আটকে আছে। অথবা রহস্য-জনক উপায়ে এসে পৌঁছেছে। এত কান্নাকাটি করে বলে এল—মনে মনে করুণা হতে পারে ওদের। অকারণ ছুটোছুটি করেছে, আশাভঙ্গ হয়েছে বারংবার, অনুকূলবাবুর কানে উঠলে কী কাণ্ড হবে সেই শঙ্কায় কেঁপেছে, শাপশাপান্ত করেছে গগন আর তার দলবলে সাতগুষ্টি ধরে। সারা রাত্রি কেটে গিয়েছে এমনি। সকালবেলা দেখা গেল, বাগদী-বুনো-তিওর, যারা এখানে-ওখানে ঘরবসত করে, একে-দুয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে দিব্যি এক জনতা হয়ে দাঁড়াল।

রাত-জাগা রাঙা চক্ষু মেলে অনিরুদ্ধ হাঁক দেয়, কী—কী চাই তোমাদের? মজা দেখতে এসেছ?

সবে এই ভোরবেলা। রাতের ভিতরেই কেমন রটনা হয়ে গেছে, চৌধুরিগঞ্জের নৌকো সরিয়ে নিয়েছে। অঢেল মাছ পড়ে আছে আলার উঠানের উপর। মজা দেখতে আসে নি কেউ। এত মাছ পচিয়ে নষ্ট না করে বিলিয়ে দেবে নিশ্চয়। সামনে গিয়ে পড়লে খাবার মাছ নির্ঘাত মিলে যাবে, গাঙে-খালে ধরতে যেতে হবে না। সেই মতলবে এসেছে সব।

অনিরুদ্ধ চেঁচিয়ে ওঠে, চলে যাও বলছি। মানুষে শয়তানি করল তো কোন মানুষের ভোগে যাবে না এর একটা মাছ। কাক-চিলের মুখে দেব। গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসব।—মুখের কথাই শুধু নয়। রাগের বশে সত্যিই গাঙে ঢেলে দিয়ে এল ঝোড়া ঝোড়া মাছ। নিজেদের আলার এতগুলো মানুষের জন্য দুটো-পাঁচটা রেখে দেবে, তা-ও প্রবৃত্তিতে এল না। দুপুরবেলা খেতে বসে শুধু ভাত—নুন আর তেঁতুল মেখে জল ঢেলে কোন গতিকে গলাধঃকরণ করল।

কিন্তু রোজ এত ক্ষতি সইবে না। ভাড়ার নৌকো ঘাটে নিয়ে এসে তবে এর পরে ঘেরির জলে জাল নামাবে। একটা দিনেই বিস্তর বরবাদ, বেশী দিন না চলে ব্যাপারটা। অন্যের

উপর ভরসা না করে অনিরুদ্ধ নিজেই ছুটল তিন মরদ সঙ্গে নিয়ে। প্রহরখানেক রাতের মধ্যে আজকেই নৌকো সহ ফিরবে, যত ভাড়া লাগে লাগুক। সে আর ঐ তিন মরদ মোট চার জনে ভাড়ার নৌকো তীরবেগে ছুটিয়ে আনবে।

যে যে-দিকের কথা বলছে, সেইখানে চলে গিয়েছে। সন্ধ্যার সময় অনিরুদ্ধ হতাশ হয়ে ফিরে গেল। সঙ্গের তিন জন চলে গেছে আরও এগিয়ে। নৌকো যোগাড় করে নিয়ে তবে তারা আসবে। অনিরুদ্ধর উপর আলার ভার। তার পক্ষে বেশী দূর যাওয়া চলে না। রাত্রিবেলা আলায় তাকে থাকতেই হবে। বিশেষ করে, হালে যেরকম গতিক দাঁড়িয়েছে। নৌকো সরিয়ে দিয়েছে, আরও ওদের কী সব মতলব, কে জানে!

আলায় এসে সোয়াস্তি হল। কনস্টেবল এসে গেছে ইতিমধ্যে। দু-জন। ছোটবাবু ব্যবস্থা করেছেন থানাওয়ালাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। তারা এসেই হাঁকডাক করে সিদে সাজিয়ে নিয়েছে। ঘি আর কোথায় মিলবে? বুনোপাড়ায় লোক পাঠিয়েছিল দুধের জন্য। সন্ধ্যাবেলা দুধও জোটানো গেল না। সকালে মোষ দুয়ে তারা দুধ পাঠিয়ে দেবে। অগত্যা ডাল আনিয়ে নিল বরাপোতা লোক পাঠিয়ে। কানা গ্যাপলা আপাতত দামটা দিয়েছে, অনিরুদ্ধ এসে পড়লে তার থেকে নিয়ে নেবে। আর এদিকে মাছের তাগিদ দিচ্ছে কনস্টেবলরা, মছলি ধরেছে দেশ ভুঁই ছেড়ে এই তল্লাটে আসার পর; মছলি বিহনে এখন অন্ন রোচে না। হুকুম করছে আলার ঐ খাস-পুকুরে জাল নামিয়ে দিতে। বাবুদের জন্য জিয়ানো মাছ—আলার মানুষ টালবাহানা করে—অনিরুদ্ধ আসুক, সে এসে যেমন বলে সেই রকম হবে, দায়িত্বটা তার উপরে পড়ুক! অনিরুদ্ধ এসে সকলকে এই মারে তো এই মারে। সরকারী মানুষের ভোগে লাগবে না তো বাবুরা পুকুর কেটে মাছ ছেড়ে রেখেছেন কি জন্য? করেছিস কি এতক্ষণ ধরে উজবুকগুলো? এখন মাছ ধরবি, সেই মাছ কোটা-বাছা হবে, রান্না চাপবে, তারপরে তো খাওয়া-দাওয়া! কি হবে

বলুন হুজুররা, রাতটা কি ডালের উপর চলবে? সকালবেলা ঘেরির হোক পুকুরের হোক মাছে মাছে ছয়লাপ করে দেব।

হুজুররা ঘাড় নাড়েন। মুলতুবী ব্যাপারে একদম আস্থা নেই। রাত তা কি হয়েছে? রাত জাগতেই তো আসা। রাঁধাবাড়ায় না হয় রাতটুকু কেটে যাবে।

লাল রঙের মোটা চাল, সে বস্তু হাঁড়িতে চাপাবার পূর্বে জলে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিতে হয়। নয়তো সিদ্ধ হবে না। রান্না সমাধা হতে দেরি যখন হবেই আপাতত সেই ভিজা চালগুলো গুড় সহযোগে কড়মড় করে চিবিয়ে হুজুরদ্বয়ের ক্ষুধা-শান্তি হল। পরের কিস্তিতে চাল সিদ্ধ করে নিয়ে পাঁচটা তরকারির সঙ্গে মউজ করে হবে। খাসপুকুরে জাল নামাতে হল ঐ রাত্রে। মন ভাল নয়। কত টাকার মাল পচে বরবাদ হল দিনমানে আলার উপর, এই আবার এখনই ভোজ জমানোর স্ফূর্তি আসে না। কিন্তু সরকারী লোকে তা শুনতে যাবে কেন? মাছ ধরে রান্নাবান্না শেষ হতে আড়াই প্রহর। গুরু ভোজন অন্তে বন্দুক ঘাড়ে বাঁধে বাঁধে টহল দেবার তাগত কোথায়? টহল না দিয়ে ঐ বন্দুক শিয়রে রেখে পড়ে পড়ে যদি ঘুমোয়, তাতেও ক্ষতি নেই অবশ্য। চারিদিকে চাউর হয়েছে, চৌধুরিগঞ্জে কনস্টেবল মোতায়েন। মাছিটিও উড়ে আসবে না আর এ দিগরে।

পরের দিন কাটল। অনিরুদ্ধ আলা ছেড়ে নড়তে পারে না, কনস্টেবলের খেদমতেই চৌপহর কেটে গেছে। সেই তিন মরদ আজও ফিরল না—তার মানে, নৌকো সংগ্রহ হয় নি। নৌকোয় চেপে ফিরবে তারা। ঘেরিতে জাল নামানো হয় নি, আঁরও একটা দিন অতএব বিনা কাজে কাটল। প্রচুর লোকসান। তার পরের দিনও ঠিক এমনি। তিনদিনের ভিতর একটা নৌকো জোটানো যায় না, এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। সারাদিন সমস্তগুলো মানুষের পথ তাকিয়ে কেটেছে। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল, সুদাম আসছে বাঁধের

উপর দিয়ে। তিন মরদকে ছেড়ে এসেছিল, তাদের একটি। অনিরুদ্ধ ছুটে চলে যায় ততদূর অবধি।

কী কাণ্ড! মোটে ফিরিস নে তোরা। আমি ভাবছি, তোদের কুমিরে খেয়ে ফেলল, না দেশের সমস্ত নৌকো পুড়ে জ্বলে গেল একেবারে?

গতিক তাই-ই বটে! এ-ঘাটে ও-ঘাটে, এ-বন্দরে ও-বন্দরে খোঁজা খুঁজি করতে করতে শেষটা শহর ফুলতলা। আর ফুলতলায় গিয়েছে যখন, যাঁদের নুন খাচ্ছে তাঁদের একটু চরণধূলি না নিয়ে ফেরে কেমন করে! তাঁরাই আটকে রাখলেন: ভাড়া-করা নৌকোয় ভাল মতন কাজ হবে না, নৌকো ভাড়া করে চৌধুরিগঞ্জের কাজ-কারবার চালানো অপমানের কথাও বটে। অন্য কোন্ ঘেরির জন্য নতুন নৌকোয় আলকাতরা মাখাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি একটা-দুটো পোঁচ সেরে নৌকোটা দিয়ে দিলেন ছোটবাবু। আর দেখ গে, সেই নৌকোর গায়ে কাছি নয়, লোহার শিকল। তাতে মস্তবড় বিলাতী তালা। গাছের সঙ্গে শিকল জড়িয়ে তালা আঁটবে, গাছ না কেটে কেউ নৌকো খুলে নিয়ে যেতে পারবে না। পইপই করে ছোটবাবু বলে দিলেন, খোঁটার সঙ্গে নৌকো বাঁধা আর নয়—মোটা রকমের গাছ দেখে নিয়ে সেই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

অনিরুদ্ধ চেঁচিয়ে তোলপাড় করে: ওরে, কোথায় গেলি সব? জাল নামিয়ে দে এক্ষুনি। নৌকো এসে গেছে। তিন দিন হাত কোলে করে বসে আছিস। শালতিগুলো কোথায়, টেনে আলার নীচে নিয়ে আয়।

সুদামকে বলে, ওরা দুজন নৌকোয় বুঝি? তা ভাল। কোন্ দিকে রেখে এলি নৌকো?

সুদাম বলে, বাক্সর পাশে হরগোজা-বনের ঐখানটা ধ্বজি মেরে বসে আছে। ঘাটে নিয়ে যাবে কিনা, জানতে এসেছি।

অনিরুদ্ধ বলে, কী ন্যাকার মতন বলিস! ঘাটে নয় তো ঐ ফাঁকার মধ্যে চৌপহর চাপান দিয়ে থাকবে?

সেই তো বার্তা নিতে এলাম। চুরি হয়ে গেল কিনা ঘাট থেকে। এবারে কিছু হলে মুণ্ডু কেটে নেবে, বলে দিয়েছে ছোটবাবু।
সন্ধ্যে থেকে একজন কেউ নৌকোয় শুয়ে থাকবে। শুনে নাও তোমরা সকলে। ধর্মের ভরসায় আর নয়। আর ছোটবাবু যেমনটা বলেছেন, ঘাটের উপর বানগাছ—তার সঙ্গে শিকল জড়িয়ে তালা এঁটে দেবে। কোন্ হারামজাদা কি করতে পারে এবার, দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে গলা খাটো করে বলে, ছোটবাবু আর কি বললেন রে সুদাম?

সুদাম বলে, রাত্তিরবেলা তুমি তো মাছের নৌকোয় যাচ্ছ চলে। জোর তলব। কালোসোনাকে দিয়ে হুকুম আগেই পাঠিয়েছেন। সে কিছু বলে নি?

বলবে না কেন! কিন্তু তুই আর কি শুনে এলি, তাই বল। মতলবটা কি—আমার কোন্ দোষ-ঘাট? চোরে চুরি করে নিয়ে গেল, আমরা তার কি করব? তলব পাঠায় তবে কেন?

কথা বলতে বলতে সুদামের সঙ্গে অনিরুদ্ধ ঘাট অবধি চলে গেল। কোন্ গাছে শিকল জড়াবে, সেটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য। ঘাটে গিয়ে দেখে—কী আশ্চর্য, হারানো নৌকোটা গোলঝাড়ের আবছা আঁধারে এগোচ্ছে-পিছোচ্ছে, মাথা দোলাচ্ছে স্রোতের সঙ্গে। এবং কাছি-করা রয়েছে ডাঙার সেই খোঁটার সঙ্গেই। ফিরে এসেছে নৌকো। মানুষ হলে বলা যেত, পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যেমন-কে-তেমন ফেরত রেখে গেছে। কিন্তু গগনের আলায় গিয়ে এত যে কান্নাকাটি করে এল—সেই দিন ফিরলে ফুলতলা অবধি এতখানি জানাজানি হত না।

আঠার

বিনোদিনী ভাবনায় পড়েছে। ধান তো আউড়ির তলায় এসে ঠেকল। ক্ষেতেলরা নতুন ধান দিয়ে যাচ্ছে না। উপায় কি হবে?

মেয়েমানুষ—চাষীপাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়তেও পারে না। একদিন দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল ঊর্ধ্ব মোড়লের সঙ্গে। ঐ পথের উপরেই সে করকর করে ওঠে: কেমন আক্কেল তোমাদের মোড়ল? তোমাদেরই দশজনের উপর ভরসা করে সে-মানুষ বিদেশ বেরুল। দুটো মেয়েলোক ভিটের উপর পড়ে আছি, তোমরা দায়েবেদায়ে দেখাশুনো করবে। সে পড়ে মরুক, হকের পাওনা নিয়েই টালবাহানা।

ঊর্ধ্ব বলে, অজন্মাব বছর। সময়ে জল হল না, খরার টানে ধান শুকিয়ে চিটে। দিই কোত্থেকে মা?

কিন্তু পেট তা বলে মানে না। দশের বিচারে গেলে তারাও মানবে না। গুলো-বন্দোবস্ত নিয়েছ—যেবারে বেশী ফলন, সেবারে কি এক মুঠো ধান বেশী দিয়ে থাক?

সে তো সত্যি। দেখি, ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ষোল-আনা না হোক, কতক তো দিতেই হবে।

এমনি সব বলে ঊর্ধ্ব সরে পড়ে সামনে থেকে। বিনোদিনী জানে, পারতপক্ষে আর দেখা দেবে না। নগেনশশীও যাতায়াত ছেড়েছে। অনেক দিন তার দেখা নেই।

ভাইয়ের তল্লাসে বাপের বাড়ি গেল সে একদিন। বলে, সে মানুষ কোন্ মুলুকে গিয়ে পড়ে রইল, একখানা চিঠি লিখে খোঁজ নেয় না। তুমিও মেজদা ওপথ মাড়াও না, একেবারে ভুলে বসে আছ।

নগেনশশীর কণ্ঠ গদগদ হয়ে উঠে: মায়ের পেটের বোন, বত্রিশ পাক নাড়ির বাঁধন। ভোলা চাট্টিখানি কথা! কিন্তু কী করা যাবে! যা ননদখানা তোর, মারমুখী হয়ে পড়ে, অকথা-কুকথা শোনায়।

একটুখানি চুপ করে থেকে বলে, বলেছে কি জানিস? কুড়ালের উল্টোপিঠের ঘায়ে আমার ডান-পাখানাও জখম করে দেবে। এর পরে কোন্ সাহসে যাওয়া যায় বল।

হেসে উঠে বিনোদিনী সমস্ত ব্যাপার লঘু করে নিতে চায়: হ্যাঁঃ,

পা ভেঙে দেবে! ঠাট্টার সম্পর্ক—ঠাট্টা করে কি বলল, অমনি তুমি ভয় পেয়ে গেলে।

ভয় পেতেই হয়। অতি নচ্ছার মেয়েমানুষ। কুড়াল না মারুক, বদনাম রটিয়ে দিতে কতক্ষণ। দশে আমায় মানে গণে, সেই জন্যে সামাল হয়ে চলতে হয়।

তার পরে বলে, তা নাই বা গেলাম। দরকারটা কি শুনি? বেটারা ধান দিচ্ছে না, এই তো? আমি বলে দিয়েছি, আবার বলব। মাতব্বর কটাকে ডাকিয়ে এনে আচ্ছা করে কড়কে দেব একদিন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বিনি, তোদেরই বা এত হাঙ্গামা পোহাবার দরকারটা কি? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় কেন, বুঝতে পারি নে। সোজা চলে আয় আমাদের বাড়ি। আগে বলেছি, এখন আবার বলি। যদি ভাবিস, আমাদের ভাত কেন খেতে যাবি। কিন্তু ভাত আমাদের হল কিসে? তোদেরই ধান চাল ভেনেকুটে আমাদের বাড়ির উপর বসে খাবি। এখানে থাকলে বর্গাদারেও বুঝবে, পিছনে লোকবল আছে। নিজেরা কাঁধে বয়ে পাওনা ধান শোধ করে দিয়ে যাবে। তাই বুঝিয়ে বল গে তোর ননদকে। দুটো সোমত্ত মেয়েমানুষ আলাদা পড়ে থাকিস, লোকেও সেটা ভাল দেখে না।

বাড়ি ফিরে বিনোদিনী সেই কথা বলে। চারু ঝেড়ে ফেলে দেয়: ভাইর বোন ভাগ্যবতী তুমি চলে যাও ওখানে। আমি কোন্ সুবাদে যেতে যাব!

বিনোদিনী ভয় দেখানোর ভাবে বলে, সত্যি যদি চলে যাই, থাকতে পারবি একলা ভিটের উপর।

কেন পারব না? আমারও ভায়ের ভিটে। কত জোর এখানে! ভাই আমায় রেখে গেছে তার ভিটের উপর।

এর মধ্যে আবার এক অদ্ভুত উৎপাত। একদিন চারুবালা গোলায় সাঁজ দেখাতে যাচ্ছে, টুক করে এক টুকরা মাটির ঢিল গায়ে পড়ল। তেঁতুলতলার দিক থেকে! ঝাঁকড়া-ডালপালা পুরোনো তেঁতুলগাছ

বাড়ির বাইরে রাস্তার পাশে—ছোটবেলা ঐ তেঁতুলগাছের ভয়ে চারু সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরুত না, দায়েবেদায়ে বেরুতে হলে ওদিকে তাকাত না চোখ তুলে। গাছের ডালে ডালে ভূত-পেত্নী ব্রহ্মদৈত্য হোঁদল-কুতকুতে যাবতীয় অপদেবতার চলাচল। বড় হয়ে ভূতের ভয় ভেঙেছে, কিন্তু ঐ গাছতলা থেকেই তো ঢিল এসে পড়ল।

আর কদিন পরে—ভূত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে—উঠানের আর ঘরের বেড়ায় দমাদম ঢিল পড়তে লাগল। সবে সন্ধ্যা গড়িয়েছে। কিন্তু মেঘলা আকাশের নীচে বড় অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না। ভরত রাতে এসে দাওয়ায় শোয়, সেই ব্যবস্থা চলছে এখনও। রাতের খাওয়াটা এ-বাড়ি, সেইটে মুনাফা। কিন্তু তার এখনো আসবার সময় হয় নি।

দুই মেয়েলোক পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। মানুষজন এসে পড়ল। কি, কি হয়েছে? ঢিল পড়েছে তো কি হল? বজ্জাত লোকের উৎপাত।

ভরত এসে পড়লে পাড়ার মানুষজন চলে গেল। চোখ ঠেরে চাপা গলায় কেউ বলতে বলতে যাচ্ছে, ডবকা ছুঁড়ী ঘরে পুষে রেখেছে—ভূত-প্রেত তো নেমন্তন্ন করে ডেকে আনা। তা ছাড়া আবার কি!

সকালবেলা ওপাড়া অবধি রটনা হয়ে গেল। নগেনশশী হন্তদন্ত হয়ে এসেছে: আর জেদ করিস নে বোন। চল্ আমাদের বাড়ি।

বিনি চারুবালাকে ঠেস দিয়ে বলে, মানী ঘরের মেয়ে—ও কেন যাবে? পায়ের বেড়ি ঝেড়ে ফেলে আমিই বা যাই কেমন করে?

ভাগ্যিস ছিল না চারু। থাকলে কুরুক্ষেত্র বাধত। চারু আসছে দেখে নগেন তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ ধরে: উর্ধ্ব দেখা করে গেছে তো এসে? আমি নিজে গিয়ে বলে এলাম।

নগেনশশীর উপর চারু কোন দিন প্রসন্ন নয়। আজকে আরও কি হয়েছে, কথা পড়তে দেয় না, খরখরিয়ে বলে ওঠে: এই সর্বনাশ! নিজে সেখানে গিয়ে পড়েছিলেন?

নগেন নিজের বোনের সঙ্গেই কথা বলে চলেছে : কথা শোন রে বিনি। অত করে তুই বলে এলি, বর্গাদারের বাড়ি নিজে চলে গেলাম। সেই জন্যে দোষ হয়ে গেল আমার ?

এদ্দিন এর-তার মারফতে বলে বলে পাঠাচ্ছিলেন, এবারে নিজ মুখে বলে এলেন। বউদির তাগাদায় কেউ কেউ যদিই বা দোমনা হয়েছিল, এর পরে এক চিটে ধান আর কেউ দেবে না।

নগেনশশী আর্তনাদ করে ওঠে : ওঃ, এত বড় কলঙ্ক আমার নামে! আমার বোন উপোস করে মরবে—মানা করে দেওয়ায় স্বার্থ কি আমার শুনি ?

হাসিমুখে সহজ কণ্ঠে চারু বলে, কায়দায় ফেলে আমাদের অন্দরে নিয়ে ফেলবেন। তার উপরে আরও কোন মতলব আছে কিনা ঠিক জানি নে—যাতে ধোপা নাপিত বন্ধ হয় না, সমাজের লোকের সঙ্গে পাত পেতে খাবারও অসুবিধে ঘটে না।

প্রথমটা নগেনশশী তলিয়ে বোঝে নি। বুঝি তার পরে ফেটে পড়ল : শোন্, শুনলি তো বিনি ? এই জন্যে আসি নে তোদের বাড়ি।

চারু বলে, দিনমানে আসেন না, আসেন রাত্রে। বাড়ির ভিতরে আসেন না, আনাচেকানাচে আসেন। ভূত হয়ে ঢিল-বৃষ্টি করেন।

নগেনশশী গর্জন করে ওঠে : কে বলেছে ?

মানুষ কেউ নয়—বলেছে, আপনার খোঁড়া পা। ভিজে মাটির উপর পায়ের দাগ—একখানা পা পুরোপুরি, আর এক পায়ের শুধু আঙুল। তাই তো দেখে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু শুনে রাখুন—

চোখ তুলে সোজাসুজি তাকায় নগেনের দিকে : ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না। দাদার মত চাই। তিনি যদি ও-বাড়ি গিয়ে থাকতে বলেন, তবেই।

এ কথায় নগেন নরম হয়ে গেল : কোথায় পাওয়া যাবে তাকে ? কুমিরমারি ছিল, সেখান থেকে বয়ারখোলা। তার পরে আর পাত্তা নেই।

চারু ভারী গলায় বলে, তাড়িয়ে তাড়িয়ে দাদাকে আমার জঙ্গলে নিয়ে তুলল। আমিও যাব চলে। মানুষের চেয়ে জঙ্গল ভাল।

বিনোদিনী সজল কণ্ঠে বলে, কাজ নেই টাকায়। ফিরে আসুক। না হয় একবেলা খেয়ে থাকব সকলে মিলে। খোঁজ কর তুমি মেজদা।

চারু বলে, মন করলে খোঁজ নেওয়া যায়। কুমিরমারি বিলেত জায়গা নয়, যাওয়া যায় সেখানে। কেউ না যায় আমি বেরিয়ে পড়ব কাউকে কিছু না বলে। মেয়েমানুষ বলে মানব না। পুরুষে না পারে তো আমি খুঁজে বের করব আমার ভাইকে।

উনিশ

অনেক রাত্রি। জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মাছ-মারারা। নিঝুম চারিদিক। রাধেশ্যাম ছুটতে ছুটতে নতুন আলায় এসে উঠে ঝপ করে হাতের জাল ফেলে দিল। কাঁপছে ঠকঠক করে। গগন মাচার উপরে শুয়েছে, ব্যাপারীরা মেঝের এদিকে-সেদিকে। শব্দসাড়ায় জেগে উঠে কেউ তড়াক করে উঠে বসল, চোখ রগড়াচ্ছে কেউবা অমনি শুয়ে শুয়ে।

কি সমাচার রাধেশ্যাম? হল কি, ফিরে এলে কেন?

রাধেশ্যাম বাইরের দিকে আঙুল দেখায়। কী বলতে চাচ্ছে মুখ দিয়ে ক্ষণকাল কথা বেরোয় না। বেড়ার একেবারে কাছ ঘেঁষে চলে এল। ফিসফিসিয়ে অনেক কষ্টে বলে, বড়-শেয়াল ইদিক পানে ধাওয়া করেছে।

বাদাবনে শিয়াল নেই। বড়-শিয়াল হল বাঘ—বাঘের নাম করতে নেই, বড়-মিয়া বড়-শিয়াল ভোঁদড় এমনি সব নামে পরিচয়। ঘুমের লেশমাত্র নেই আর কারো চোখে। লাঠি রামদা নিয়ে বেরিয়ে

পড়ল এখান-ওখান থেকে। লহমার মধ্যে সকলে সশস্ত্র। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, খাল-পারে বনের কাল কাল গাছপালা সুস্পষ্ট নজরে আসে। বাঘ নাকি এপারে আসছিল জোয়ারে জল সাঁতরে। ভাসানো মাথা দেখতে পেয়ে রাধেশ্যাম দৌড় দিয়েছে।

কিন্তু আসতে আসতে গেলেন কোন্‌দিকে প্রভু? পাখনা মেলে আকাশে উড়লেন? না জোয়ারে গা ভাসিয়ে চললেন সুদূরের মানষেলা মুলুকে? সতর্ক চোখে সকলে বাঁধের দিকে তাকিয়ে। চোখের পলক পড়ে কি না পড়ে। কামরার দরজা খোলা। ঐটুকু ঘরে এত লোকের জায়গা হবে না। নয় তো ঢুকে পড়ত সকলে এতক্ষণ। দরজা তবু খুলে রেখেছে, সত্যি সত্যি বিপদ এসে পড়লে ওরই ভিতরে ঠাসাঠাসি হয়ে দরজা দেবে। বাঘের পার হয়ে আসা অবিশ্বাস্য কিছু নয়। হরিণ মারতে কিংবা মধু কাটতে ইচ্ছে হল তো আবাদের মানুষ বনে গিয়ে ঢোকে। বাঘও তেমনি মুখ বদলাতে কখনোসখনো ফাঁকায় চলে আসে। সুস্বাদু নরমাংসের কথা ছেড়ে দিন, আজেবাজে মাংসও সকল দিন জোটে না—জঙ্গলের জীবগুলো এমনি ত্যাঁদোড় হয়ে গেছে। পেটের পোড়ায় বাঘ তখন ভাঁটা সরে যাওয়া চরের উপর চুনোমাছ ধরে ধরে খায়। ছাতু খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে, তারপরে পোলাও-কালিয়ার লোভে বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ একদিন।

কিন্তু বাঘ পার হয়ে এলে এতক্ষণে ঠিক বাঁধের উপর দেখা যেত। এমন জ্যোৎস্নার আলোয় চুপিসাড়ে কিছু হবার জো নেই। রাধেশ্যাম, কি দেখে এলি বল্ তো ঠিক করে—

হরি, হরি! রাধেশ্যাম কোন সময় সকলের পিছনে গিয়ে বেড়া ঠেস দিয়ে বসে ঘুমুচ্ছে। মুখে ভকভক করছে গন্ধ। তাড়ি গিলেছে। জালে না গিয়ে বেটার ঘুমোবার গরজ ছিল আজকে। প্রায়ই হয় এমন, আর বউয়ের সঙ্গে কোন্দল বেধে যায়। ভেবেচিন্তে আজকে এই বাঘের গল্প বানিয়েছে। এখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, মরবে কাল কাঠ-কাঠ উপোস দিয়ে।

পরের দিন ভোরবেলা। সূর্য ওঠে নি তখনো। মাছের ডিঙি রওনা হয়ে গেছে। কাজকর্ম সেরেসুরে গগন বনঝাউয়ের একটুকরো ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করছে আলার উঠানে দাঁড়িয়ে। দেখা গেল, খালের ঘাটে শালতি-ডোঙা এসে লাগল। কে একজন ডাঙায় নেমে এলো শালতি থেকে। শালতি ভেড়ির কাজকর্মে লাগে, বাইরের নদীর খালে বড় বেরোয় না। স্রোতের মুখে পড়লে বিপদ আছে। দূরদূরন্তর কেউ শালতিতে যায় না। অতএব মানুষটা আসছে কাছাকাছি জায়গার। কোন্ লাটসাহেব হে—পায়ে না হেঁটে শালতি চেপে আসে! কৌতুহল ভরে গগন তাকিয়ে রয়েছে।

কালো রং, রোগা-লিকলিকে দেহ, কাঁধের উপর ধবধবে উড়ানি। আসছে এদিকেই বটে। উঠানের উপর এসে চতুর্দিক একবার তাকিয়ে দেখে নিল।

জগন্নাথ তুমিই নাকি হে?

গগন বলে, জগা কোথা এখন? কুমিরমারি ছুটল নৌকো নিয়ে। আমার নাম শ্রীগগনচন্দ্র দাস।

আরে, তুমিই ঘেরিদার। কী মুশকিল—সেই একটু ক্ষণের দেখা তো—গোড়ায় ধরতে পারি নি।

তারপর একগাল হেসে বললেন, আমি কে বল দিকি।

গগন বলে, ভরদ্বাজ মশায়। ঘেরির বন্দোবস্ত আপনিই তো দিয়ে দিলেন। আপনাকে চিনব না?

গোপাল ভরদ্বাজ চোখ ঘুরিয়ে চারিদিক ভাল করে একবার দেখে নিলেন। বললেন, বেশ, বেশ! বড্ড খুশী হলাম। যার বুদ্ধি আছে, ধুলোমুঠি থেকে সে সোনা খুঁটে বের করে। সেই কথা বলছিলাম ছোট বাবুকে। ছটাক খানেক চরের জঙ্গলে জমি নিয়ে তার উপর গগন দাস পেল্লায় সায়ের জমিয়ে বসেছে। যত রাজ্যের মাছ এসে পড়ছে।

গগন অবাক হয়ে বলে, সায়ের বলেন কাকে? এ দিগরে

সায়ের আছে বলে তো জানি নে। চরের উপর সামান্য একটু ঘেরি দিয়ে বসেছি।

ভরদ্বাজ দরাজ ভাবে হেসে ওঠেন: ঐ হল। যার নাম চাল-ভাজা, তার নাম মুড়ি। নামে না হোক, কাজকর্ম তো সায়েরের। মাছের নৌকো যে কুমিরমারি ছুটল, সে নৌকোয় কি তোমার একলার ঘেরির মাছ? ভাতার-ভাসুরের নাম জানি রে বাপু, মুখে বললেই তখন দোষ অর্সায়।

হাসতে হাসতে আলা-ঘরে ঢুকে বাখারির মাচার উপর চেপে বসলেন। মাছ কেনা-বেচার সময় গগন যেখানটা বসে চারিদিকে নজর ঘোরায়, ওজন ও দরদাম খাতায় টোকে।

বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ ভরদ্বাজ বলে ওঠেন, তামাক খায় কে ওখানে? খাসা তামাক, দিব্যি বাস বেরিয়েছে। নিয়ে এস। হুঁকো লাগবে না, পরের মুখ-দেওয়া হুঁকোয় আমি খাই নে। ব্রাহ্মণের হুঁকো পাচ্ছই বা কোথা? হাতের চেটোয় হয়ে যাবে। কলকেটা আন ইদিকে।

সকালবেলার পয়লা ছিলিম। অনেক মেহনতে গেঁয়োকাঠের কয়লা ধরিয়ে রাধেশ্যাম দুটো কি তিনটে সুখটান দিয়েছে, হেনকালে কলকে দেবার আবদার। তবে বাইরের মানুষ এসে চাচ্ছে, ধরতে গেলে অতিথি, জাত্যাংশে ব্রাহ্মণ—নিজেদের কেউ হলে সে কানে নিত না। নলচের মাথা থেকে কলকে খুলে দিয়ে অতিথিসেবা করতে হল।

গগন বলে, বুঝলাম। চৌধুরিগঞ্জে আসা হয়েছে মশায়ের। হুঁ, আপনি তবে সেই মানুষ।

তাই। হাসেন আবার ভরদ্বাজ: তুখোড় বটে হে তুমি! এসেছি কাল সন্ধ্যের সময়। এর মধ্যে সমস্ত খবর জেনে বসে আছ।

গোপাগুনতি জনমনিষ্যি—খবর উড়ে বেড়ায়, ধরে নিলেই হল। শুনলাম, অনিরুদ্ধর জায়গায় নতুন লোক এসেছে একজন ফুলতলা-সদর

থেকে। তার পরে আপনাকে দেখছি, তবে আর বুঝতে আটকায় কিসে ?

ভরদ্বাজ বলেন, খবর পেয়েছ ঠিকই দাস মশায়, কিন্তু পুরো খবর নয়। অনিরুদ্ধর জায়গায় আসি নি। বাবুদের ষোলআনা এস্টেটের তহসিলদার আমি। খালি পায়ে হাঁটতে পারি নে, মাটিতে পা ঠেকলে টনটন করে ওঠে। শুকনো এইটুকু পথ আসতে, দেখতে পাচ্ছ, খালের মধ্যে শালতি নামাতে হল। আমি হেন মানুষ মেছোঘেরিতে পড়ে পড়ে নোনাজল খাব—খেপেছ নাকি হে! বাবুরাও তো ছাড়বেন না। আমা বিহনে যাবতীয় ভূসম্পত্তি লাটে উঠে যাবে ওদিকে। দশ-বিশ দিন থেকে এদিককার একটা সুরাহা করে সদরের আমলা আবার সদরে গিয়ে উঠব। অনিরুদ্ধ রগচটা মানুষ -কী নাকি গণ্ডগোল পাকিয়েছে তোমাদের সঙ্গে। জন্তু-জানোয়ারের রাজ্যে আছিস তো কটা মানুষ পড়ে, তার মধ্যেও বিবাদ-বিসম্বাদ! আমি এসেছি বাপু মিটমাট করতে। দোষঘাট যা কিছু হয়েছে, কিছু মনে রেখো না বাপসকল। মিলে-মিশে ভাই-ভাই হয়ে সকলে থাক এই কথা বলবার জন্য এদ্দূর অবধি চলে এলাম।

গগন তটস্থ হয়ে পড়ে: এ সমস্ত কী কথা! জুতোর কাদা হলাম গে আমরা, দোষঘাট কিসের আবার? চৌধুরি হুজুরদের আশ্রয়ে গাঙের উপর গেঁয়োবনের মধ্যে একটু ঘর তুলে নিয়েছি—অত বড় ঘেরি থেকে গুঁড়োগাড়া কিছু যদি ছিটকে এসে পড়ে, কোন রকমে কটা মানুষের পেট চলে যাবে।

মানুষটা কিন্তু আলাপ-ব্যবহারে খাসা। অথচ আগেভাগে লোকে কত রকম রটিয়েছিল! ছোটবাবু নাকি কিরে করেছে, রাতারাতি গগনের আলা ভেঙে গাঙের জলে ডুবিয়ে দিয়ে নৌকো-চুরি ও ক্ষতি-লোকসানের শোধ নিয়ে নেবে। গুণ্ডা পাঠিয়ে দিয়ে জগা ও গগনের গলা দুইখণ্ড করবে। এমনি কত কি! গোপাল ভরদ্বাজের সম্বন্ধেও শোনা যায়, অতবড় ডাকসাইটে দুর্দান্ত

মানুষ তল্লাটের মধ্যে একটির বেশী দুটি নেই। অথচ সেই মানুষ, দেখ, সকলের মধ্যে জমিয়ে বসে কত ভাল ভাল কথা বলছে। লোক অনেক এসে জমেছে, কথা শুনছে সকলে তার মুখের দিকে চেয়ে।

অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হল, বেলা হয়ে গেছে বিস্তর। তা সত্ত্বেও গল্প বোধ হয় থামত না। কিন্তু খালের দিকে তাকিয়ে দেখেন ভাঁটার টান ধরে গেছে। আর দেরি হলে অনেকখানি কাদা ভেঙে শালতিতে উঠতে হবে। নোনা কাদা—পায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে। তার উপরে ভরদ্বাজের ঐ শৌখিন ব্যাধি—কাদা-মাটি পায়ে ঠেকলেই পা টনটন করে উঠবে।

চলি তবে। জগন্নাথের সঙ্গে দেখা হল না। পাঠিয়ে দিও একবার আমাদের ওখানে।

বারংবার জগার কথা। গগন কিছু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, কেন, তাকে কি দরকার?

নাম শোনা আছে, চোখে একবার দেখব। শুনেছি ছোঁড়া বড্ড ভাল। তোমার ডান হাত। একটু আলাপসালাপ করব, আবার কি!

উঠতে গিয়ে একটা ঝুড়ির দিকে নজর পড়ল। গোপাল বলেন, চাকা-চাকা ওগুলো চিত্রামাছ না?

উঁহু, পায়রা-চাঁদা।

ঐ হল। আবাদে তোমরা চাঁদা বলো, ডাঙা রাজ্যে আমাদের বাহারে নাম—চিত্রা। দিব্যি স্বাদ, রাঁধতে আলাদা তেল লাগে না। দাঁতে ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে মাখনের মত গলে যায়। আমাদের চৌধুরিগঞ্জের অত বড় ঘেরির মধ্যে এমন চিত্রা একটা পড়ে না।

রাধেশ্যাম বলে, এ মাছও ঘেরির নয়। ঘেরির মধ্যে এত বড় হতে বিস্তর দিন লাগে। গাঙে খালে বেউটিজাল পেতে ধরেছে। বড়দাকে ঐ মাছ কটা একজনে খাবার জন্যে দিয়ে গেল।

গোপাল ভরদ্বাজ দাঁত মেলে হাসলেন গগনের দিকে চেয়ে: কথা বেরিয়ে পড়ল এই দেখ। বাইরের মাছও তোমার খাতায় বিক্রি

হতে আসে। সায়ের বলা হবে কিনা, তা হলে বিবেচনা কর। গোখরো-কেউটেরা সাপ আবার হেলে-ধোঁড়ারাও সাপ। সে যাকগে—রোজগারের জন্য দুনিয়ার উপর আসা, দুটো পয়সা কোন গতিকে হলেই হল। এই, দাড়িওয়ালা কে তুই রে বাবা, ঝুড়িটা নিয়ে আয় ইদিকে, মাছগুলোর চেহারা দেখে যাই।

কাছে নিয়ে এলে গোপাল শতকণ্ঠে তারিপ করেন: বগিথালার মতন সাইজ। কী সুন্দর, যেন রাজপুত্তুর! দুটো-চারটে আমাদের ফুলতলা অবধিও না পৌঁছয় এমন নয়। কিন্তু পচে ঢোল হয়ে গিয়ে তখন আর পদার্থ থাকে না।

গগনকে অগত্যা বলতে হয়: মাছ কটা আপনি নিয়ে যান। মুলুক মিঞা শালতিতে ঢেলে দিয়ে এস।

গোপাল না-না করে ওঠেন: সে কি কথা! ভাল বলেছি বলেই অমনি দিয়ে দেবে? তোমরা আশাসুখে রেখে দিয়েছ—

আমাদের কি অভাব আছে? আজকে না হল তো কাল। কাল না হয় তো পরশু। মাছ তো আসছেই।

গোপাল গদগদ কণ্ঠে বলন, তবে দাও। চিত্রামাছ ভাল খাই আমি। তবে রাঁধুনী হল গে কালোসোনা—যা-ই এনে দাও, এক আস্বাদ। বলে কি জান, এক হাঁড়ি থেকে নামছে, একই হাতা-খুন্তি, রান্না বাটনা একজনার হাতে—স্বাদ তবে দুই রকম হয় কেমন করে?

কুড়ি

কুমিরমারি মাছ নামিয়ে দিয়ে ডিঙির ফিরে আসতে বেলা গড়িয়ে গেল। গগন বলে, ফুলতলা থেকে ভরদ্বাজ এসেছে। অনিরুদ্ধর জায়গায়। লোকটার এত বদনাম শুনি, সে রকম কিন্তু মনে হল না। তোমার খোঁজে এই অবধি চলে এসেছিল। যেতে বলে গেছে।

জগা শুনে গেল মাত্র, কানে নিয়েছে কিনা বোঝা যায় না।

কদিন কাটে এমনি। হঠাৎ একদিন কালোসোনা এসে পড়ল : কই জগা, গেলে না ?

জগা ঘাড় নেড়ে বলে, কেন যাব না ? দেবতা নিজে এসে ডেকে গেলেন—আলবত যাব। যেতেই হবে।

কবে ?

যাব দু-চার দিনের মধ্যে।

ঠিক করে বলে দাও। আমার উপর হুকুম হল, সঠিক তারিখ নিয়ে আসবি।

জগন্নাথ বলে, আলায় পাঁজি নেই। তারিখ-টারিখ ঠিক থাকে না। ভরদ্বাজকে বলিস গিয়ে সেই কথা।

দেবতা-দেবতা করছিস, কিন্তু এবারের কথাগুলো ঠিক ভক্ত-জনোচিত হল না। আর অধিক উচ্চবাচ্য না করে কালোসোনা চলে গেল। তখন জগা হি-হি করে হাসে : নাম আমার বড্ড চাউর হয়ে গেছে, নৌকো সরানোর যশটা ষোলআনা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। গেলে ঠিক মারবে।

বলাই বলে, মারের ভয় করিস তুই জগা ?

তা বলে ওদের কোটে যাই কেন ? নিয়ে গিয়ে হয়তো বা বলবে, পিঠে সরষের তেল মালিশ কর জগা, মারতে গিয়ে হাতে না লাগে। ক্ষমতা থাকে আমাদের কোটে এসে মেরে যাক।

কদিন গেল। গোপাল আবার একদিন এসে পড়ে জগাকে ধরলেন। পায়ে মাটি ছোঁবার উপায় নেই বলে যথারীতি শালতি করেই এসেছেন। এবং যোগাযোগ ভালই—হর ঘড়ুইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন, তদুপলক্ষে বরাপোতায় গগন নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছে। জগাকে বলে গেল, আলার দিকে কড়া নজর রাখবি। কিংবা চালা ঘরেই বা কেন—দিনমানটা আলায় এসে শুয়ে থাক।

চৌধুরিদের সঙ্গে রেষারেষি—খুব সামাল হয়ে থাকার দরকার। এই গণ্ডগোলের ব্যাপারে জগারও দায়িত্ব আছে। গগন

নেই তো সে এসে চেপে পড়ল আলার মাচায়। মাচার উপরে চোখ বুজে অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নজর রাখছে।

এমনি সময় ভরদ্বাজ এলেন। খবরবাদ নিয়েই এসেছেন নিশ্চয়। একগাল হেসে বললেন, এই যে, আজকে ঠিক ধরেছি। এমন লোহার শরীর—তুমি বাপু জগন্নাথ না হয়ে যাও না। সত্যি কিনা বল?

জগন্নাথ উঠে বসে নিদ্রারক্ত চোখ রগড়াচ্ছে। একবার মাঝে ঘাড় নেড়ে দিল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোপাল বলেন, গগন নেই, কাউকে তো দেখছি নে। তা তোমার সঙ্গেই দরকার। ছোটবাবু তোমার কথা সমস্ত শুনেছেন।

জগা কঠিন হয়ে বলে, শুনবেন না কেন? অনিরুদ্ধ আড়ে-হাতে লেগেছে, না শুনিয়ে সে ছাড়বে? নৌকো নাকি সরিয়েছিলাম আমি। তা শুনে থাকেন ভালই। কারো চালে চাল ঠেকিয়ে আমি বসত করি নে।

গোপাল জিভ কাটেন: ছি ছি, নৌকোর কথা উঠছে কিসে? দোষ ষোলআনা অনিরুদ্ধর, এখন আজেবাজে বলে বেড়ালে কি হবে! কাছির আলগা বাঁধন ছিল কিংবা গাঁজার ঝোঁকে কাছি হয়তো মোটেই করে নি। টানের মুখে নৌকো ভেসে গেল। নিজের দোষ ঢাকতে এখন নানান কথা বলছে। ছোটবাবু বোঝেন সবই, কাটা-কান চুলে ঢাকবে না।

অকারণে গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, চৌধুরিগঞ্জে কাজ করবে তো বল। নতুন নৌকো এসেছে গাঙের উপর, সে নৌকো রেলগাড়ি হয়ে ছুটবে। নৌকোর দায়িত্ব তোমার উপরে—তুমি কর্তা। কাজ এখানে যা, সেখানেও তাই। বরঞ্চ মজা ওখানে। সন্ধ্যাবেলা রওনা হয়ে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। মাল পৌঁছে দিয়ে, ব্যস, তারপরে যা খুশি তুমি করে বেড়াও গে।

ঘাড় নেড়ে জগা এক কথায় সেরে দেয়: না—

কেন, কি হল? লম্বা মাইনে রে বাপু। ত্রিশ, ছোটবাবুকে

বলেকয়ে না হয় পঁয়ত্রিশেই তুলে দেওয়া যাবে।

বেয়াড়া জগা তবু ঘাড় নাড়ে।

গোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, তবে কি? লাটসাহেবের মাইনে চাও না কি হে? এখানে তো মুফতের খাটনি। খবর লুকোছাপা থাকে না, সমস্ত জানি।

জগা বলে, মুফতে কি জন্য হতে যাবে? দুবেলা খাই শুই, যা যখন দরকার পড়ে নিয়ে নিই—

হীরে-জহরত কী খেয়ে থাক, সেটা অবশ্য জানি নে। কোন্ পালঙ্কে শুয়ে থাক, সে এই চোখের উপর দেখছি। আপন ভাল পাগলেও বোঝে। বিবেচনা করে দেখ, তিরিশটা দিন পুরলেই করকরে পঁয়ত্রিশখানি টাকা। তার পরে ধরগে, কুমিরমারি থেকে চৌধুরিগঞ্জ অবধি পাকা-রাস্তা হয়ে যাচ্ছে—বারোবেঁকির গোলক-ধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে না। মোটরলরিতে মালচলাচল। ছোট-বাবু উদ্যোগ করে নিজে দেখেশুনে রাস্তা বানাচ্ছেন—লরির লাইসেন্স তিনি ছাড়া কি বাইরের মানুষ পাবে? তখন মোটর-ড্রাইভারি শিখে নিও। ভাল হয়ে কাজকর্ম করলে ছোটবাবুই ব্যবস্থা করে দেবেন, তোমায় কিছু করতে হবে না। মাইনে সঙ্গে সঙ্গে পঁয়ত্রিশ দুনো সত্তর। আর ঐ বাড়তেই থাকল। টাকার আণ্ডিল দু-চার বছরের ভিতর।

জগা উদাসীনের ভাবে বলে, কী হবে টাকায়?

অ্যাঁ, সাক্ষাৎ ন্যাংটেশ্বর তুমি যে বাপু! বলে, টাকা দিয়ে কি হবে? ভূ-সম্পত্তি খাতির-ইজ্জত ঘরবাড়ি সবই তো টাকার খেলা।

ঘরে আমার গরজ নেই।

চিরটা কাল ফুটো চালায় তালি দিয়ে থাকবে? ছি-ছি, আশা বড় করতে হয়। বিয়েথাওয়া করবে, ছেলেপুলে হবে, দশের একজন হয়ে জমিয়ে বসবে।

জগা রীতিমত চটে গিয়ে বলে, বেশ আছি মশায়। তুমি এমনধারা লেগেছ কেন বল দিকি? ঘরবাড়ি ছেলেপুলে বিয়ে-

খাওয়া চেয়েছি তোমার কাছে? ওই মাছের কাজও করছি নে আর বেশী দিন। বড়দার মত মানুষটাকে বুদ্ধি দিয়ে আমিই জঙ্গলে নিয়ে এলাম। তাই দায়িত্ব পড়ে গেছে, খানিকটা গোছগাছ করে দিয়ে সরে পড়ব। প্রাণ আমার ছটফট করছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। আজেবাজে কথার সময় নেই। এসে পড়বে মানুষজন, জমবে এইবার। তার আগে ডিঙিটা পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখতে হবে। রাত থাকতেই আবার ডিঙির কাজ। বাদামের এক পাশে খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, বারসুঁইয়ের কয়েকটা ফোঁড় দিতে হবে জায়গাটায়। আর ঐ দেখ, খালপারে বড় জঙ্গলের দিক থেকে কালো মেঘ আকাশে উঠে আসছে। কালো মহিষের পাল বুঝি বাদাবন থেকে বেরিয়ে ডাঙা ভেবে আকাশমুখো ধাওয়া করেছে। চরের উপর নয়, ঘরের মধ্যে বসতে হবে আজ সকলের। মনটা খারাপ হয়ে যায়, বন্ধ জায়গায় বসে আরাম হয় কখনো?

নেমন্তন্নের পাট চুকিয়ে গগন কখন ফিরবে, ঠিক কি! ফড়খেলা হয়তো হবে না। পয়সার ব্যাপার—গগন ছাড়া কাঁচা-পয়সা ছুঁড়ে দেবার তাগত ক-জনার? পয়সা ছুঁড়বে যেন খোলামকুচি। গগন বিহনে নিরামিষ গানবাজনাই আজকে শুধু।

গোপাল বলেন, খেলই না হে, আমরাও জানি। দেখ খেলে এক-দান দু-দান।

কত পয়সা নিয়ে এসেছ?

সে কি আর মুখস্থ রয়েছে বাপু?

গাঁজিয়া ঝেড়ে গণে-গেঁথে সাড়ে ন-আনা হল। গোপাল বলেন, ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়—বেশি আনতে যাব কেন? খেলেই দেখ না, এই পয়সা নিয়ে নাও জিতে। বুঝব ক্ষমতা। হুঁ, এই ন-আনার চৌগুণ গেঁথে ন-সিকে পুরিয়ে যদি না ঘরে যাই, আমার নাম বদলে রেখো তোমরা।

জগা গা করে না: আর একদিন এস ভরদ্বাজ মশায়। ভাঙানি টাকা পাঁচেকের নিয়ে এস অন্তত। ন-আনার চৌগুণ না করে পাঁচ

টাকার চৌগুণ করে নিয়ে যেও। আর মা বনবিবির দয়ায় সেই পাঁচ টাকা আমরাই যদি জিনে নিতে পারি, জাঁক করে কিছু বলার মতন হবে।

খেলল না সে কিছুতে। গোপাল মনে মনে গরম হলেন। মাত্র সাড়ে ন-আনা সম্বল জেনে খেলতে চাইল না—অপমানই করা হল তাঁকে। আলা ছেড়ে তবু ওঠেন না। এসেছেন যখন গগনের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া ঠিক হবে না। হোক না রাত্রি—শান্তি সঙ্গে রয়েছে, ভাবনা কি ? গান আরম্ভ হল ওদিকে। সঙ্গে ঢোলক আর খঞ্জরি। খোলও আছে। জগা ধরল, সেই সময়টা খোল বেরুল। গোপাল শুনছেন চুপচাপ বসে বসে। শেষে আর থাকতে পারেন না, বাহবা দিয়ে ওঠেন উচ্চ কণ্ঠে : বেড়ে গলা হে তোমার। প্রাণ পাগল করে দেয়—

জগন্নাথ বলে, যাত্রার দলে ছিলাম—অধিকারীর বিস্তর পিটুনি খেয়ে খেয়ে তবে হয়েছে। থাকবে না, গলার তদ্বির হয় না—মাছের নৌকো বেয়ে বেয়ে গলার কিছু থাকে ?

মনটা এক লহমা পিছনের দিকে চলে যায়। যাত্রার দল এসেছিল কোন্ অঞ্চল থেকে, গেয়ে গেয়ে খুব নাম করল। ছেলেমানুষ জগন্নাথ ঘুরছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। গান শুনতে দু-তিন ক্রোশ চলে যায়। সমস্ত বায়না সেরেসুরে যাত্রার দল একদিন নৌকোয় চাপল। জগন্নাথও আর গ্রামে নেই। অনেকদূর গিয়ে এলাকা পার হয়ে এক এক বাঁকের মুখে নৌকো ধরে আছে। পায়ে হেঁটে জগন্নাথ সেই অবধি চলে গেল। বন্দোবস্ত ছিল তাই। চেনা-জানা কারো নজরে পড়ে না যায়। তবে তো রক্ষা থাকবে না : দেখ, দেখ, পালিয়ে যাচ্ছে যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে। জোর করে নামিয়ে নিত, যাত্রাওয়ালাদের পিটুনি দিত। তাই সেই কচি বয়সে খাল-বিল জল-কাদার ভিতর দিয়ে চার-পাঁচ ক্রোশ ছুটতে হয়েছিল। গানের নেশা এমনি। কিন্তু আকাঁড়া চালের ভাত, পুঁই-কুমড়োর ঘঁ্যাট আর অধিকারীর মার-গুতোন অধিক দিন চালানো গেল না। নানান ঘাটের জল

খেয়ে নোনাজলের বাদাবনে এখন। ছুটোছুটির মধ্যে গানবাজনা কটা দিনই বা হয়েছে! এই এখনই গগনের সায়ের বসানো থেকে সন্ধ্যার পর যা হোক দশ জনে আয়েস করে বসা যাচ্ছে।

জগন্নাথ চুপ করে গেছে তো রাধেশ্যাম ঢোলকটা টেনে নিল। ঢপাঢপ ঢপাঢপ মোক্ষম কয়েকটা ঘা দিল ঢোলকের এদিকে ওদিকে। তারপর গান। চিরদিন সে একটা গান গেয়ে এসেছে—একখানা বই দুখানা জানে না। গান কে বেঁধেছে কেউ বলতে পারে না, রাধেশ্যাম ছাড়া অন্য কারো মুখে কস্মিন কালে শোনা যায় নি এ গান:

গোবিন্দনারায়ণ
চাষ দিচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন॰;
তামুক সেজে বলরাম সে ভুড়ুক-ভুড়ুক টানে।
ছিদাম বলে, কালিয়া দাদা,
চৌদিকে যে জবর কাদা,
পান্তাভাতের শালুকখানা বল্ রাখি কোয়ানে।

রাত বেশ হয়েছে। 'চারিদিক নিঝুম নিঃসাড়। কিন্তু যে-ই না রাধেশ্যাম গানের দুটো চারটে কথা উচ্চারণ করেছে, রৈ-রৈ রব উঠল পাড়ার মধ্যে। ভাঙা কাঁসরের মতন অন্নদাসীর কণ্ঠ—অকথা-কুকথা বলছে। নেহাত বাদা-জায়গা, ভদ্রজনের চলাচল নেই, আপনারা হলে তো দু-কানে আঙুল গুঁজে নারায়ণ নারায়ণ বলে উঠতেন। বউ পতিদেবতাকে লক্ষ্য করে বাছা বাছা বিশেষণ ছুঁড়ছে। রাধেশ্যামের ভাবান্তর নেই, নির্বিকারে গেয়ে যাচ্ছে। সমের মুখে এসে হঠাৎ থামল। ঢোলক নামিয়ে রেখে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল আলার উঠানে। দুম-দুম দুম-দুম মাটি কাঁপিয়ে দৌড়।

গোপাল ভরদ্বাজ এ তল্লাটে নতুন, কাণ্ডবাণ্ড দেখে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। তুমুল আর্তনাদ—পাড়ার ভিতর থেকে অন্নদাসী মর্মান্তিক চিৎকার করছে, বহু বিচিত্র সম্বন্ধ পাতাচ্ছে স্বামীর সঙ্গে। গুড়ুম-গুড়ুম কিল পড়ছে, আওয়াজটা দিব্যি ধরা যায়। আওয়াজের

সঙ্গে সঙ্গে বউয়ের গালি তীক্ষ্ণ হয়। মিনিট কতক পরে বোধ করি দম ফুরিয়ে গিয়েই ঝিমিয়ে আসে। আবার কিল। কিল ও গালি পর্যায়ক্রমে চলল বেশ খানিকক্ষণ। তার পরে দেখা যায় অন্ধকারে গজেন্দ্রগতিতে রাধেশ্যাম ফিরে আসছে। একটি কথা বলল না সে কারো সঙ্গে। ঢোল নামিয়ে রেখে দিয়েছিল—সেই ঢোল কোলের উপর তুলে নিল। গান যেখানটায় ছেড়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই কথা থেকে আবার শুরু করে দিল। জগা এতক্ষণ একেবারে চুপ হয়ে ছিল—বোঝা যাচ্ছে, এই রাধেশ্যামের ফিরে আসার অপেক্ষায়। গান মাঝখানে বন্ধ রেখে চলে গিয়েছিল, সেটা শেষ করে না দেওয়া অবধি অন্য কেউ ধরবে না, এই রেওয়াজ।

এখানকার এই প্রতিদিনের ব্যাপার। কিন্তু নতুন আগন্তুক গোপালের তাজ্জব লাগে। একেবারে কিছু না বলে থাকতে পারেন না। ঐ গানের ভিতরেই জিজ্ঞাসা করলেন, মারমুখী হয়ে অমন ছুটে বেরুলে কেন ?

রাধেশ্যাম সঙ্গীতরসে মজে আছে, কণ্ঠে একবিন্দু জ্বালা নেই। একগাল হেসে বলল, রাশ করে এলাম মশায়।

সেটা আবার কি ?

রাশ বোঝেন না : মাগী বড্ড বাড়িয়েছিল। লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছে। আপনি এতবড় একজন মানুষ, কী মনে করলেন বলুন তো ? কটা কিল ঝেড়ে ঠাণ্ডা করে এলাম। দু-চার দিন এখন ঠাণ্ডা থাকবে, সোয়ামি বলে মান্য করবে।

অন্যদিন হয়তো তাই হয়ে থাকে। আজ অন্নদাসীর কী হয়েছে —রাধেশ্যাম আবার গান ধরতে না ধরতে পুনশ্চ চিৎকার। গোড়ায় গোড়ায় যেমন হয়—রাধেশ্যামের ভ্রূক্ষেপ নেই, গানের গলা দ্বিগুণ চড়িয়ে দিল।

জগা কাছ ঘেঁষে এসে তার পিঠের উপর হাত রাখে : আর উঠিস নে রাধেশ্যাম। মেরেধরে আজ কিছু হবে না, বড্ড ক্ষেপে গেছে। ওসব কোন কথা কানে নিস নে।

এক লহমা গান থামিয়ে মুখ বিকৃত করে রাধেশ্যাম বলে, সমস্তটা দিন পেটে দানা পড়ে নি। অসুরের মতন গতরখানা—তিনবেলা তিন পাথর ফুস-মন্তরে উড়ে যায়। সেই মানুষের কাঠ-কাঠ উপোস।

গোপাল শিউরে উঠে বলেন, বল কি হে?

রাধেশ্যাম বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, জলের নীচের মাছ—সব দিনই যে সুড়সুড় করে জালের তলে আসবে তার কোন নিয়ম আছে? উপোসের কথা যদি বলেন, সেটা কি একলা ওর? না নতুন কোন ব্যাপার? এই আমরা সব জুটেছি, পেটে টোকা দিয়ে দেখুন—কত জনে এর মধ্যে উপোসী। কোন্ কাজটা তার জন্যে আটকে রয়েছে বলুন।

তিক্ত কণ্ঠে আবার বলে, মাগীটারও কী স্বভাব! পরশু দেড় টাকা রোজগার হল। সীতাশাল চাল নিয়ে এল বরাপোতা পার হয়ে গিয়ে। কি না মোটা চালের ভাতে পেট গড়গড় করে। ঘি এল তিন আনার, পেঁয়াজ, কালজিরে, চাটনি হবে তার চিনি-কিসমিস। খাবার সময় জলে দেখি কর্পূরের বাস। কী ব্যাপার, কর্পূর আসে কেন রে? শেষবেশ নাকি চারটে পয়সা বেঁচেছিল, তাই দিয়ে কর্পূর কিনে জলে দিয়েছে। বুঝুন। সাক্ষাৎ উড়নচণ্ডী, পয়সা ইঁদুর হয়ে ওর গায়ে কামড় দিতে থাকে। খরচা করে ফেলে নিশ্চিন্ত।

বুদ্ধীশ্বর ও-পাশ থেকে বলে ওঠে, উঁহু, ষোলআনা হল না। ভালমানষের মেয়ের ঘাড়ে সব দোষ চাপালে হবে না—আমিও বলি, পয়সা ঘরে রাখলে রক্ষে আছে? এমনি না দিল তো জোরজার করে কিংবা হাত সাফাই করে সেই পয়সা নিয়ে গিয়ে তুই নেশাভাং করবি। কাঁচা পয়সা রাখে তবে কোন্ ভরসায়?

মরুক গে উপোস করে। তবে কেন মরণ-চেঁচানি?

রাধেশ্যাম প্রাণপণ বলে এবার ঢোলে ঘা দিচ্ছে, বউয়ের ঝগড়া যাতে কানে না ঢোকে। চিৎকার যত, বাজনা তার বিস্তর উপরে। চপাচপ চপচপ, চপাচপ চপচপ। কানের পর্দা চৌচির হবার দাখিল।

যাঃ শালা, ঢোল ফেঁসে গিয়েছে।

আর কী আশ্চর্য, ওদিকেও যে ঝিমিয়ে গেছে একেবারে। খালি পেটে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা কাঠ হয়ে হয়তো বা আর এখন আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

সলজ্জে রাধেশ্যাম বলে, ঢোলক আমার হাতেই ফাঁসল রে জগা। ছাউনি মগ্ন হয়েছিল, ঝোঁকের মাথায় হুঁশ ছিল না। তা তুই নতুন করে ছেয়ে নিয়ে আয় ফুলতলা থেকে। খরচা, আমার থেকে নিয়ে নিস।

না, মেঘটা যেন গোলমাল করল না। শতখণ্ড হয়ে আকাশের এদিকে সেদিকে ভেসে বেরিয়ে গেল। কালো জঙ্গলের উপর চাঁদ। কী সর্বনাশ, আসর শেষ হয়ে গিয়ে কাজকর্মের মুখটায় চাঁদ এবারে আকাশে চেপে বসলেন। গগনের অনুপস্থিতিতে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন গোপালকে রাধেশ্যাম জিজ্ঞাসা করে, কোন্ তিথি আজ ভরদ্বাজ মশায়? চাঁদ কতক্ষণ আছে?

গগন নিমন্ত্রণ সেরে গাঙ পার হয়ে এই সময় এসে পড়ল।

কি গো, এখনো চলছে তোমাদের? কাজের সময় হয়ে গেল, খাওয়াদাওয়া করবে আর কখন? আমি খাব না, সে তো জানই।

জ্যোৎস্নার ক্ষীণ রশ্মি ঘরের মধ্যে। নজর পড়ল, গোপাল ভরদ্বাজের দিকে। গোত্রছাড়া হয়ে মাচার উপর বসে আছেন। তাঁকে দেখে কাজের কথাবার্তা আপাতত এগোয় না।

আপনি—ভরদ্বাজ মশায়? কতক্ষণ আসা হয়েছে? ভাল, ভাল, এইখানেই চাট্টি সেবা হোক তবে।

অর্থাৎ প্রকারান্তরে উঠতে বলা হচ্ছে তাঁকে। গোপাল না-না করেন: আমার জন্য পাকশাক ওদিকে হয়ে আছে।

রাত অনেক হয়েছে। যেতে তো অনেকক্ষণ লাগবে। তাই বলছিলাম, কাজ কি ঝঞ্ঝাট করে? যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে এইখানে গড়িয়ে পড়লে হয়।

গোপাল বলেন, উঁহু, ঘেরিতে কত কাজ আমার। শালতি সঙ্গে আছে। সাঁ করে চলে যাব। আমি উঠি।

গগন বলে, ভর জোয়ার—কোটালের মুখ। বাঁধের কানা অবধি জল উঠেছে। রাত্রে শালতিতে উঠতে যাবেন না। খজিতে মাটি পাবে না, একটু কাত হলে সামলে উঠতে পারবে না। এক কাজ কর বুদ্ধীশ্বর, শালতিতে উঠে কাজ নেই। ডিঙিতে করে তুই একেবারে আলায় তুলে দিয়ে আয়। বাঁধে ছেড়ে দিস নে। রাত্তিরবেলা উড়ো কাল—আলায় তুলে দিয়ে তবে ফিরে আসবি।

আলো ধরে খুব খাতির করে ভরদ্বাজকে নিজেদের ডিঙায় তুলে দিয়ে গগন ফিরে এল। উঠানে এসে দাঁতে দাঁত রেখে বলে, শালা ওৎ পেতে ছিল। আমি এসে না তুলে দিলে রাতের মধ্যে নড়ত না। ঘাঁতঘোঁত বুঝে নিত, মানুষজন চিনে রাখত। বুদ্ধীশ্বরকে একেবারে আলায় তুলে দিয়ে আসতে বললাম, পথে ঘাটে না ছেড়ে দেয়। চাঁদ ডুবে যায়, আর বসে রয়েছ কেন তোমরা ?

অন্নদাসীর শাপশাপান্ত বন্ধ হয়েছে। পাড়া নিঃশব্দ। রাত ঝিমঝিম করছে। ভাঁটার টান ধরল বুঝি এইবার। বাদার জল কলকল করে খালে পড়েছে, সেই আওয়াজ। জন পাঁচ-সাত মরদ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ঃ থুড়ি বুড়ো-হালদার, মান রেখো বাবা, জাল টেনে তুলতে ঘাম ছুটে যায় যেন।

মাছ ধরবার আগে বুড়ো-হালদারের নাম স্মরণ নেয়। তিনি সদয় হলে মাছ পড়ে ভাল। সে দেবতার বিগ্রহ নেই, পুজা-প্রকরণ কিছু নেই, পুরাণে-পাঁজিতে কোন রকম তাঁর খবর মেলে না। তবু আছে নামটা। থুড়ি বলে মাটিতে থুতু ফেলে বেরিয়ে পড়ে মাছ-মারারা। বুড়ো-হালদার জলের মাছ তাড়িয়ে এনে জালে ঢোকাবেন। যদি ছিপ নিয়ে বসো, তোমার চারে ভুলিয়েভালিয়ে ভাল মাছ নিয়ে আসবেন। থুড়ি, থুড়ি, থুড়ি বুড়ো-হালদার।

একুশ

আর এদিকে ঢেকুর তুলে গগন দেখি মাছুর পাতবার উদ্যোগে আছে। ঠেসে এসেছে প্রচুর, খাড়া হয়ে বসে থাকবার তাগদ নেই। জগা ও বলাই উঠে পড়ে পাড়ার মধ্যে তাদের চালাঘরের দিকে চলল। রান্না-খাওয়া এবারে। তার পরে চক্ষু বুজে পহরখানেক পড়ে থাকা। হর ঘড়ুই শুধুমাত্র গগনকে নিমন্ত্রণ করল, ঘেরির মালিক বলেই সমাদর দেখাল। গগনকে ইতিমধ্যেই আলাদা নজরে দেখছে সবাই। এর পরে নতুন ঘেরি জমজমাট হয়ে উঠলে তখন গগন আর এক মেছো-চক্কোত্তি। জগা-বলাইয়ের সঙ্গে হর ঘড়ুই কতবার এক ডিঙিতে গিয়েছে। মুখে এত খাতির, কিন্তু তাদের বলল না। তা হলে আজকে রাত্রির হাঙ্গামাটা কাটানো যেত।

বলাই বলে, না-ই বা বলল, গিয়ে পড়লে ঠেকাত কে? এই যে এসে গেছি ঘড়ুই মশায়। নেমন্তন্ন করতে তোমার ভুল হয়েছিল, তা বলে আমরা ভুল করব কেন?

জগা বলে, মনে আমার উঠেছিল কথাটা। করতাম ঠিক তাই। ভরদ্বাজ এসে পড়ে গোলমাল করে দিল। তার উপরে বড়দা আমার উপরে আলার ভার দিয়ে গেল। চৌধুরিগঞ্জের ঐ শয়তানগুলোর মুখ মিষ্টি, মনে মনে ওরা কোন প্যাঁচ কষছে কে বলবে?

বাঁধের উপর পড়ে ফিরে তাকায়। কী আশ্চর্য, হেরিকেন জ্বলছে এখনো। শুয়ে পড়েও আলো জ্বালিয়ে রাখে, বড়দা যে লাটসাহেব হয়ে উঠল! ঠাহর করে দেখে, উঁহু—শোয় নি এখনো, কী কতকগুলো কাগজ নিয়ে আলোর কাছে এসে পড়ছে। জরুরী বস্তু নিশ্চয়, দিনের আলো অবধি সবুর সইল না। কেরোসিন পুড়িয়ে পড়ে নিতে হয়।

পেট মানে না, অতএব ঘরে এসে রান্নার যোগাড়ে বসতে হল। বিশেষ করে হর ঘড়ুইয়ের বাড়ির রকমারি আয়োজনের গন্ধ শুনে

অবধি ক্ষিধে যেন বেশী বেশী আজকে। জগন্নাথ উনুন ধরাচ্ছে, বলাই চুপচাপ বসে। সর্বকর্মে সহকারী বলাই—কেবল এই রান্নার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে। রাঁধাবাড়া শেষ হবার পরেই তার কাজ—খাওয়া, এবং বাসনকোশন ধোওয়া। জগা যা-হোক কিছু জানে, কিন্তু বড় আলসেমি তার রান্নার ব্যাপারে। বাদাবনে নয়, উনুনের ধারেই যেন বাঘ। মানুষ কি জন্যে বিয়ে করে, জগা কখনোসখনো ভাবতে যায়। জলজ্যান্ত একটা মেয়েলোক ঘাড়ে তুলে নেয়, অপারগ হলেও যাকে আর নামানোর উপায় থাকে না। ভাবতে গিয়ে তখন এই রান্নার কথা মনে ওঠে। আগুনের তাপে বসে রান্নার ঝামেলা পুরুষমানুষের পক্ষে অসহ্য, মরীয়া হয়ে তাই মেয়েলোক বিয়ে করে বসে। লোক-জন রেখে যে চলে না, তা নয়। শহরের হোটেলে দেখ গিয়ে, দশাসই জোয়ানরা রাঁধাবাড়া ও দেওয়া-থোওয়া করছে। শহরে কেন, কুমিরমারিতেই তো গদাধর শানা পৈতে ঝুলিয়ে ভটচাজ্জি হয়ে গদাধর আশ্রম বানিয়ে দিব্যি দু-পয়সা রোজগার করছে। তবে ঐ ব্যবস্থার মুশকিল, রাঁধুনী-পুরুষকে মাইনে দিতে হয় নগদ টাকা। এবং মাইনে-করা মানুষ হলেই কখনো আছে কখনো নেই। বিয়ে-করা পরিবার সম্পর্কে মাইনের ঝঞ্ঝাট নেই। এবং তারা কায়েমী বস্তু।

কাঁচা কাঠ কেটে রেখেছ জঙ্গল থেকে, ভাল রকম শুকোয় নি। উনুন ধরাতে গিয়ে হয়রান—পালা করে ফুঁ দিচ্ছে একবার জগা একবার বলাই। এমনি সময়, অবাক কাণ্ড, এতখানি পথ ভেঙে গগন এসে ঘরে ঢুকল।

কি করছ? অ্যাঁ, ভাতটাও চাপাও নি এতক্ষণে?

বলাই আশ্চর্য হয়ে বলে, শোও নি যে বড়দা, এত রাত্রে বাঁধের উপর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছ!

জগা বলে, পরের ভাত পেয়ে ঠেসে চাপান দিয়ে এসেছ, পেটের মধ্যে ফুটছে বুঝি? ভাত ঘড়ুইয়ের কিন্তু পেটটা যে নিজের, সেটা তখন মনে ছিল না।

গগন গম্ভীর। এসব রসিকতার জবাব না দিয়ে সে বলে, গায়ের

জোর দিয়ে উনুন ধরানো যায় না রে! কায়দা-কৌশল আছে। কাঠ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উনুনের দফা নিকেশ করেছ—সর, আমি ধরিয়ে দিয়ে যাই।

কোন কাজে জগা অক্ষম, শুনলে অভিমানে লাগে। বলে, কাঁচা কাঠে উনুন ধরবে কি! বলাইর কাণ্ড, এক গাদা কাঁচা গেঁয়োকাঠ কেটে রেখেছে। আবার তা-ও বলি, বাদার মধ্যে খুঁজে খুঁজে শুকনো কাঠ কেটে আনব, ছুটিই বা পাচ্ছি কোথা? নৌকা বাওয়ার এক দিনের তরে বিরাম নেই। ওসব হবে না বড়দা, ডিঙি একদিন কুমিরমারি না গিয়ে বাদার দিকে চালিয়ে দেব। মাছ পচলে নাচার। আগেভাগে বলে রাখছি, তখন দোষ দিতে পারবে না।

গগন তাড়াতাড়ি বলে, আমি বসছি। দেখবে এবারে কাঁচা কাঠ জ্বলে কি রকম দাউ দাউ করে। ফুঃ ফুঃ—

খান কয়েক খামের চিঠি হাতের মুঠোয়। সেগুলো উনুনে দিল। ফুঃ ফুঃ—

ফুঁয়ের জোরে অথবা এই চিঠির ইন্ধনে উনুন এবারে ধরে গেল।

ফুরসত পেয়ে জগা জিজ্ঞাসা করে, চিঠি বুঝি বরাপোতা থেকে নিয়ে এলে? অত চিঠি কে লিখল?

গগন বলে, গরজ বিনে কে কোন্ কাজ করে? যাদের গরজ তারাই লিখেছে। এত চিঠি এক দিনে আসে নি, বিস্তর দিন ধরে জমে ছিল বয়ারখোলার তৈলক্ষের কাছে। হঠাৎ কোন্ খেয়াল হল, ঠিকানা কেটে এক সঙ্গে সব পাঠিয়ে দিয়েছে। তার পরে পিওনের ঝোলার মধ্যেই পড়ে আছে কত কাল। ঘড়ুইয়ের বাড়ি পিওনেরও নেমন্তন্ন, আজকে সে চিঠি দিয়ে দিল।

বলাই বলে, কষ্ট করে লিখেছে—সমস্ত উনুনে দিয়ে দিলে বড়দা? কি লিখেছে?

গগন বলে, কী এমন হীরে-মুক্তো যে প্যাঁটরা ভরে রাখতে হবে! পয়সা খরচ করে লোকে চিঠি পাঠায় কি 'কেমন আছ ভাল আছি'র জন্যে? দুটো-চারটে কথা পড়েই মাথা চনমন করে উঠল।

স্থির থাকতে পারি নে। চলে এলাম শলাপরামর্শ করতে। আবার শাসানি দিয়েছে, টাকা না পাঠালে সব সুদ্ধ এসে পড়বে।

জগা ঘাড় নেড়ে বলে, ভয়ের কথা বটে!

বলাই অভয় দিচ্ছে: বাদা জায়গার পথ ঠিক করে যমরাজা আসতে পারে না, এখানে আসবে মানষেলার মেয়েছেলে! দূর!

গগন আলায় ফিরে গেছে। খেয়েদেয়ে বলাই-জগা গড়িয়ে পড়ল। এদের কাজ পোহাতি-তারা উঠবার পর। এখন যাদের কাজ, তারা সব বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পনের-বিশ মরদ বেরিয়েছে নানান দিকে। গগন নিশ্বাস ফেলে এক এক সময়: মূলধন থাকলে মাছ-মারার লোক পনের-বিশ থেকে পঞ্চাশে তোলা যেত। মাছের দরদাম করে ব্যাপারীরা তো ঝোড়া নৌকোয় তুলল—দামটা তখনই মাছ-মারাদের আগাম ফেলে দিতে হবে। কুমিরমারি মাছ বিক্রি হয়ে নৌকো ফেরত এলে সে টাকা আদায় হবে তখন। নবলগ টাকার ব্যাপার। টাকা বেশী থাকলে নৌকোও করা যেত আর একটা। পুরানো দিনকাল নেই বটে, তা হলেও কাঙালি চক্কোত্তির পথে এগুনো যায় এখনো অনেকখানি দূর। খালি হাতে কত আর খেল দেখিয়ে পারা যায়? আবার এরই মধ্যে চিঠির পরে চিঠি। বনে এসেও ত্রাণ নেই। কত জন্মের মহাজন যে বিনি-বউ! সাগরের নীচে ডুবে থাকলেও বোধ করি সাগর সেঁচে হিড়হিড় করে টেনে তুলত।

টিপিটিপি পা ফেলে সাঁইতলার পনের-বিশ মরদ নানান দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু চৌধুরিগঞ্জ নয়—ছোট-বড় আরও সব ঘেরি রয়েছে নানান দিকে। যে জায়গায় যখন সুবিধা। হাতে খেপলা-জাল, কোমরে বাঁধা বাঁশের বুনানির খালুই। আলোর কথাই ওঠে না, যত অন্ধকার ততই মজা। দিনমানে নিরীহ ভাবে ঘুরে ফিরে মনে মনে আঁচ করে আসে, কোন্ ঘেরির কোন অঞ্চলে আজকের অভিযান। ঘোরাফেরারই বা কী এমন দরকার—এ তল্লাটের সকল

সুলুক সন্ধান মাছ-মারাদের নখদর্পণে। দিনমানেই চলতে গিয়ে পদে পদে সাপ দেখবেন আলের উপরে, বাঁধের উপরে। রাতের অন্ধকারে বেপরোয়া এরা চলাচল করে, অথচ সাপে কেটেছে কেউ কোনদিন শোনে নি। কেমন যেন বুঝসমঝ আছে সাপে আর মানুষে- একই তর জীব। কেউ যায় গড়িয়ে গড়িয়ে বুকে ভর দিয়ে, কেউ বা পা টিপে টিপে ধনুকের মতন বাঁকা হয়ে। ঝিম-ঝিম করে চতুর্দিক, রাত্রিচর কোন পাখি পাখার ঝাপটায় অন্ধকারে দোলা দিয়ে মাথার উপর দিয়ে হয়তো বা উড়ে গেল। ঝপাং করে আওয়াজ একবার জলে—জাল ফেলল কোন মাছ-মারা। পাহারার লোক এদিক-সেদিক ছড়িয়ে আছে, ডিঙি-শালতি পাঁচ-সাতখানা সাঁ-সাঁ করে ছুটেছে সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে। ডাঙার বাঁধে মানুষ ছুটেছে হেরিকেন দুলিয়ে শব্দসাড়া করে। কোথায় কে? আন্দাজি জায়গাটায় এসে দেখা যাবে, সদ্য জাল ঝেড়েছে—তার শেওলা-গুগলি পড়ে আছে কতকটা। মানুষ উধাও। তখনই হয়তো বা কানে আসবে অনেক দূরে ঠিক অমনি জাল ফেলার শব্দ। ছোট আবার সেদিকে। রাত দুপুরে এ-ঘেরিতে ' ও-ঘেরিতে নিত্যিদিনের এই লুকোচুরি-খেলা।

আগে এত দূর ছিল না। বেশী মাছ ধরে পচিয়ে ফেলে মুনাফা কি? এখন জায়গা হয়েছে—করালী গাঙ আর সাঁইতলা-খালের মোহানায় গগন দাসের আলা। মাছ মেরে সোজা এনে নামাও আলার উঠানে। ব্যাপারীতে ব্যাপারীতে রেষারেষি—আট আনা, দশ আনা, এগারো আনা, সাড়ে-এগারো, বারো। দর শুনে রাধেশ্যাম আগুন। পুরো ঝুড়ি নিয়ে এলাম—পারশে, বাগদা-চিংড়ি, ভেটকির বাচ্চা—কানা ব্যাপারীরা দেখেও না চোখ তাকিয়ে? বারো আনা বলে কোন্ বিবেচনায়? বারো আনা হলে জলের মাছ জলে ঢেলে দেব। নয় তো বরাপোতার বাজারে নিয়ে হাতে কেটে বেচে আসব। তাতেও কোন না পাঁচ-সিকে দেড়-টাকা হবে।

এক টানে মাছের ঝুড়ি নিয়ে আসে নিজের দিকে। হর ঘড়ুই বলে, রাখ, রাখ,—রাগলে কাজকর্ম হয় ? আচ্ছা, আরও দু-আনা ধরে দিচ্ছি। উঁহু, এক আধলা নয় এর উপরে। বউ অন্নদাসী ওৎ পেতে আছে উঠানের এক দিকে। একা সে নয়, পাড়ার আরও যত মেয়েলোক। মাছ-মারাদের বউ-বোন-মা-পিসী। বসে আছে সেই কখন থেকে—পান-তামাক খায়, চুপি চুপি গল্পগুজব করে নিজেদের মধ্যে। মাছের দরদাম হচ্ছে, সচকিত হয়ে ওঠে সেই সময়টা। বিক্রি পাকা হয়ে গগনের খাতায় লেখা পড়ল, তড়াক করে উঠে এসে মেয়েলোকে অমনি হাত পাতবে। খাতাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে দাম মিটিয়ে দেবে, এই হল দস্তুর। দিতে হবে মেয়েলোকের হাতে। পুরুষের হাতে পড়েছে কি অন্ততপক্ষে আধাআধি গায়েব হবে নেশাভাঙের দরুন। নেশা করে পড়ে থাকবে, পরের দিন আর জালে নামবে না। অতএব খাতাওয়ালার স্বার্থও বটে। গগন চৌদ্দ আনার দুটো পয়সা তোলা কেটে রেখে সাড়ে-তেরো আনা দিয়ে দেয় অন্নদাসীর হাতে। আরও দুটো পয়সা আদায় হবে ব্যাপারী হর ঘড়ুই যখন দাম শোধ করবে, চোদ্দ আনার জায়গায় সাড়ে চোদ্দ আনা দেবে। পয়সা আঁচলের মুড়োয় বেঁধে বউ চলে গেল। রাধেশ্যামের এর পরে আর কাজ নেই বেলা আড়াই প্রহর অবধি। স্নান করে মাথায় টেরি কেটে ঘুমাক পড়ে পড়ে—বউ বাজারঘাট রান্নাবান্না সেরে এসে ডেকে তুলবে। খাওয়া-দাওয়ার পর পুনশ্চ শুয়ে পড়ুক, অথবা যা খুশি করুকগে। কাজ আবার সেই নিশিরাত্রে। ভোরের মুখে ভরতি খালুই নিয়ে উঠবে গগনের আলায়—তবে আর ঝগড়াঝাঁটি হবে না, বউ মন্দ বলতে যাবে না পুরুষকে।

সকালবেলা পাড়ার মধ্যে কানা স্থাপলা।

রাধেশ্যাম কই গো ? পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ, রাতের কাজকর্ম তবে ভাল। বেশ, বেশ।

চোখ কচলাতে কচলাতে রাধেশ্যাম উঠে বসল। ন্যাপলা বলে, ভরদ্বাজ মশায় এক পালি এই চাল পেঠিয়ে দিল।

কেন, চাল কেন।

তোমার বাড়ির চেঁচামেচি কাল শুনে গেল। দয়ার প্রাণ, দয়া হয়েছে—আবার কেন?

রাধেশ্যাম খাতির করে ডাকে: উঠোনে কেন ন্যাপলা দাদা, দাওয়ার উপরে উঠে বস। পান-তামাক খাও। কি কি বলল, শুনি সমস্ত কথা।

হোগলার চাটাই পেতে দিল ন্যাপলাকে। ঘরের ভিতরে ঘুরে এসে বলে, পান নেই ন্যাপলা দাদা। পান খাবে তো বিকেলে এস। বউ বরাপোতা গেছে, পান-খয়ের-লবঙ্গ সব এসে পড়বে।

হুঁ, ঘুমের রকম দেখেই বুঝেছি। বড়লোক হয়ে গেছ আজকে। বাবু তো বাবু—রাধেশ্যাম বাবু।

ঐ তো মজা। আজ নবাব, কাল ফকির। কাল উপোস গেছে, আজকে ডবল খাওয়া খেয়ে নেব। চাল ফেরত দাওগে ন্যাপলা দাদা, আজ লাগবে না। কাল দিলে কাজে লাগত। ঝগড়া-কচকচি যখনই হবে, বুঝে নিও সেদিন বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। তখন নিয়ে এস।

তামাক খেতে খেতে ন্যাপলা চোখ পিট-পিট করে বলল, চাল ফেরত দিয়ে মুনাফাটা কি? ভরদ্বাজ কি ঘরের থেকে এনে দয়া দেখায়? মনিব মেরে দিচ্ছে, ফেরত দিলেও সেই মনিব অবধি ফেরত পৌঁছবে না।

রাধেশ্যাম বলে, তবে থাক।

ন্যাপলা আর গোটা কয়েক টান দিয়ে রহস্য-ভরা কণ্ঠে বলে, বউ তোমার ফিরবে কতক্ষণে?

সকল পথ দৌড়াদৌড়ি, গাঙের ঘাটে গড়াগড়ি। গাঙের পারাপার আছে, দেরি বেশ খানিকটা হবে বই কি!

তবে চল। চাঁদের কুনকে হাতে করেই যাচ্ছি।

রাধেশ্যাম বুঝেছে। উৎসাহের সঙ্গে তড়াক করে দাওয়া থেকে নামল। বলে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু, বউ এসে পড়বার আগে।

যেতে যেতে ফোঁস করে একবার নিশ্বাস ছাড়েঃ অর্থপিশাচ মাগী। রাত জেগে জাল বেয়ে মরি, তা যদি দুগণ্ডা পয়সা হাতে নিতে দেয়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে—পারলি কই আটকাতে? এক কুনকে চাল বিক্রি করে একটা আধুলি তো নিদেন পক্ষে।

কানা ন্যাপলা দেমাক করেঃ আমাদের এসব ঝামেলা নেই। এস্তাজারির ধার ধারি নে। দু-পয়সা রোজগার করব তো সে দুটো পয়সাই আমার। যা ইচ্ছে করব, গাঙের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও কথা নেই।

অন্নদাসী এসে পড়বার আগেই বাড়ি ফেরার কথা, ফিরে এল এক প্রহর রাতে। একা একা এসেছে, ন্যাপলা সাহস করে নি পাড়ার মধ্যে এসে অন্নদাসীর মুখোমুখি পড়তে। বাজারে বুঝি কটা মুড়ির মোয়া কিনে খেয়েছিল বউ, তার পর বাড়ি এসে রাঁধাবাড়া করে চুপচাপ বসে আছে। কাল উপোস গেছে, আজও মুখে ভাত পড়ে নি এখনো। ঘরে এসে রাধেশ্যাম হাউ-হাউ করে কাঁদে। কান্নার চোটে বাচ্চাটা জেগে উঠে কাঁদতে লাগল। পুরুষ ঠেকায় না বাচ্চা ঠেকায়, অন্নদাসীর এই এখন মুশকিল।

রস অর্থাৎ তাড়ি গিলে এসেছে। রস খেলে মন নরম হয়, মায়াদয়া উথলে ওঠে। কিন্তু পয়সা কোথায় পেল? অন্নদাসী নানান কায়দায় জেরা করে। জালে আজ বেরুল না রাধেশ্যাম, বেরুবার অবস্থাও নেই। যা ছিল এদিকে তো পাইপয়সা অবধি খরচপত্র করে এসেছে অন্নদাসী। রাত পোহালে যে আবার একটা দিন হবে, কালকের সে দিনের উপায়?

রাগ হলে অন্নদাসীর জ্ঞান থাকে না। পরের দিন সোজা চলে গেল চৌধুরিগঞ্জের আলায়। ভরদ্বাজ তখন নেই। বাঁধ ঘুরতে বেরিয়েছেন। বাঁধ বাঁধা এবং বাঁধ কেটে ঘেরিতে নোনা জল তোলার সময় এইবার। সেই সবের তদারকি হচ্ছে। রান্নাঘরে কান্নাসোনা।

খাচ্ছে। রাতে ভাত বেশী হয়ে যাওয়ায় কড়াই স্থদ্ধ ভাতে জল ঢেলে রেখেছিল। সেই কড়াই থেকেই খেয়ে নিচ্ছে। অন্নদাসী হুমকি দিয়ে পড়েঃ চাল দাও—

চাল? কেন, তোমায় চাল দিতে হবে কেন?

ন্যাপলা কাল দিয়ে এসেছিল তো আজও ফের দিতে হবে।

মুখের দিকে তাকিয়ে কালোসোনা ফিক করে হাসলঃ দেবার মালিক আস্থক। এসে যা হয় করবে। বেলা চড়ে উঠেছে, আসবে এইবারে। ভরদ্বাজ মশায় গা ঘামিয়ে মনিবের কাজ করে না।

গব-গব করে খেয়ে নিচ্ছে। আর শুনছে রাধেশ্যাম ও কানা ন্যাপলার কাণ্ড। খেয়েদেয়ে কড়াইটা এগিয়ে দেয়ঃ অমন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বউ? বস। ঘাটে নিয়ে বসে বসে কড়াইখানা মেজে দাও দিকি। তোমায় দেখেই তাড়াতাড়ি অবসর করে দিলাম। ঘষামাজা আমি তেমন পেরে উঠি নে।

কড়াই দেখে অন্ন মুখ সিঁটকে বলে, কী করে রেখেছ! হাতে ধরতে ঘেন্না করে। নাম কালো তো যা ছোঁবে তাই অমনি কালি-ঝুলি হয়ে যাবে?

ঘাটে বসে কড়াই মাজে অন্নদাসী। নতুন কড়াই কেনার পরে মাজে নি বোধ হয় কোনদিন। অন্নকে দেখেই খেয়াল হল কালো-সোনার। পরের গতর দেখলে খাটিয়ে নেওয়া এদের অভ্যাস। দুই আংটা দুখানা পায়ে চেপে ধরে খড় আর ভাঙা-হাঁড়িকুড়ির চাড়া দিয়ে সজোরে ঘষছে। উপোসের পর উপোস দিয়েও গায়ে কিন্তু দিব্যি জোর। এক গণ্ডা সন্তানের মা, তিনটে পেট থেকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে—বাঁধন-আটা অন্নদাসীর শরীরখানা তবু চেয়ে দেখতে হয়।

ভরদ্বাজ দলবল নিয়ে ফিরলেন। মাজা কড়াই হাতে নিয়ে অন্নদাসী ঘাট থেকে উঠে এল। ভরদ্বাজ তারিপ করেনঃ পরিষ্কার কাজকর্ম তোমার হে! রুপোর মতন ঝকঝকে করে ফেলেছ।

অন্নদাসী বলে, খোরাকির চাল দিতে হবে। সেইজন্যে দাঁড়িয়ে

আছি। কালকের চাল বরবাদ হয়ে গেছে আজকে নিজে হাতে করে নিয়ে যাব।

ভরদ্বাজ বলেন, ও, রাধেশ্যামের বউ তুমি ? এ বড় ফ্যাসাদের কথা হল। একদিন দিয়েছি বলে, রোজই দিয়ে যেতে হবে ?

হবেই তো। কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখালেন কি জন্যে ?

বলে মুখ টিপে অন্নদাসী হাসল।

ভরদ্বাজ তাকিয়ে দেখে বললেন, আচ্ছা থাক তুমি। এদের সঙ্গে সেরে আসি আগে। তোমার সব কথা শুনব।

বাইশ

জগা বলল, ফুলতলায় যাব বড়দা। ঢোলক ছেয়ে আনব, আর ভাল খঞ্জরি পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। এ জোড়া ক্ষয়ে গেছে।

গগন বলে, তুমি ঢোলক ছাইতে গেলে কুমিরমারি মাল পৌঁছবে কেমন করে ? এত জন মাছ-মারা, তাদের উপায় কি ? তারা কি খাবে ?

এক দিনের তো মামলা। নয়তো বড় জোর দুটো দিন। কত ব্যাপারী আছে—হর ঘড়ুই, মুলুক মিঞা, বুদ্ধীশ্বর—ওদের চালিয়ে নিতে বল।

ওরা বেয়ে দেবে মাছের নৌকো, তবেই হয়েছে! ছাগলের পায়ে ধান পড়লে লোকে গরু কিনত না। নৌকো নিয়ে পৌঁছতেই বিকেল করে ফেলবে—গঞ্জের খদ্দেরপত্তোর সমস্ত ততক্ষণে সরে গেছে, মাছ পচে গোবর।

জগন্নাথ খুশী হয়েছে অন্য সকলকে ছাগল বলা এবং তাকে গরুর সম্মান দেওয়ার জন্য। তবু বলল, আমি যদি কাজ ছেড়ে চলে যাই ? এমন তো কতবার হয়েছে। এক কাজ নিয়ে পড়ে থাকবে, সে মানুষ জগন্নাথ নয়।

তুমি ছাড়লে আমি তোমায় ছাড়ব না।

কথার কথা নয়, মনে মনে জগার সম্পর্কে রীতিমত শঙ্কা। যে রকম খেয়ালী লোক, এক লহমায় ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়া অসম্ভব নয় তার পক্ষে। গগন তা হতে দেবে না। ভোর-রাত্রে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে মোটরবাস ধরা। এক জীবনের মৃত্যু হয়ে পুনর্জন্মে এসে গেল। এত দিনে এইবার মনে হচ্ছে, চেপে বসার দিন এসেছে।

গগন বলে, যেখানে যাবে আমি তোমার পিছন ধরব জগা। দেখি, পালাও কোথা। কোন দিন তোমায় আর পালাতে দেব না।

আরও খুশী জগন্নাথ। খোশামুদি পেলে আর সে কিছু চায় না। বলে, আমি যদি মরে যাই বড়দা—

গগন আগুন হয়ে বলে, মরণের ডাক ডাকবে না বলছি। ভাল হবে না! মেরে খুন করে ফেলব বারদিগর বাজে কথা মুখে আনলে।

জগা হেসে ফেলে বলে, আচ্ছা—আচ্ছা, ঘাট মানছি। থাম এবারে বড়দা। কিন্তু রাধেশ্যাম যে ঢোলক ছিঁড়ে দিয়েছে—গানবাজনা না হলে টিকতে পারবে সন্ধ্যের পর? বল সেটা। তা হলে চুপচাপ থেকে যাই।

কদিন কেটে যায় বিনা সঙ্গীতে। সত্যি, অসহ্য। দিনের আলো যতক্ষণ থাকে, সে একরকম। রাতে একেবারে ভিন্ন জগৎ। অকারণ ভেড়িতে চলাফেরা করো না, কেউটে সাপ। জলে পা দিও না, কুমির। গাছের উপর কুঁকুঁ করছে, বানর। হরিণের ডাক আসে ওপারের বাদাবন থেকে, এক-একবার তার মাঝে বাঘের হামলা। কলকল করে জল নামছে একটানা কোন দিকে, জোলো হাওয়ায় গোলবনে পাতা ঝিলমিল করে। এই হল বাদাবন। এরই মধ্যে আপাতত নিষ্কর্মা কয়টি প্রাণী অন্ধকার আলাঘরের ভিতর। সেই কত দূরের কুমিরমারি থেকে কেরোসিন কিনে নিয়ে আসে, কেরোসিন দুর্মূল্যও বটে। ভোর-রাত্রে কেনাবেচার সময়টা আলো

জ্বলে। পারতপক্ষে আলো আর কোন সময় জ্বালতে চায় না। এমন কি রাতের খাওয়াও অনেক দিন অন্ধকারে। খালটুকু পার হয়ে গিয়ে ঘন অরণ্য। এ-পারেও ছিটে জঙ্গল। চুপচাপ অন্ধকারে বসে থেকে বুকের মধ্যে কাঁপে। মনে হয়, জমে গিয়ে জঙ্গলের গাছ হয়ে যাচ্ছে ওরাও যেন। হঠাৎ এক সময় গগন চেঁচিয়ে ওঠে, গান না-ই হল, কথা বলছ না কেন তোমরা? মুখের বাক্যি হরে গেল? গতরের খাটনি এত খাটতে পার, মুখের ভিতরে জিভটা নাড়তেই কষ্ট?

জগন্নাথ আবার এক দিন বলে সেই কথা: ঢোলক ছেয়ে না আনলে হচ্ছে না বড়দা। চলে যাই ফুলতলা।

গগন এক কথায় মত দিয়ে দেয়: যাও—

সকালবেলা মাছের নৌকো নিয়ে কুমিরমারি যাব। হরও যাব-যাব করছে, ফুলতলায় ওর কি সব কাজকর্ম। দু-জনে আমরা কুমির-মারি থেকে টাপুরে-নৌকোয় চলে যাব। আমাদের খালি ডিঙি বলাই বেয়ে নিয়ে আসবে। তা সে পারবে।

গগন ভেবে বলে, উঁহু, কাল নয়—পরশুও নয়। পাঁজি দেখে দিন বলে দিব।

হর ঘড়ুই আছে সেখানে। হেসে উঠে সে বলল, জগা কি বউ আনতে যাচ্ছে যে পাঁজি দেখতে হবে?

গগন বলে, দেখতে হবে বইকি! জ্যোৎস্না-পক্ষ পড়ে গেল। অষ্টমীতে যেও তোমরা। মরা গোনে এমনিই মাছ কম, তার উপরে জ্যোৎস্না হয়ে মাছ-মারাদের মুশকিল বেশী।

আবার বলে, সে-ই ভাল। অল্পসল্প যে মাছ আসবে, বরাপোতায় হাতে কেটে বিক্রি হবে। ব্যাপারীদের কেউ নিজের বন্দোবস্তে ডিঙি নিয়ে কুমিরমারি আনাগোনা করে তো আরও ভাল। মুলুক মিঞা পারতে পারে। সে যা হয় হবে, অষ্টমী থেকে তোমাদের ছুটি রইল জগা। মাছ-মারাদের বলে দিও, বুঝেসমঝে জাল নামাবে—ঐ কটা দিন আমাদের মাল কাটানোর দায় রইল না। সত্যিই তো, ছুটিছাটা না পেলে মানষে বাঁচে কেমন করে? আর শোন—ঢোলক

আন মন্দিরা আন, যদি ইলিশমাছ উঠে থাকে তা-ও নিয়ে আসবে একটা। অবিশ্যি করে এনো। নোনা মাছ খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেল।

বৃত্তান্ত শুনে বলাই বেঁকে বসে: সে হবে না। জগা যাচ্ছে তো আমিও যাব ফুলতলায়। ডিঙি কুমিরমারি থেকে যে-কেউ ফেরত আনতে পারবে। মুলুক মিঞা আনবে। না হয় রাত হয়ে যাবে সেদিনটা ফিরতে। তাতে দোষ হবে না।

হর ঘড়ুই বলে, কী রকম, বলি নি বড়দা? বলাই ছাড়বে না। যা গতিক, জগা মারা গেলে বলাই এক-চিতেয় তার সঙ্গে সহমরণে যাবে।

কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই। দেখালে বিপদ ঘটে। দেখুন না, বিপদ কী রকম ভরদ্বাজের! সেই একদিন দয়াপরবশ হয়ে অন্নদাসীর জন্য চাল পাঠালেন, তার পরে অন্নদাসী খুঁচি হাতে নিজে চৌধুরিগঞ্জের আলায় এসে পড়ে। এক-আধদিন নয়, দায়ে পড়লেই আসবে চলে। রাধেশ্যাম জালে যায় নি, কিংবা জালে তেমন মাছ পড়ে নি—একটা-কিছু হলেই হল। দাবি জন্মে গেছে যেন ভরদ্বাজের উপর। আর রাধেশ্যামও জো পেয়েছে। হাতের নাগালে দুটো চারটে পয়সা পেল তো কাউকে কিছু না বলে শুট করে নেশায় বেরিয়ে পড়ল। অথবা জাল হাতে করে বেরিয়ে কোন এক আড্ডায় গিয়ে বসল। কিংবা মনের সুখে নিদ্রা দিল কোনখানে পড়ে পড়ে। শেষরাত্রে জালগাছা জলে চুবিয়ে এনে শুকনো মুখে বলবে, বুড়ো-হালদার দিল না আজ কিছু। আসলে হল, শৌখিন মানুষ—মেজাজখানা অবিকল বাবুভেয়ের মত। জাল বেয়ে জলকাদা ভেঙে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে মন চায় না। কাজ করতে হত নিতান্ত পেটের দায়ে। এখন দেখছে, কাজে ঢিল দিয়েও উপোস করতে হয় না। হেন অবস্থায় যে রকম ঘটে—খাটনিতে গা নেই। বউকে তাড়া দেয় ভরদ্বাজের কাছ থেকে চাল নিয়ে আসবার জন্য। গড়িমসি করলে মারগুতোনও দেয়।

অন্নদাসীকে গোপাল বলেন, এমন খাসা তোর গতরখানা, ঐ হতভাগার সঙ্গে নিত্যি নিত্যি চেঁচামেচি করতে যাস কি জন্যে? নিজে রুজিরোজগার করলেই তো হয়।

ফিক করে হেসে অন্নদাসী বলে, মরণ!

হাসি দেখে আরও মাথা ঘুরে যায় গোপালের। তবু শান্তভাবে বলেন, রোজগার করে খাবি, তার মধ্যে মরণ ডাকবার কী হল রে?

অন্নদাসী বলে, কী রকমের রোজগার বলে দাও না বাবু আমায়।

গোপাল সতর্কভাবে এগোন: এই ধর না কেন, এবার থেকে ভাবছি আমি নিজে রান্না করব। তুই তার যোগাড়যন্তর করে দিবি।

কালোসোনার হল কি?

গোপাল বলেন, দূর! মেছোঘেরির কাজকর্মে আছি তা বলে মানুষটা সামান্য নই আমি। ব্রাহ্মণ-সন্তান, দেশে অঢেল যজন-যাজন। সোনারাজ্যে নানান ভজোকটো—তাই ভাবলাম, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি, এখানে কে দেখছে, এক সময় কলকাতায় গিয়ে আচ্ছা করে গঙ্গায় ডুব দিয়ে সব অনাচার ধুয়ে দিয়ে আসব। তা বেটা কালোসোনার এমন রান্না, অন্নপ্রাশনের অন্ন অবধি পেটের তলা থেকে উগরে বেরিয়ে আসে। খেতে গিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হই। আপন হাত জগন্নাথ। তুই যদি ভরসা দিস অন্ন, পৈতে কোমরে গুঁজে হাতা-খুন্তি নিয়ে লেগে যাই আবার।

সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন তার পানে: কতক্ষণের বা কাজ! কাজকর্ম সেরে রাঁধা ভাত খেয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ঘরে চলে যাবি। কি বলিস?

কাজকর্মগুলো বাতলে দিন, তবে শুনি।

উনুন ধরানো, বাসন মাজা, বাটনা বাটা। খাবার জল বয়ে আনতে হবে না, ফুলতলায় আমাদের বাবুদের টিউকল থেকে মিঠা জল ধরে নৌকোয় করে নিয়ে আসে।

আর কিছু নয় তো? বলুন বাবু মশায় সমস্ত খোলসা করে। দেখা গেল, অন্নদাসী মুখ টিপে টিপে হাসছে। গোপাল বলেন,

মেয়েমানুষের মন দেবতাও জানেন না। তোর মনের অন্দরে আর কোন্ কাজের শখ, আমি তা কেমন করে বলব রে!

তেইশ

টাপুরে বলে থাকি আমরা, ইংরেজিনবিস আপনারা বলেন শেয়ারের নৌকো। ফুলতলা আর বয়ারখোলার মধ্যে চলাচল। কুমিরমারির ঘাট মাঝে পড়ে। কুমিরমারি থেকে টাপুরে ধরে জগন্নাথরা ফুলতলায় চলে গেল। নতুন-ছাওয়া ঢোলক গলায় ঝুলিয়ে ঐ নৌকোতেই আবার ফিরে আসবে। আসবে বয়ারখোলা অবধি। সেখানে মেছো-নৌকো পাওয়া গেল তো ভাল। নয় তো হেঁটেই মেরে দেবে নতুন রাস্তার নিশানা ধরে।

হর ঘড়ুইকে সঙ্গে নেওয়া মিছে। তার মাথায় খালি ঘুরপাক খায় বাড়তি দুটো পয়সা আসবে কোন্ কায়দায়। পয়সা, পয়সা, পয়সা—পয়সা কি কড়মড় করে চিবিয়ে খাবি রে বাপু? প্রাণধারণের দায়টুকু মিটে গেলে হল। কুমিরমারি থেকে রাস্তা হয়ে যাচ্ছে, চৌধুরিগঞ্জ ছাড়িয়ে রাস্তা চলে যাবে আরও নাবালে। সাগর অবধি চলে যাবে, এই রকম শোনা যায়। অতদূর যাক না যাক, সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নয়। রাস্তার একটা চেহারাও দাঁড়িয়েছে মোটামুটি —মাটি ফেলেছে অনেক জায়গায়, বন কেটে দিয়েছে। পায়ে হাঁটা চলে। রাস্তাটা পাকা করে এবং ছোট-বড় গোটা তিনেক পুল বানিয়ে দেয় যদি, তখন লরী চলবে। হবে নিশ্চয় তাই। কাঙালি চক্কোত্তির ছেলে অনুকূল চৌধুরী যখন উঠে পড়ে লেগেছে, ওদের স্বার্থ রয়েছে—কাজ শেষ না করে তখন ছাড়বে না। নাকের সিধে রাস্তা—ডিঙিতে এ-খাল থেকে ও-খালের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে না আর তখন। কত দিন লাগতে পারে ঐ রাস্তায় খোয়া ফেলতে? এক বছর—দু-বছর? হয়ে গেলে তখন এক ঘণ্টার মধ্যে

কুমিরমারি। আর কুমিরমারি একেবারে ঘরের দুয়োরে হয়ে গেল তো বেচা-কেনা সেখানেই বা কেন? গঞ্জ জায়গা হলেও খেয়ো-খদ্দের যত ওখানে—তারা কত আর মাল টানবে, কী দাম দেবে! ব্যবসা তাতে কত আর ফাঁপানো যায়! এক ঘণ্টায় কুমিরমারি এসে গেলাম তো মোটরলঞ্চে মাল নিয়ে ফেল ফুলতলা। বড় পাইকারেরা বরফ চাপিয়ে ওখান থেকে কলকাতা শহরে চালান দেবে। কলকাতার মানুষ ছাড়া ট্যাঁকের জোর কার?

হর ঘড়ুই এমনি সব মতলবে মশগুল। আড়তওয়ালাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, পড়তা খতিয়ে দেখছে। ধৈর্য ধরতে পারে না। আচ্ছা, রাস্তা যত দিন লরি চলবার মতন না হচ্ছে, লোকের কাঁধে শিকে-বাঁকে মাল যদি কুমিরমারি পৌঁছে দেওয়া যায়? সময় কত লাগে, মুনাফা দাঁড়ায় তা হলে কি পরিমাণ?

হরর মুখে এই সমস্ত কথাই কেবল, মনে মনে এই ভাবনা। জগা দোকানে ঢোল ছাইতে দিয়ে এসেছে। একটা দিন পরে দেবে। রেল-স্টেশন থেকে সামান্য দূরে ঘাট। আঁকা-বাঁকা গাঙ দু-পারে মানুষজনের ঘরবসত ছাড়িয়ে তেপান্তর ধানবনগুলো পার হয়ে গিয়ে অরণ্যভূমে পথ হারিয়ে শতেক ডালপালা ছেড়ে এক সময়ে অবশেষে দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর রেললাইন চলল ঠিক তার উল্টোমুখো। লাইনের ধারে ধারে দালানকোঠা ঘন হচ্ছে ক্রমশ। হতে হতে শেষটা শহর কলকাতা—দালান আর পাকা-রাস্তা ছাড়া একটুকু মাটির জমি নেই, মাটি যেখানে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।

জগা আর বলাই ফুলতলা স্টেশনে চলে যায় এক সময়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেলগাড়ির চলাচল দেখে। কত মানুষ নামল এসে শহর কলকাতা থেকে, ফর্সা জামা-কাপড় পরনে। ঘাটে গিয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নৌকোয় চাপে। নৌকোয় উঠে জামা খোলে। খোলস খুলে ফেলে যেন বাঁচল, ধড়ে প্রাণ এল। পুঁটলি খুলে গামছা বের করে গা-হাত-পা ঘষে ঘষে শহরের কেতাকানুনও মুছে দিল যেন ঐ সঙ্গে। জামা খুলে ফেলে দাঁড় ধরল। মচ-মচ করে

দাঁড় পড়ছে। জলে আলোড়ন। সাঁ সাঁ ছুটছে নৌকো।...আবার ওদিকে দেখ, তার উল্টো রকম। বাদা অঞ্চলের যত নৌকো এসে ধরছে ফুলতলার ঘাটে। ঘাটে এসে জোয়ানমরদরা গামছায় জড়ানো গেঞ্জি-কামিজ অমনি গায়ে চড়ায়। কনুই ভরতি লোহা ও তামার মাদুলির রাশ জামার নীচে ঢেকে যায়। অব্যবহারে ধনুকের মতন বেঁকে-যাওয়া চটি—পা ধুয়ে ফেলে চটিজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তারা কলকাতার গাড়ি ধরতে চলল।

জগারা দেখে এই সব। নৌকোয় উঠে মাঝিদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। তামাক খায়, নানান জায়গার খবরাখবর শোনে। স্টেশনের অফিসঘরে টরে-টক্কা বেজে যায়, চোঙার মুখে স্টেশনে মাস্টারবাবু অদৃশ্য কার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। এ-ও হল দূরের তল্লাটের খবরাখবর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না স্টেশনবাবুদের কাছে। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢোকাই যায় না।

অনেক রাত্রি। বাদাবনের বুকের উপর পাষাণ চাপা—শব্দসাড়া একেবারে নেই। মরা গোনে গাঙখালগুলো অবধি যেন তটের কাছে ঘুমিয়ে। হঠাৎ চিৎকার। চেঁচাচ্ছে কে গলা ফাটিয়েঃ সর্বনাশ হয়েছে, মারা গেলাম। কে কোথা আছ, এস শিগগির।

ঘুমের ঘোরে গগন ধড়মড়িয়ে ওঠে। রাধেশ্যামের গলা যেন। অনেক দূর থেকে, বোধ করি কালীতলার ওপাশ থেকে,—চেঁচাল বার কয়েক। তার পরে চুপচাপ। ওটাকে নিয়ে আর পারা যায় না—আবার কোন্ কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। আগুপিছু না ভেবে এক-একটা দুঃসাহসিক কাজে নেমে পড়ে, তখন আর খোয়ারের পার থাকে না। আজকে হয়তো মেরেই ফেলেছে একেবারে। নয়তো দু বার তিন বারের পর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন?

ছটফট করছে গগন। নিজে বেরুবে না। ছোট হোক, সামান্য হোক, একটা ঘেরির মালিক সে। জীবনের মূল্য হয়েছে। রাত্রিবেলা একা-দোকা তার পক্ষে বেরুনো ঠিক নয়। যত ঘেরিওয়ালার রাগ

তার উপরে। চতুর্দিকে মাছ পাহারা দেওয়া নিয়ে তোলপাড় পড়ে গেছে—সবাই জানে, কলকাঠি টিপছে সে-ই নতুন-ঘেরির আড়ায় বসে। কামরার বাইরে কবাটের ধারে হর ঘড়ুই শুয়ে পড়ে চটাপট শব্দে মশা মারে, ডাক দিলেই সাড়া পাওয়া যায়। আজকে সে নেই—ফুলতলায় চলে গেছে জগা-বলাইর সঙ্গে। তার জায়গায় শুয়েছে বুদ্ধীশ্বর। দোসর একজন থাকা উচিত—মানুষটিকে সেই জন্যে ডেকে আনা। দিনমানে পুরো মানুষই বটে, কিন্তু রাত্রে শুয়ে পড়বার পর শুকনো কাঠ একখানা। ধাক্কাধাক্কি করেও সাড়া মিলবে না। ধরে ঠিক মত বসিয়ে দিলেন তো বসে রইল—একটু কাত হয়েছে কি গড়িয়ে পড়বে আবার মেজেয়।

দরজা খুলে বেরিয়ে গগন ডাকছে, ওঠ দিকিনি একটু বুদ্ধীশ্বর।

শেষটা কলসির জল নিয়ে খানিক ঢেলে দিল তার গায়ের উপর।

উ—

গগন খিঁচিয়ে ওঠে: মানুষটা মরল কি থাকল, খবর নিবি তো একবার?

বুদ্ধীশ্বর জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, আলো জ্বাল—

গগন হেরিকেন ধরাচ্ছে। বুদ্ধীশ্বরের তবু ওঠবার গা নেই। শুয়ে শুয়ে চোখ পিটপিট করে।

উঠলি কই রে?

বুদ্ধীশ্বর বলে, উঠে কি হবে? শড়কি-লাঠি তো চাই। শুধু-হাতে যাওয়া যায় না রাত্রিবেলা।

সে বস্তুও দুর্লভ নয়। কামরার মধ্যে একটা কোণে লাঠি-শড়কি থাকে। দেয়ালে ঝোলানো মেলতুক-রামদা। কখন কোন বিপদ এসে পড়ে, অস্ত্রশস্ত্র হাতের কাছে রাখতে হয়। কামারের গড়া বেপাশি বন্দুকও একটা আনবার ইচ্ছা, কিন্তু চৌধুরিবাবুদের শত্রুতার ভয়ে সাহস করছে না। পুলিস ডেকে হয়তো ধরিয়ে দিল। নতুন ধার-দেওয়া চকচকে শড়কি বের করে নিয়ে এল তো তখন বুদ্ধীশ্বর বলছে, রাধেশ্যাম কি আছে? বড়-শিয়ালে ওটাকে মুখে

করে নিয়ে গেছে—বুঝলে বড়দা ? গিয়ে কি হবে ? এতক্ষণে কাঁহা-কাঁহা মুলুক—

গগন রীতিমত চটে গিয়ে বলে, নড়বার ইচ্ছে নেই, সেই কথাটা বল না স্পষ্ট করে। আলো রে শড়কি রে হেনোতেনো করে আমায় তবে খাটালি কি জন্যে ?

বুদ্ধীশ্বর বলে, তুমি যাচ্ছ না কেন বড়দা। পায়ে পায়ে গিয়ে দেখে এস।

যাবার হলে তোকে তবে তেল দিই ? এতক্ষণে কতবার আসা-যাওয়া হয়ে যেত।

ঘুমটা ভেঙেছে বটে বুদ্ধীশ্বরের। উঠে বসে সে বলল, তা যাই বল একলা মানুষ আমি যাচ্ছি নে। পাড়ার লোকজন ডাক, সকলের মাঝখানে থেকে তবে আমি যেতে পারি।

ঠিক এমনি সময় বাঁধের উপর কলরব। ডাকাডাকি করতে হল না, ছুটে ছুটেই আসছে জন কয়েক। মুলুক মিঞার কণ্ঠটাই প্রবল ঃ সর্বনাশ হয়েছে বড়দা। নতুন বাঁধ ভেঙে গেছে।

পিছনে শিরোমণি সর্দার। সে বলে ওঠে, ভেঙেছে না কেটে দিয়েছে ?

বুদ্ধীশ্বরের উদ্বেগ প্রবল হয়ে উঠল এতক্ষণে। বলে, রাধে-শ্যাম চেঁচিয়ে উঠল একবার। তার খোঁজ নিয়েছ—বলি, সে কোথায় ?

মুলুক মিঞা বলে, খানার মধ্যে—

শিরোমণি বলে, সেই তো ! চেঁচানি শুনে জাল-টাল তুলে নিয়ে ছুটেছি। নতুন বাঁধের খানিকটা কেটে হারামজাদারা গাঙের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যারাত্রে কেটেছে বোধ হয়। ভাঁটার পয়লা মুখ এখন। পুরো ভাঁটা এমনি থাকলে ঘেরির অর্ধেক জল বেরিয়ে যাবে। মাছ যা জম্মেছে সমস্ত গিয়ে গাঙে পড়বে। কপাল ভাল যে রাধেশ্যাম কাটা-গর্তে পড়ল। তাইতে জানাজানি হয়ে গেল।

মুলুক মিঞা বলে, জাল ঘাড়ে করে বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। নেশায় টরটরে, চোখ মেলে চলাফেরা করে না তো!

গগন বলে, হাত-পা ভাঙে নি তো?

শিরোমণি সহজ কণ্ঠে বলে, তুলে ধরে কে দেখতে গেছে! ঐ দেহ টেনেহিঁচড়ে বাঁধের উপর তোলা দু-একজনের কর্ম নয়! পড়ে আছে, তাতে খুব ভাল হয়েছে। ঝিরঝির করে জল বেরুচ্ছিল, দেহখানা পড়ে সেটা আটক হয়ে গেছে।

মুলুক মিঞা জুড়ে দেয়, আছে বেশ ভালই। খানায় পড়েছে না ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে, সে বোঝবার মতন হুঁশজ্ঞান নেই।

ছুটল সকলে। জগা নেই বলে মাছের ডিঙির চলাচল বন্ধ। মাছ-মারারা কাজে ঢিলটান দিয়েছে, সাঁইতলার পাড়ার মধ্যে শুয়ে অনেকে আজ ঘুম দিচ্ছে। এ ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে। পাড়াসুদ্ধ গিয়ে জমল বাঁধের উপরে। এই তবে শুরু হয়ে গেল ও-তরফের কাজকর্ম —এরা নৌকো সরিয়েছিল, তার পালটা শোধ।

রাধেশ্যামকে টেনে তুলেছে, হাউহাউ করে সে কাঁদছে এখন। চরের কাদামাটি কেটে এনে চাপাচ্ছে ভাঙা জায়গায়। মাটি দাঁড়ায় না, জলের টান বেড়েছে। পাড়ায় ঢুকে কজনে তখন ছাউনি-সুদ্ধ এক চাল খুলে এনে আড়াআড়ি বসিয়ে দিল। বুদ্ধিটা বড় ভাল। খোঁটা পুঁতে দাও, চাল শক্ত করে বাঁধ খোঁটার সঙ্গে, মাটি চাপান দাও এবার ওদিকে। জলের টানে মাটি আর ভেসে যাবে না। একটু-আধটু যায়ও যদি, মাছ বেরুতে পারবে না—চালে আটক হয়ে থাকবে।

গোপাল পরদিন অন্নদাসীকে বলেন, রাতে গণ্ডগোল শুনলাম যেন তোদের ওদিকে?

আমাদের মানুষটা জখম হয়ে পড়ে আছে।

সে কী রে?

মোটামুটি সমস্ত শুনে নিয়ে গোপাল বললেন, একবার ইচ্ছে হল

যাই দেখে আসি। কিন্তু গেলে হয়তো কথা উঠত। ধর্ম দেখতে এসেছে বলত লোকে।

তা কেন? বলত, কাজটা কদ্দুর কি দাঁড়াল ভরদ্বাজ মশায় খোদ তার তদারকে এসেছেন।

গোপাল বলেন, দেড় কোদাল মাটি ফেলে ফঙ্গবেনে ঘেরি বানিয়েছে। মাটি ধুয়ে বাঁধ ফাঁক হয়ে গেল, তার জন্য আমরা বুঝি দায়ী? তুইও বুঝি সেই কথার উপর গেরো দিয়ে রেখেছিস?

অন্নদাসী বলে, চোখে যখন দেখা নেই, ছেঁড়া-কথার দাম কি! কিন্তু চাল আজকে বেশী করে ফুটিয়ে দিতে হবে। আমার একলার পেট ভরালে হবে না। যে-মানুষ শুয়ে পড়ে রয়েছে, তার জন্যে বেড়ে নিয়ে যাব।

গেরো কেমন দেখ। সে-ই বা কেন ওদিকে মরতে যায়? হয়েছে কী তার?

গা-গতর চুরমার হয়ে গেছে, এই তো বলছে। পায়ে খুব চোট লেগেছে।

কচু হয়েছে। পড়েছে হাত তিন-চার নীচে, পাথরের শরীরে কী হয় তাতে? তুইও যেমন!

অন্নদাসী ঘাড় নেড়ে মেনে নেয়ঃ সে কথা ঠিক, ও-মানুষ অমনি। কায়দায় পেয়েছে তো সহজে ছাড়বে না। এই গা-হাত-পা ব্যথা নিয়ে ছ-মাস এখন নড়ে বসবে না। আমার জ্বালা—এক এক পাথর ভাত নিয়ে গিয়ে মুখের কাছে ধর। আমার ঘরের মানষের জন্যে চাল নিয়েছ তো ঠাকুর মশায়?

চব্বিশ

চৌধুরিগঞ্জ এলাকার যে কেউ ফুলতলা আসুক, অসুবিধা নেই। সোজা গিয়ে চৌধুরিবাড়ি উঠবে। অনুকূল বাবুর ঢালা হুকুম।

কিন্তু এলাকার মানুষ হয়েও জগারা তা পারে না। শত্রুপক্ষ। অত বড়মানুষ চৌধুরিরা—এরা সে তুলনায় কী? হাতি আর মশায় শত্রুতা। তা সেই মশা বিবেচনা করেই হাতের নাগালে পেয়ে দিল বা একটা চাপড় ঝেড়ে!

হর ঘড়ুই আগে আরও এসেছে। তার অনেক জানাশোনা। বলে, ভাবনা কি! কুমিরমারিতে এক গদাধর হোটেল, এখানে চার-পাঁচটা। গদাধরের চালাঘরে পাত পেড়ে খাওয়ায়, এখানে পাকা দালানের পাকা মেঝেয় থালায় ভাত বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন।

টাপুরেঘাটার অনতিদূরে গাঙের উপর প্রথম যে হোটেলটা পেল, সেইখানে উঠেছে। রেটটা কিছু বেশী এই হোটেলে, জন-প্রতি এক সিকি এক এক বেলায়। পাকা দালান এবং থালা-বাটির খাতিরে সম্ভবত। তবে পেট চুক্তি। এবং তামাক ও মাথবার তেল ফ্রী। কোন খদ্দের রাত্রে থাকতে চাইলে একটা মাদুরও দেবে, সে বাবদ কিছু লাগবে না।

রেটের কথায় হর ঘড়ুই আগু-পিছু করছিল। বলাই হাত ধরে টানে: এস দিকি। মা বনবিবির আশীর্বাদ থাকে তো তিন জনের তিন সিকি নিয়েও ওদের জিনে যেতে দেব না। তিনটে পাতা করতে বল ঠাকুর মশায়। দেখা যাক।

বামুন ঠাকুর মালিকের কাছে এই তম্বির ব্যাপার কিছু বলে থাকবে। এর পরে দেখা গেল, খাওয়ার সময়টা খুদ তিনি সামনের উপর দাঁড়িয়ে। বলাইর আরও রোখ চড়ে যায়। ভাত দিয়ে ঠাকুর ডাল আনতে গেছে, ইতিমধ্যে নুন সহযোগে সমস্তগুলো ভাত সাপটে দিয়ে সে বসে আছে। বাটিতে ডাল ঢেলে দিয়ে আবার ভাত আনতে গেছে, বাটির ডাল চোঁও করে এক চুমুকে মেরে দিল। এক খদ্দের নিয়েই নাস্তানাবুদ বামুন ঠাকুর। মালিক রাগে গরগর করছে। বলে: মটর কলাই দু-আনা সের হয়ে গেছে। আর ডাল পাবে না বাপু।

হর বলে, কোন হোটেলে তো এ নিয়ম নয়। ভাত আর ডালে

কেউ কথাকথি করে না খদ্দের সব ভেগে যাবে এমনধারা করলে।

হোটেলওয়ালা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, তাদের ডালে মাল থাকে কতটুকু ? সাকুল্যে মালসাখানেক ডাল রাঁধে ; আর বড় গামলায় ফ্যানে-জলে গুলে রেখে দেয়। গামলার ফ্যানে হাতা কয়েক ডাল ঢেলে আচ্ছা করে ঘুঁটে দেয়। ব্যস, হয়ে গেল। তারা কি জন্য দেবে না, অমন ডালে খরচাটা কি ?

বলাই তাড়াতাড়ি বলে, যাক গে, ডাল কে চায়! ভাত হবে তো ? আর নুন ? নুন না হলেও চলবে, শুধু ভাতই সই।

নুন-ভাতই চলল। হাঁ, বাহাদুর বলি বলাইকে। সৃষ্টিছাড়া রেট সত্ত্বেও মালিক লোকটার চক্ষু কপালে উঠে গেছে। হাসি চেপে জগা জিজ্ঞাসা করে, অমন এক নজরে কি দেখেন মশাই ?

লোকটা বলে, চোখে তো ওর বাইরেটা দেখছি। টিপে দেখতে ইচ্ছে করছে, চামড়ার নীচে বোধ হয় এক কুচি হাড়মাস নেই— শুধুই খোল। তূলো ভরার আগে পাশবালিশের খোলের মতন।

সেই পয়লা দিনের পর থেকে হোটেলওয়ালা আর অমন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না, ঘোরাফেরার মধ্যে এক-একবার উঁকি দিয়ে যায়। চোখ মেলে ব্যবসার ডাহা সর্বনাশ দেখতে ভয় করে বোধ হয়।

খাওয়ার পরে পয়সা মিটিয়ে নেয়, এবং পানের খিলি দেয় খদ্দেরদের। সেই সময় জিজ্ঞাসা করে, কদিন আছ আর তোমরা ?

জগা ভালমানুষের মত বলে, কাজ মিটলে তবে তো যাওয়ার কথা! পনের-বিশ দিন লাগবে। বেশীও লাগতে পারে। ভয় নেই, যে কদিন আছি, তোমার হোটেল ছেড়ে অন্য কোনখানে নড়ছি নে।

আমি তো নুন-ভাত খাওয়াচ্ছি, অন্য সব হোটেলে দেদার ডাল দেয়, তবু যাবে না ? ঐ রসময় চক্কোত্তির ওখানে যাও। বড় বড় মাছের দাগা।

জগা বলে, উঁহু, তুমি যে মানুষ ভাল। তোমার ঘরের দাওয়াটা আরও ভাল। ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়। শুয়ে সুখ আছে।

সেই রাত্রে শুতে গিয়ে তারা মাদুর খুঁজে পায় না। গেল কোথা?

হোটেলওয়ালা বলে, দেখ কোন দিকে পড়ে আছে। বাতাসে হয়তো বা গাঙের খোলে নিয়ে ফেলেছে। কি করব, বাড়তি মাদুর মানুষে কটা রাখতে পারে বল ?

হর ঘড়ুই তখন বলে, ধূলোর উপর শুইয়ো না দাদা। বের কর মাদুর। আজকেই শেষ। সকালবেলা আমরা চলে যাচ্ছি।

ঠিক ? তুমি মুরুব্বী মানুষ—কথা দিচ্ছ কিন্তু। ছোঁড়াগুলো কখন কি বলে, ওরা বললে বিশ্বাস করতাম না।

হ্যাঁ, বলছি আমি। নিশ্চিন্ত হয়ে মাদুর বের কর দাদা। ঢোলক আজ বিকেলেই পাবার কথা। হয়ে উঠল না। ছাউনির কাজ রাতের মধ্যে শেষ করে রাখবে, ভোরবেলা দিয়ে দেবে।

হোটেলওয়ালা বলে, পুরানো লোক তুমি, অনেক দিনের ভালবাসাবাসি। হোটেলে এ-রকম খদ্দের কোন্ আক্কেলে এনে তুললে বল দিকি ?

খাইয়ে দেখেছি নাকি ? হেসে উঠে হর ঘড়ুই বলে, আচ্ছা, এবারে কাউকে যখন সঙ্গে আনব, বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে পরখ করব আগেভাগে।

বড্ড হাওয়া হোটেলের পিছন দিককার দাওয়ায়। মাদুরের উপর পড়ে আছে তাই, নয়তো মাদুর সত্যি সত্যি উড়িয়ে নিয়ে ফেলত। কটা রাত পাশাপাশি কাটিয়ে গেল তিন জনে। জগা-বলাই অসাড় হয়ে ঘুমোয়। ঘড়ুইয়ের মগজের ভিতর মতলবের পর মতলব যেন পাঁয়তারা কষে বেড়ায়। এক এক সময় অধীর হয়ে ওঠে, চুপচাপ থাকতে পারে না, ঘুমন্ত জগা-বলাইর গা ঝাঁকিয়ে তাদের কাছে অতীত আর ভবিষ্যতের কথা শোনায়। বন কেটে বসতির শুরু—এই তো কটা বছরের কথা। কী হয়ে যায় দেখতে দেখতে! আরও হবে, শহর কলকাতা এসে পড়বে দেখো বাদা অঞ্চলের মধ্যে।

সকালবেলা উঠে জগন্নাথ ছুটল ঢোলের দোকানে। পয়সা চুকিয়ে দিয়ে জিনিসটা শুধু নিয়ে আসা। বলে, তোমরা ঘাটে চলে যাও। যদি একটু দেরি হয়ে যায়, টাপুরে-মাঝিকে বলেকয়ে রাখবি তুই বলাই। নৌকো ছেড়ে না দেয়।

ঘাটে গিয়ে বলাই বসেছে। আছে বসে তো আছেই। এই আসছি বলে হর ঘড়ুই পথের পাশে এক দোকানে ঢুকে পড়ল— পাটি-মাদুরের দোকান। জগারও দেখা নেই। নতুন ছাউনির পর ঢোলক কী রকমটা দাঁড়াল, পরখ করতে হয়তো সে দোকানেই বোল তুলতে বসে গেছে। কিছু বিচিত্র নয়। কেউ যদি দু-চার বার বাহবা দেয়, ব্যস, হয়ে গেল আজকের মতন টাপুরে ধরা। দোকানের উপরেই গান-বাজনার আসর। জগাকে বিশ্বাস নেই, জগা সব পারে।

ঘাটের উপরে এক দোকান। ভাল দোকান—বিড়ি খিলি-পান বাতাসা মুড়ির-মোয়া সমস্ত মেলে। দোকানের ছোট্ট চালাঘর ঠিক মাটির উপরে নয়। খানিকটা উঁচুতে বাঁশ ও গরানের ছিটের মাচা, সেই মাচার উপরে মালপত্র ও দোকানদার। উপরে খড়ের চাল। কোটালের সময় গাঙের জল বেড়ে মাচার নীচে ছলছল করে। দোকানের সামনে খুঁটি পুঁতে চেরা-বাঁশের বেঞ্চি মত করে রেখেছে, জন পাঁচ-ছয় বসে আছে বেঞ্চিতে—বিড়ি খাচ্ছে, পান খাচ্ছে। টাপুরে-নৌকোর চড়ন্দার এরা সব। এবং বলাইও বসেছে এই জায়গায়। নৌকো ছাড়ো-ছাড়ো। উঠে পড়েছে বেশির ভাগ। এদেরও ডাকছে। বলাই কিন্তু একনজরে চেয়ে ডাঙার পথের দিকে। সোজা পথ— বাঁকচুর নেই। উদ্বেগের বশে এগিয়েও দেখে এসেছে বারকয়েক।

টাপুরে-নৌকোর ভাড়ার দরদাম করতে হয় না। একেবারে বয়ারখোলা অবধি যাবেন তো চার আনা। তবে ঠিক অর্ধেক পথ কুমিরমারি কিন্তু দশ পয়সা। তেলিগাঁতি এক আনা, সজনেডাঙা তিন আনা। গলুয়ে দাঁড়িয়ে এক জনে হাঁক পাড়ছে : বয়ারখোলা কুমিরমারি সজনেডাঙা ছাড়ে নৌকো, ছাড়ে-এ-এ-এ—

এবং ছেড়েও দিল টাপুরে। কাছি খুলে হাল-দাঁড় বেয়ে চলে গেল মাঝ-গাঙ অবধি। বেঞ্চির উপরের চড়ন্দারেরা নড়ে না—গুলতানি করছে, নতুন করে বিড়ি ধরাচ্ছে আবার। হাঁ, আসছে এইবার—বলাই ঠাহর করে দেখে, মানুষটা জগন্নাথ না হয়ে যায় না। আসছে বাতাসের বেগে, দৌড়ানো বলা চলে। কাছাকাছি এলে দেখা যায়, ঢোলক ঝুলছে পিঠের দিকে—ঢোলকের আংটার মধ্যে চাদর গলিয়ে পৈতের মতন কাঁধের উপর আর বগলের তলা দিয়ে নিয়ে গেছে।

ছেড়ে গেল নাকি রে?

বলাই বলে, নতুন বউ হয়ে পালকি থেকে নামলে দেখছি। যা বললে, আর বলো না। লোকে হাসবে।

বেকুব হয়ে গিয়ে জগাও হাসতে লাগল। তা বটে, পুরানো কায়দা টাপুরেওয়ালাদের। ছাড়ছি বলে মুখে মুখে চেঁচালে চড়ন্দারে গা করে না। ঘাট থেকে সত্যি সত্যি ছেড়ে খানিকটা আগু-পিছু করতে হয়। তখনও এমন কিছু চাড় নেই, সে তো এই বুঝতে পারছেন উপরের লোকগুলোর ধরন দেখে।

গাঙের দিকে তাকিয়ে জগা অবাক হল: এক-পো ভাঁটি নেমে গেল, এখনো চড়ন্দার ডাকে! বয়ারখোলা আজ পৌঁছতে হবে না, সজনেডাঙা কি কুমিরমারি অবধি বড় জোর। আর দেরি কিসের মাঝি? ছাড় এবারে।

ছইয়ের ভিতরের লোকগুলো কলরব করে ওঠে। মনের মত কথা পেয়েছে। ঠিক কথা, সত্যি কথা, ছাড় এখুনি। কেউ বাকি থাকে তো সে লোক কালকে যাবে। দু-এক জনের জন্যে এত মানুষ কষ্ট পাবে, সেটা হতে পারে না।

মাঝি চেনে জগাকে। এ অঞ্চলের গাঙে খালে যাদের গতায়াত, জগাকে চিনবে না এমন কে আছে? চড়ন্দারে চেঁচামেচি করছে, ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল—অন্য কে নয়, জগা এসে আবার ফোড়ন দিচ্ছে তার ভিতরে। রাগ করে ঝি বলে, দেরি তো তোমাদের

জন্যে জগা। তুমি এসে গেলে, তোমাদের হর-ব্যাপারীর এখনো পাত্তা নেই। যাবে ফেলে তাকে ? তাই চল। ধ্বজি তুলে ফেল ওরে ছোঁড়া। দাঁড়ে চলে যা।

জগা বলাইকে বলে, কোথায় রে ঘড়ুই ? আমি ভাবছি, ব্যস্ত-বাগীশ মানুষ—নৌকোর মধ্যে আগেভাগে গিয়ে বসে আছে।

বলাই বলে, আসছিলাম দুজনে। মাদুরের দোকান দেখে ঘড়ুই ঢুকে পড়ল। বলে, এগুতে লাগ, একটা শীতলপাটি নিয়ে যাচ্ছি।

পায়ে পায়ে তারা নদীর খোলে গিয়ে দাঁড়াল। জগা বলে, ছেড়ে দাও মাঝি, আর কাজ নেই। শীতলপাটি কিনতে গেছে—দোকানসুদ্ধ সওদা করে আনতেও তো এতক্ষণ লাগে না!

এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। নৌকো ছাড়বার মুখে এ ধরনের কথাবার্তা হামেশাই হয়ে থাকে। শেষ মুখটায় কাদায় ধ্বজি পুঁতে নৌকোর কাছি তার সঙ্গে জড়িয়ে রাখে। রাগের বশে ধ্বজি একবার বা তুলেই ফেলল, পরক্ষণে আবার পুঁতে দেয়। এক চড়ন্দারের ভাড়া চার-চার আনার পয়সা ছেড়ে যাওয়া সহজ কথা নয়।

এমন সময় দেখা গেল, হর ঘড়ুই বিড়ির দোকানের ধারে এসে গেছে। হাত উঁচু করেছে সেখান থেকে।

মাঝি হাঁক দিচ্ছে : চলে এস, চলে এস—

জগা তেড়ে ওঠে : কোথা ছিলে এতক্ষণ শুনি ?

হর হাঁপাচ্ছে। কাঁধের শীতলপাটি দেখিয়ে বলে, সওদা করলাম রে ভাই। আগে মনে ছিল না, দোকানের সামনে এসে মনে পড়ে গেল।

জগা বলে, ওরে আমার লাটসাহেব! বড্ড পয়সা হয়েছে। ছেলের অন্নপ্রাশন দিয়ে উঠলে সেদিন, তার উপরে আবার শীতলপাটি!

ওদের মধ্যে চলিত বিশেষণের দুটো-একটা প্রয়োগ করতে

যাচ্ছিল। বলাই ত্বরিতে জগার মুখে হাত চাপা দেয় : খবরদার, চাষামি দিয়ে কথাবার্তা বল।

নৌকোর গলুয়ের একজন ভিতরের দিকে ইঙ্গিত করে চাপা গলায় বলে, ভাল লোকেরা আছেন, চুপ চুপ! *

কাদা ভেঙে বাকি কজনে এবার উঠে পড়ল। বাইরে পা ঝুলিয়ে বসেছে। নৌকো বেশী জলের দিকে গেলে কাদা ধুয়ে তবে পা তুলে নেবে। জন কুড়িক চড়ন্দার আগেভাগে চড়ে বসে আছে। একটা ছইয়ের নীচে অতগুলো মানুষ—শোরগোলে গাঙে তো তুফান উঠবার কথা। কিন্তু কী তাজ্জব, ধ্যানে বসে আছে সকলে যেন। অথবা মানুষগুলোকে কেউ বুঝি খুন করে নৌকোর উপর ফেলে রেখেছে। জ্যান্ত মানুষ—বিশেষ করে জোয়ানযুবা যেগুলো আছে, এমনধারা চুপচাপ থাকে কেমন করে? তামাক খাচ্ছে, তা-ও অতি সাবধানে। হুঁকো টানার কড়ফড় আওয়াজ যেন অতিশয় লজ্জার ব্যাপার।

ভাল করে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ব্যাপারটা মালুম হল জগার। কাড়ালে দুটো মেয়েমানুষ। দুটো মাত্র মুষলের ভয়ে বাঘের দোসর এতগুলো মরদ ঠাণ্ডা। দুই বা বলি কেন—একজনে ঘোমটা টেনে জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। বিনোদিনী—বিনি-বউ—গগন দাসের পরিবার। বিনি-বউ কিছু নয়—মুষল হল অপরটি, চারু। আগেও ভাল ছিল। এখন আরও সুন্দর গোলগাল ও পরিপুষ্ট হয়েছে। কমবয়সী মেয়ের লজ্জা করা তো উচিত. সে-ই তো দেখি নাটার মতন বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে একনৌকো মানুষ জব্দ রেখেছে। টাপুরে-নৌকোয় মেয়েমানুষ চড়ন্দারও যায়। কেনাবেচা করতে যায় ফুলতলা, আবার তল্লাটের বউ-ঝিরা বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করে। দরগা ও ঠাকরুনতলায় পুণ্য করতে চলেছে, এমনও আছে। এরা সে দলের নয়—চেহারা, এলাকপোশাক ও চালচলনে সবাই বুঝেছে। এই আবাদ এলাকারই নয়। উত্তরের অঞ্চল থেকে আসছে। এসে থাকে পুরুষেরা—যার নাই মূলধন সেই আসে

বাদাবন। শূন্য হাতে এসে আস্তে আস্তে জমিয়ে নেয়। কাঙালি চৌধুরি যেমন একদিন বনকরের বাবুদের চক্কোত্তি-রাঁধুনী হয়ে এসেছিল। আশায় আশায় এসেছে যেমন ঐ গগন, এবং গোপাল ভরদ্বাজও বটে। পুরুষেরা আসে, কিন্তু বাইরের ভদ্রঅঞ্চলের মেয়েলোক এই প্রথম বোধহয়। তাই দেখে তাদের সামনে বাদার জোয়ানপুরুষরা ভদ্র হবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

বিরক্তি ভরে জগা ছইয়ের বাইরে বসে পড়ল। আকাশ মেঘে ভরা, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি নামছে। বৃষ্টির জল ঝরঝর করে মাটি ভিজিয়ে দিয়ে গাঙের জলের উপর দিয়ে বনের মাথার উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। একবার এই হয়ে গেল, বাঁকটা না ঘুরতেই আবার সেই কাণ্ড। তা হোক, বৃষ্টিতে বারংবার চান করবে তবু ছইয়ের ভিতরের ঐ ভেড়ার পালের মধ্যে নয়।

চলেছে, টাপুরে-নৌকো চলেছে। ছপ-ছপ দাঁড় পড়ে একটানা, মচমচ আওয়াজ ওঠে দাঁড়ের বাঁশ-দড়িতে। অতল নিঃশব্দতার মধ্যে ঐ যা এক ধরনের আওয়াজ। জগা আর পারে না, ক্ষেপে গিয়ে বলে ওঠে, বাক্যি সব হরে গেল—তোমাদের হল কি আজকে মাঝি? ভূত দেখেছ না বেলে-সিঁদুর খাইয়ে দিয়েছে কেউ? (বেলে-সিঁদুর কোন্ বস্তু সঠিক জানি নে, খেলে নাকি মানুষের বাক্‌শক্তি উপে যায় একেবারে।)

মাঝি বলে, বকবক করে হবে কি! সজনেডাঙার খাল নিয়ে ভাবনা, শেষ-ভাঁটায় একেবারে জল থাকছে না। কোমর ভর কাদা।

দাঁড়িদের স্ফূর্তি দিচ্ছে: সাবাস ভাই। জোর জোর এমনি মেরে দিয়ে ওঠ। কুমিরমারিতে জোয়ার ধরে দাও। নয়তো সারা রাতের ভোগান্তি।

আবার চুপচাপ। জগা তখন ঘড়ুইকে নিয়ে পড়েছে: তোমার জন্যে দেরি। মাছের পয়সার বড্ড গরম—উঁ, শীতলপাটি বিনে ঘুম হয় না!

হর গলা বাড়িয়ে জবাব দেয়, পাটি আমার নয়। বড়দার।

জগা বলে, বটে! বড়দা আমাদের কিছু বলে না, চুপি চুপি তোমার কাছে ফরমাশ করল। আমরা পর হয়ে যাচ্ছি।

হুড়োহুড়ির মানুষ তোমরা। ঠাণ্ডা মাথায় দেখেশুনে বাছগোছ করে কেনা পোষায় তোমাদের? ধর, এই একখানা পাটি পছন্দ করতে বিশ-ত্রিশখানা পেড়ে ফেললাম। শলা সরু-মোটা হালকা ভারী আছে, বুনুনি ঘন-পাতলা আছে—অনেক কিছু দেখে নিতে হয়। সওদা অমনি করলেই হল না।

বলাই বলে, ওসব কিছু নয়। বড়দার লজ্জা করেছে আমাদের বলতে। আজকাল ঘড়ি-ঘড়ি খালে নেমে ডুব দেয়, গরম কী রকম বুঝতে পার না? জল নোনা হোক যাই হোক, পানকৌড়ির মত ডুবুতেই হবে।

জগা বলে, আর সেই মানুষ, এদিকে দেখলি তো, বাড়ির চিঠি না খুলে উনুনের আগুনে দেয়। খুলে পড়লে মন পাছে নরম হয়ে গিয়ে কিছু পাঠাতে ইচ্ছে করে। বড়দা বলে মান্য করি—কিন্তু এক এক সময় চামার বলতে ইচ্ছে করে।

হর ঘড়ুই তাড়াতাড়ি চাপা দেয়: থাক থাক। ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা যাচ্ছে, অকথা-কুকথা মুখের আগায় আনবে না।

ভাল রে ভাল! মুখ খুললেই ত্রস্ত হয়ে ওঠে অন্য সকলে। কোন বেখাপ্পা কথা কখন বেরিয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণের এত রাস্তা তবে কি বোবা হয়ে কাটাতে হবে? জগা তা পেরে উঠবে না, ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা যা-ই বলুক।

তখন দাঁড়িদের বলে, হাতে-মুখে চালাও ভাই সব। দাঁড় মার, আর গীত ধর সেই সঙ্গে—

চাপা গলায় হর ধমক দিয়ে ওঠে: থাম। ওঁরা সব যাচ্ছেন, গীত আবার কী জন্য এর মধ্যে!

বাঃ রে, ওঁরা যাচ্ছেন বলে মুখে তালাচাবি এঁটে থাকতে হবে? আমার দ্বারা পোষাবে না। তোমাদের শরম লাগে তো আমিই

ধরি একখানা।

দাঁড়িদের উদ্দেশ করে আবার বলে, গান গাইবে না তো দোয়ারকি কর আমার সঙ্গে। ফাঁকা গাঙের উপর একলা গলায় জোর পাব না।

ঘাড় কাত করে গালে বাঁ-হাত চেপে ধরে আঁ-আঁ-আঁ করে জগা তান ধরল।

বলাই কনুই দিয়ে গুঁতো দেয়ঃ আঃ, কী হচ্ছে!

ফিক করে হেসে ফেলে জগা বলে, শুনতে পাচ্ছিস নে? গান—

গান নয়, কানের ফুটোয় মুগুর মারা। কী ভাবছে বল দিকিনি ভাল ঘরের মেয়েছেলেরা! ষাঁড়ের মতন না চেঁচিয়ে গানই ধর তবে সত্যি সত্যি।

জগা বলে, গানের তুই কি জানিস রে? গান হলেই বুঝি নাকী-কান্না! নানান সুরের গান আছে। আজকে এই চেঁচানো গানে আমার মন নিচ্ছে।

আরম্ভ করে দিল মার-মার কাট-কাট রবে, কানে তালা ধরিয়ে দেবার মতলব। কিন্তু কিছু দখল আছে বিদ্যাটায়—সুরটা এক সময় মোলায়েম হয়ে উঠেছে, তাল-মাত্রাও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে গানের ভিতরে। প্রতিহিংসার ভাব তেমন আর উগ্র নয়। আবেশে এমন কি চোখও বুজে গিয়েছে, হাতের চেটোয় থাবা দিচ্ছে নৌকোর উপরে। ছইয়ের বেড়ার গায়ে ঢোলক, বলাই পা ঘষে ঘষে গিয়ে পেড়ে আনবার তালে আছে সেটা।

খসখসানি আওয়াজ পেয়ে জগা চোখ মেলল। চারুবালা ছইয়ের বাইরে চলে এসেছে। এসেছে সামনের উপর। স্বহস্তে শাসন করতে এল নাকি? অন্যের কথায় হল না তো ঐ পরিপুষ্ট হাতে জোর করে তার মুখ চেপে ধরে গান থামিয়ে দেবে?

গান আপনা-আপনি থেমে গেছে তৎক্ষণে। তাজ্জব কাণ্ড! জগন্নাথ বিশ্বাসের সঙ্গে লাগতে এসেছে—যত বলবানই হোক—

বেটাছেলে নয়,   য় একটা। পরক্ষণে আচ্ছন্ন ভাবটা ঝেড়ে ফেলে শুরু করবে আবার প্রবল কণ্ঠে—আগেভাগে মেয়েটাই বলে ওঠে, খাসা হচ্ছিল—থামলেন কেন ?

আরো আশ্চর্য, আপনি-আপনি করে কথা ! জগা যেন মান্য-গণ্য মানুষ, খাতির দেখিয়ে তেমনি ভাবে বলছে। এ তল্লাটে এমন সম্বোধন চলে না। ভদ্র অঞ্চল থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। উৎকট লাগে জগার। নীরস কণ্ঠে সে বলে, গানের এমনি জায়গায় আমি থেমে যাই।

সে কি গো ! মাঝখানে থেমে পড়লে ভাল লাগবে কেন ?

আমার এই নিয়ম।

নগেনশশী নিয়ে চলেছে এদের। অথবা চারুই অপর দুটিকে টেনেহিঁচড়ে বাদাবনে নিয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকের সুরে নগেন ডাকে : চলে এস চারুবালা, ওদিকে কী ? ওদের সঙ্গে কি বচসা লাগিয়েছ।

চারু কানেও নিল না। অভিমানে কণ্ঠ একটু বুঝি থমথমে হয়ে যায় : আমি না এলে আপনি ঠিক সারা করতেন। বেশ, যাচ্ছি আমি ভিতরে।

আমার গান সারা হয়ে গেছে।

চারু তর্ক করে, কক্ষনো হয় নি। যা-তা বোঝালেই হবে ?

নগেনশশীতে হল না তো বিনোদিনী ওদিক থেকে রাগ করে ওঠে : কী হচ্ছে ঠাকুরঝি ?

চারু বলে, এক-একটা গোঁয়ার স্বভাবের মানুষ থাকে বউদি, লোকে যা বলে ঠিক তার উল্টোটি করবে।

নৌকোসুদ্ধ মানুষ থ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। কোথাকার মেয়ে এসে উঠেছে, একটুখানি সঙ্কোচ নেই। জগা হেন পুরুষকেও মুখের উপর ট্যাক-ট্যাক করে শুনিয়ে দেয়। বলে, বেশ, তবে আমি বলছি গান আর গাইবেন না আপনি। ঐখানে শেষ।

গাবই না তো

এটা কি হ ? একমত হয়ে গেলাম যে তবে আমি এক কথা বলব, আর ঘাড় হেঁট করে সেইটে আপনি মেনে নেবেন ?

জগন্নাথ বলে, আমার উল্টোপাল্টা রীত। লোকের কথা কখনো শুনি, কখনো শুনি নে। এবারটা শুনব।

বিনি-বউ আবার ডাকে, ঠাকুরঝি ভাই, চলে আয়—

যাচ্ছি বউদি। গানটা পুরো শুনে তবে যাব।

কিন্তু গান আর হল না কিছুতে। চারুও নাছোড়বান্দা, গান না শুনে নড়বে না। আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে গেল সামনে। বসেই রইল। থাক বসে, বয়ে গেল। সারা বেলাস্ত বসে থাক না—কী হয়েছে।

চারু রাগল অবশেষে: বড্ড যাচ্ছেতাই মানুষ আপনি। না গাইলেন তো বয়ে গেল। মেঠো গান বই তো নয়! এর চেয়ে ভাল ভাল গান কত আমরা শুনেছি!

মুখ ফিরিয়ে চলল। ছইয়ের নীচে গেল না আর, উঠল গিয়ে ছইয়ের উপরে। উঠবার ধরনই বা কি, খুঁটিতে পা ঠেকিয়ে তড়াক করে উপরে উঠে পড়ল। কী গেছো মেয়ে রে বাবা! সার্কাস দেখিয়ে বেড়ায় নাকি? ছইয়ের উপরে উঠেই কিন্তু একেবারে চুপ—মন্ত্র পড়ে কে যেন পাষাণ করে দিয়েছে। মুগ্ধচোখে চেয়ে আছে দিগন্তের দিকে। মাঠের দূরপ্রান্ত অবধি সবুজ রঙে ঢাকা, এতটুকু ফাঁক নেই কোনখানে। উল্লসিত কণ্ঠে সহসা চারু কথা বলে ওঠে: জঙ্গল ঐ নাকি মাঝি? বাদাবন?

জগন্নাথ উপযাচক হয়ে সামাল করে: নৌকো টলছে—জলে পড়ে গেলে চিত্তির। জঙ্গলের ফুর্তি বেরিয়ে যাবে তখন।

নিরুদ্বেগ কণ্ঠে চারু বলে, কিছু হবে না। ভাল সাঁতার জানি আমি।

সাঁতারের ফুরসত দেবে না। কুমিরে ধরবে কিংবা কামটে কাটবে। কেটে নেবে যখন, বেশ সুড়সুড়ি লাগবে। তারপরে দেখা

যাবে, পুরো একটা পা-ই পাওয়া যাচ্ছে না।

মাঝি বলল, ছইয়ের উপর অমন দাঁড়ায় না বুনডি। বসে বসে দেখ।

অনেক পথ গুণ টেনে সজনেডাঙার খালের কাদায় নৌকো ঠেলে ঠেলে অনেক কষ্টে কুমিরমারি পৌঁছানো গেল। বড় গাঙের মধ্যে উজান বাওয়া চলবে না, বাতাসও মুখড়। নৌকো চাপান দেওয়া ছাড়া গতি নেই। আরও খান দুই বাঁক গিয়ে দোখালার ভিতর কোন গতিকে যদি ঢুকে পড়া যেত, খালে খালে যা-হোক করে এগুনো চলত। হল না হরর দোষে। তার ওই শীতলপাটি পছন্দ করতে গিয়ে।

জগা বলে, বয়ারখোলার কাজ কী, কুমিরমারি নেমে আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব। তোমাকেও হর, হাঁটতে হবে আমাদের সঙ্গে।

ব্যাপার বাণিজ্যে দু-চার পয়সার মুখ দেখতে আরম্ভ করে হর ঘড়ুই খানিকটা বাবু হয়ে পড়েছে। বলে, জান না তাই। পথ এখনো হয়েছে নাকি ? বনজঙ্গল জল জাঙাল—

তোমার জন্যে এতগুলো লোকের ভোগান্তি। ছাড়ছি নে তোমায়। হাঁটতে না পার, পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে তুলব।

হর চুপ করে যায়। কথায় কথা বাড়ে। ভদ্র অঞ্চলের মানুষ নৌকোয় যাচ্ছে, তাদের সামনে আরও না জানি কী বলে বসে! বাঁক ঘুরতেই ছোট ছোট টিনের চালা। কুমিরমারির হাটখোলা। হাটখোলার ঘাটের একদিকে টাপুরে-নৌকো কাছি করল। থাকতে হবে বেশ খানিকক্ষণ। জোয়ার শেষ হয়ে গিয়ে ভাঁটার টান যতক্ষণ না ধরছে। এক প্রহর রাত তো বটেই।

নেমে পড়ছে সব চড়ন্দার। মরা গোনে জল বড্ড নেমে গিয়েছে। নিকানো উঠানের মত নদী-চর তকতক করছে। ছোট ছোট মাছ কাদার উপর ছাপ কেটে সর-সর শব্দে ছুটোছুটি করছে এদিক-

সেদিক। পা চাপালে কাদার মধ্যে বসে যায়। নোনা কাদা সাংঘাতিক বস্তু। জোয়ার বলে নৌকো তবু তো অনেক দূর অবধি উঠে এসেছে।

নামতে হবে গো এবারে। নেমে খেয়ে-দেয়ে খানিকটা বেড়াওগে এখন। টানের মুখ ঘুরলে সেই সময় উঠে পড়ো আবার।

চারু নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। যারা নেমেছে, তাকিয়ে তাদের দুর্গতি দেখছে। মুখেই যত ফড়ফড়ানি—কাদায় পা দিতে হবে, সেই শঙ্কায় আঁতকে উঠেছে। সাপের মুখে পা দিতেও মানুষে এমন করে না। তা নামতে না চাও তো থাক নৌকোর খোপে আটক হয়ে, অন্য সকলে নেমে যাক, থাক পড়ে একা একা। কার দায় পড়েছে, কে পিঠ দিচ্ছে দুর্গাঠাকরুনের সিংহের মতন—সেই পিঠের উপর পা রেখে কাদা পার হয়ে উনি ডাঙায় নামবেন। আর যে পারে পারুক, জগা বিশ্বাস নয় কখনো। তার দিকে তাকায় কেন বারংবার, ভেবেছে কি? বাঁধন-আঁটা নিটোল দেহটার শোভা দেখছে? দেখ তাই, অন্য কিছু প্রত্যাশা করো না। মাথায় কাপড়-দেওয়া অপর্ব মেয়েলোকটি দিব্যি তো নেমে এল। আর নবাবনন্দিনী, দেখ, নাকী-নাকী বুলি ছাড়ছেঃ সবাই চললে যে বউদি, একা-একা আমি পড়ে রইলাম—। যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ বেঁধে রেখেছে ছইয়ের বাঁশের সঙ্গে! কাদায় নামবে না তো লাফিয়ে পড় এই জগন্নাথ ও আরো দশটা মরদের মতন। কাদা তো বড় জোর হাত আষ্টেক জায়গায়—আট হাত লাফাতে পারবে না, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তবে শাসন কিসের অত?

এক দল পশ্চিমা কুলী রাস্তার মাটি ফেলছে। বেলা পড়ে এল, কাজ করছে তবু এখনো। আর কত কাল লাগাবি রে বাপু! মাটি ফেলাটা হয়ে গেলেই পায়ে-হাঁটার অন্তত সোজা পথ পাওয়া যায়, গাঙে-খালে ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে না। খালের উপর পুল হবে। পুলের জন্য ইটকাঠ লোহালক্কড় এসে পড়েছে। খাল-ধারে পাহাড়-প্রমাণ তক্তা গাদা দিয়ে রেখেছে। আরে আরে কী করেছে দেখ

ছোঁড়া কজন—চার-পাঁচটা তক্তা কাঁধে বয়ে এনে কাদার উপর ফেলল। তক্তার উপর পদারবিন্দ রেখে ঠাকরুনের ডাঙায় ওঠা হবে। আবদার তো বেড়েই চলবে এমনিধারা তোয়াজ হলে।

এত বন্দোবস্ত সত্ত্বেও চারুবালা যেন গলে গলে পড়ছে। চারু নয়, নাম হওয়া উচিত ছিল নবনীবালা। নৌকোর কাড়ালে দাঁড়িয়ে বলছে, হাত ধর না গো কেউ তোমরা। নামি কেমন করে তক্তার উপরে ?

তা-ও চার-পাঁচ মরদ এগিয়ে এসেছে তার হাত ধরে নামাবার তরে। রকম দেখে জগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। হঠাৎ সে-ও ছুটল —তার সঙ্গে পারবে কে ! ছুটে সকলের আগে চলে গেল। কাড়ালের এপাশে ওপাশে হাতগুলো উঁচু হয়েছে চারুকে নামিয়ে আনার জন্য। সকলের উঁচুতে উঠে আছে জগার ইস্পাতের মত কঠিন কালো হাতখানা।

লম্ফ দিয়ে কাদা পার হওয়ার সময় জগার বিক্রম সকলে জেনে বুঝে নিয়েছে। চারুও বুঝেছে। আগ বাড়িয়ে এসে দাঁড়াল সেই মানুষ। হাতে হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে জগা মেয়েটার হাত অমনি মুঠোয় পুরে হেঁচকা টানে এনে ফেলল তক্তার উপরে নয়—তক্তার পাশে কাদার ভিতর। আর কেউ হলে সে টানে কাদার উপর গড়িয়ে পড়ত, শক্ত মেয়ে তাই সামলে নিল কোন গতিকে।

ছুঁচো কাঁহাকা—বজ্জাতের বেহদ্দ ! রাগে গরগর করতে করতে চারুবালা একতাল কাদা তুলেছে জগাকে ছুঁড়ে মারবে বলে। কোথায় জগা ? চক্ষের পলকে অত দূরে ঐ নতুন রাস্তার আড়াল হয়ে গেল। কিংবা ধোঁয়া হয়ে আকাশেই উড়ে গেছে হয়তো।

একছুটে চারুও রাস্তার উপর গেল। নতুন মাটি ফেলে অনেক উঁচু করেছে—চতুর্দিক সেখান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। গেল কোন্ দিকে ? যে চুলোয় গিয়ে থাকে, থাকুক না আপাতত পালিয়ে। নৌকো ছাড়বার সময় হলে আসতে হবে বাছাধনের।

শোধবোধ সেই সময়।

হর ঘড়ুই ঘাড় নেড়ে বলে, ক্ষেপেছ ? পায়ে পায়ে কত পথ মেরে দিল তারা এতক্ষণে। একা নয়, সঙ্গের সাথী বলাইটা আছে। আমাকেও টেনেছিল। আমি কারো গোলাম নই বাপু, স্বাধীন ব্যবসা আমার। দেরি হল কিংবা তাড়াতাড়ি পৌঁছলাম, আমার কি যায় আসে ? আমি কেন কষ্ট করতে যাই ?

সকলে অবাক হয়ে যায়ঃ বল কি গো ? রাস্তার একটুখানি নিশানা হয়েছে কি না হয়েছে—জলে নেমে খালই পার হতে হবে তিন-চারটে—

হর বলে, এক পহর ঠায় বসে থেকে তারপর নৌকোয় শতেক অঞ্চল ঘুরে যাওয়া—এর চেয়ে জল ঝাঁপানো কাদা মাখা ওদের কাছে অনেক ভাল। যতক্ষণে নৌকো বয়ারখোলা যাবে, ওরা খেয়েদেয়ে পুরো একঘুম ঘুমিয়ে উঠবে তার ভিতরে।

ধোপদুরস্ত কামিজ-পরা নগেনশশীর সঙ্গে হর ঘড়ুই এবার পরিচয় করছেঃ বাবু মশায়ের যাওয়া হচ্ছে কোথা ? ভেবেছিলাম, কুমিরমারি। নতুন চৌকি বসে গেল, কুতঘাটা হল, বাবুলোকের আনাগোনা বেড়ে গেছে—মা-লক্ষ্মীরা এসে পড়ে গেরস্থালি পাতাচ্ছেন এবারে। আরও নাবালে চললেন এঁদের সব নিয়ে ? কোথায় শুনি ?

পঁচিশ

চৌধুরিগঞ্জ অবধি রাস্তার নিশানা। জগা সেই রাস্তা ধরে চলেছে। চলা আর কি, একরকম দৌড়ানো। রাস্তায় বেরুলেই জগার এই কাণ্ড, ধীরেসুস্থে পা ফেলা কোষ্ঠিতে লেখে না। পিছনে বলাই, সে হাঁপাচ্ছেঃ আস্তে রে জগা, আস্তে।

আবার ওরই মধ্যে রসিকতা করে নেয় একটুঃ এত ছুটছিস

কেন রে? দজ্জাল মেয়েটার ভয়ে? উঁহু, সে পিছনে নেই আস্তে চল।

উঁচু জায়গা হল তো বন জঙ্গল, নাবাল হল তো জল। বনের গাছপালা কেটে নাবাল জমির উপর মাটি ফেলে হাত চারেক চওড়া রাস্তা টেনে নিয়ে গেছে। সেই আরো বিপদ। কাঁটাগাছের গোড়াগুলো শূলের মতন পায়ে খোঁচা দেয়। নতুন-তোলা মাটিতে ঠোক্কর লাগে পায়ে। জগার লাগে না, বোধ করি শহুরে ঘোড়ার মতন পায়ের তলায় সে লোহার নাল বাঁধিয়ে নিয়েছে। নয় তো ছোটে কেমন করে ঐ রাস্তায়? বলাই পেরে ওঠে না—রাস্তা ছেড়ে সে পাশের অপথে চলে যায়, জলে নেমে পড়ে। গোটা দুই-তিন খাল বাঁধা হচ্ছে, কাজ শেষ হয় নি এখনো। তা জগার কাণ্ড দেখ, তিলেক দ্বিধা না করে খালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তরতর করে সাঁতরে পার হয়ে গেল। রাস্তাটা করেছে কিন্তু নাকের সোজা। বারো-বেঁকির প্যাঁচে প্যাঁচে যত ঘুরতে হত, সংক্ষেপ হয়ে গিয়ে বোধ করি তার সিকিতে দাঁড়িয়েছে। আর সত্যি সত্যি যখন পাকা রাস্তা হয়ে মোটর গাড়ি চলবে, তখন কুমিরমারি একেবারে ঘরের দুয়ারে। পলক ফেলতে না ফেলতে পৌঁছে দেবে।

সাঁইতলা পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিস্তর ক্ষণ আগে এসেছে তবু। নৌকো হলে দিনের আলোর মধ্যে আসা ঘটত না। জগা বলে, আলায় চল রে বলাই আগে। পনের-বিশ হাত বাঁধ ভেঙেছে, তার মধ্যে আজব ব্যাপারটা কি হল? লোহার নয়, মাটির বাঁধ—ভাঙবেই তো জলের তোড়ে। এত বেশী উতলা কেন বড়দা? ধানকর নয় যে নোনা জল ঢুকে সবুজ ধানচারা রাঙা হয়ে মরে যাবে। চারামাছ অবিশ্যি কিছু বেরোতে পারে, তেমনি গুঁড়ো ডিমও ঢুকবে জলের সঙ্গে। ভাঙনের মুখে গোটাকয়েক খোঁটা পুঁতে খোঁটার গায়ে খড় জড়িয়ে দিয়ে জলের টান রুখে দাও আগে। মাছ ঠেকাও। ধীরেসুস্থে মাটি এনে ঢাল তারপরে। ধানচাষীর মতন বুক চাপড়ে হাহাকার কেন করতে যাবে?

আলায় এখন একলা রাধেশ্যাম। গগন বাঁধে গেছে লোকজন যোগাড় করে নিয়ে। ভাঙা জায়গায় মাটি ফেলছে, আর খুঁজে খুঁজে দেখছে ঘোগ হয়েছে কিনা অন্য কোথাও। অর্থাৎ কোনখানে ছিদ্র হয়ে গাঙের জল চুঁইয়ে ভিতরে আসে কিনা। মাটি ধুয়ে ধুয়ে ঐ সরু ছিদ্র এক সময়ে বড় হয়ে নদীস্রোতের পথ করে দেয়। গোড়া থেকে সতর্ক হলে আখেরে হাঙ্গামা ও খরচান্ত হয় না। বাঁধের আগাগোড়া গগন তাই চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাধেশ্যাম বাবু-মানুষ—পেটের দায়ে জালে যায় বটে কিন্তু জলকাদা মাখতে সে নারাজ। তায় আবার খানায় পড়ে পা মচকেছে। শুয়ে বসে সে আলা পাহারা দিচ্ছে।

বলে, কালীতলার ঐ দিকটা চলে যাও তোমরা। দূর বেশী নয়। সকলকে পেয়ে যাবে।

বলাই বলে, গিয়ে কি হবে ? হাক্লান্ত হয়ে এসে আবার এখন কোদাল ধরতে পারব না। পেট চোঁ-চোঁ করছে—ঘরে চল জগা, ভাত চাপিয়ে দিই গে। খেয়েদেয়ে আত্মারাম ঠাণ্ডা করে খোঁজখবর নিতে আসব।

ভাত নামিয়ে লঙ্কা-তেঁতুল এবং গুড়-তেঁতুল দিয়ে খেয়ে নিল। এই তো তোফা দু-খানা তরকারি। চেষ্টা করলে মাছও মিলত, কিন্তু অত সবুর সয় না। পরিতোষের খাওয়া সেরে গড়িয়ে পড়ল মাদুর পেতে। খোঁজখবর নেবার কথা আর তখন মনে নেই। ঘুম তো নয়, কেউ যেন মেরে রেখে গেছে দৈত্যসম ছোঁড়া দুটোকে। ছুটোছুটি করে কত কাতর হয়ে পড়েছে, ঘুমের এই ধরন দেখে বোঝা যায়।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে চোখ রগড়ে জগা উঠে বসল, তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে।

ওঠ রে বলাই। কি হল ? জাগবি নে মোটে তুই ?

বলাইর পা ধরে ঝাঁকি দেয়। উঁ—বলে একবার চোখ মেলে দরাজ মাদুর পেয়ে পা ছড়িয়ে সে পাশ ফিরল।

এক ছিলিম তামাক খাওয়ার দরকার এখন মউজ করে। ঘুমের

আগে যেটুকু হয়েছে, তাতে তেমন জুত হয় নি। তামাক আছে, কিন্তু গুড় শুকিয়ে গিয়ে বিস্বাদ। তামাক টানছি না শুকনো লাউপাতা—সেঁকই লাগে না গলায়। ক'টা দিন ঘরে ছিল না, সমস্ত গণ্ডগোল হয়ে গেছে এর মধ্যে।

বলাই ঘুমোক, জগা আলায় চলল। গগন ফিরেছে ঠিক এতক্ষণে। বাঁধ ভাঙার বৃত্তান্ত শুনবে জমিয়ে বসে। তামাক যত কলকে ইচ্ছে খাবে।

গগন দাসের আলা মেছোঘেরির আর দশটা আলার মতন নয়। ছ-চালা ঘর। সাঁইতলা তল্লাটের মধ্যে ঘরের মতন ঘর বানিয়েছে বটে একখানা! বাহারটা আস্তে আস্তে জমেছে। তিন দিকে এখন মাটির দেয়াল। এক পাশের দাওয়া গরানের ছিটেয় বন্ধ করে ঘিরে নিয়ে চৌকাঠ-দরজা বসিয়েছে। গগনের শোবার ঘর—যাবতীয় খাতাপত্র এবং হাতবাক্স সেখানে। এই ঘরে তালা দিয়ে রাখে গগন যখন বাইরে কোথাও যায়।

আলা একেবারে চুপচাপ। এ সময়টা এমন হওয়ার কথা নয়। কাদামাটি-মাখা জন তিন-চার ডোবার জলে হাত-পা ধুচ্ছে। জগা জিজ্ঞাসা করে, মাটি কাটছিলে বুঝি তোমরা? কাজকর্মের কত দূর?

আজ শেষ হয়ে গেল।

বড়দা নেই এখন আলায়?

আছে—হুঁ। হিসেবপত্র হল এতক্ষণ। আমাদের রোজ গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে ঘেরিদার ঘরে ঢুকে পড়েছে।

কামরায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে জগা হেসে ওঠে: একা একা ধ্যানে বসেছ নাকি বড়দা? আলা ভোঁ-ভোঁ করছে, মানুষজন গেল কোথা?

সত্যি, হাসির ব্যাপার নয়। এত দিন সঙ্গে সঙ্গে আছে, এমন ধারা দেখা যায় নি আর কখনো। কামরার মাঝখানটায় টেমি জ্বলছে, সস্তা লাল কেরোসিনের ধোঁয়া উঠছে গলগল করে। আলোর সামনে দু-হাতে মাথা চেপে গগন ঝিম হয়ে বসে। খাওয়ার সময়টাও

আলো জ্বালে না, মাছের কাঁটা অন্ধকারে আন্দাজে বেছে ফেলে। সেই মানুষ অহেতুক কেরোসিন পোড়াচ্ছে। ভয় হল জগন্নাথের।

হল কি তোমার? কি ভাবছ?

গগন ক্ষীণকণ্ঠে বলে, এস জগা। মনটা বড় মিইয়ে আছে। জলের নীচে যথাসর্বস্ব ঢেলে দিয়েছি। দু-চার পয়সা এদ্দিনে যা রোজগার-পত্তোর হল, বাঁধের মাটি খেয়ে নিল সমস্ত। উল্টে পাঁচ-ছ টাকার মতন দেনা। তার উপরে পিওন এসেছিল আজ আবার। ভুল আমারই। বড় বড় পারশেমাছ খাইয়েছিলাম সেদিন, সেই লোভে পিওন নিত্যি আসতে লেগেছে। এসে মাথায় মুশল মেরে গেল।

চিঠি?

এতখানি পথ আসছে, খালি হাতে আসে কি করে? সেদিন, এই ধর, তিনটে খামের চিঠি নিয়ে এল। উনুনে দিয়ে অবসর হলাম। আবার আজ। আগের চিঠি বয়ারখোলায় তৈলঙ্গের বাড়ি থেকে ঠিকানা কেটে এখানে পাঠায়। এবারে সরাসরি চলে এসেছে। তার মানে, এই আস্তানাও জেনে গেছে। কেমন করে জানল, রোজ রোজ এত সমস্ত কী লেখে—দেখিই না খুলে। বুঝলে জগা, ঐ ইচ্ছেটাই হল কাল। চিঠি পড়ে সেই থেকে মাথা ঘুরছে আমার।

জগার ভাল লাগে না। মনোমত এক ছিলিম তামাক খেতে এসে একঘেয়ে কাঁদুনি শুনবে এখন বসে বসে? সংসার জোটানোর সময়টা মনে ছিল না যে ফ্যাচাং আছে পিছনে?

বলে, কষে ফুর্তি লাগাও বড়দা। মাথা ঘোরার জবর ওষুধ। মানুষজন দেখতে পাচ্ছি নে—কটা দিন ছিলাম না, তার মধ্যে মরেহেজে গেল নাকি সমস্ত?

তোমরা ছিলে না, মাছের খাতা বন্ধ হবার দাখিল। মানুষ এখন কোন্ কাজে আসতে যাবে?

বলতে বলতে গগন কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে: বাদাবনের বেঘোরে এনে সত্যি সত্যি মেরে ফেলবে? এই তোমার ধর্ম হল?

জগা ?

জগা বলে, আমি ছাড়া আর লোক নেই ?

বলাইটাকেও যদি রেখে যেতে—

জগা-বলাই একই কথা! এ তোমার অন্যায় বড়দা। জগা তোমায় চিরকাল আগলে বসে থাকবে না।

কিন্তু মেছো নৌকো কে নিয়ে যায় শুনি? দু-দুবার এর মধ্যে লোক বদলেছি। বারোবেঁকি ঘুরে মাছ নিয়ে পৌঁছতে বেলা দুপুর করে ফেলে। খদ্দের নেই তখন, একেবারে মাটির দর। ব্যাপারীরা তাই মাল কেনবার গা করে না মাছ-মারারাও তেমন জাল নিয়ে বেরুচ্ছে না।

জগা বলে, বারোবেঁকি আর ক'দিন! রাস্তায় মাটি পড়ে গেছে, সেই ডাঙার পথে আমরা এলাম। মাছ এর পরে এক দণ্ডে নিয়ে ফেলবে। ভাবনা করো না, বেরিয়ে এস দিকি। গানবাজনা হোক একটু। নয় তো ছক-ঘুঁটি নিয়ে বসো। কী ঘরের মধ্যে বসে প্যানপ্যানানি!

বাইরে এসে উচ্চকণ্ঠে বলাইয়ের নাম ধরে ডাকে। পচাকে ডাকে। রাধেশ্যামকে। খোল দেয়ালে টাঙানো, চাঁটি মেরে পাড়াময় জানান দিয়ে দিল। গগনকে বলে, জুত করে এবারে এক ছিলিম চড়াও বড়দা। তামাক না খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে। ঘুম ভেঙেই তোমার কাছে ছুটেছি।

তামাক সেজে টানতে টানতে এসে গগন জগার হাতে হুঁকো দিল। হুঁকো দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বলে ওঠে, দশটা টাকা কর্জ দিতে পারিস জগা?

জগা বলে, বড়মানুষ তুমি বড়দা। শীতলপাটি বিনে ঘুম হয় না। হর ঘড়ুই কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে তোমার জন্য শীতলপাটি বয়ে আনে। তোমার আবার টাকার কি টান পড়ল?

শীতলপাটির কথায় গগনের লজ্জা হয়। কৈফিয়ত দিচ্ছে ফলাও করে: সে এক কাণ্ড! দুপুরবেলা ঘুম হচ্ছে না, গরমে এপাশ-ওপাশ

করছি। হর ঘড়ুই সেই সময়টা এল। বলে, সামনে বোশেখ মাস, গরমের হয়েছে কি এখন? ফুলতলায় তোফা শীতলপাটি পাওয়া যাচ্ছে। চোদ্দ সিকের পয়সা তখন গাঁটে, পাশ ফিরতে গায়ে ফোটে। সেই জন্যে আরও ঘুম হয় না। সেই পয়সা ঝড়াকসে বের করে দিলাম ঘড়ুইয়ের হাতে। আখের ভাবলাম না। আবার তা-ও বলি, তখন তো জানি নে, বাঁধ ভেঙে এককাঁড়ি পয়সা গুণোগার যাবে। আর পিঠ পিঠ পিওন শালা এসে পড়বে। মাছ খেতে এসেছে! মাছ না দিয়ে নুড়ো জ্বেলে দেব এবারে বেটার মুখে।

পরক্ষণেই আবার অনুনয়ের সুরে বলে, দশটা টাকা দেবে আমায় জগা? পিওন বেটা অনেক দূর থেকে আশামুখে এসেছিল। কিন্তু খাতা একরকম বন্ধ এই কদিন—ভাল মাছ কোথা? ঘুসো-চিংড়ির ঝোল খেয়ে গেল বেচারা। কোটালের মুখে আবার আসতে বলে দিলাম। হয়তো বা রাত পোয়ালে এসে পড়বে। দশ টাকা তার কাছে দিয়ে দেব মনিঅর্ডার করতে।

বলার ধরনে জগা অবাক হয়ে তার মুখে তাকায় : মুখেই তোমার ফড়ফড়ানি। বউয়ের জন্য মন কেমন করছে—উঁ?

গগন না-না করে না অন্য দিনের মত। একটুখানি চুপ করে রইল। বলে, ধরেছিস ঠিক। চিঠি পড়ে ফেলেই মুশকিল হল। বউ একা লেখে নি। বোন লিখেছে। মেজো সম্বন্ধীও লিখেছে। সেটা অতি নচ্ছার, সম্বন্ধ না থাকলেও তাকে আমি শালা বলতাম। সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আমি নাকি পালিয়ে বসে আছি। শোন কথা!

সজোরে নিশ্বাস ফেলে একটা। জগার হাত থেকে হুঁকো নিয়ে ফড়ফড় করে দ্রুত কয়েকটা টান দেয়। বলে, বউ আছে বোন আছে, ঘরবাড়ি বাগান-পুকুর পড়শী-কুটুম্ব সমস্ত নিয়ে দিব্যি এক সংসার রে! কেউ কি শখ করে সে জিনিস ছেড়ে আসে! বাইরে তাড়াবার জন্য সকলে ওরা উঠে পড়ে লাগল। আমি নড়ব না, ওরাও ছাড়বে না। গাঁয়ে জাগ্রত রক্ষেকালী ঠাকরুন, কালীভক্ত

আমরা। তাঁর পাদপদ্মে রেখে চলে এলাম। ঠাকরুন দেখেও আসছেন এত বছর। মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে ইদানীং অচল অবস্থা নাকি, ঘন ঘন চিঠি হাঁটাচ্ছে। ধানাইপানাই করা মেয়েমানুষের স্বভাব—আমি আমল দিই নে। চিঠিই খুলি নে, দেখেছিলে তো। নিজের একটা পেটই চলে না, বারো ঘাটে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। চিঠি খুলে কোন্ সুবিধা তাদের করে দেব?

জগার মনটাও কেমন হয়ে যায় আজ। গগনের জন্য কষ্ট হয়। কোন্ এক দূরদেশে ঘরসংসার ফেলে এসেছে, টাকা পাঠানোর দরকার। সেই টাকার ধান্দায় কত জায়গায় ঘুরল, কত রকম চেষ্টাচরিত্র করছে—কিছুতে কিছু হয় না। আর জগার ট্যাঁকে টাকাপয়সা আপনি গড়িয়ে আসে। বাদাবনে তোমরা দেখ শুধু জঙ্গল, জঙ্গলে বাঘ, জলে কুমির দেখে আর শুলোর খোঁচায় পা জখম করে বাপ-বাপ বলে চেঁচিয়ে ওঠো। ভিতরের মজাটা জান কজনে? বাদায় ঢোকবার মুখে টাকা দিয়ে লাইসেন্স করবার আইন। অদৃষ্টে কী ঘটবে ঠিকঠিকানা নেই, আগেভাগে গাঁটের টাকায় সরকার-সেলামি দিয়ে এস। আচ্ছা আইন রে বাপু! বাঘ-কুমির তো লাইসেন্স করে ঢোকে না, বিনি ট্যাক্সোয় খেয়েদেয়ে চরে বেড়িয়ে এই তাগাড় হচ্ছে। তাদের কায়দায় চলাচল কর তুমিও—লোকসানের ভয় নেই। যা-কিছু সওদা ষোলআনা লাভের অঙ্কে পড়বে। টাকা আর নোট কোথায় রাখা যায়, সেই তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ও-বছর গগনের এসে পড়ার আগে—গোলপাতা কাটতে গিয়ে কি হল? সরকারী খাতায় বেবাক শূন্য, বনকরের বাবুদের পান-খাওয়া বাবদ বারো কি তেরো টাকা সর্বসাকুল্যে। নিঃসাড়ে মাল বেরিয়ে এল বিশ কাহন। বড়লোক হতে ক'দিন লাগে হেন অবস্থায়? মোটামুটি রকমের গেঁথে নিয়ে বসো; তারপরে পায়ের উপর পা চাপিয়ে খাওদাও আর ফুর্তিসে ঢোলক বাজাও। শহরে পাক দিয়ে এস মাঝে মাঝে দু-পাঁচ দিন। টাকা কিছুতে ফুরোতে চায় না। কিন্তু এমন কপালখানা জগার, মনিঅর্ডার করে ঐপথে কিছু যে হালকা হয়ে

যাবে, ভুবন ঢুঁড়ে তেমন একটা লোক মেলে না। গগন বিদ্বান্ মানুষ—বাদার কাজ তাকে দিয়ে হয় না। তার কাজ ডাক্তারি কিংবা মাস্টারি। বড় জোর এক মাছের খাতা খুলে মাচার উপর হাতবাক্স কোলে নিয়ে ঝুড়ি প্রতি এক এক আনা উপার্জন। বিদ্যাই কাল হয়েছে, এর বেশী এ মানুষকে দিয়ে হতে পারে না।

ছিলিম শেষ করে জগা উঠল। গগন বলে, যাও কোথা ?

চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেললাম। পাড়াসুদ্ধ ঠিক মরেছে, নয় তো এ রকম নিঝঝুম হয় না। ঘুরে দেখে আসি বড়দা।

আর ঐ যে টাকার কথা বললাম তোমায়। ন্যায্য সুদ দেব।

হবে, হবে। সে তো কালকের কথা।

হন-হন করে সে বেরুল। পাড়ায় নয়, চলল উল্টোমুখো—কালীতলা যেদিকটায়।

কালীতলার আরও খানিক এগিয়ে, বলাসুন্দরীর ঝোপের এদিকে-সেদিকে বড় বড় কয়েকটা পশুর ধোন্দল বান মাথা তুলে আছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে জগা সতর্কভাবে সেইখানে ঢুকে পড়ে। একটা বান গাছ চিহ্নিত করা আছে, গুঁড়িতে প্রকাণ্ড খোল। আবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে খোলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। বজ্জাত ছোঁড়াগুলো গাঙশালিক ও কাঠঠোকরার ছানা বের করে এমনি ধারা হাত ঢুকিয়ে। অথবা হাতে তুলসীপাতার রস মেখে মৌচাক ভেঙে এনে নিঙড়ে নিঙড়ে মধু খায়। গ্রহ মন্দ হলে সাপেও কাটে—পাখির ছানার লোভে সাপ কখনোসখনো গাছের খোলে ঢুকে পড়ে। জগা বের করল মাটির ঘট একটা। ঘটের মুখ টাটি দিয়ে ঢাকা—আধাআধি টাকায় ভরতি। নোট নয়, রুপোর টাকা শুধু। মাটির নীচে কাগজের নোট নষ্ট হয়ে যায়, নোট ভাঙিয়ে টাকা করে ঘটের ভিতর রাখে। আজকালকার টাকা—রুপা নামেমাত্র, খাদবস্তু বেশী। টাকার রং কালো হয়ে যায় দু-পাঁচ দিনে। তেঁতুল বা আমরুল-পাতায় ঘষে চকচকে কর, নয় তো বাজারে নিতে চায় না।

কম নয়, থোক কুড়ি টাকা নিয়ে এল জগা। গগনের হাতে দিয়ে বলে, মেকি নয়, রংটা এই রকম। বাজিয়ে দেখে নাও বড়দা। সুদও সস্তা করে দিচ্ছি—এক পয়সা হিসাবে। বিশ টাকার দরুন পাঁচ গণ্ডা পয়সা খাতা থেকে রোজ ফেলে দিও। চুকে গেল। আসল যদ্দিন খুশি রেখে দাওগে, তাগিদ করব না। সুদটা ঠিক ঠিক দিয়ে যেও।

টাকা গগন বাজিয়ে দেখে না। গুণে নিল। কুড়িই বটে। চাইল দশ, দিয়ে দিল তার ডবল। সাক্ষাৎ কল্পতরু। এক দিনের সুদ এক পয়সা--এক রকম বিনা সুদেই বলা যায়। এমন হলে তো বাদা অঞ্চলের সবাই ঋণ করে হাতি কিনে বসে একটা। জগার ঔদার্যে গগন অবাক হল। খুশিতে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হেসে বলে, আজকের দিনের সুদ কুড়ি পয়সা—নিয়ে নাও সেটা নগদ।

থলি ঝেড়েঝুড়ে পয়সা সাতটার বেশী হল না। তাই তো! তখন আর এক পন্থা মনে এসে গেল।

ডেকে এলে, তা আসে কই ওরা? গানবাজনা নয়, খেলা হবে এখন। খেলায় রোজগার করে তোমার সুদ শুধব। সুদই বা কেন, আসলের আধাআধি ঝেড়ে দিচ্ছি এখনই।

এগিয়ে গিয়ে নিজেই চেঁচামেচি করে আসে: চলে আয় কোন্ কোন্ মরদের বেটা আছিস। পয়সা গাঁটে নিয়ে আসবি।

শেষ কথার মধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার। জগা ইতিমধ্যে মেজেয় মাদুর বিছিয়ে ছক পেতে বসেছে। বলাই এল। আরও জন চার-পাঁচ—আজকে যারা জালে যায় নি। গাঁটে যাদের পয়সা তারা খেলবে; বাকি লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে সদুপদেশ ছাড়বে, যে লোক জিতবে তুড়িলাফ দেবে তার পক্ষ হয়ে।

কুড়ি কুড়িটা টাকা গগনের হাতে একসঙ্গে, অতিশয় উঁচু মেজাজ, আপাতত সে থোড়াই কেয়ার করে দুনিয়াটাকে। বলে, দশ টাকা এই আলাদা করে কাপড়ের খুঁটে বাঁধি। বাপের হাড় রে বাবা। পিওন এসে পড়লে তখন গাঁট খুলব। বাকি দশ এই মুঠোয়

—রণে এস রাপধনেরা। দেখ কি জগন্নাথ—আধাআধি নয়, তোমার পুরো দেনা শোধ করব এখনই। দেনা দাঁড়াতে দেব না।

চলল ফড়খেলা। ক্রমেই গগনের মুখ শুকাচ্ছে। যাঃ শালা, কি বিশ্রী পড়তা, উল্টোপাল্টা দানই পড়ে কেবল। টাকা সমস্ত খোয়া গেল, একলা জগাই তার মধ্যে আট টাকা পনের আনা মত জিতে নিল। বেটা সব দিকে তুখোড়, ফড়ের ঘুঁটিও যেন কথা শোনে ওর। এখন কী উপায়? কানে জল ঢুকলে আবার খানিক জল ঢুকিয়ে আগের জল বের করে ফেলে। ইতস্তত করে গগন শেষটা কোঁচার খুঁট খুলে বাকি দশ টাকা বের করে ফেলল।

তা-ও খতম। নেশা জমে গেছে তখন। ছাড়বে না কি জগা আর কিছু? যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। বিশ কর্জ হয়েছে, না হয় পঁচিশই হবে। চেটে পুঁছে সবই তো নিয়ে নিলে তুমি।

জগা চটে গিয়ে বলে, খোঁটা দেবার কি আছে বড়দা? চুরি-জোচ্চুরি করেছি? আইনদস্তুর খেলা খেলে জিতে নিইছি।

গগন বলে, তাই দেখলাম গো জগা, পয়সাকড়ি তোমার পোষ-মানা। বিষম চেনা চিনে ফেলেছে তোমায়। যার কাছে যা থাকুক, পায়ে হেঁটে যেন তোমার গেঁজেয় গিয়ে উঠে বসে। তা পাঁচ টাকা না হোক, জুটো টাকা ছাড়। পিওন বেটাকে আসতে বলেছি—পোড়া অদৃষ্টে হবে না কিছু জানি—আরও একটুখানি চেষ্টা করে দেখা।

জগা উঠে দাঁড়াল তো গগন তার হাত চেপে ধরে। জগা মুখ খিঁচিয়ে বলে, টাকার আমি গাছ নাকি—নাড়া দিলে অমনি ঝুরঝুর করে পড়বে?

এই তো জিতে নিলে এতগুলো টাকা। ধর্মপথেই জিতেছ, আমি বলছি। বউয়ের কথা ধরি নে—কিন্তু মায়ের পেটের বোন আমার মিছে কথা লিখবে না। বড়লোক শালারা দেখাশুনো করত। কী নাকি ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে—এক পয়সাও নেবে না শালার কাছ থেকে, না খেয়ে দাঁতে কাঠি দিয়ে পড়ে থাকবে। তা সে পারে, বড্ড

জেদী মেয়ে। উঠে পড়ছ কেন জগা, বসো আর একটু। টাকা দিয়ে লোকসান কিসের তোমার ? এমন খাতা রয়েছে, ভেড়ির মাছও বড় হচ্ছে ওদিকে—ঐ কটা টাকা তুলে দিতে পারব না ?

হেন কালে মানুষের শব্দসাড়া উঠানে। খেলায় মগ্ন ছিল, নজর তুলে কেউ দেখে নি।

কারা গো ?

হর ঘড়ুই শীতলপাটি ঘাড়ে নিয়ে আগে আগে আসছে। বলে, বাইরে এসে দেখ বড়দা, তোমার আপন লোকেরা সব এসে পড়ল।

বাদারাজ্যের ভিতর কুটুম্ব আসা একটা সমারোহের ব্যাপার। হুড়মুড় করে সবাই দাওয়ায় চলে এল। জগার চক্ষু কপালে উঠে গেছে। কি আশ্চর্য, কুমিরমারি অবধি টাপুরে-নৌকোয় যাদের সঙ্গে এসেছে সেই ছুটো মেয়ে লোক এবং পুরুষটি। তাদেরও যে সাঁই-তলায় গতি, কে ভাবতে পেরেছে!

চারুর একেবারে চোখোচোখি পড়ে গেল জগা। বিনি-বউকে চারু বলে, সেই মানুষটা বউদি। চিনতে পারছ না—আমায় যে কাদার মধ্যে ফেলে দিল। দাদার কাছে এসেছে সেই বজ্জাত।

যে জগা বাঘ দেখে ডরায় না, চারুবালার মুখোমুখি কেমন সে জবুথবু হয়ে গেছে। চেহারায় মেয়েলোক, বয়সও কম বটে—কিন্তু পিত্তি জ্বালা করে কথাবার্তায়। নতুন জায়গায় পা দিয়েই সকলের সামনে তার সম্বন্ধে পয়লা উল্লেখ হল বজ্জাত বলে। নেহাত লোকে কি বলবে,—নয় তো ছুট দিয়ে পালাত মেয়েটার সামনে থেকে। তবে বউদি মানুষটি দেখা গেল মিটমাটের পক্ষপাতী। চাপা গলায় তাড়া দিয়ে ওঠে, ঝগড়া বাধিও না বলছি ঠাকুরঝি। চুপ কর। যেখানে পা দেবে সেইখানে গণ্ডগোল।

জগাকে ছেড়ে চারু তখন নিজের ভাই গগন দাসকে নিয়ে পড়ল : কী মানুষ তুমি দাদা। আমরা আছি কি মরেছি, চিঠি লিখে একটা খবর নাও না। তাবৎ পিরথিমের ভিতর জায়গা একটা বেছেছ বটে! সত্যি সত্যি খুঁজে পাব, একবারও তা ভাবতে পারি নি।

নগেনশশী পিছনে পড়ে ছিল, পা টানতে টানতে দাওয়ার ধারে এসে দাঁড়ায় : হুঁ, খুঁজে পাবে না! মানযে আজ চাঁদ-তারা তাক করে ছুটোছুটি করছে, এ তবু মাটির উপরে। খুঁজে পাবে না তো আমি রয়েছি কি জন্যে? বিনিকে তাই বললাম, চোখ-কান বুজে আমার পিছু পিছু চলে আয়। হাজির করে দিলাম কি না বল এবারে।

গগন গরম হয়ে বলে, যা লিখেছিলে নগেনশশী, সেইটে অক্ষরে অক্ষরে করে তবে ছাড়লে? ছি-ছি, গেরস্তঘরের মেয়েছেলে তুমি বনে এনে তুলেছ। তোমার বোনকে নিয়ে এসেছ, আমি কিছু বলতে চাই নে। কিন্তু আমার বোনকে নিয়ে এলে কোন্ বিবেচনায়?

নগেনও সমান তেজে জবাব দেয়, তোমার বোনেরই তো গরজটা বেশী! তার ঠেলায় তিষ্ঠানো দায়। নিরুপায় হয়ে বিনি তখন বলে, চল মেজদা, পৌঁছে দেবে আমাদের। সাথী না জুটলে ও-মেয়ে শেষটা একা-একা বেরিয়ে পড়বে।

চারু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : আলবৎ বেরুতাম। গায়ে যেন জল-বিছুটি মারছিল। কাদের কাছে কোন্ ভরসায় রেখে এসেছিলে শুনি? এদ্দিন তবু চাট্টি চাট্টি ধান হয়েছে, ভেনে-কুটে চলে গেছে একরকম। এবারে খরায় মাঠ শুকনো, একচিটে ঘরে উঠল না। বড়লোকের হাততোলা হয়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল দাদা। সে বড়লোক দয়ায় কিছু করে না, মতলব নিয়ে করে।

ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় একবার নগেনশশীর দিকে। দৃষ্টির তেজেই বুঝি নগেন সরে গিয়ে হরর কাছে দাঁড়াল। গগন বেকুব হয়েছে, ঠাণ্ডা করতে পারলে এখন বাঁচে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, চলে এসেছিস, সে তো ভালই। ক্ষেতখামারের এই হাল, আমি তা জানব কেমন করে? কুটুম্বর হাততোলা কেন হতে হবে? কাল সকালেই মনিঅর্ডার হয়ে টাকা চলে যেত। খবর আসতেই লেগে গেল তো কত দিন।

জগা হঠাৎ কতকগুলো টাকা ছুঁড়ে দেয় গগনের দিকে। না বুঝে

গগন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়।

তোমারই টাকা বড়দা। একটু আগে যা তোমার থেকে আমার ট্যাঁকে চলে এল। আলাঘরে কুটুমরা—কুটুম রে-রে করে এসে পড়েছে। টাকা নইলে মচ্ছব হবে কি দিয়ে?

দাওয়া থেকে সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে উঠানে। পৈঠা দিয়ে নামবার তাগত নেই, চারুবালা সেই দিকে। ও যা বস্তু —চোখ দিয়ে পোড়াচ্ছে—নাগালের মধ্যে পেলে কি করে বসে, বলা যায় না।

অন্ধকারে যেন ঢেউ তুলে দিয়ে তার মধ্যে জগা ডুবে গেল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। বাইরের সবাই চলে গেছে, আপন লোকেদের কথাবার্তা এইবার নিজেদের মধ্যে। জগা আলা-ঘরের কানাচে এসে দাঁড়াল।

বোন বলছে, দাদা, কি করছিলে ঘরের মধ্যে তোমরা এতজনে মিলে?

ভারী মজাদার জবাব ভাইয়ের: নামগান হচ্ছিল।

কই, আওয়াজ পাই নি তো?

বিড়বিড় করে হচ্ছিল। তাতে যা ভাব আসে, চেঁচামেচিতে তেমন হয় না।

দেয়ালে-ঝোলানো খোলখানা—আঙুল তুলে নিশ্চয় সেটা দেখিয়ে দিয়েছে। বড্ড কাজে লেগে গেল খোলটা—পশার বাড়ল আত্মজনের কাছে। কিন্তু ফড়ের ছকঘুঁটি কোন্ কায়দায় তিন জোড়া চক্ষুর সামনে থেকে বেমালুম সরিয়ে ফেলল, জগা এক দিন বড়দাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবে।

ছাব্বিশ

ভোররাত্রে ডাকাডাকি: জগা কোথা? বলাই কোথা রে? সাড়া

দেয় না ওরা ঘরের ভিতর থেকে। পচা আজ জালে বেরিয়েছিল, হয়েছেও যা-হোক কিছু। তার স্বার্থ রয়েছে, তাকেই পাঠাল খাতা থেকে। অন্য কেউ এসে ঘুম ভাঙালে জগা কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে চাইবে,—ভাবের মানুষ পচাকে কিছু বলবে না।

মাছের আমদানি বড্ড কমে গেছে। সে দোষ ষোলআনা জগার। ফুলতলা নিজে গেল, আবার লেজুড় করে নিয়ে গেল বলাইটাকে। দু-দিন বলে পুরো পাঁচ-পাঁচটা দিন কাটিয়ে এল। মাছের নৌকো সেই ক'দিন কুমিরমারি হাজির হয়ে একটা ভাল খদ্দের ধরতে পারে নি। কিছু ছ্যাঁচড়া খদ্দের ছিল তখন।—যেসব মানুষ ইচ্ছে করেই মেছোহাটে দেরি করে আসে। এসে হয়তো দেখে মাছই নেই তখন। যেদিন থাকে, সস্তা দরে পাওয়া যায়। বেশী থাকল তো বেশী সস্তা। কাঁচা মাল রেখে দেওয়া চলে না, দরদাম যা-ই হোক ছাড়তেই হবে। দর পাচ্ছে না বলে মাছ-মারা-দেরও উৎসাহ নেই জলে নামার। খাতার কাজকর্ম তাই বসতে না বসতে চুকে গেছে। গাঙে একপো জোয়ার। এই যে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সে-ও জগারই কারণে।

জগা চোখ মুছতে মুছতে সোজা গিয়ে ডিঙির গলুয়ে বোঠে ধরে বসল। অন্য দিন খাতায় বসে একটি ছিলিম অন্তত তামাক খেয়ে তবে ঘাটে নামে। আজকে—ওরে বাবা, দাওয়ার কামরায় চারুবালা হয়তো ঘাঁটি পেতে রয়েছে। তা ছাড়া দেরিও হয়ে গেছে, মাছের ঝোড়া নিয়ে হর ঘড়ুই ডিঙিতে উঠে গেছে অনেকক্ষণ।

কাছি খুলে দে বলাই। গাজি বদর বদর!

চারুবালা উপর থেকে ডাকছে, শোন, কানে যাচ্ছে না ও-লোকটা? বোঠে থামাও না গো—

একটা নাম থাকে মানুষের। নাম না-ই যদি জান, তবে কি তাচ্ছিল্য করে 'লোকটা' বলে ডাকবে? বয়ে গেছে জগার বোঠে থামাতে। বলাইকে বলে, তুইও ধর বোঠে। খালের এইটুকু উজান, কষে টান দে।

চারু বাঁধ থেকে খালের গর্তে নামল। হাত উঁচু করে চেঁচাচ্ছে: শোন, ঝাঁটা নিয়ে এস একগাছ। বাঁধা ঝাঁটা না পেলে নারকেলের শলা। আর রান্নার জন্যে হাতা খুন্তি আর কাঁটা—

ফর্দ বলতে বলতে আসছে। ভুট-ভাট-ভটাস আওয়াজ উঠছে কাদায়। বাঁয়ে—হেই ভগবান, আর খানিকটা বাঁয়ে নিয়ে ফেল দজ্জাল মেয়েটাকে। বাঁয়ে বিষম দোপি—উপর থেকে কিছু মালুম হবে না। কোমর অবধি বসে যাবে, কাদার মধ্যে আটকে থাকবে। জনা চারেক মরদ-জোয়ান পাঁঠার ছাল ছাড়ানোর কায়দায় টানা-টানি করে তবে তুলবে। এই কাজটি করে দাও হে মা রক্ষেকালী। চারুবালার দুর্গতি দেখতে দেখতে আর বোঠের আগায় জল ছিটাতে ছিটাতে মনের খুশিতে ওরা গাঙে গিয়ে পড়বে। ভোরবেলাকার সুযাত্রায় দিনমানটা তা হলে কেটে যাবে ভাল।

গাঙে পড়ে জগা বলে, ঝাঁটা চায় কেন রে?

বলাই হেসে বলে, পেটাবে। পিরীত জমেছে তোমার সঙ্গে—শুধু-হাতে সুখ পাবে না, হাতের অস্তোর জুটিয়ে রাখছে।

হর ঘড়ুই বিষম ঘাড় নাড়ে: উঁহু, কি বলছ তোমরা। ভাল জায়গার মেয়ে—আমাদের বাদাবুনে শাকচুন্নী পেয়েছ নাকি? কোস্তা দিয়ে ঝাঁট দিচ্ছিল—ন্যাড়া কোস্তা, মাথা ক্ষয়ে গেছে। ঝাঁট দিতে দিতে ঝাঁটার কথা মনে পড়েছে বোধ হয়। রান্না করবার সময় অসুবিধা হয়েছে, হাতা-খুন্তির গরজ তাই।

আরও গদগদ হয়ে বলতে লাগল, এসেছে কাল রাত্রে। সকাল-বেলা—দেখলে না তুমি জগা, ধুলোমাটি পোড়া-বিড়ি ম্যাচের-কাঠি কিছু আর নেই। লক্ষ্মীর অংশ হলেন ওঁরা তো, লক্ষ্মীঠাকরুনের পা পড়েছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, রূপ যেমনধারা কপাল-খানা তার উল্টো।

থেমে যায় হর ঘড়ুই। একটু থেমে ঢোক গিলে হর ঘড়ুই বলে, কালাপেড়ে ধুতি পরনে দেখে ঘেরিদারকে জিজ্ঞাসা করলাম। বিয়ে হতে না হতে কপাল পুড়েছে। মেজাজ তাই একটু তিরিক্ষি।

কুমিরমারির গঞ্জে এসে মাছ সমস্ত বিক্রি হয়ে গেছে। পয়সা হর ঘড়ুইয়ের গাঁটে। ভরা জোয়ার। কিন্তু জগার ফেরবার চাড় দেখা যায় না। হর তাগিদ দিচ্ছে: উঠে পড় তোমরা। গোন বয়ে যায়, দেরি কিসের?

জগা বলে, খাব না?

খাবে বই কি! মুড়ি কিনে নাও, আর বাতাসা। দানাদার কিনে নাও সেরখানেক। কোঁচড়ে করে খেতে খেতে যাবে।

মুড়ি নয়, ভাত খাব।

আহা, ভাতের হাঙ্গামা কেন আবার! ভাত খাবে সাঁইতলা গিয়ে। পুরো গোন তার উপরে পিঠেন বাতাস—ডিঙি তো উড়ে গিয়ে পৌঁছবে।

জগা বলে, হাঙ্গামাই তো সেখানে। উনুন জ্বাল, রাঁধ-বাড়, বাসন ধোও—হরেক ব্যাপার। এখানে কি, গদাধর ঠাকুরের হোটেলে ভাত রেঁধে বসে খাওয়ার মানুষ ডাকছে।

অন্য দিন তো সাঁইতলা গিয়ে রাঁধাবাড়া কর।

জগা এবারে রীতিমত চটে গিয়ে বলে; জান তো ঘড়ুই, নিয়মের বাঁধাবাঁধি আমার সহ্য হয় না। দুটো দিন সাঁইতলা গিয়ে খেয়ে থাকি তো পাঁচটা দিন এখন গদাধরের হোটেলে খেয়ে যাব।

জেদ যখন ধরেছে নিরস্ত করা যাবে না। হর ঘড়ুই হোটেলে গিয়ে তাড়া দেয়: হাত চালিয়ে ভটচাজ্জি। ভাত আর ডালটা নেমে গেলেই পাতা করে দাও।

জগা বলে, উঁহু, মাছ খাব, মুড়িঘণ্ট খাব।

বেশ, খাও ষোড়শোপচারে। বেগোন হয়ে যাবে, বুঝবে তখন ঠেলা।

তোমার কী ভাবনা ঘড়ুই? ডিঙি আমরা কি মাঝপথে ফেলে যাব? বেগোন হোক যা-ই হোক এমনি কথা বলব না যে ঘড়ুই মশায় ডাঙায় নেমে গিয়ে দুটো বাঁক গুণ টেনে দাও।

গদাধর কাঁটা পাকাচ্ছে ফুটন্ত ডালে। কম পরিমাণ ডাল দিয়ে

থনথনে ঘন করবার এই কায়দা। জগা বলে, খালের নাম কে যে বারোবেঁকি রেখেছে! সে বেটা শতকে জানত না। গণে দেখেছি ভটচাজ্জি, বারো ছনো চব্বিশ বাঁকেও বেড় পায় না।

বলাই বলে, বোঠে মেরে মেরে লবেজান। রাস্তাটা এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে, তড়িঘড়ি এবারে ঝামা ফেলে দিক। নৌকো ছেড়ে তাহলে গাড়ির কাজে লেগে যাই। জল ছেড়ে ডাঙার উপর উঠি।

ডালের কড়াই নামিয়ে দিয়ে গদাধর বলে, ঝামা ফেলা পর্যন্ত লাগব না রে! বর্ষা কেটে গিয়ে রাস্তা খটখটে হয়ে যাক। ধানও পেকে যাবে তদ্দিনে। সাত-রাজ্যি ঘুরে নৌকোয় এবারে ধান বওয়াবয়ি নয়। গরুর গাড়িতে। এরই মধ্যে সব গাড়ি বানাতে লেগে গেছে। মরশুমে বিস্তর গাড়ি নেমে যাবে। আমিও ভাবছি, দু-জোড়া গরু কিনে গরুর-গাড়ি করে ফেলি খান দুই। ভাড়া খাটবে।

বলাই পুলকে ডগমগ : করে ফেল ভটচাজ্জি, মস্ত মুনাফা। গাড়ি চালানোয় ভারী মজা। ডাডা-ডাডা, ডাইনে-বাঁয়ে—খালি মুখের খাটনি। বাবুমানষের কাজ। বোঠে মারতে মারতে হাতে এমন ধারা কড়া পড়ে না।

আদরমণি গগনের কথা জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তারের কি খবর?

জগা বলে, ডাক্তার এখন নয়, ঘেরিদার। মাঝে দিনকতক গুরু-মশাই হয়েছিল।

আদর হেসে বলে, আবার কোন্‌টা ধরবে এর পরে?

বলাই বলে, আর কিছু নয়। পয়মন্ত মানুষ বড়দা। ছোটখাটো একখানা খাতাও জমে উঠেছে। হচ্ছে দুটো পয়সা।

জগা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, হতে আর দিল কই! হরেক শত্রু। এক শত্রু চৌধুরিরা। ঘেরির বাঁধ ভেঙে নানান রকমে নাস্তানাবুদ করছে। তার উপর আর এক উৎপাত—ঘরের মানুষজন এসে পড়েছে। নতুন ব্যবসা, এত ধকল সামলে উঠতে পারলে হয়।

গদাধর বলে উঠল, হোটেলের প্রাপ্য এগারো টাকা ছ'আনা দিয়ে দিতে বলো দু-পাঁচদিনের মধ্যে।

জগা বলে, টাকা কেউ বাড়ি বয়ে দিয়ে যায়, শুনেছ কখনো? নিজে গিয়ে পড় একদিন, যদ্দূর পার থাবা মেরে নিয়ে এস।

বলাই বলে, টাকা না পাও আকণ্ঠ মাছ ঠেসে খেয়ে উশুল করে এস খানিকটা।

সাঁইতলা ফিরতে বেশ খানিকটা রাত হল সেদিন। বলাই বলে, আলা চুপচাপ, গানবাজনা নেই। বোধ হয় ওরা ছকঘুঁটি নিয়ে বসে গেছে।

জগা নজর করে দেখে বলে, খেলা হলে তো আলো থাকবে। নয় তো কোট দেখে কেমন করে? গালে-মুখে হাত দিয়ে বসে আছে বড়দা। নয় তো কোনখানে যদি বেরিয়ে থাকে। কিন্তু রাত্তিরবেলা শখ করে বেরুবার মানুষ তো বড়দা নয়। আরও এখন ঘেরিদার মানুষ।

সোজা চলেছে চালাঘরের দিকে। বলাই হাত ধরে টান দেয়ঃ এক্ষুনি ঘরে ঢুকে কি হবে? চল, আমরাই গিয়ে জমাইগে।

শুয়ে পড়ব। গা ব্যথা-ব্যথা করছে আমার।

বলাই হি-হি করে হাসেঃ তা নয়। খাণ্ডারনী মেয়েটাকে ডর লেগেছে তোমার। ঝাঁটা দিয়ে পেটায় নি তো এখনো, এর মধ্যে গা ব্যথা কেন?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জগা চলল। ঘরে গিয়ে সত্যিই সে মাতুরে গড়িয়ে পড়ে। বলে, তুই বসে বসে-কী পাহারা দিবি? তুই চলে যা, আমি ঘুমোই।

আমি একলা গিয়ে কি হবে? তুমি না হলে ফুর্তি জমে না।

জগা চটে ওঠেঃ ফুর্তি না হলে বুঝি যেতে নেই? তোরা সুদিনের কেবল সাথী। বড়দার এই বিপদ! মানুষটা কোথায় ঝিম হয়ে পড়ে আছে —অসময়ে দুটো ভাল কথা বলে আসার মানুষ হয় না।

বলে পাশ ফিরে শুল জগা। আর কথাবার্তা বলবে না। একটু-খানি বসে থেকে বলাই উঠল। দেখে আসা যাক গগনের দশা।

আপন মানুষদের সঙ্গে কেমন মজায় ডুবে এমনিধারা নিঃসাড় হয়ে পড়ল।

নিঃশব্দ রাত। ফাঁকা আকাশের মধ্যে বাতাসও হঠাৎ কেমন বন্ধ—গাছের ডালপাতা নড়ে ফিসফাস শব্দটুকু উঠছে না। গাঙে জোয়ার—ভাঁটার জল নামার যে কলকল শব্দ, তা-ও নেই এখন। আলার দিক থেকে—হাঁ, খোলের আওয়াজ আসছে বটে! বলে দিতে হবে না, বাজাচ্ছে বলাই। বাজনার ব্যাপারে সে একটু-আধটু জগার সাগরেদি করে, খোলে চাটি মেরে বোল তুলতে গিয়ে গালি খায়। জগা আসরে নেই, অতএব একেশ্বর হয়ে জমিয়ে বসে সে বাজাচ্ছে। গানও যেন বাজনার সঙ্গে—ধড়মড়িয়ে উঠে জগা বাইরে চলে এল। বিড়বিড় করে গান—কান পেতে একটু একটু শুনতে পাওয়া যায়। বাদ্যকর বলাই এবং গানের মানুষও পেয়ে গেছে। জগাকে বাদ দিয়েই আসর করতে পারে ওরা। দরকার নেই তবে আর জগার!

টিপিটিপি চলেছে সে চোরের মত। দেখে আসা যাক—বলাই এসে আনুপূর্বিক বলবে, ততক্ষণের সবুর সয় না। সোজাসুজি বাঁধ ধরে না গিয়ে ঝুপসি জঙ্গলের আড়ে-আবডালে চলেছে। কেউ না দেখতে পায়। আলাঘরের খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। মালুম পাওয়া যাচ্ছে এবার—গগনের গলা। আরও আছে—কিন্তু ভিন্ন গোঠের গরুর মত গগনের কণ্ঠ একেবারে ভিন্ন পথ ধরেছে। হায় মা বনবিবি, হায় মা রঙ্কেকালী, তোমাদের মহিমায় বড়দাও কিনা গায়ক হয়ে উঠল! গান অবশ্য নয়—হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাধেগোবিন্দ—নামগান। বিড়-বিড় করে গাইছে কতকটা মন্ত্রের মত।

বলাই এলে জগা হাসিতে ফেটে পড়ল: দেখে এসেছি। চার জন দেখলাম আসরে। তুই ছিলি, বড়দা ছিল, আর দুটো কে রে?

একজন আমাদের পচা। পচা ওদিকে মুখ করে ছিল। আর ছিল বড়দার মেজো সম্বন্ধী—সেই যে, নগেনশশী যার নাম।

বলে গম্ভীর হয়ে যায়: প্যাঁচে ফেলছে বড়দাকে। ফড়ের ঘুঁটি

লুকিয়ে ফেলে কাল সেই যে নামগানের কথা বলেছিল, সেই হল কাল। পচা আগেভাগে গিয়ে গরুড়পক্ষীর মত অন্ধকারে বসে আছে। আমায় দেখে বলল, তবে আর কি—খোল বাজানোর মানুষ এসে গেল। আর সেই সম্বন্ধী বলে, রোজ নামগান করে থাক, আজকেই বা হবে না কেন? লাগাও। পচা ধরল, সম্বন্ধী ধরল—বড়দা কি করে, তারও দেখি ঠোঁট নড়তে লেগেছে। আমার মুখে ওসব বেরোয় না, খোলটা কোলের মধ্যে টেনে নিলাম।

তাই তো বলছি রে, বড়দা সুদ্ধ গান গায়। বাদার কী তাজ্জব রে বাবা!

বলাই বলে, সাধে কি বাবা বলে, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়। বাইরে ঐ সম্বন্ধী, ওদিকে কামরার ভিতরে বউটা আর বোনটা টেমি জ্বেলে বসে গান শুনছে, আর ভাঁটার মতন চোখ ঘুরিয়ে নিরিখ করছে। কী করে তখন বড়দা? একবার হয়তো একটু থেমেছে—চমক খেয়ে তক্ষুনি আবার হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করতে লেগে যায়। ভাল করে দেখতে পাস নি জগা-- পাষাণ ফাটে বড়দার কষ্ট দেখে।

জগা বলে, ভুল করল যে বড়দা, আখের ভেবে দেখল না। দেশে ঘরে বন্ধন রেখে এসেছে—হাতে টাকাপয়সা আসা মাত্তর ওদিকে কিছু কিছু ছাড়লে তবে এই খোয়ার হত না! বেড়াল তাড়াবার ভাল ফিকির হল, মাছের কাঁটাকুটি ছুঁড়ে দেওয়া। দূর থেকে কামড়া-কামড়ি করুক, কাছ ঘেঁষে ঝামেলা করতে আসবে না। টাকা পাঠাতে বড়দা গাফিলতি করল, তার এই ভোগান্তি।

সম্বন্ধী কালকেও আমায় যেতে বলেছে। বলে, গেরস্তঘরে সন্ধ্যার পর ঠাকুরের নাম—খুব ভাল কাজ করছ তোমরা। কোন দিন কামাই না পড়ে!

জগা শিউরে ওঠে: সর্বনাশ! একদিন দুদিন নয়, রোজ রোজ এখন অতগুলো পাহারার মধ্যে বড়দাকে বাবাজী হয়ে বসতে হবে! বড়দা বাঁচবে না।

আজ ভোররাত্রেও আগের দিনের মত। জগা সোজাসুজি ঘাটের উপর ডিঙি চেপে বসেছে। বলাই আলা ঘুরে আসছে। গগন ফর্দ লিখে বলাইর হাতে দেবে—কত ঝোড়া মাছ যাচ্ছে, কী রকম দরে কেনা।

এবং ঠিক আগের দিনের মত বাঁধের উপর চারু। আজকে আর কাদায় নামে না, নোনা কাদার মহিমা কাল বুঝে নিয়েছে। বাঁধের উপর থেকে চেঁচাচ্ছে: ঝাঁটা আর হাতা-খুন্তি-কাঁটা। কাল ভুলেছ, আজকে ভুল না হয়। এমন ভুলো মানুষ তুমি!

জগার মুখে হাঁ-না কিছু নেই, লোহার মূর্তির মত স্থির। কানে গেল কিনা বোঝা যায় না। পচা নেমে আসছে, সে যাবে। কুমির-মারির হাটবার আজ। ঘেরির ডিঙি হোক কিম্বা সাধারণ নৌকো হোক, হাটবারের দিনে কিছু বাড়তি লোকের ভিড় হয়। হাটবেসাতি করতে যায়, হাটে ঘোরাঘুরি করে নতুন মানুষজন দেখতেও যায় অনেকে। পচাকে ডেকে চারু বলে, কালা নাকি গো নৌকোর ঐ লোকটা, রা কাড়ে না। একগাছা ঝাঁটার কথা বলছি কাল থেকে—

জগা কালা নয়, সে তো ভাল মতই বুঝে নিয়েছে সেদিন। ফুলতলার ঘাটে, টাপুরে-নৌকার ভিতরে, এবং বিশেষ করে কুমির-মারিতে। এটা হল মনের ঝাল মেটানো কথা। আকাশে এখনো সূর্য ওঠে নি— নতুন দিনের সবে মাত্র সূচনা—এর মধ্যে অকারণ গালি-গালাজ শুনিয়ে মনটা খিঁচড়ে দিল একেবারে।

ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে। পচা বলে, খেয়াল করে ঝাঁটা আজ আনতেই হবে।

জগা গর্জন করে ওঠে: আনবি তো ধাক্কা মেরে ফেলে দেব তোকে গাঙের জলে। মরদ হয়ে মেয়েমানুষের ঝাঁটা বইতে লজ্জা করে না?

পচা বলে, পুরুষে না আনলে মেয়েমানুষ পাবে কোথায়? বুঝে দেখ সেটা। দুটো দিন মাত্র ওরা এসেছে, ঠাট বদলে দিয়েছে আলাঘরের। মেয়েজাত হলেন লক্ষ্মী—ঘড়ুইমশায় যা বলে থাকেন। লক্ষ্মীর চরণ পড়েছে, আর লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠেছে। যাও না তো ও-

মুখো—দেখে এস একটিবার গিয়ে।

বলাই হেসে ওঠে: খবরদার জগা! দেখতে পেলে তোকেও কিন্তু ছেড়ে দেবে না। গানের গলা শুনেছে সেদিন নৌকোর মধ্যে। আলাঘরে সকলে আমরা নামগানে মাতোয়ারা হয়েছিলাম, তা-ও শুনল ঘরের মধ্যে প্রথম পা দিয়েই। বাবাজী করে তোকেও ঠিক আমাদের সঙ্গে বসিয়ে দেবে।

জগা বুক চিতিয়ে বলে, কে বসাবে? কার ঘাড়ে কটা মাথা? টের পাবে আমার সঙ্গে লাগতে এলে। বলে দিস সেকথা।

বলাই বলে, বড়দাও এমনি বিস্তর দেমাক করত। কী হাল হয়েছে এই দুটো দিনে! যেন এক ভিন্ন মানুষ। কিছু বলা যায় না রে ভাই, গায়ের জোরের কথাও নয়। কামরূপ-কামাখ্যায় পুরুষকে ভেড়া বানায়। পর্বতের নীচে, শুনেছি, ভেড়ার পাল সারি সারি দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। হল কি করে?

সাতাশ

যা বলেছিল অন্নদাসী—ঘর করছে এতকাল, মানুষটা চিনবে না? রাধেশ্যামের গায়ের ব্যথা কিছুতে মরে না। তার পর ব্যথা যদিই বা কিছু কমল, খোঁড়া ডান পাখানা কিছুতে আর ভাল হতে চায় না। ঘরে বসেই যখন দু-বেলা দু-পাথর জুটে যাচ্ছে। ব্যথা সারতে যাবে কেন? ভাল হয়ে গেলেই তো জাল হাতে বেরুতে বলবে রাত্রিবেলা। মাছ মার, মাছ না মিলল তো উপোস কর। সেই পুরানো ঝামেলা। দিব্যি আছে এখন। অন্নদাসী সকালবেলা বাড়ির পাট সেরে ছেলেটাকে রাতের জল-দেওয়া ভাত চাট্টি খাইয়ে দিয়ে চৌধুরিগঞ্জের আলায় চলে যায়। ভরদ্বাজের খাওয়াদাওয়ার পর নিজে খেয়ে কাঁসর ভর্তি ভাত-তরকারি নিয়ে ঘরে আসে। সন্ধ্যার পর বেরোয়, রাত্রে আবার ভাত নিয়ে আসে দুপুরবেলার মত।

আছে ভাল রাধেশ্যাম। একটা মুশকিল, অন্নদাসী চলে যাবার পর নিতান্তই চুপচাপ বসে থাকা। বাচ্চাটা ট্যাঁ-ভ্যা করলে তাকে একটা দুটো চড়চাপড় দেওয়া ছাড়া অন্য কাজ নেই। মন টেঁকে না ঘরের মধ্যে এমন ভাবে। ভেবেচিন্তে এক কাজ করে। বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে-ও বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। বউ টের পাবে না, ফিরে আসতে তার অনেক রাত্রি হয়। পায়ে-পায়ে রাধেশ্যাম চলে গেল গগনের আলায়। নামগানের আসরে গিয়ে বসল। অবাক! বুড়ো হর ঘড়ুই অবধি ইতিমধ্যে গৌরভক্ত হয়ে পড়েছে। 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম গৌরনিতাই রাধেশ্যাম'—বলছে সকলে বিড়বিড় করে। হ্যারিকেন-লণ্ঠন জ্বলছে আসরের একদিকে—এ-ও ভারী তাজ্জব। গগন কত বড়লোক হয়েছে বোঝ তবে—অবহেলায় অকারণে কেরোসিন পোড়ায়। আর সেই আলোয় দেখা যায় ভাব-বিহ্বল গগন, এবং আশেপাশে একগাদা মানুষ। বনরাজ্যে হাঙ্গামা তো কথায় কথায়। মেছোঘেরি হবার পর কোন আলা অরক্ষিত দেখলে রে-রে করে আলায় পড়ে লোকজন পিটিয়ে হল বা শড়কিতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে এখনো মাছ লুঠ করে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া যারা পেরে ওঠে না, নিশিরাত্রে তারা টিপিটিপি ভেড়ির খোলে জাল ফেলে। ডাকাত না হতে পেরে চোর। সেই সব লোকই পরম শান্ত ভাবে গৌরাঙ্গ-ভজন করছে কেমন দেখ : ভজ গৌরাঙ্গ, ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম—

রাধেশ্যাম ভাবছে তা মন্দ কি! ঘরেও যখন একলা চুপচাপ থাকা, এখানে অর্ধেক চোখ বুজে চুপ করে থাক, পরকালের পুণ্য লাভ হবে।

তা ছাড়া নগদ লভ্যও কিছু আছে, আসর ভাঙার মুখে সেটা জানা গেল। গুড়ে-ঢালা চিঁড়ে-ভাজা, কোন দিন বা মুড়ি-ফুলুরি। আবার এক-একদিন হরির লুঠ দেয়—লুঠের বাতাসা কুড়িয়ে কণিকা পরিমাণ মাথায় দিয়ে দিব্যি কুড়মুড় করে অনেকক্ষণ ধরে চিবানো চলে। শুধুমাত্র পরলোকের আশাতেই, অতএব, ভক্তদল আলায়

জমায়েত হয় না। গগন দাস কল্পতরু হয়ে দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছে, পোড়ো টাকা পেল নাকি কোনখানে? না মা রঙ্কেকালী নতুন-আলার চাল ফুঁড়ে নিশিরাত্রে টাকার বৃষ্টি করে গেছেন?

আলা থেকে ঘরে ফিরে রাধেশ্যাম যথারীতি মাদুরের উপর শুয়ে পড়ে। অন্নদাসীর ফিরবার তখনো দেরি। ফুলতলার নৌকো রওনা করে দিয়ে তবে ভরদ্বাজ রাঁধতে বসেন। রাঁধাবাড়া শেষ করে তিনি খাবেন, উচ্ছিষ্ট মুক্ত করে এঁটো-বাসন সরিয়ে রেখে রান্নাঘরে গোবরমাটি পেড়ে তবে অন্নদাসী বাড়ি ফিরবে। রাধেশ্যাম ঘুমোয় ততক্ষণ। বড় সজাগ ঘুম—বউয়ের পায়ের শব্দ পেলেই জেগে উঠে কাতরাতে আরম্ভ করে। অন্নদাসী এসে কাঁসরের ভাত-তরকারি পাথরের থালায় বেড়ে রাধেশ্যামকে দেয়। অল্প চাট্টি কাঁসরে থাকে, সেগুলো ব্যঞ্জন দিয়ে মেখে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে বসিয়ে গালে পুরে পুরে খাওয়ায়।

একদিন গণ্ডগোল হল। ভাত মেখে বাচ্চাকে তুলতে গিয়ে দেখে, নেই। কোথায় গেল?

রাধেশ্যামকে জিজ্ঞাসা করে, তুষ্টু কোথা গো?

অ্যাঁ, ছিল তো শুয়ে—

অন্নদাসী এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে দেখে বলে, কোথাও তো নেই। ছেলের খোঁজ জান না—তুমি ছিলে কি জন্যে তবে ঘরে?

রাধেশ্যাম বলে, ঘুম এসে গিয়েছিল। বুঝি কি করে যে হারামজাদা সেই ফাঁকে অমনি কানে হেঁটে রওনা দেবে।

বাদারাজ্যে শিয়াল নেই যে ঘুমন্ত বাচ্চা শিয়ালে মুখে করে নিয়ে যাবে। আর হল বড়-শিয়াল—কিন্তু পাড়ার মধ্যে এসে টুঁ শব্দ না করে ছেলের টুঁটি ধরে সরে পড়বে, তেমন চোরাই স্বভাবের তারা নয়। গেল কোথায় তা হলে?

রাধেশ্যামও খোঁজাখুঁজি করছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—বিষম কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়—ঘরের বাইরেও উঁকিঝুঁকি দিয়ে আসে

একবার। অন্নদাসী চরকির মতন পাক দিচ্ছে। ঝগড়াঝাঁটির সময় আপাতত নয়, ভাঁটার মতন বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে ভবিষ্যতের আভাস দিয়ে যাচ্ছে শুধু। বাঁধ অবধি চলে গিয়ে হাঁক পাড়ছে : তুষ্টু, তুষ্টুরে—

শিরোমণি সর্দারের বউ সুবোধবালা সাড়া দিয়ে উঠল : ফিরলি নাকি রে দিদি ? কী কাণ্ড—ওরে মা, সে কী কাণ্ড !

বলতে বলতে এদের উঠানে চলে এল। কাঁধের উপর তুষ্টু। ঘুমুচ্ছে। নেতিয়ে আছে একখানা ন্যাকড়ার মত।

তুষ্টু তোমার কাছে দিদি ? তুমি নিয়ে গিয়েছিলে, আর দেখ, আমরা দাপাদাপি করে মরি।

সুবোধবালা গালে হাত দিয়ে বলে, বলিহারি আক্কেল তোদের দিদি। ঘরের মধ্যে বাচ্চা রেখে দুজনে বেরিয়ে পড়েছিস। দুয়োর হা-হা করছে।

অন্ন বলে, দুজনে কেন যাব ? তোমার দেওর ছিল। তার জিম্মায় রেখে আমি চৌধুরি-আলায় যাই। পেটের পোড়ায় না গিয়ে উপায় তো নেই।

শিরোমণি আর রাধেশ্যামে ভাই ডাকাডাকি। বয়সে কে বড় কে ছোট, এই নিয়ে বিরোধ আছে। হিসাব ও তর্কাতর্কি হয় মাঝে মাঝে। অন্নদাসীর স্বার্থ, নিজের মরদের কম বয়স বলে জাহির করা। রাধেশ্যাম তাই হল সুবোধবালার দেওর।

অন্নদাসী বলে, তোমার দেওর সেই থেকে নড়ে বসতে পারে না। আমিও ছাড়ন-পাত্তর নই দিদি। জালে যাবে না তবে ছেলে ধর।

সুবোধবালা বলে, নড়তে পারে না তো ঘর ছেড়ে গেল কেমন করে ? তুইও যেমন দিদি—পুরুষ বলল, আর সেই কথায় অমনি গেরো দিয়ে বসেছিস !

রাধেশ্যাম না-না করে ওঠে : ছিলাম বই কি ! আলবত ছিলাম ঘরে, তুমি দেখ নি। ঘুমুচ্ছিলাম।

সুবোধবালা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, যা চেঁচান চেঁচাচ্ছিল, মরা মানুষও

খাড়া হয়ে উঠে বসে। বিছেয় কামড়েছিল—কান্না শুনে ছুটে এসে তুলে নিলাম, বাড়ি নিয়ে গিয়ে মাথা-তামাক ডলে ডলে তবে বুঝি জ্বালাটা কমল, কান্না থামে তখন। ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলে —আমি কানা কি না, পর্বতের মতন দেহখানা আমার ঠাহরে এল না।

ছেলে দিয়ে সুবোধবালা চলে গেল। এইবারে এতক্ষণে বোঝা-পড়া—রাধেশ্যাম সেটা বুঝতে পারছে। মাদুরের উপর পড়বে নাকি —পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে মোক্ষম ঘুম? তাতে খুব সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। আঁস্তাকুড়ে গিয়ে দাঁড়ালে যমে রেহাই করে না। টেনে খাড়া তুলে বসিয়ে অন্নদাসী কথা শোনাবে। তার চেয়ে উল্টো চাপ দিয়ে সে-ই আগেভাগে শুনিয়ে দিক।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রাধেশ্যাম বলে, বলি, এত রাত অবধি কোন্‌-খানে থাকা হল ঠাকরুনের? কি কর্ম করা হচ্ছিল?

অন্নদাসী মুহূর্তে হকচকিয়ে যায়। শেষে বলে, ভাত এনে এনে মুখের কাছে ধরি কিনা, মুখে তাই ট্যাঙস-ট্যাঙস বুলি হয়েছে। যার ভাত এনে খাওয়াই, সে মানুষটার খাওয়া শেষ না হলে চলে আসি কেমন করে?

রাধেশ্যাম বলে, সাত জন্মের ভাতার কিনা তোর, সামনে বসে আদর করে খাওয়াস। সেই শোভাটা দেখবার জন্য মরি-মরি করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পায়ের দরদে বেশী দূর পারলাম না। ফিরে এলাম। ফিরতে হল জিরিয়ে জিরিয়ে। তার ভিতরে এই কাণ্ড!

মোটামুটি বেশ একটা কৈফিয়ত হয়ে দাঁড়াল। অন্নদাসী বিশ্বাস করেছে। রাতটা সত্যিই বেশী হয়ে গেছে, পুরুষমানুষের ক্রোধ অসঙ্গত নয়। দোষ ভরদ্বাজের, গড়িমসি করে রাত করে দিলেন। উনুন ধরিয়ে অন্নদাসী ডাকাডাকি করছে—কাজকর্ম নেই বসে রয়েছেন, তবু রান্নাঘরে আসেন না। মতলব করে কি না, কে জানে! রান্না শেষ হবার পর খেতে বসতেও অকারণ দেরি। আলা নিঝুম তখন, সবাই ঘুমুচ্ছে। গা ছমছম করছিল অন্নদাসীর। ভয় ঠিক নয়। দৈত্যের

মতন অতগুলো মরদ পড়ে রয়েছে, চেঁচালে তড়াক করে লাফিয়ে উঠবে—ভয়ের কি আছে? তবু যেন কী রকম! সতর্ক নজর রেখে নিজের ভাতগুলো গবাগব গিলেছে তার পর। বাকি ভাত-তরকারি কাঁসরে তুলেই সাঁ করে বেরিয়ে পড়েছে। এসেছে বাতাসের বেগে। এসে তো এই সমস্ত এখন।

চেঁচামেচিতে নিজের রাত করে ফেরাটা পাড়ার মধ্যে বেশী চাউর হবে। অন্নদাসী চেঁচাল না। ভাত টিপে টিপে তুষ্টুকে খাওয়াচ্ছে। এর মধ্যে একবার ছড়া কেটে উঠল:

একগুণ ব্যায়োনের তিনগুণ ঝাল,
নিগুর্ণ পুরুষের বচন সার।

এই সামান্য কথায় রাধেশ্যামের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ার কথা নয়। শুয়ে পড়ে সে পাশ ফিরল। পাশ ফিরতে নজর পড়ল, বাড়া-ভাত পড়ে আছে, ভাতের দু-পাশে তরকারি দু-খানা। গগনের আলার মুড়ি-ফুলুরি অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে। ভাত দেখে রাগের নিবৃত্তি করে সে উঠে বসে। দাওয়ায় নিয়ে গিয়ে তুষ্টুর মুখ ধোয়াচ্ছিল অন্নদাসী। ভিতরে এসে বউ চোখ পিটপিট করে দেখে। ছেলে শোয়াতে শোয়াতে পুনশ্চ মধুর এক মন্তব্য ছাড়ে: অন্নদাসীর পুরুষ অন্নদাস।

সেই রাত্রেই। আরও অনেকক্ষণ কেটে গেছে। বেড়ার গায়ে আস্তে আস্তে টোকা দেয় কে যেন। দু-বার এক সঙ্গে। একটুখানি থেমে রইল। আবার। রাধেশ্যাম একবার ঘুমালে তারপর ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে গেলেও বোধ হয় জাগবে না। অন্নদাসীর ঠিক উল্টো, গাছের পাতাটি পড়লে অমনি চোখ মেলে উঠে বসবে। উঠে পড়ে সে বাইরে চলে এল।

কে র‍্যা? কোন্ ড্যাকরা, হাড়হাবাতে?

ফিসফিস করে ভরদ্বাজ বলছে, আমি রে আমি। একটা দরকারে পড়ে এলাম।

রাত্রিটা সুমুখ-আঁধারি। এতক্ষণে চাঁদ দেখা দিচ্ছে আকাশে। বাবলাতলায় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে একেবারে সেঁটে গোপাল ভরদ্বাজ দাঁড়িয়ে আছেন।

অন্ন বলে, আপনি যে শালতি ছাড়া চলেন না ঠাকুরমশায়। পায়ে মাটি ফোটে। পায়ে হেঁটে কষ্ট করে এসেছেন, বলে ফেলুন দরকারটা।

রাধেশ্যাম আছে কেমন ?

বড্ড ভালবাসেন মানুষটাকে ! আমার সঙ্গে মোটেই তো দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, রাতদুপুরে খবর নিতে তাই ঘর-কানাচে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বলতে বলতে অন্নদাসী ফিক করে হেসে ফেলল। বলে, তাড়াতাড়ি সেরে নিন। মানুষটা এমনি ভাল। ভস-ভস করে ঘুমুচ্ছে। জাগলে কিন্তু কুম্ভকর্ণ।

ভরদ্বাজ সকাতরে বলেন, তোর যেমন মতি হয় রে অন্ন—আমি কিছু বলতে যাব না। কাঠ-কাঠ উপোস দিচ্ছিলি, আমায় কিছু বলতে যাস নি। কানে শুনেই আমি মানুষ দিয়ে চাল পাঠিয়ে দিলাম। এই বাজারে ফেলে ছড়িয়ে নিজে তুই ভরপেট খাচ্ছিস, যতগুলো খাস তার দেড়া বাড়ি নিয়ে আসিস। চাল এত দিস যে হাঁড়ি উপচে পড়ে যায়। বিনা ওজরআপত্তিতে আমি রেঁধেবেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। বল্, সত্যি কি না।

অন্ন বলে, আপনার বড্ড দয়া ঠাকুরমশায়।

দয়া শুধু একতরফে হলে তো হবে না ! বিবেচনা করে দেখ। ব্রাহ্মণসন্তান—বউ-ছেলেপুলে ছেড়ে পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নোনা জল খেয়ে পড়ে আছি। আমিই কেবল সকলের দেখব—আমার মুখ পানে কেউ তাকিয়ে দেখবে না ?

অন্নদাসী বলে, সরে পড়ুন ঠাকুর মশায়। ঐ যা বললাম—আমাদের মানুষটা এমনি ভাল, কিন্তু বড্ড সন্দেহের বাতিক, আমি রাত করে আসি বলে আপনাকে জড়িয়ে আজকেই নানান কথা হচ্ছিল। উঠে এসে আমাদের দু-জনকে একসঙ্গে যদি দেখতে পায়, বন-কাটা

হেসো দিয়ে দু-জনের মুণ্ডু দুটো কন্ধ থেকে নামিয়ে নেবে। উঃ, পাড়ার মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছেন, এত সাহস ভাল নয়।

পাড়ায় হবে না, আলার মধ্যে নয়, তা কোন্ দিকে যাব সেটা তো বলে দিবি—

অন্নদাসী দ্রুতপায়ে ঘরে চলে যাচ্ছে।

ভরদ্বাজ অধীর হয়ে বলেন, আহা, বলে যা একটা কথা। কষ্ট করে এদ্দূর থেকে এসেছি।

অন্নদাসী বলে, মাছ-মারা লোক ফিরছে ঐ। গেঁয়োবনের ভিতর ঢুকে যান, শিগগির। নয় তো দেখে ফেলবে।

গোপাল ভরদ্বাজ সন্ত্রস্ত হয়ে বাঁধের দিকে তাকান। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় অনেক দূর অবধি নজরে আসছে। কই, মানুষ কোথা? হয়তো বা এই সময়টা মানুষ বাঁধের নীচে নেমে পড়েছে। বাবুদের খাস-কর্মচারী সদর ফুলতলা থেকে আসছেন—চিনে ফেললে নানান কথা উঠবে। ফুড়ুৎ করে জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাপ-খোপ থাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু উপায় কি?

অন্নদাসী তখন ঘরে ঢুকে পড়েছে।

আটাশ

শীত পড়ি-পড়ি করছে। সুসময় এখন মানুষের। ক্ষেতে ধান পাকে। গাই বিয়োয় ঘরে ঘরে। নতুন-গুড় ডালকলাই রকমারি তরিতরকারি পাইকারেরা দূর-দূরন্তর থেকে নিয়ে এসে কুমিরমারির হাটে নামায়। কাঠুরে আর বাউলেরা দলে দলে জঙ্গলে ঢুকে বোঝাই কিস্তি নিয়ে ফেরে। মাল ছাড় করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রমারম খরচ করে দু-হাতে। ভারী জমজমাট হাট এই সময়টা।

হাটের মধ্যে ঘুরছে জগা, কিনছে এটা-ওটা। হঠাৎ তৈলক্ষের সঙ্গে দেখা। বয়ারখোলার সেই তৈলক্ষ। বলে, তোমায় খোঁজাখুঁজি করছি জগন্নাথ। কোন্ বনবাসে গিয়ে রয়েছ, কেউ সঠিক বলতে

পারে না। যাত্রার দল খুলছি, মনের মত বিবেক জোটানো যাচ্ছে না। কী গাঙে গাঙে বোঠে বেয়ে মরছ! চল এস। এইসা গলা তোমার—গেরুয়া আলখাল্লা পরে বিবেক হয়ে আসরের উপর দাঁড়ালে ধন্যি-ধন্যি পড়ে যাবে।

জগার হঠাৎ জবাব যোগায় না। পুরানো দিন মনে পড়ে। বাপমা-মরা ছেলে গানের নেশায় বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। কচি-কচি চেহারা তখন, রাধা সাজত। আসর ভাঙবার পর একবার এক গৃহস্থবাড়ির বউ তাকে দোতলার উপর ডেকে নিয়ে পায়েস খাইয়েছিল। তারপর নতুন পালা খুলল দলে—অভিমন্যু বধ। উত্তরার পাঠ দিল জগাকে। অভিমন্যু সমরে যাচ্ছে, সেই সময়টা পতির হাত ধরে ফেলে গান:

যেও না যেও না নাথ করি নিবেদন
দাসীরে বধিয়া যাও বিচার এ কেমন—

অভিমন্যুর হাত ছেড়ে দিয়ে তারপরে উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম চতুর্দিকে ফিরে ফিরে গানের একটি মাত্র কলি কেঁদে কেঁদে গাওয়া: ও তুমি যেও না যেও না, ও তুমি যেও না যেও না…। আসরের মধ্যে সেই সময় একটা স্থঁচ ফেলে দিলে বোধকরি শব্দ পাওয়া যেত।

তৈলক্ষ বলে, তাই বলছিলাম। চল জগা আমাদের বয়ারখোলায়। কায়েমী হয়ে না থাকতে চাও, একজন বিবেক তৈরি করে দিয়ে তারপরে তুমি চলে এস। আটকে রাখব না। দুবেলা দু-নম্বর ষোলআনা সিধে, তেল-তামাক আর নগদ পনের টাকা। গায়ে ফুঁ দিয়ে এমন রোজগার দুনিয়ার মধ্যে কোনখানে হবে না।

জগা এর মধ্যে সামলে নিয়ে বলে, ক্ষেপেছ? সকলে মিলে ঘেরি বানালাম। অজঙ্গি বনে মানযেলা হচ্ছে। আগে জন্তু-জানোয়ার চরেফিরে বেড়াত, এখন মানুষ। যতই হোক, নিজের কোট—জোর কত ওখানে আমার! আপন কোট ছেড়ে কোনও জায়গায় যাচ্ছি নে। একদিন গিয়ে তোমার দল কেমন হল, দেখে আসতে পারি।

ফেরার পথে ডিঙির উপর বসে ঐ যাত্রাদলের কথা হচ্ছে। বলাই

বলে, বড্ড গান-পাগলা তুই। একটু যেন মন পড়ে গেছে।

জগা বলে, দূর! তার জন্যে বয়ারখোলা যেতে যাব কেন? যা-কিছু হবে আমাদের সাঁইতলায়। আরও কিছু মানুষ জমুক—দল এইখানে গড়ব। তৈলক্ষকে বললাম, নেহাত যদি দায় ঠেকে যায় তো এক দিন দু-দিন থেকে তালিম দিয়ে আসতে পারি। তার বেশী হবে না।

সাঁইতলার ঘাটে ডিঙি লাগল। ডিঙিতে কখনোসখনো শোওয়ার প্রয়োজন হয়, ছইয়ের নীচে সেজন্য একটা মাদুর গোটানো থাকে। কাঁধে সেই মাদুর এবং হাতে পোঁটলা পচা তরতর করে নেমে পড়ে।

জগা দেখল পাছ-গলুই থেকে: মাদুর নিয়ে চললি কোথা রে? নৌকোর মাদুর?

ও, তাই তো! এতক্ষণে যেন হুঁশ হল পচার। মাদুর যেন হেঁটে গিয়ে তার কাঁধে উঠে পড়েছে। বেকুবির হাসি হেসে মাদুর নামিয়ে বাঁধের উপরে পচা দাঁড় করাল। আটি-বাঁধা ঝাঁটার শলা ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে। আড়াল করে বস্তুটা বের করে নেবার মতলব ছিল, কিন্তু জগার নজরে পড়ে যায়।

উঁ, এই তোর কাণ্ড! যা মানা করলাম, তাই। ঝাঁটা কিনে তাই আবার মাদুর জড়িয়ে রেখেছে, যাতে আমার নজর না পড়ে।

সে যা-ই হোক, আপাতত পচা নিরাপদ। মুখ ফিরিয়ে আলার দূরত্বটা দেখেও নেয় একবার বুঝি। তাড়া করলে ছুটবে।

জগা বলে, আমরা হাটে ঘুরছি, সেই ফাঁকে তুই চারুবালার কেনাকাটা করছিলি। আমায় লুকিয়ে চুরিয়ে আমারই নৌকোয় তার সওদা নিয়ে এলি।

বলাই বলে, কী করবে! তুমি ভয় দেখালে, ধাক্কা মেরে গাঙে ফেলে দেবে। সামনাসামনি পারে না বলেই গোপন করে।

নির্লজ্জ পচা দু-পাটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে, আমায় জলে ফেললে ক্ষতি নেই। কুমিরে কামটে না খায় তো সাঁতরে ঠিক

ডাঙায় উঠে যাব। ঝাঁটা ফেললে মুশকিল। সারা হাট খুঁজেপেতে এই কটা নারকেলের শলা পাওয়া গেল। ফেলে দিলে আবার কোথা পেতাম?

জগা বলে, ঐ ঝাঁটা তোর পিঠের উপর দেয় ঝেড়ে! কালীতলায় সেদিন আমি পাঁচ পয়সার ভোগ দিয়ে আসব। আছে ভাই তোর অদৃষ্টে। কামরূপের কথা বলছিলি বলাই, আমাদের সাঁইতলাতেও ভেড়া বানিয়ে ফেলছে। মেয়েমানষের ভেড়া দেখ ঐ একটা। ঐ পচা।

পচা দৃকপাত করে না। কাঁধে ঝাঁটার আঁটি, হাতে পোঁটলা—চারুর হাতা-খুন্তি সম্ভবত পোঁটলার মধ্যে—বীরদর্পে সে আলার অভিমুখে চলল।

অনতিপরে জগাদের ঘরের সামনে পচা এসে ডাকে, বলাই!

হাটের ঘোরাঘুরিতে ক্ষিধে আজ প্রচণ্ড। রাতও হয়ে গেছে। উনুন ধরিয়ে বলাই ভাত চাপিয়ে দিয়েছে।

জগা বলে, পথে দাঁড়িয়ে কেন রে? ঘরে উঠে আয়।

পচা বলে, না, তুমি গাল দেবে।

ডাকিনী গুণ করেছে, মরণদশা ধরেছে তোর। গাল দিয়ে আর কী করব? বোস ঘরে এসে।

পচা ঘরের ভিতরে এল, বসল না। বলে, খোল বাজাবার মানুষ নেই। একবারটি চলে আয় বলাই। বিনি খোলে নামগান খোলতাই হয় না।

জগা বলে, কাল গিয়েছিল খেয়ালখুশি মত, তা বলে রোজ রোজ যেতে যাবে কেন? তুই দাসখত দিয়েছিস, তুই পা চেটে বেড়া ওদের—অন্য মানুষ ডাকিস নে।

বউঠাকরুন বলে পাঠালেন, গৃহস্থর একটা ভাল-মন্দ আছে। বাদা জায়গা—শুধু কেবল জন্তু-জানোয়ার নয়, কত লোক এসে বেঘোরে মারা পড়ে, তাঁরাও সব রয়েছেন। ঠাকুরের নামে দোষদৃষ্টি ছেড়ে যায়। তাই বললেন, আরম্ভ হয়েছে যখন, কামাই দেওয়া

ঠিক হবে না। রাত হয়ে গেছে বলে আজ না হয় কম করে হবে।

বলাই বলে, আজকে বরং তুই একবার যা জগা। শুনিয়ে আয় বাজনা কাকে বলে। আমার ঐ হাত থাবড়ানোয় ওদের মুখে সুখ্যাতি ধরে না। তোর বাজনা শুনলে দশা পেয়ে পটাপট সব উপুড় হয়ে পড়বে।

জগা বলে, বয়ে গেছে। সুখের আলা বাঁধলাম সকলে মিলে, আলার মটকায় বাজ পড়ল। বজ্জাতগুলো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

পচা রাগ করে বলে, বাজ পড়েছে না আরো-কিছু! চোখে দেখে এস গিয়ে। ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়, পরের মুখে ঝাল খাবে কেন? দোমুখো বলাইটা—ওখানে গিয়ে ভাবে গদগদ, এখানে তোমার কাছে ফিরে এসে কুচ্ছো করে। এসেছে মেয়েরা দুটো-তিনটে দিন, শ্রী-ছাঁদ এর মধ্যে একেবারে আলাদা। তকতকে ঘর-উঠোন—কোনখানে একরত্তি ধূলোময়লা থাকতে দেয় না। ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেছিল, সেই উঠোন লেপেপুঁছে কী করে ফেলেছে---সিঁদুর-টুকু পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। পানের পিক পোড়া-বিড়ি আগে তো যেখানে-সেখানে ফেলতাম, এখন মালসা পেতে দিয়েছে, যা-কিছু ফেলবে মালসার ভিতরে।

জগা বলে, বলছি তো তাই। বিড়ি খাব না, পানের পিক ফেলব না, হাসিমস্করা করব না, চোখ বুজে খালি হরেকৃষ্ণ হরেরাম করব—সে কাজ আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

বলাইকে বলে, মেয়েমানুষের সামনে গিয়ে তুই গদগদ হোস, আমার সামনে কেন আর ভালমানুষ সাজিস? চলে যা এখান থেকে, খোল কোলে নিয়ে আলায় গিয়ে বোসগে।

অগত্যা বলাই উঠল। যাবার মুখে পচা আর একবার বলে, তুমিও গেলে পারতে জগা। দেখেশুনে ভাল লাগত।

জগা কালোমুখ করে বলে, চেপে এসে বসেছে সহজে নড়বে না, বুঝতে পারছি। একে একে সকলকে নিয়ে নিচ্ছে। যাবই তো বটে। গিয়ে পড়ব একদিন। ভেঙেচুরে সমস্ত তছনছ করে দিয়ে আসব।

ঐ একটা দিনেই বলাইর চক্ষুলজ্জা ভেঙেছে। ডিঙি ঘাটে বাঁধা হলে সে সোজা গিয়ে ওঠে আলায়। জগা একলা পাড়ার মধ্যে চালা ঘরে চলে যায়। পচা সেদিন বার কয়েক তাকে বলে দায় সেরে গেল। এক সঙ্গে তো ঘোরাঘেরা—ইতিমধ্যে জগার মত পালটাল কি না, একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করার পিত্যেশ নেই। আনাড়ী লোকগুলোর আসরে বলাই খোল বাজিয়ে মস্ত বায়েন হয়েছে। বন-গাঁয়ে শিয়াল রাজা। সেই দেমাকে মত্ত হয়ে আছে। জগন্নাথকে নিয়ে যাওয়ার কী গরজ আর এখন! সে হাজির হলে বরঞ্চ পশার হানি ওদের।

নামগান আগে মিনমিন করে হচ্ছিল, গানের ভিতরে হুঙ্কার ক্রমশ ফুটে উঠছে। অর্থাৎ দল ভারী হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং গানের সম্পর্কে ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেছে। গানের পরে এক-একদিন বারম্বার হরিধ্বনি। হরির লুঠ—হরিধ্বনির পর উঠানে বাতাসা ছড়িয়ে দেয়, কাড়াকাড়ি করে লোকে বাতাসা কুড়ায়। বলাই কখানা বাতাসা হাতে ঘরে ফিরে বলে, নাও জগা, প্রসাদ নাও।

বাদাবনে বসত, বড়-মেজ-ছোট কোন দেবতাকে চটানো চলে না। হাত পেতে একখানা বাতাসা নিয়ে—একটু গুঁড়ো মাথায় দিয়ে এক কণিকা জিভে ঠেকিয়ে বাতাসাখানা জগা ফিরিয়ে দিল।

মজা দিনকে-দিন বেড়েই চলেছে। আলা থেকে ঘরে ফিরতে বলাইর ইদানীং রাত দুপুর। নামগানের পর গল্পগুজব চলে বোধ হয়। রান্না শেষ করে জগা বসে থাকে, আর গর্জায় মনে মনে। তাদের গড়ে-তোলা সাঁইতলা ঘেরিতে একঘরে করেছে তাকে সকলে। এমন কি বলাই অবধি। সকল গোলমালের মূলে চারুবালা। সর্বনেশে মেয়ে রে বাবা! হনুমানের লেজের আগুন—লঙ্কাকাণ্ড করে সমস্ত ছারখার করবে।

শেষটা একদিন জগা রাগ করে বলে, ভক্ত হয়ে পড়েছিস—উঁ? ঠাকুরের নামে তো রাত কাবার করে ফিরিস। কাঁহাতক বসে আমি ভাত পাহারা দিই? এবার থেকে আমি খেয়ে নেব।

বলাই সঙ্গে সঙ্গে হাত দুখানা ধরে বলে, তাই করবি। খেয়ে নিয়ে তুই শুয়ে পড়িস। নয় তো আমার মরা মুখ দেখবি জগা। হাঁড়িতে ভাত রেখে দিস। নিয়েথুয়ে আমি খাব।

নতুন ব্যবস্থায় ভাল হল বলাইর। জগা না খেয়ে আছে, আগে তাই তাড়াতাড়ি ফেরার তাড় ছিল একটা। এখন নির্ভাবনা। জগা ঘুমিয়ে থাকে। খুটখাট আওয়াজ হল একটু ভেজানো ঝাঁপ খোলার। ভিতরে এসে কপকপ করে ভাত খাচ্ছে। বাইরে গিয়ে জল ঢেলে আঁচিয়ে এল। ঘুমের মধ্যে এই সমস্ত জগা স্বপ্নের মতন টের পায়। সমস্ত দিনমানটা গাঙে খালে আর কুমিরমারির গঞ্জে কেটে যায়। বড়দাকে জপিয়েজাপিয়ে এই বাদা এলাকায় নিয়ে এল—সেই বড়দার পক্ষেও কি উচিত নয়, রাত্রে জগার ঘরে একটিবার এসে খোঁজখবর নেওয়া! উত্তর অঞ্চল থেকে বড়দার আপনজনেরা এসে মিলেছে—আমে-দুধে মিশেছে, আঁটির কী গরজ আর এখন?

শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছতে মুছতে মাছের ডিঙি নিয়ে কুমিরমারি ছুটুক, এ ছাড়া জগাকে নিয়ে অন্য দরকার নেই।

সেদিন ঘাটে ফিরে ডিঙি বাঁধতে বাঁধতে জগা ওয়াক-ওয়াক করে। বমি করে ফেলবে এমনি ভাব। দ্রুত বাঁধে উঠতে উঠতে জগা পিছন ঘুরে তাকায়।

ঐ যে ওল-চিংড়ি খাওয়াল গদা ঠাকুর, ক-দিনের পচা চিংড়ি, আর কী রকমের ওল কে জানে! পেটের মধ্যে সেই থেকে পাক দিচ্ছে।

বলাই বলে, ওল-চিংড়ি আমিও তো খেলাম।

বলেই তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেয়। অবিশ্বাস করা হচ্ছে, ক্ষেপে উঠবে জগা। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলাই বলে, গুচ্চের খেতে গেলি কি জন্যে? আমি ডাল দিয়ে খেয়েছি, ওল খেতে পারি নে, ওলের নাম শুনলেই আমার গাল ধরে। এক টানিস নে অমন করে, গলার নলি ছিঁড়ে যাবে। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় এক্ষুনি।

আজকে যাস নে তুই বলাই। আমি রাঁধতে পারব না এই অবস্থায়।

বলাই বলে, রান্না আবার কি! তোর খাওয়াদাওয়া নেই। একলা আমি। গদাধরের খাওয়ানোর চোটে তোর ঐ অবস্থা : আমারও গলায় গলায় হচ্ছে। চাট্টি মুড়ি-চিঁড়ে চিবিয়েও থাকতে পারি। চিঁড়ে-মুড়ি আমাদের ঘরে না থাক, বড়দার ওখানে আছে। মুখের কথা মুখে থাকতে চিঁড়ে ভিজিয়ে দুধ-বাতাসা দিয়ে বাটি ভরে এনে দেবে।

জগা আগুন হয়ে বলে, খাওয়াটাই ভাবলি শুধু, আমার দশা দেখছিস নে। বমি করতে করতে মরে যাচ্ছি—

বলাই বলে, আমি যেতাম না জগা। মাইরি বলছি। যাওয়া যায় না একলা মানুষ হেন অবস্থায় ফেলে। কিন্তু না গেলে ঠাকুরের নাম বন্ধ। যাব আর চলে আসব। রীতরক্ষে করে আসি। রোজ নিয়ম মত করে এসে মাঝখানে একদিন বন্ধ করা যায় না। কোন ভয় নেই, শুয়ে পড়গে জগা। ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি তো, তিনিই ভাল করে দেবেন।

বুঝিয়েসুঝিয়ে বলাই যথারীতি আলামুখো হাঁটল। ছাই হয়েছে জগার, অসুখের ভান করে বলাইটাকে পরখ করে দেখল। পরীক্ষার ফল দেখে ঝিম হয়ে গেছে। অভ্যাস বশে তামাক সেজে নিয়েছে, কিন্তু টানবার মেজাজ নেই। কলকে নিভে গেল না টানার দরুন। ঠকাস করে কলকে মেজের উপরে উপুড় করল। বাদা অঞ্চলে বড় বড় গুণীন আছে—মন্তোর পড়ে আঁকচোখ কেটে বাঘবন্ধন করে। কিন্তু মেয়ে-জাত যেন সকলের বাড়া গুণীন—মন্তোর পড়ে না, আঁকচোখ কাটে না, এমনি-এমনি মায়া করে ফেলে।

আসি বলে বলাই সেই চলে গেল। নামগানও আজ তাড়াতাড়ি সমাধা হয়ে গেছে, শব্দসাড়া বন্ধ। তবু ফিরছে না কেন? কী করছে না জানি নিঃশব্দ আলার ভিতর বসে বসে! পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে—জগা বলেছিল। ঠিক উল্টো, ক্ষিধেয় পেটের

নাড়ি চনমন করছে। সে ভাত রেঁধে রাখে, রাতদুপুর অবধি প্রাণ ভরে আড্ডা দিয়ে এসে রাঁধা ভাত ফয়তা দেয়। রোজ রোজ কেন তা হবে?—আড্ডা কামাই দিয়ে বলাই আজকে রাঁধাবাড়া করুক, এই সমস্ত ভেবে বলেছিল অসুখের কথা।

রাত বাড়ছে। পিছনের বনে রাত্রিচর কোন পাখির দল ছুটোপাটি লাগিয়েছে, ঝপাস-ঝপাস করে ডালের উপর পড়ছে। দুত্তোর, কত আর দেরি করব!—উনুন ধরিয়ে জগা ভাত চাপিয়ে দিল। ভাত আর ঝিঙে-ভাতে। ন্যাকড়ায় বেঁধে চাট্টি ডালও ছেড়ে দিল ওর ভিতরে। ভাত ঢেলে নিয়ে খেতে বসল, বলাইয়ের নিশানা নেই। মরেছে নাকি? অসুখ জেনে গেছে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার কথা—তা দেখি অন্য দিনের চেয়ে বেশী দেরি আজকে। তাই দেখা গেল—জগা যদি সত্যি সত্যি মরে যায়, তিলেকের তরে ওদের আড্ডা বন্ধ হবে না। গ্রাসে গ্রাসে খেয়ে নিচ্ছে, বলাই আসার আগেই খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বে। রাত্রের মধ্যে কথা বলবে না, সকালবেলাও না—এক ডিঙিতে যাবে, তবু মুখ তুলে তাকাবে না তার দিকে।

খাওয়া শেষ হব-হব, হঠাৎ শাঁখের আওয়াজ। ঘোর জঙ্গলের ভিতরেও অবশ্য শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। এ রকম রাতদুপুরে নয়, ভর সন্ধ্যাবেলা। বাদার নৌকোয় মাঝিমাল্লারা গৃহস্থর রীতকর্ম করে। গাঁয়ে-ঘরে দায়ে-বেদায়ে নিয়মের তবু ব্যত্যয় আছে, কিন্তু বনবিবি-দক্ষিণরায়ের এলাকায় নীতিনিয়ম মেনে ষোলআনা শুদ্ধাচারে থাকতে হয়—মা এবং বাবা কোপের কোন কারণ যাতে খুঁজে না পান। কিন্তু মেছোঘেরির আলার মধ্যে শঙ্খধ্বনি—হেন কাণ্ড কে কবে শুনেছে? মেয়েমানুষ এসে পড়ে কটা দিনের মধ্যে মানবেলার গাঁ-ঘর বানিয়ে তুলল!

শাঁখ বাজিয়ে নতুন কি পুজোআচ্চার শুরু এই রাত্রে! চুলোয় যাকগে। বলাইর যে ভাত রেঁধেছিল, জগা সেগুলো পগারের জলে ফেলে দিয়ে এল। আছে, থাক ওখানে। ভাত রাঁধার চাকর-ফনর

কে রয়েছে, খাবে তো ফিরে এসে কষ্ট করে রেঁধেবেড়ে খাক।

ভাত ফেলে এসে জগা শুয়ে পড়ে। শাঁখ বাজছে, আর উলু্ও সেই সঙ্গে। উলু দেবার মানুষও জুটেছে। উলু-উলু, উলু-উলু—দীর্ঘ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ জলের উপরে জঙ্গলের ভিতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিষম জাঁক আজকে যে আলার, রাত কাবার করে ছাড়বে। আবার উঠে পড়ল জগা। উনুনে জল ঢালল, রান্নার কাঠ যা আছে জল ঢেলে আচ্ছা করে ভিজিয়ে দিল। রাঁধবে তো বন থেকে শুকনো কাঠ ভেঙে নিয়ে এস যাদুমণি। ভিজে উনুনও ধরানো যাবে না, ডেলা সাজিয়ে তার উপরে হাঁড়ি রেখে রাঁধতে হবে। এতখানি অধ্যবসায় থাকে তো পেটে পড়বে ভাত। নইলে উপোস।

শুয়ে পড়ে ভাবছে এই সব। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে জোৎস্না। বাঁধের উপরে মানুষজন কলরব করতে করতে যাচ্ছে, এতক্ষণে বোধকরি মচ্ছবে ইতি পড়ল। ঘাড় তুলে জগা তাকিয়ে দেখে। পাড়া ঝেঁটিয়ে গিয়েছিল আলায়। জালে বেরুবে আজ কখন—আলার স্ফূর্তিতে কালকের দিন অবধি পেটে ভর থাকবে তো ?

বলাই ফিরছে। আরে সর্বনাশ, মেয়েটাকে গেঁথে নিয়ে এসেছে যে!

ও লোকটা, তুমি গেলে না কেন? লক্ষ্মীপূজো হল, সবাই গিয়েছিল। ওঠ, মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ হাত পেতে নাও।

বয়ে গেছে শত্রুর কাছ থেকে হাত পেতে প্রসাদ নিতে! জগা তো ঘুমিয়ে আছে। ঘোরতর ঘুম। বলাই তাড়াতাড়ি বলে, অসুখ করেছে। তা তুমি রেখে যাও প্রসাদ। পাত্তরটা কাল দিয়ে আসব।

ঘুম থেকে জগাকে ডেকে তুলতে চায় না বলাই। সন্ত্রস্ত। জগা যেন দৈত্যদানো বিশেষ, উঠেই অমনি তোলপাড় লাগিয়ে দেবে চারুবালার সঙ্গে। চোখ বুজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জগা সব দেখতে পাচ্ছে। পিতলের রেকাবিতে পূজার প্রসাদ রেখে চারুবালা ফিরে চলল। পিছনে পিছনে বলাই আলা অবধি এগিয়ে দিচ্ছে। তা বেশ হয়েছে। বলাই আবার যখন পাড়ায় ফিরবে, তাকে এগুতে

আসবে না চারুবালা? এবং তারপরে চারুবালা যখন ফিরবে? চলুক না সারারাত্রি ধরে এই টানাপোড়েন!

বলাই ফিরে এসে এক ঘটি জল ছড়ছড় করে পায়ে ঢেলে জগার পাশে একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাত রান্না আছে কি না, দেখে না একবার তাকিয়ে। ভাতের গরজই নেই তার। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ে বুঝি।

তখন জগাকেই কথা বলতে হয়: শাঁখ পেল কোথা রে?

জুটিয়ে নিয়েছে। কালীতলায় এক কাঠুরের নৌকো বেঁধে মানসিক শোধ দিচ্ছিল। শাঁখের ফুঁ শুনে চারুবালা গিয়ে পড়েছে। অনেক বলেকয়ে কিছু দাম ধরে দিয়ে শাঁখটা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিল। মানযেলায় গিয়ে তারা আবার কিনে নেবে। শাঁখ জুটে গেল—তখন ঝোঁক হল, গেরস্তঘরে লক্ষ্মীপূজো করলে তো হয়। দিনটাও আজ বিষ্যুৎবার। এবার থেকে হপ্তায় হপ্তায় ফী এমনি পূজো করবে।

জগা বলে, শাঁখ হল, ফুল-নৈবিদ্যিও না হয় জুটিয়েছে। কিন্তু বামুন নইলে পূজো হয় না—বামুন পেল কোথা রে? তুই গলায় জালের সুতো ঝুলিয়ে পৈতে করে নিলি নাকি?

বলাই বলে, লক্ষ্মীপূজো শিবপূজো বিনি বামুনে দোষ নেই। হপ্তায় হপ্তায় বামুন মিলবেই বা কোথা? পয়লা দিন আজকে কিন্তু বামুনের হাত দিয়েই ফুল ফেলেছে।

হেসে উঠে বলে, জাত-বামুন রে ভাই। একেবারে জাত-গোখরো। চারুবালা খবর রাখে সব, ওর সঙ্গে চালাকি চলে না। বলে, কাছেপিঠে তো বামুন রয়েছে—চৌধুরিগঞ্জের গোপাল ভরদ্বাজ। বলে-কয়ে তাঁকে নিয়ে এস তোমরা। সে কী কম হাঙ্গামা! প্রথমটা রাজী হয়ে শেষে বিগড়ে গেল: জরুরী কাজ আছে,—ভেড়ির একটা ব্যাপার: এক পা নড়তে পারব না এখন আলা ছেড়ে। পচা দুই পা জড়িয়ে একেবারে ঠুশ হয়ে পড়ল তো তখন অন্য এক ছুতো: বলি নৈকষ্যকুলীন আমি, সেটা জানিস? কার

নামে পূজোর সংকল্প হবে, কোন্ জাত কি গোত্র কিছু জানি নে। গেলেই হল অমনি! মুখ চুন করে সবাই ফিরল। চারুবালাও তেমনি মেয়ে। বলে, আমি যাচ্ছি নিজে—গিয়ে মুখোমুখি জবাব দেব। সকলে মিলে দল হয়ে গিয়ে পড়লাম চৌধুরি-আলায়। চারু বলে, ঠাকুরমশায়, জাত-জন্ম যত-কিছু মানষেলায় গিয়ে। বাঘ হরিণ সাপ শুয়োরের মধ্যে জাত-বেজাত নেই, বাদাবনে মানুষেরও নেই। বলতে পারেন, পৈতেওয়ালা খুঁজি কেন তবে? সে আমার বউদির জন্যে, আর কপাল-গুণে আপনি রয়েছেন বলে। বউদি সমস্তটা দিন উপোসী আছে, আপনি পূজো করে এলে খুঁতখুঁতানি গিয়ে মনের সুখে সে প্রসাদ পাবে। রাতের বেলা সেই জন্যে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি ঠাকুরমশায়! যা তুখোড় মেয়ে—তোকে কী বলব জগা! মিষ্টি কথায় ভরদ্বাজকে একেবারে জল করে দিল। শালতি নিল না, বাঁধ ধরে পায়ে হেঁটে নতুন আলায় এসে পূজোআচ্চা করল। এর পরে ফী বিষ্যুৎবারে এসে এসে পূজো করে যাবে, কথা দিয়েছে।

জগা বলে ওঠে, কী কাণ্ড রে বাবা! আলা তবে রইল কোথা? আমাদের সাধের আলা যোলআনা এখন গেরস্তবাড়ি।

জগন্নাথের উষ্মা বলাই ধরতে পারে না। পুলকিত কণ্ঠে আরও সে ফলাও করে বলে, বিস্তর ক্ষমতা ধরে মেয়েটা। অমন দেখা যায় না। এই ধর, বাদা-জায়গা—পূজোর কোন অঙ্গে তা বলে খুঁত রাখে নি। মালসার মধ্যে টিকে ধরিয়ে ধুনো দিয়েছে। সেই বরাপোতা থেকে গাঁদাফুল যোগাড় করে এনেছে। ঘর ভরে আলপনা দিয়েছে —পদ্ম আর লক্ষ্মীর পা। লক্ষ্মীঠাকরুন পা ফেলে ফেলে উঠান থেকে ঘরে উঠে বসেছেন, তারই যেন ছাপ পড়ে গেছে।

বিরক্তিতে জগার মুখে জবাব আসে না। বলাই ঘুমুতে লাগল। জগা ভাবছে। ভারী বিপদের কথা হল, ভাবতে গিয়ে দিশা পায় না। একচক্ষু হরিণের মত এতকাল শুধু একটা দিকের বিপদ ভেবে এসেছে। চৌধুরিগঞ্জের শত্রুতা। অনেক আগে থেকে

জমিয়ে আছেন তাঁরা—মাছের এলাকার শাহান-শা বলা যায়। নতুন ঘেরিদারের আসার পথে কাঁটা ছড়ান। কিন্তু এটা ছিল জানা ব্যাপার—এরাও সদাসতর্ক এই জন্য। কাঁটা যতই ছড়িয়ে দিক, খুঁটে তুলবে আর এগিয়ে যাবে। চৌধুরিদের ডরায় না, কিন্তু গাঁ-গ্রাম থেকে মেয়েছেলেরা এসে পড়ে ঘরগৃহস্থালি বানিয়ে গগনকে সকলের থেকে আলাদা মানুষ—ভদ্রমানুষ করে তুলবে, এটা কে কবে ভাবতে পেরেছে?

ঘুম হয় না, ছটফট করছে। নানান রকম মতলবের ভাঙাগড়া। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে যায়। সন্ধ্যারাত্রে মিথ্যা করে অসুখের কথা বলেছিল, রাতদুপুরে অসুখ করেছে সত্যিই। সর্বাঙ্গ জ্বলছে রাগে। রাগ মেয়েলোক দুটোর উপর। বিশেষ করে ঐ চারুবালা—সকলের বড় প্রতিপক্ষ সে-ই এখন। অনুকূল চৌধুরির চেয়েও বড়। রাগে রাগে বাইরে চলে এল। বাঁধ ধরে চলল কয়েক পা।

নতুন আলা নিঃশব্দ। ঘুমোচ্ছে সকলে বিভোর হয়ে। জগা চোরের মতন টিপিটিপি এগোয়। যাবে আলার উঠোন অবধি—লক্ষ্মীর পা এঁকেছে যেসব জায়গায়। পা ডলে ডলে মুছে দিয়ে আসবে আলপনা। রাগের খানিকটা শোধ দিয়ে তার পরে যদি ঘুম হয়।

বাঁধের উপর রাধেশ্যাম। আশ্চর্য, খোঁড়া পা দেখি পরিপূর্ণ আরাম হয়ে গেছে। হনহন করে চলেছে। খানিকটা পিছনে অন্নদাসী। অন্নদাসী হেঁটে তার সঙ্গে পারছে না।

জগাকে দেখতে পেয়ে রাধেশ্যাম বলে, ভাল হয়েছে। চল দিকি আমাদের সঙ্গে। হাতে লাঠি? বেশ হয়েছে, নিঃসম্বলে বেরুতে নেই। বউকে বললাম, বাড়ি থাক। তা শুনল না। পুলক কত! বাচ্চাকে সেই সন্ধ্যেবেলা সুবোধবালার কাছে দিয়ে রেখেছে। রাতদুপুরে এখন মজা দেখতে চলল।

উনত্রিশ

চৌধুরির ঘেরি করালীর উপরে নয়। করালী থেকে বেরিয়েছে সাঁইতলার খাল—সেই খাল আর ঘেরির বাঁধ প্রায় সমসূত্রে চলেছে। একটা জায়গায় এসে খাল থেকে এক ডাল বেরিয়ে সেই ডাল সোজা ঢুকে পড়ল ঘেরির ভিতর। বাঁধ দিয়ে তার মুখ আটকানো। বাইন গেঁয়ো ও বনঝাউয়ে আচ্ছন্ন ঐ দিকটা। চোত-বোশেখে নদীতে বান এসে পড়লে বাঁধের ওখানটা কেটে দেয়। বাঁধ কেটে ইচ্ছা মত ঘেরির খোলে নোনা জল তোলে। প্রয়োজন মিটে গেলে আবার বাঁধ বাঁধে। নোনা জলের সঙ্গে মাছের ডিম ও গুঁড়ো-মাছ উঠে আসে। তারাই বড় হয় ঘেরির ভিতরে। মাছের পোনা কেনার জন্য এক আধেলা খরচা নেই এ তল্লাটে। বর্ষাকালে ভেড়ি জলে ভরভরতি, জল ছাপিয়ে উঠে বাইরের সঙ্গে একাকার হওয়ার উপক্রম। মাছ তখন আটকে রাখা দায়। তখন আবার মরা-কোটালে বাঁধ কেটে খালের পথে বাড়তি জল বের করে। খুব সতর্ক হয়ে এই কাজ করতে হয়, জলের সঙ্গে মাছ না বেরুতে পারে। বাঁশের শলার পাটা বোনা থাকে, বাঁধের কাটা জায়গায় সেইগুলো শক্ত করে বসিয়ে দেয়। জোয়ার আসবার আগেই তাড়াতাড়ি মাটি ফেলে বাঁধ মেরামত শেষ করতে হবে। নয় তো খালের জল ভিতরে ঢুকে জল ফেঁপে যাবে আবার। অনেক হাঙ্গামা। এবং একদিন একবার করেই হল না। সারা বর্ষাকাল ধরে নজর রাখতে হয়, অনেক বার এমনি কাটাকাটির প্রয়োজন পড়ে।

বাঁধের ঠিক নীচে সেই জন্য একটা চালা বানিয়ে রেখেছে। বাঁধ-কাটা লোকেরা বৃষ্টিবাদলার মধ্যে সেখানে আশ্রয় নেয়, কোদাল রেখে বিশ্রাম করে, তামাক-টামাক খায়। রাত্রিবেলা পড়েও থাকল বা কোনদিন। বর্ষার সময়টা ভিড় খুব, মানুষের গতায়াতে সর্বদা সরগরম, পায়ে পায়ে জঙ্গলের ভিতর পথ পড়ে যায়। অন্য সময়

উঁকি মেরেও তাকায় না কেউ ওদিকে। জঙ্গল এঁটে গিয়ে পাতা-লতার মধ্যে চালাঘর অদৃশ্য হয়ে থাকে।

গগন দাসের আলায় ভরদ্বাজকে সেদিন বড় খাতির করল। পূজোর কাজকর্ম মিটে গেল, ভরপেট প্রসাদ পেয়েছেন, তবু ছেড়ে দিতে চায় না। নাছোড়বান্দা চারু বলছে, সে হবে না ঠাকুর মশায়! বউদি বলছে, দুটো চাল ফুটিয়ে সেবা করে যেতে হবে এখান থেকে। ভিটেবাড়ি পবিত্র হবে, দোষদিষ্টি কেটে যাবে। বউদি ছাড়বে না, আমি কি করব? ঐ দেখেন, উনুন ধরাতে লেগে গেছে এর মধ্যে।

চারুবালা মেয়েটা হাসে বড় খাসা, আর আবদার করে। আবাদের পেত্নিগুলোর মতন নয়। ছাড়বে না যখন, কী উপায়! আসবার সময় অন্নদাসীকে বিদায় দিয়ে এসেছেন। রাত্রে আজ ভাতের গরজ নেই, ওদের ওখানে জলটল খাওয়াবে, তাতেই ঢের হয়ে যাবে। কিন্তু গুরুতর রকমের জলযোগের উপরে আবার এই ভাত জুটে যাচ্ছে। হোক তবে তাই— মা-লক্ষ্মী যখন আসেন, না বলতে নেই।

ভরপেট খাওয়াদাওয়ার পর গড়াতে ইচ্ছে যায়। কিন্তু না, অনেক রাত হয়েছে, দেরি করা চলবে না আর একটুও। গোপাল ভরদ্বাজ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। সঙ্গে লোক দিতে চাচ্ছে গগন। ভরদ্বাজ ঘাড় নাড়েন: নাঃ, কী দরকার! এই তো, পৌঁছে গেলাম বলে।

চারুবালা বলে, শালতিও নিয়ে এলেন না। পায়ে হেঁটে একলা যাবেন ঠাকুর মশায়?

ভরদ্বাজ বলেন, শালতি আর চাপি নে এখন। কতটুকু বা রাস্তা! ফুলতলা থেকে তখন নতুন এসেছি, জুতো পরে পরে তুলতুলে পা, মাটির উপর বড্ড লাগত। এখন কড়া পড়ে গেছে, মুগুর মারলেও পায়ে সাড় হবে না। আরও ঐ অন্নদাসীকে দেখেই হয়েছে। দেখ না, সাঁইতলা থেকে কেমন রোজ দু-বেলা ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে যাওয়া-আসা করে। সে আমায় লজ্জা দিয়েছে। মেয়েমানুষে পারে তো আমি দশাসই মরদ পারব না কি জন্যে?

গদগদ হয়ে বলেন, খুব খেয়েদেয়ে গেলাম। পূজোআচ্চার ব্যাপারে কি অন্য রকম দায়ে-বেদায়ে যখনই দরকার হবে, আমায় ডেকো। আসব। সত্যিই তো, ব্রাহ্মণ বলতে একলা আমি তল্লাটের মধ্যে—মান টানিয়ে বসে থাকলে হবে কেন, আমারও একটা কর্তব্য আছে বই কি! ডেকো তোমরা, কোন রকম সঙ্কোচ করো না।

হনহন করে চললেন। কয়েক পা গিয়ে ভয়-ভয় করছে। একেবারে নিষুতি হয়ে গেছে যে! বাদাবনের দিক থেকে ভয়ানক একটা আর্তনাদ উঠল, এক রকম রাত্রিচর পাখীর ডাক ঐ রকম।

পচা থাকতে অন্য কে যাবে? পচা যেন কেনা-গোলাম। তাই বা কেন, কাজের নামে গা ঝাড়া দিয়ে যে আপনি উঠে পড়ে, কিছু বলতে হয় না—কেনা-গোলামে এতদূর করে না। ভরদ্বাজের আগে আগে আলো ধরে পচা চলল। চৌধুরিগঞ্জের বাঁধের উপরে উঠে গেছে, অদূরে আলা।

ভরদ্বাজ বলেন, চলে যা এবারে তুই। আর কষ্ট করতে হবে না। সোজা পথ—জলকাদা নেই, দিব্যি এইটুকু চলে যাব।

তবু পচা খাতির করে বলে, কেন গো? পথটুকু এগিয়ে দিলে আমারই কোন্ পায়ে ব্যথা ধরবে!

ভরদ্বাজ চটে উঠলেন: আচ্ছা নেই-চুঙে তুই তো বেটা! বলছি যেতে হবে না, জোর করে যাবি নাকি? চৌধুরি-আলায় গিয়ে ঘাঁতঘোঁত বুঝে আসতে চাস? চরবৃত্তি করবার মতলব?

এত বড় অভিযোগের পর পচা আর এগোয় না। রাগে গজর-গজর করতে করতে ফিরে চলল।

ভরদ্বাজ এগুলেন না আর আলার দিকে। চুপচাপ দাঁড়ালেন। পচা নজরের বাইরে যেতে ফিরে চললেন আবার। ডাইনে ঘুরে বাঁধ ধরে হনহন করে চলেছেন। বাঙ্গর মুখে জঙ্গলের দিকে।

কাছাকাছি এসে বাঁধ থেকে নেমে পড়েন। রাত অন্ধকার, ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালা। বাঁধের উঁচু সোজা সড়ক ছেড়ে জঙ্গলের আঁকাবাকা পথে যেতে গা-ছমছম করে। উঃ, সাহস বলিহারি

অন্নদাসীর ! অনেকদিন টালবাহানার পর শেষটা এই জায়গার কথা বলে দিয়েছে। পরিত্যক্ত ঐ চালাঘরে। ঘরের ভিতর অপেক্ষা করছে সে। জায়গাটা বেছেছে অবশ্য ভালই—স্বয়ং যমরাজেরও খুঁজে পাবার কথা নয়।

ভরদ্বাজকে দেখতে পেয়ে চালাঘরের ভিতরে নয়—বাইরে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে অন্নদাসী। হাঁ, অন্নদাসী বই কি—মানুষ ঠিক চেনা যায় না, কাপড়চোপড় জড়িয়ে আছে। নিঃসংশয় হবার জন্য ভরদ্বাজ ডাক দিলেন, কে ?

অন্নদাসী হেসে গলে গলে পড়ছে : আমি গো—আমি এক পেত্নী। এত কথাবার্তা—পোড়ারমুখো মনের মানুষ সমস্ত বিস্মরণ হয়ে গেলি ?

মানিকপীরের গান হয়ে গেছে সম্প্রতি গাঙপারে বরাপোতায়। গরুর বড় রকমের রোগপীড়া হলে কিম্বা গরু নিখোঁজ হলে মানিক-পীরের নামে সিন্নি মানে, পীরের মহিমা প্রচারে গানও দেয় সুবিধা হলে। এর ফলে গরু নিয়ে আর কোন ঝামেলা হয় না, মানিক-পীরের সতর্ক দৃষ্টি থাকে গরুর উপর। পীরের গান থেকে বাদশা-নামদারের প্রতি প্রেয়সীর উক্তি অনেকগুলো অন্নদাসী মনে গেঁথে রেখে দিয়েছে। বলে, পীরিতের মানুষ একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেছে গো। ভাবছে পেত্নী আছে দাঁড়িয়ে।

ভরদ্বাজ বলেন, পেত্নী ছাড়া কী আর তুই ! মানুষ হলে এখানে আসতে ডর লাগত। কান পেতে দেখ রে—পুরুষমানুষ হয়ে বুকের মধ্যে আমার ধড়াস-ধড়াস করছে। একলা মেয়েমানুষ এলি তুই কেমন করে বল দিকিনি।

একা কেনে আসব—

ভরদ্বাজ বলেন, কাকে নিয়ে আবার দল জোটাতে গেলি ? এত রঙ্গ জানিস, এমন ঘাবড়ে দিস সময় সময়—

অন্নদাসী বলে, আসছিলাম একা একা—তা মরদ কেমনে টের পেয়েছে। সন্দ-বাতিক কি না—পিছু নিয়েছে কখন থেকে।

খোঁড়া হয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে পড়ে কোঁকায়, চৌধুরিগঞ্জ থেকে তোমার হাঁড়ির ভাত এনে খাওয়াতে হয়। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি, খোঁড়া পা দিব্যি ভাল হয়ে গেছে। বাতাসের আগে ছুটছে। বলি, অত হিংসে কিসের শুনি ? তোমার দয়ায় গুষ্টিসুদ্ধ পেটে খেয়ে বাঁচছি—কোন দরকারে একটু জঙ্গলে ডেকেছ, তা নিয়ে ছুটোছুটি অত কিসের শুনি ?

রাধেশ্যাম হঠাৎ কথা বলে ওঠে। ঝোপের আড়ালে ছিল, উদয় হল যেন মায়া বলে। বলে, এসেছি তাতে কি দোষ হল ? দায়ে পড়ে আসতে হয়। একা তুই আসিস কি করে ? জঙ্গলের মধ্যে ধর কোন জন্তুজানোয়ার বেরিয়ে পড়ল।

রাধেশ্যামের পাশে আবার জগা। ফিকফিক করে হাসছে। জগা বলে, আমি মানা করেছিলাম, দল বেঁধে গিয়ে কাজ নেই রে তুষ্টুর মা। মেয়েমানুষ তুমিই বা কি জন্য যাবে—আমরা কেউ গিয়ে দরকারটা শুনে আসি গে। তা ভরদ্বাজ মশায়, তোমার উপরে দেখলাম টান খুব। ছেলে অন্য বাড়ি রেখে রাত্তিরবেলা হোঁচট খেতে খেতে চলে এসেছে।

রাধেশ্যাম বলে, টান বলে টান ! চৌধুরি-আলা থেকে ফিরতে এদিকে বিকেল, ওদিকে রাত দুপুর।

অন্নদাসী কিন্তু হাসে। রাধেশ্যামের মুখের নিন্দেমন্দ গায়ে মাখে না। হাসতে হাসতে বলে, তা কথাবার্তা কি আছে, বলে ফেল এবারে। এতখানি পথ আবার তো ফিরে যেতে হবে।

জগা হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল : এই রাধে, মারধোর দিবি নে —খবরদার ! মানী লোক—ফুলতলা সদরের খাস-গোমস্তা, গায়ে হাত না পড়ে। সঙ্গে চাকু এনেছি—জাপটে ধর, ক্যাচ-ক্যাচ করে কান দুটো কেটে নিয়ে ছেড়ে দিই।

ভরদ্বাজ আকুল হয়ে কেঁদে বলেন, ওরে বাবা ! ধর্মবাপ তোরা আমার। অন্ন আমার মা। নাক মলছি, কান মলছি—বারদিগর আর এমন কাজ হবে না।

জগা নরম হয়ে বলে, আচ্ছা, ব্রাহ্মণমানুষ যখন এমন করে

বলছে—মাঝামাঝি একটা রফা হোক। ছটো কানের দরকার নেই। একটা কেটে নিয়ে যাই, একটা ঠাকুর মশায়ের থাকুক গে।

কান কাটা শেষ অবধি রদ হয়ে গেল অবশ্য। চ্যাংদোলা করে ভরদ্বাজকে চৌধুরি-আলার সামনে পুকুর-ধারে দড়াম করে এনে ফেলল। ফেলে দিয়ে জগা আর রাধেশ্যাম সরে পড়ে। ভরদ্বাজ সেখান থেকে কাতরাচ্ছেন: ওরে, কারা আছিস—তুলে নিয়ে যা আমায়। হাঁটবার জো নেই।

লোকজন এসে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

কি হয়েছে?

বলিস কেন। পূজো করতে গিয়ে এই দশা! ঠাহর করতে পারি নি, বাঁধ থেকে গড়িয়ে পগারের মধ্যে। গা-গতর আর আস্ত নেই।

ছুই জোয়ানমরদ বগলের নীচে হাত দিয়ে একরকম ঝুলিয়ে ভরদ্বাজকে আলায় নিয়ে চলল। আলায় গিয়ে একটা চৌপায়ায় গড়িয়ে পড়লেন। ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, মাছের ঝোড়া সব উঠে গেছে? নৌকো ছাড়বার দেরি কত রে?

এই তো, ভাঁটা ধরে গিয়ে জল থমথমা খেয়েছে। উল্টো টান ধরলেই ছেড়ে দেবে।

ধরে নিয়ে আমায় নৌকোর চালির উপর তুলে দে বাপসকল। কুলতলায় গিয়ে চিকিচ্ছেপত্তোর হই গে।

নৌকোয় তুলে দিয়ে ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো নিয়ে কালোসোনা জিজ্ঞাসা করে, আবার কবে আসা হবে ঠাকুর মশায়?

আমি আসি কিম্বা অন্য যে-কেউ আসুক। ঘেরির পাশে ওই ছুঁচোর পত্তন করালীর জলে না ভাসিয়ে আর কাজ নেই। পৈতে ছুঁয়ে এই দিব্যি করে যাচ্ছি।

ত্রিশ

কুমিরমারি থেকে মাছের ডিঙি সেদিন সকাল সকাল ফিরেছে। কিন্তু হলে কি হবে—বলাইকে চালাঘরে পাওয়া যাবে না। সকাল সকাল হোক আর দেরিই হোক, ডিঙি থেকে মাটিতে পা দিয়েই চলে যাবে সে গগন দাসের আলায়। আলা আর কি জন্যে বলা, আলয় এখন পুরোপুরি। আলার কাজকর্ম গিয়ে আড্ডামচ্ছব সেখানে। ওদের আমোদস্ফূর্তি হৈ-হল্লা—আর জগা দেখ কথার দোসর পায় না একলাটি এই ঘরের মধ্যে।

পায়ে পায়ে সে রাধেশ্যামের বাড়ি চলে গেল।

আছ কেমন রাধে?

আলার দিক থেকে একটু বুঝি খোলের আওয়াজ আসছিল, রাধেশ্যাম উৎকর্ণ হয়ে ছিল সেদিকে। জগন্নাথের গলা শুনে চকিতে ফিরে তাকিয়ে আঃ-ওঃ—করতে লাগল। তারই মধ্যে টেনে টেনে বলে, ভাল নয় গো জগা ভাই। সেই একদিন ছুটোছুটি করে রাগের বশে ব্রাহ্মণ নির্যাতন করে পায়ের দরদ বড্ড বেড়ে গেছে। তার উপরে বউ জবরদস্তি করে দুটো দিন আবার জাল ঘাড়ে দিয়ে পাঠাল।

ব্রাহ্মণ না কাঁচকলা! পৈতেয় বামুন হয় না। একটা শত্রু নিপাত হল, আর একটা ঘাড়ের উপর চেপে রয়েছে। এরা কবে বিদায় হবে—কালীতলায় ঢাক-ঢোলে পূজো দিয়ে মানত শোধ করে আসব।

রাধেশ্যাম ঘাড় নাড়েঃ না জগা ভাই, মিছামিছি রাগ তোমার চারুবালার উপর। সকলে যায়, তুমি তো একটা দিন গেলে না। গিয়ে আগে নিজের চোখে দেখ—

জগা বলে, যা শুনছি তাতেই আক্কেল-গুড়ুম। দেখবার আর সাধ থাকে না। থুতু ফেলবার উপায় নেই, থুতু নাকি গিলে ফেলতে

হবে। বিড়ি খেয়ে গোড়াটুকু হাতের মুঠোয় ধরে বসে থাক, নয় তো উঠে ফেলে দিয়ে এস সেই বাঁধের উপর গিয়ে। জোরে হাসবে না, কথাবার্তা হিসেব করে বলবে। পাড়ার যত মরদ, সব ভেড়া হয়ে গেছে। ছুঁড়ী কামরায় বসে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শাসন করে। যেমনটা বলবে ঠিক তেমনি করতে হবে।

রাধেশ্যাম হেসে উঠে বলে, পরের মুখে ঝাল খেয়েছ তুমি। চোখে দেখে তারপরে যা বলবার বলো। পচা-মাছের গন্ধ আর নাকে পাবে না। জায়গার একেবারে ভোল পালটেছে। শুধু জায়গার কেন, মানুষেরও। বড়দা অবধি আলাদা এক মানুষ। ধবধবে গেঞ্জি গায়ে, পান খেয়ে মুখ রাঙা, মিষ্টিমিষ্টি কথা বলে বড়দা। অভ্যেস সকলের ভাল হয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি, গিয়ে দেখ একদিন। হাতে ধরে বলছি তোমায়।

জগা বলে, যাব বই কি! যেতেই হবে। গিয়ে পড়ে বাবুইয়ের বাসা ভেঙে দিয়ে আসব।

বলতে বলতে বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে: আমার ডান-হাত বাঁ-হাত হল বলাই আর পচা—হাত দুখানা মুচড়ে ভেঙে ষোলআনা নিজের করে নিয়েছে। ঘরের মধ্যে কথার দোসর পাই নে। ও ছুঁড়ীকে সহজে ছাড়ব? কুলো বাজিয়ে বিদেয় করে দেব আমাদের বাদা-অঞ্চল থেকে।

গজরাচ্ছে কেউটে সাপের মত। রাগের ক্ষান্তি হয় না। বলে, তুমি এক দৈত্য-মানুষ—নিজের বউ পিটিয়ে ভুলো-ধোনা কর—ঐ ছুঁড়ীর কাছে গিয়ে কেঁচো। আমার হাত ধরে তুমি ওর জন্যে ওকালতি করছ। না-ই বা গেলাম, খবর রাখি সমস্ত। পা ভেঙে পড়ে ছিলে তবু সেই খোঁড়া পায়ে গড়াতে গড়াতে ওদের ওখানে গিয়ে উঠতে। তোমার বউ তাই নিয়ে ক্যারক্যার করে, খেঁউড় গায়—ঘরের চালে কাক বসতে দেয় না।

রাধেশ্যামও চটেছে: ক্যারক্যার করে সেইজন্যে? না জেনেশুনে তুমি এক-একখানা বচন ঝেড়ে বসো। দুই দিন জালে গিয়ে

দু-গণ্ডা কুচো-চিংড়িও আনতে পারি নি, তাই চেঁচায়। লোভী মেয়েমানুষ। কুকুরের মুখে মাংস ছুঁড়ে দিলে ঘেউ-ঘেউ বন্ধ, ওদের সামনেও তেমনি পয়সা ছুঁড়ে দিলে চেঁচানি থামে। সেটা পেরে উঠি নে—অনেকদিন শুয়ে বসে অভ্যাস ছেড়ে গেছে। গতরও নেই। চৌরস বাঁধের উপরেই এক পা হাঁটতে চিড়িক মেরে ওঠে, ঘাঁতঘোঁত বুঝে ভেড়িতে জুত করে জাল ফেলি কেমন করে? মাগী তা বুঝবে না। পেটের পোড়ায় আজেবাজে নানান কথা তুলে ঝগড়া করে মরে।

জগা নরম হল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, বাড়ি যে একেবারে চুপচাপ! বউ কোথায় গেল?

গেছে ঐ নতুন আলায়। ছেলে ঘুম পাড়িয়ে আমায় পাহারায় রেখে সে গিয়ে মচ্ছবে বসেছে।

কী সর্বনাশ! অ্যাঁ, তোমার বউ অন্নদাসী অবধি ভক্ত হয়ে গেল?

রাধেশ্যাম বেজার মুখে বলে, ভক্ত না আরো-কিছু! হিংসে--বুঝতে পারলে না? আমি কখনোসখনো গিয়ে বসতাম, সেইটে হতে দেবে না। আগে থেকে ঘাঁটি করে বসে আছে। কেষ্টকথায় মন বসাবে হাড়বজ্জাত ঐ মেয়েমানুষ! তবে একটা ভাল—সমস্তটা দিনের পর বাড়ি এইবারে ঠাণ্ডা। দিব্যি শান্তিতে আছি একলা মানুষ।

জগা বলে, তুমি তো জালে যাচ্ছ না রাধে। জালগাছটা দাও দিকি।

রাধেশ্যাম অবাক হয়ে বলে, জালে তোমার গরজ কি জগা?

বাইব, কী আবার! পারি নে ভাবছ? দুনিয়ার হেন কর্ম নেই তোমাদের জগন্নাথ যা না পারে। মাছ-মারার কাজ কত করেছি এককালে! যতই হোক, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি তো! এখন তাই আর ইচ্ছে করে না।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে রাধেশ্যাম বলে, জগা তুমি ভটচাজ্জি

হয়েছ। পেটে জুত থাকলে সবাই হয় ওরকম। মাগী এদ্দিন চাট্টি চাট্টি ভাত এনে দিত চৌধুরি-আলা থেকে—আমিও খুব সাচ্চা হয়ে ছিলাম। এখন ভাত নেই—তাই আবার জাল ঘাড়ে নেবার দরকার। কিন্তু পেরে উঠছি নে। পাখানা খারাপ। পা যদিই বা ভাল হয়ে যায়, অভ্যাস একেবারে খারাপ হয়েছে। জাল ফেলতে গা ছমছম করে। সামলে উঠতে সময় লাগবে।

জগা দেমাক করে বলে, আমার অভ্যাস মোটেই নেই। তবু কিছু না কিছু হবেই। জাল তো নিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাবে।

রাধেশ্যাম হিতোপদেশ দিচ্ছে ঃ গোঁয়ার্তুমি করে যেথাসেথা জাল ফেললেই হল না। সমস্ত পরের জায়গা—এ-লোকের ভেড়ি, নয় তো ও-লোকের ভেড়ি। কোথায় ফেলবে, পাহারা কোন্‌দিকে কমজোরি—আগে থাকতে তার বুঝসমজ থাকবে। দিনমানে ভাল-মানুষ হয়ে ঘোরাঘুরি করতে হয়; গতিক বুঝে নিতে অন্তত দুটো-তিনটে দিন লাগে। তুমি তো কোন দিন এমুখো হও নি—পয়লা দিনেই জালগাছটা আক্কেলসেলামি দিয়ে শুধু-হাতে ফিরে আসবে।

জগা রাগ করে বলে, জাল কেড়ে নেয় তো জরিমানার পয়সা দিয়ে খালাস করে নিয়ে আসব। ছিঁড়ে যায় তো নিজ খরচায় মেরামত করে দেব। মাছ সমস্ত বড়দার খাতায় উঠবে, তার অর্ধেক বখরা হিসেব করে পয়সাকড়ি নিজের হাতে গণেগেঁথে এনো তুমি। এই চুক্তি। এর উপরেও মনে সন্দ থাকলে কাজ নেই। ধানাই-পানাই না করে সোজাসুজি বল। অন্য কোথাও চেষ্টা দেখি গে।

এত সুবিধা কোথায় আর! রাধেশ্যাম জাল দিয়ে দিল। অন্নদাসীর গতর যত দিন আছে, দু-বেলা দু-পাথর যেমন করে হোক জোটাবেই। তার উপর এই বাবদে হাতে-গাঁটে কিছু যদি নগদ মিলে যায়, সেটা রাধেশ্যাম অন্যভাবে খরচ করবে।

বলে, জাল নিয়ে যাও জগা। একটা কথা, বখরা আমি নিজে আনতে যাব না। তোমার উপর ধর্মভার, চোরাগোপ্তা তুমি এসে

দিয়ে যাবে। মাগী হল চিলের বেহদ্দ। টের পায় তো ছোঁ মেরে সমস্ত নিয়ে নেবে। আমার ভোগে হবে না। এইটে খেয়াল রেখো।

জাল নিয়ে বেরিয়ে এসে তখন বড় ভাবনা। ঐ যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে রাধেশ্যাম—বেকুব হবার ভয়, ধরা পড়ে আহাম্মক বনে যাওয়ার ভয়। জাল ফেলতে জানে জগা ঠিকই। অনেক বছর জাল ফেলে নি—তা হলেও ভরসা আছে, সুতোয় আর কাঠিতে জড়িয়ে গিয়ে আনাড়ীর হাতে যেমন লাঠির মতন সোজা হয়ে জাল পড়ে সে অবস্থা হবে না। জায়গা ঘিরে গোল হয়েই পড়বে। কিন্তু ফেলে কোন্ জায়গায়? যেখানে সেখানে ফেললেই মাছ পড়ে না। কোন্ ঘেরিতে কি রকম পাহারা, তারও কিছু আন্দাজ নেই। রাধেশ্যাম যে ভয় করেছে—হয়তো বা ধরাই পড়ে গেল সত্যি সত্যি। জগন্নাথ বিশ্বাসকে ধরে ফেলেছে, বাদা অঞ্চলে এর চেয়ে বড় খবর কি! জঙ্গলের মধ্যে এতকাল চরে বেড়াচ্ছে—সরকার বাহাদুর এত নৌকো মোটরলঞ্চ মানুষজন পিটেল-পুলিস নিয়েও তার গায়ে হাত ঠেকাতে পারে নি। আর এখানে ফাঁকা ঘেরির এলাকায় পাঁচ-দশটা মানুষ পায়চারি করে বেড়ায়—তারা ধরলে তো মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

জাল কাঁধে নিয়ে জগা হনহন করে চলেছে রাস্তা ধরে। কুমির-মারি থেকে নতুন যে রাস্তা আসছে। নতুন মাটি ফেলেছে—আর ঐ চারু মেয়েটার অত্যাচারে কিছু অন্যমনস্কও বটে জগা—হোঁচট লাগে বারম্বার। তা হোক, রাস্তা তবু সরকারী জায়গা। হাতে তুলে জাল নাচিয়ে শব্দসাড়া করে রাস্তা ধরে যতদূর খুশি যাও, কারও কিছু বলবার এক্তিয়ার নেই। বড় বড় মেছোঘেরি ডাইনে বাঁয়ে, রাত্রে আজ জোর হাওয়া দিয়েছে, ছলছল করে জল এসে লাগে রাস্তার নতুন মাটির গায়ে। আঘাতে আঘাতে ফেনা উঠছে জলে। জলের উপর ঢেউ-লাগা সাদা ফেনা আবছা আঁধারেও দিব্যি নজরে আসছে। জল অগভীর—জলের মধ্যে মাছ। অনেকবার ঝোঁক

হয়েছে কোন এক দিকে রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে দেয় এক খেওন। কিন্তু খেওনের জাল জল থেকে টেনে টেনে তুলছে---যদি সেই সময় পাহারার মানুষ গেঁয়োবনের আড়াল থেকে বেরিয়ে খপ করে জালের মুঠো চেপে ধরে! বড্ড অপমান। কে হে বট তুমি? আজেবাজে মানুষ নয়, জগন্নাথ বিশ্বাস। ঘটনা চাউর হয়ে গেলে এই তল্লাট ছেড়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই।

এগিয়েই যাচ্ছে। যতদূর সম্ভব চেনা-জানার চৌহদ্দি যাবে ছাড়িয়ে। মাঝে মাঝে জঙ্গল---এখনো হাসিল হয় নি। হয়তো করবেই না হাসিল, ইচ্ছে করে রেখে দিয়েছে। ধানকরের চেয়ে জলকরে রোজগার বেশী---যদি অবশ্য ঠিক মত মাছ চালানের ব্যবস্থা করা যায়। বনকর এক হিসাবে আবার জলকরের চেয়েও ভাল। রোজগারে জলকরের মতন নয় বটে--কিন্তু বড় সুবিধা, পয়সা খরচ করে বাঁধ বাঁধতে হয় না। বাঁধ বেঁধে 'কখন ভাঙে' 'কখন ভাঙে' করে শঙ্কিত থাকতে হয় না অহরহ। ক্ষেতে ধানের চারা লাগানো কিম্বা ঘেরিতে চারামাছ তোলার বাবদে পয়সা খরচ করতে হয় না। কখনো জলকর কখনো বা বনকর দু-পাশে ফেলে জগা নিশিরাত্রে নতুন রাস্তা ধরে চলেছে।

ধবধবির খাল---পুল এখনো বানানো হয় নি। ইট এনে ফেলেছে, পুল গাঁথা শুরু হয়ে যাবে খুব শিগগির। এমনি আরও তিন-চারটে পুল বাকি, আপাতত বাঁশের সাঁকো বানিয়ে পারাপারের কাজ চলছে। ধবধবিতে এসে জগার হুঁশ হল, অনেকটা দূর এসে পড়েছে। খাল পার হয়ে গিয়েই তো, মনে পড়ছে, মেছোঘেরি আছে একটা। যা হবার হোক, ঐ ঘেরিতে কপাল ঠুকে দেখা যাবে। সত্যিই তো, সারা রাত্তির ধরে হাঁটবে নাকি? হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে সেই কুমিরমারি অবধি?

সাঁকোয় উঠবে, খালের পাশে গোলবনের ভিতর কি নড়ে উঠল। কুমির---কুমির নাকি? বাঁশের উপর মাঝামাঝি জায়গায় দ্রুত চলে এসেছে। দাঁড়িয়ে পড়ল চুপচাপ সেখানে। বাঁশ মচমচ

না করে। অপেক্ষা করছে, কোন জন্তু বেরিয়ে আসে ফাঁকায়। তারপরে সাঁকো পার হয়ে ছুটে পালাবে, অথবা এপারে ফিরে মাটির ঢিল ও ডালপালা ছিটে নিয়ে রণে প্রবৃত্ত হবে—সে বিবেচনা তখনকার।

বেরুল জন্তুটা গোলবনের ভিতর থেকে। কুমির নয়, বাঘ নয়, শুয়োর নয়, এমন কি মেছো-ঘড়েল ও নয়—মানুষ একজন। সঙ্গে তার বেশ বড় সাইজের মাছের খালুই। খালুই হাতে করে নেয় নি। কাঁধের উপর লাঠি দিয়ে তারই ওদিকে পিঠের গায়ে ঝোলানো। বোঝা গেল তবে তো চাঁদ, মাছে ভরতি তোমার খালুই। ভরতি এতদূর যে হাতে ঝুলিয়ে নিতে পার নি, কাঁধের উপরে ঠেকনো দিয়ে নিতে হচ্ছে।

রাস্তায় উঠবে মানুষটা, জলজঙ্গল ভেঙে সোজা চলে আসছে। জগারও অতএব খাল পার হওয়া ঘটল না; ফিরে এসে আড়ালে-আবডালে টিপি টিপি এগোচ্ছে মানুষটার দিকে। একটা ঝোপও পাওয়া গেল, ঘাপটি মেরে আছে সেখানে। যেই মাত্র মানুষটা রাস্তায় পা দিয়েছে, জগা নাকি সুরে বলে, চাট্টি মাঁছ দেঁ—

মাছের উপর সকলের লোভ। বনকরের বাবু, ঘেরিওয়ালা, নৌকোর মাঝি, ডাকপিওন, আবাদের ডাক্তারবাবু, মরশুমী পাঠশালার গুরুমশায়— মাছের নামে সবাই হাত পাতে। মানুষ ছাড়া এমন কি বাদাবনের ভূত-দানো ওঁরাও। সেইজন্যে রাত্রিবেলা মাছ নিয়ে মানুষ পারতপক্ষে একলা যাতায়াত করে না।

মাঁছ দেঁ আঁমায়—খাঁব।

চমক খেয়ে মানুষটা ঝোপের দিকে তাকাল। হো-হো করে আকাশ ফাটিয়ে হেসে জগন্নাথ তার হাত চেপে ধরে।

আমরা মাছ-মারারা সন্ধ্যে থেকে জাল নিয়ে চক্কোর দিচ্ছি— কোন্ ঘেরিতে কখন খেওন দেওয়া যায়। তুমি বাবা ওস্তাদ সিঁদেল —টুক করে কার ঘরের পাস্তা বেড়ে নিয়ে এলে বল তো?

মানুষটা চটে ওঠে: চুরিচামারির কথা তোল কেন? তোমরাই

বা কোন্ সাধুমোহান্ত ? তুমি যা, আমিও সেই। দু-জনেই মাছের ধান্দায় ঘুরছি।

জগা বলে, না সাঙাত, ছোট হও কি জন্যে ? বিস্তর ক্ষমতা তোমার। এক খেওন জাল ফেল নি, জালই নেই তোমার হাতে, দিব্যি গায়ে ফুঁ-দেওয়া কাজ। মাছের ভারে পিঠ কুঁজো হয়ে চলেছ। আর আমাদের দেখ, কালঘাম ছুটিয়ে জাল ফেলে ফেলে মুনাফার বেলা অষ্টরম্ভা। বলছ কিনা, তুমি যা আমরাও তাই। অনেক উপর দিয়ে যাও তুমি আমাদের।

মানুষটা দেমাক করে : গায়ে ফুঁ-দেওয়া কাজ হলে সবাই ঝুঁকত এই দিকে। কষ্ট করে কেউ জাল ফেলতে যেত না। বুকের বল চাই রে দাদা, যেমন-তেমন লোকের কর্ম নয়। টের পেলে গাঙের মধ্যে ধরে চুবানি দেবে। গলা টিপে মেরে ফেলে ভাসিয়েও দিতে দিতে পারে জোয়ারের জলে। টানের সঙ্গে ভেসে ভেসে লাস চলল কাঁহা-কাঁহা মুলুক। সেই জন্যে তক্কেতক্কে থাকতে হয়। পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে বসে মশার কামড় খাও, আর নজর পেতে রাখ। নৌকো কাছি করল এইবারে। বেউটি-জাল নামাল জলে। গাঁজা খাচ্ছে হাত-ফিরতি করে—এ-হাত থেকে ও-হাত, ও-হাত থেকে সে-হাত। পাঁচবার সাতবার চলে এইরকম, তারপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে গল্প চলল, শেষটা ঝিম হয়ে আসে। তৈরি হও এবারে—জলে নেমে আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে এগোও। জলের এতটুকু নাড়ানি নেই—ভাঁটার টানে যেমন একটানা নেমে যাচ্ছে তেমনি। জালের মাথা উঁচু করে সাবধানে তুলে ধর, খালুই পাতো ঠিক তার নীচে, ধারাল ছুরি দিয়ে পোঁচ লাগাও জালে। খলবল করে মাছ এসে পড়বে খালুইতে, কপালে থাকে তো ভরে গিয়ে ছাপিয়ে পড়বে। তিলেক আর দেরি নয়—ফের, ঠিক যেমন কায়দায় এসেছিলে। ফাঁকায় যাবে না, জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে এগোবে। হাতের নাগালে পেলে বন-কাটা হেঁসো-দা দিয়ে কাঁধের উপরের মুণ্ডুখানা নামিয়ে নেবে। সড়কির নাগালে পেলে এ-ফোঁড়

ও-ফোঁড় করবে। এত কষ্টের কাজ—আর তুমি কিনা বল গায়ে-ফুঁ দিয়ে বেড়ানো!

জগা বলে, মাছ কি করবে—বেচবে তো নিশ্চয় এত মাছ? মহাজন কে তোমার, কোন্ খাতায় নিয়ে তোল?

লোকটা হেসে বলে, বিনি পুঁজির ব্যবসা—এতে মহাজন লাগে না। জাল কাটার জন্যে বারো আনার এক ছুরি মাত্তোর মূলধন। যেখানে খুশি মাল ছাড়তে পারি। কুমিরমারি চলে যাওয়াই ভাল। দেড় পহরে পৌঁছে যাব। বাজার পুরোপুরি ধরা যাবে।

কেন ভাই, কাছেপিঠে গগন দাসের খাতা—তোমাদের জন্যই খাতা বসানো। কুমিরমারি অবধি কি জন্য কষ্ট করবে?

খাতায় কি আর কুমিরমারির দর দেবে? খাতার ব্যাপারীরা কুমিরমারি নিয়ে বেচবে—নৌকোয় খরচ-খরচা করে নিয়ে যাবে, তার উপরে লাভও চাই খানিকটা! আর তোমাদের খাতা বসবে সেই ভোর-রাত্রে। হাত-পা কোলে করে ততক্ষণ বসে না থেকে টুকটুক করে পায়ে পায়ে চলে যেতে লাগি।

জগা বলে, মাল নামাও, কোনখানে যেতে হবে না। যাবে তো অজঙ্গি বন কেটে এত কাণ্ড করেছি কেন? কি মাছ এগুলো—পারসে? আচ্ছা রাক্ষুসে-পারসে জুটিয়েছ ভাই!

মাছের আয়তন দেখে উল্লাসের অবধি নেই। এক-একটা বের করে জগা, পরম আদরে হাত বুলায়, আর বাৎসল্যের চোখে চেয়ে থাকে: আহা-হা, রাজপুত্তুর! তিন-চার গণ্ডায় সেরের ধাক্কা। এ জিনিস পেটে খাবার নয়—সদরে নিয়ে দেখালে সরকারী পুরস্কার দেবে। আমি ছাড়ছি না, কুমিরমারির দর দিয়েই কিনে নেব। আরও বেশী চাও, তা-ই দেব। কষ্ট করে তোমায় একবার সাঁই-তলা অবধি যেতে হবে। পয়সাকড়ি লোকে তো সদাসর্বদা গাঁটে করে ঘোরে না।

কুমিরমারি চলে যাচ্ছিল. সেই লোক সাঁইতলার এইটুকু পথ যাবে, এ আর কত বড় কথা! কালীতলার ওদিকে বানগাছটায়

সেই যে জগার সিন্দুক—সিন্দুক থেকে টাকা বের করে লোকটাকে দাম দিতে হবে।

সাঁইতলায় নিয়ে গিয়ে জগা তাকে চালাঘরের ভিতর বসাল। প্রসন্ন মুখে বলে, ঢেলে ফেল সমস্ত মাছ এইবারে। নেড়েচেড়ে দেখে আন্দাজ করে দাম বল।

লোকটা দাম বলে, পাঁচসিকে।

উহুঁ, আরও বেশী। দেড় টাকা। দেড় টাকায় খুশী হলে কিনা বল। কুমিরমারিতে তুমি এই দর পেতে না ভাই। বসে বসে তামাক খেতে লাগ, টাকা নিয়ে আসি।

তামাক সাজছে জগা। লোকটা প্রশ্ন করে, তুমিই বা এত দর দিচ্ছ কেন? পোষাতে পারবে?

তাই বোঝ। না পোষালে দিই কেমন করে?

লোকটা হি-হি করে হাসে: বুঝতে পেরেছি।

কি বুঝলে?

মানুষের মনে কত কি মতলব থাকে। কত রকম ভেবে কাজ করতে হয়। খাতা জমাচ্ছ তোমরা এই কায়দায়। বাবুরা যেমন করে হাট জমায়। হাটে যে মাল অবিক্রী থাকে, বাবুদের তরফ থেকে সমস্ত কিনে নেয়। এমনি করে করে ব্যাপারী জমে। ব্যাপারীর মাল আমদানি হতে লাগলে খদ্দেরও এসে পড়ে। হাট জমে গেল। তারপরে আর কি—কষে তোলা আদায় করে যাও। ভাল দর দিয়ে তোমরাও তেমনি খাতা জমাচ্ছ—যত মাছ-মারা তোমাদের এখানে যাতে জোটে। কেউ কুমিরমারি যাবে না, এদিকে-ওদিকে হাতে কেটে বেচতে যাবে না। খাতায় এসে নির্ঝঞ্ঝাটে পাইকারি ছেড়ে দিয়ে যাবে।

জগা বিষণ্ণ মুখে বলে, বন কেটে ঘেরি বানিয়েছি। খাতাও আমার বুদ্ধিতে। কিন্তু আমি এখন কেউ নই। আমি তো আমি—খোদ মালিক গগন দাসের দশা গিয়ে দেখ। যাই নে আমি—কিন্তু যা কানে শুনতে পাই, পাষাণ ফেটে জল বেরুবে। ডাঙা অঞ্চলের

ভদ্দোররা এসে চেপে পড়েছে। গগন আছে জেলখানায় কয়েদীর মত হয়ে।

লোকটা ছিলিমে গোটা দুই টান দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল : মতলব এইবারে ধরতে পেরেছি। বলি ? জাল নিয়ে বেরিয়েছ— জালে একেবারে ফক্কা। আমার মাছ দেখিয়ে বউয়ের কাছে পশার বাঁচাবে তুমি। বল্ল ঠিক কি না ?

জগাও হাসে : বউই নেই। এই আমার বসত-ঘর। বউ থাকলে মজা করে এমনি হাত-পা মেলে থাকতে দিত ? ঘরের চেহারা দেখে বোঝ না ?

একত্রিশ

ভোররাত্রে আর দশটা মাছ-মারার সঙ্গে জগা গিয়ে নতুন আলায় উঠল। বসেছে মাছ-মারাদের মধ্যে। জালে জড়িয়ে মাছ এনেছে, জাল খুলে মাছ ছড়িয়ে দিল। জগার এই নবমূর্তিতে অবাক সকলে। কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলে না। কাজের ভিতর গোঁয়ার মানুষকে ঘাঁটাতে গিয়ে কোন্ বিপত্তি ঘটে না জানি! কী দরকার!

আলায় এসেছে জগা অনেক দিন পরে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চতুর্দিক। হায় হায়, কী চেহারা করে ফেলেছে তাদের সাধের আলার! রাধেশ্যাম বাড়িয়ে বলে নি। আলা কে বলবে, ষোল-আনা গৃহস্থবাড়ি। দরাজ উঠান পড়ে ছিল—আগাছার জঙ্গল, আর নুন ফুটে-ওটা সাদামাটি। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে সারা উঠান ভরে লাউ-কুমড়ার চারা পুঁতে দিয়েছে, নটে-পালংশাক-মুলোর বীজ ছড়িয়েছে। নধর লকলকে শাকে মাটি দেখা যায় না। সামনের দিকে গোয়ালঘর বাঁধা হচ্ছে। উদ্যোগী মরদ-জোয়ানের অভাব নেই— খুঁটি পোঁতা হয়ে চাল উঠে গেছে এর মধ্যে। গোয়ালঘর শেষ হতে বেশী দেরি হবে না। শেষ হয়ে গেলে গরু আসবে, ছাগল আসবে।

আর এখনই এই ভোর হবার মুখে হাঁস ঝটপট করছে রান্নাঘরের দাওয়ায় একটুকু খোপের ভিতরে। হাঁস তো এসেই গেছে আর গোয়াল হয়ে গেলে কী কাণ্ড যে হবে, ভাবতে শিহরণ লাগে। গোয়াল, তরিতরকারির ক্ষেত, উঠান জুড়ে লাউ-মাচা। মাচার তল দিয়ে মাথা নীচু করে দাওয়ায় এসে উঠব তখন। সাগরের কূলে চর পড়ে ডাঙা বেরুল, ডাঙায় জঙ্গল জন্মল আপনাআপনি। জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার চরে বেড়ায়। সকলের শেষে এল মানুষ। শুধুমাত্র চরে খেয়ে ও-জীবের সুখ হয় না। জমিজিরেত নিজস্ব করে ঘিরে নেবে, চিরস্থায়ী ঘরবাড়ি বানাবে—সকল জীবের মধ্যে এই মানুষই কেবল যেন অনড় হয়ে ত্নিয়ায় এসেছে!

সব চেয়ে কষ্ট হয় বড়দার জন্যে। কথা বলা চুলোয় থাক, নিদারুণ লজ্জায় মুখ তুলে সে জগার দিকে চাইল না এতক্ষণের মধ্যে। যেন কে না কে এসেছে। পুরো-হাতা কামিজ এবং পুরো দশহাতি কাপড় পরিয়ে খাতা-কলম আর হাতবাক্স সামনে দিয়ে মাচার উপর গগনকে ভদ্রলোক করে বসিয়ে দিয়েছে। বসে বসে হিসাব কর, আর দেদার লিখে যাও। লেখাপড়া শেখার এই বিষম জ্বালা। ফষ্টিনষ্টি ঠাট্টাতামাশা হাসিহল্লা করবে—তা দেখ, শ্যালক নগেনশশী খোঁড়াতে খোঁড়াতে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে সামনের উপর। এবং কামরার দরজার আড়াল থেকেও দোর্দণ্ডপ্রতাপ বোন আর বউ নিশ্চয় একগণ্ডা চোখ তাকিয়ে পাহারায় রয়েছে। খাতার এই কেনাবেচার সময়, কাজের সময় বলেই নয়—এমনি নজর দিনরাত অষ্টপ্রহর। মানুষটাকে নড়ে বসতে দেবে না। সন্ধ্যার পর গান-বাজনা আর ফড়ের আড্ডা বসত এইখানে, আড্ডা এখনো আছে। কিন্তু রসের গান গাও দিকি একখানা—'গয়লা দিদি লো, বড় ময়লা তোর প্রাণ'—গাও দিকি কত বড় সাহস! শ্রীখোলের সঙ্গে নামগান করে এখন বড়দা বোন-বউ-শ্যালকের সামনে বাবাজি হয়ে বসে। হরিধ্বনি করে হরির

লক্ষ্মীপূজোর সময়। জেলের কয়েদী হয়ে আছে, সেটা কিছু মিথ্যে বলে নি জগা।

গগন গদিয়ান হয়ে বসে। আর নগেনশশী মাতব্বরীর চালে চরকির মত ঘুরছে। অকাজের ঘোরাফেরা নয়—খাবার মাছ বলে এক এক আঁজলা মাছ তুলে নিচ্ছে মাছ-মারাদের ঝুড়ি খালুই ও জাল থেকে। জগা বলেও বাদ দিল না, নিল তার কাছ থেকে গোটা-কতক। জগা কিছু বলবে না, সে তো পুরোপুরি মাছ-মারা হয়েই এসেছে। এমনি ভাবে খাতার নিজস্ব ঝুড়িও প্রায় ভরতি। তার অল্প-কিছু খাবার জন্য রান্নাঘরে পাঠিয়ে বাকিটা বিক্রি করে দেবে। সেটা সকলের শেষে। নগেনশশী এসে এই একখানা বুদ্ধি বের করেছে—অতিরিক্ত রোজগারের পন্থা। ফন্দিফিকিরের অন্ত নেই লোকটার মাথায়। মাছ-মারারা মাছ নিয়ে বসে আছে —নগেনশশী ঘুরে ঘুরে এক-এক জনের কাছে যায়, হাত দিয়ে মাছ উল্টেপাল্টে ব্যাপারীদের দেখায়, দু-হাতে খালুই তুলে ধরল বা একটু উঁচুতে। উঃ, পাহাড়ের সমান ওজন! একটা জালে ভেড়ির যাবতীয় মাছ তুলে এনেছ গো! কত বলছ ঘড়ুই মশায়? কিছু বলবার আগে নিজেই মন-গড়া দর বলে, বার আনা? ঝড়ু ব্যাপারী ঐ দেখ এক আঙুল দেখিয়ে পুরো টাকা বলে বসে আছে। এর উপরে কে কত উঠতে পার? এক-দুই—উঁহু আঠার আনা নয়, পাঁচ সিকে। তিন ব্যস, ডাক শেষ, পাঁচ সিকেয় চলে গেল। মাছ ঢেলে নাও ব্যাপারী।

এমনি কায়দায় মাছের দর তোলে নগেনশশী। দর উঠলে বৃত্তি বেশী আদায় হয়, খাতার মুনাফা বেশী। যা গতিক, খাতা তো ধাঁ-ধাঁ করে এবারে জমে উঠবে নগেনশশীর ব্যবস্থা ক্রমে।

সকাল হয়েছে। কিন্তু আজ বড় কুয়াশা—মনে হচ্ছে, রাত্রি আছে এখনো। বেচাকেনা শেষ। মাছের ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ, পচা আর বলাই বেয়ে নিয়ে চলে গেল। জগা ভাবছে,

দু-জনেই ওরা সমান ওস্তাদ—এই কুয়াশায় পথ ভুল করে কাণ্ড ঘটিয়ে না বসে! আবার ভাবছে, তাই কর মা-কালী, জগা কী দরের নেয়ে হাড়ে-হাড়ে বুঝবে তবে সকলে। মাছ-মারাদের হিসাব খাতায় উঠে গেছে, এইবার পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পয়সা গণেগেঁথে বিদায় হচ্ছে একে একে।

বিনোদিনী গিয়ে হাঁসের খোপের ঝাঁপ সরিয়ে দেয়। প্যাঁক-প্যাঁক আওয়াজ তুলে ছুটোছুটি করে হাঁসের পাল বাঁধের ধারে ডোবায় গিয়ে পড়ে। বাদা অঞ্চলে শিয়াল নেই, এই বড় সুবিধা। কোমরে আঁচল ফেরতা দিয়ে নিয়ে চারুবালা ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। বলে, ঝেঁটেলা পড়ছে। সরে যাও গো ব্যাপারী মশায়েরা। সর, ও মাছ-মারা ঠাকুর—

সব মাছ-মারার হয়ে গেছে, সর্বশেষ জগার পয়সা গণা হচ্ছে। সেই বাকি আছে শুধুমাত্র। ইচ্ছে করেই যেন চারুবালা তার দিকে চেয়ে মাছ-মারা ডেকে মুখের সুখ করে নিল। হর ঘড়ুই আর জগার কথাবার্তা চলছে তখন। ঘড়ুই তারিফ করেঃ ওস্তাদ বটে তুমি জগা! সর্বকর্মে দড়। একটা দিন জাল নিয়ে পড়লে, তা-ও একেবারে সকলের সেরা মাছ তুলে নিয়ে এসেছ।

ঝাঁট দিতে দিতে চারুবালা স্বগতোক্তির মত বলে, ওস্তাদ বলে ওস্তাদ! মাছ মেরে আনা হয়, তা জালে জলের ছিটে লাগে না। একেবারে শুকনো জাল।

হর ঘড়ুই তাকিয়ে দেখে, ব্যাপার তাই বটে! আচ্ছা ত্যাঁদোড় মেয়ে তো, অতদূর থেকে ঠিক নজর করে দেখেছে।

জগা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, বড়দা বারণ কর। হচ্ছে বেটামানুষের কথা, মেয়েলোকে তার মধ্যে কেন ফোড়ন কাটবে?

জগা যত রাগে, ততই চারুবালা খিল-খিল করে হাসে। কাণ্ড-খানা বুঝেছ তো ঘড়ুই মশায়? এর-তার-কাছ থেকে মাছ যোগাড় করে নিয়ে মানুষটা আলায় এসেছে।

ঘড়ুই বলে, তার কোন্ গরজ? যার যখন ইচ্ছে, চলে আসে

চলে যায়। বাধা কিছু নেই। অন্যের মাল জগন্নাথের কেন আনতে হবে ?

চারু বলে, মনে পাপ থাকলে ছুতো খুঁজতে হয়। সকলকে মানা করে, আলায় যাতে না আসে। মাছ-মারা সেজে নিজে তারপর চরবৃত্তি করে।

ঝাঁটার তলে হঠাৎ পোকামাকড় পড়েছে বুঝি! মরীয়া হয়ে মেঝের উপর বাড়ির পর বাড়ি দিচ্ছে। জগা কোন দিকে না তাকিয়ে পয়সা গাঁটে নিয়ে হুমহুম করে পা ফেলে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল।

চালাঘরে জগা একা। সোয়াস্তি নেই। সাপের মতন ফোঁস ফোঁস করছে। ঘরে থাকতে পারে না বেশিক্ষণ, বেরিয়ে পড়ে। লোকের সামনে এমন হেনস্থা আজ অবধি তাকে কেউ করে নি। চারুবালা থাকতে ভুলেও কোনদিন আর নতুন-আলায় যাবে না। বাদাবন থেকে মেয়েটাকে তাড়িয়ে অপমানের ষোলআনা শোধ নিয়ে তবে যাবে। ভরদ্বাজকে তাড়িয়েছে—তারও চেয়ে বড় শত্রু চারু। ভরদ্বাজ ছিল ভিন্ন এলাকায় চৌধুরিদের মাইনে-খাওয়া গোলাম—নিজের ইচ্ছেয় সে কিছু করত না। চারুবালা বুকের উপর বসে থেকে শত্রুতা সাধবে। বলাই আর পচা, তার ডান-হাত বাঁ-হাত কেটে নিয়েছে সকলের আগে।

আপাতত একটা বুদ্ধি মাথায় আসে। চৌধুরি-আলায় চলে যাবে। সেখানে পুরানো সাঙাতরা আছে—অনিরুদ্ধ, কালোসোনা এবং আরও সব। গগন দাসকে নিয়ে প্রথম যেখানে এসে উঠল, বাদাবনের স্বাদ পাইয়ে দিল গগনকে। অতিথ এসে সেই গৃহস্থ তাড়ানোর ফিকির। গোপাল ভরদ্বাজ বিদায় হয়েছে, এখন আবার সেখানে ভাব জমিয়ে নেওয়া কঠিন হবে না। চৌধুরিগঞ্জ থেকে তাদের মানুষ আমদানি করে চালাঘরের ভিতর আড্ডা জমাবে। নতুন-আলার পাশাপাশি ওদের নামগানের আসর থেকে ঢের ঢের

জবর আড্ডা।

মনের মধ্যে এমনি সব আনাগোনা করতে করতে বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছে। কুয়াশা—সৃষ্টিসংসার মুছে গিয়েছে যেন একেবারে। দু-হাত দূরের গাছটাও নজরে আসে না। সূয্যিঠাকুর বনের এই নতুন বসতির পথ ভুলে গেছেন বুঝি আজ।

থমকে দাঁড়াল। শিস দিচ্ছে কে কোথায়। শিস দিয়ে ডাকছে যেন কাকে। মন্দ মানুষের কাণ্ডবাণ্ড নাকি? ঐ ভরদ্বাজের যে ব্যাপার—ব্রাহ্মণ-সন্তান পিটুনি খেয়ে মরল অসৎকর্মে গিয়ে। আর মজা এমনি, কাউকে কিছুই বলবার জো নেই—কিল খেয়ে কিল চুরি করা। কান কেটে নেওয়ার কথা হয়েছিল সেদিন—সেটা হলে কি করত? খোঁড়া পায়ের অজুহাত আছে—পগারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। ফোলা মুখের কৈফিয়ত—মৌমাছি কামড়ে দিয়েছে। পিঠে লাঠির বাড়ির দাগ—তা হয়তো গায়ের ফতুয়াই খুলল না দাগ বসে না যাওয়া অবধি, তেল মাখবার সময়েও না। কিন্তু কাটা-কানের কি কৈফিয়ত? হেন ক্ষেত্রে কান ঢেকে পাগড়ি পরে থাকত হয়তো বার মাস তিরিশ দিন; রাত্রিবেলা মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ে তবে পাগড়ি খুলত। তেমনি ধারা শয়তান মানুষ আবার কাউকে যদি বাগে পায়, আজ তবে ছেড়ে কথা কইবে না—কানই নেবে কেটে।

শিসটা বড় ঘন ঘন আসছে গো! জোর জোর এখন। মানুষটা বেপরোয়া—পিরীতের মানুষ সাড়া দিচ্ছে না, বেশী রকম উতলা হয়েছে তাই। নদী-খাল বনজঙ্গল কুয়াশায় অন্ধকার। রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত মাছ-মারারা বেহুঁশ হয়ে ঘুমচ্ছে; বউরা পয়সা নিয়ে কেনা-কাটায় বেরিয়ে গেছে। দিন-রাত্রির মধ্যে সব চেয়ে নিরালা এই সকালবেলাটা। সময় বুঝে কেউ রাসলীলার যোগাড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

জগন্নাথ বাঁধ থেকে নেমে পড়ল। আওয়াজের আন্দাজ করে যাচ্ছে। কোন্‌খানে কার কাছে গিয়ে পড়বে, কিছুই জানে না। মানুষটা যে-ই হোক—সেই একদিন ভরদ্বাজকে নিয়ে যেমন হয়ে-

ছিল,—আজকেও তেমনি হাতের সুখ হবে। কিছু বেশীই হবে। যেতে যেতে যেতে অনেক নাবালে একেবারে খালের উপর এসে পড়ল যে! ঠিক ওপারে বাদাবন। আওয়াজের অনেক কাছে এসেছে। অত্যন্ত টিপিটিপি এগুতে হচ্ছে—কাদার মধ্যে পায়ের ওঠানামায় শব্দ না হয়। সতর্ক হয়ে যাবে তা হলে মানুষটা।

একেবারে পিছনটিতে এসেছে, তখন চিনল। চারুবালা। হায় রে হায়, তোমার এই কাণ্ড! দিগন্তজোড়া কুয়াশা পেয়ে আলা থেকে এতদূর এসে প্রেমিকপুরুষ ডাকাডাকি করছ? জগা হাতের মুঠি পাকাল। উঁহু, এখন কিছু নয়—এসে পড়ুক সেই রসিক নাগর, দৌড় কত দূর দেখা যাক। কাদার মধ্যে একেবারে জলের কিনারে হেঁতালের ডাল ধরে আছে চারু। শিস দিচ্ছে, প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে তাই ফিরে। আবার করছে অমনি। হাত কয়েক পিছনে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে জগা। এসে পড়লে যে হয় আহ্বানের মানুষটা। বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরবে। বাঘের গায়ে জোর কতটুকু—তার দুনো জোর তখন জগার হাতে মুষ্টিতে।

শিস দেওয়া ছেড়ে এবারে আর একরকম—কু দিচ্ছে চারুবালা। কু-কু-কু-উ-উ-উ—কোকিলের রবের মত কণ্ঠ ঢেউ খেলে যায়। নোনাজল-ওঠা কুয়াশামগ্ন বাদাবনের ভিতর থেকেও পাল্টা দেখি কোকিল ডেকে উঠল। ভারী মজা চলেছে নির্জন খালের এপারে আর ওপারে। মেয়ে এবার স্পষ্টস্পষ্টি কথাবার্তা শুরু করল বনের সঙ্গে: ও বন, শোন—আমার কথা শোন। ওপার থেকে প্রতিধ্বনি আসছে: শোন—। অতি স্পষ্ট—চারুবালার চেয়েও স্পষ্টতর গলা। ঘাড় দুলিয়ে চারুবালা আরও চেঁচিয়ে বলে, না, শুনব না। তুমি আমার কথা শোন আগে, যা বলি শোন। শোন, শোন—দূর-দূরন্তরে ধ্বনিত হয়। চারু বলে, শোন; বনও বলে, শোন। দু-জনে পাল্লা-পাল্লি। মাঝখানে খাল না থাকলে বোধ করি চুলোচুলি বেধে যেত দুই পক্ষে।

এতক্ষণে জগা বুঝতে পেরেছে। মাথা খারাপ মেয়েটার। রকম-

সকম দেখে অনেক আগেই সেটা বোঝা উচিত ছিল। হৃৎকম্প হচ্ছে জগন্নাথের। বনরাজ্যে একটা খাল এমন-কিছু দুস্তর বাধা নয়—ভাঁটা সরে গিয়ে সেই খাল এখন আরও সরু হয়ে গেছে। চুলোচুলির ভাবনা ভাবছে না, বাঘ আসতে পারে খাল পার হয়ে। মানুষের গলা পেয়ে দূরের কোন ছিটে-জঙ্গলের মধ্যে হয়তো পার হয়ে এসে উঠেছে—সেখান থেকে টিপিটিপি পা ফেলে ঘাড়ের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন কত হয়ে থাকে! পাগলের জায়গা মানষেলার। বাদাবনে যারা আসবে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিচার-বিবেচনা করে প্রতি পায়ে সতর্ক হয়ে চলতে হবে তাদের। মানষেলার মেয়ে বাদায় এসে সঙ্গিনী পাচ্ছে না, বনের সঙ্গে তাই ডেকে ডেকে কথা বলতে খাল-ধারে এসেছে।

গালিগালাজ করা উচিত। কিন্তু খানিক আগে যা কথার খোঁচা খেয়ে এসেছে, চারুকে নাড়তে জগন্নাথের সাহসে কুলায় না। শুধু কথাই বা কেন—মাটিতে ঐ যে অতবার ঝাঁটা ঠুকল, তাই বা তাকে উদ্দেশ করে কি না কে বলবে? বাঘে যদি মুখে করে নিয়ে যায়, ভালই তো—ভরদ্বাজ গেছে, শেষ শত্রু আপসে খতম হয়ে যাক তাদের সাঁইতলা থেকে।

কুয়াশা কেটে হঠাৎ আলো ফুটে উঠল। সূর্য দেখা দিয়েছে। বনের মাথায় রোদের ঝিলিমিলি। কী সর্বনাশ, চারুবালার একেবারে পিছনটিতে জগা—দেখলে যে ক্ষেপে উঠবে দজ্জাল মেয়ে! পা টিপে টিপে পিছিয়ে সে বাঁধে গিয়ে উঠল। খানিকটা বাঁচোয়া এবার। বাঁধের উপর দিয়ে হন-হন করে চলেছে করালীর দিকে। চারুবালার দৃষ্টিতে না পড়ে যায়! কিন্তু হয়ে গেল তাই। তাড়াতাড়ি করতে পা পিছলাল। পড়ে যাচ্ছিল, একটা ডাল ধরে সামলে নিল। মুখ ফেরাল চারুবালা। এক পলক। ঘুরিয়ে নিল মুখ সঙ্গে সঙ্গে। চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থ যেন দেখে ফেলেছে—এমনি অবস্থা জগার। সন্ন্যাসী চোর নয়, সোঁচকায় ঘটায়। কিন্তু কে বুঝবে, যাবেই বা কে বোঝাতে? বলি, বাঁধের পথ তো কারো কেনা-জায়গা নয়—গরজ পড়েছে, তাই

এসেছি এখানে। যা ইচ্ছে ভাবগে, বয়ে গেল।

নতুন-আলার একেবারে গা ঘেঁষে বাঁধ চলে গেছে, সেইখানটা এসে পড়েছে জগা। বাঁধের মাটি তুলে তুলে ভিতর দিকে ডোবা মতন হয়েছে। মতলব করে ঠিক একটা জায়গা থেকেই মাটি তোলে। ক'বছর পরে এই ডোবা পুকুর হয়ে দাঁড়াবে। কলমির দামে এরই মধ্যে জলের আধা-আধি ঢেকে গেছে, কলমিফুল ফুটে আছে। হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে তার ভিতরে। কতগুলো হাঁস রে বাবা! ডোবাটা আলার এলাকার ভিতরে, কিনারা দিয়ে পথ। পিটুলি-গোলায় লক্ষ্মীর পা এঁকেছিল-- খানিকটা তার চিহ্ন রয়েছে। সাদা পায়ের দাগ ফেলে ঐ পথ ধরে লক্ষ্মীঠাকরুন আলাঘরে উঠে বসেছেন— আপদবালাই তাদের দূর করে দিয়ে লক্ষ্মীর বসত। এবং সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীমন্তদের আনাগোনা সেই জায়গায়।

খান দুই-তিন গুঁড়ি ফেলে ডোবার একদিকে ঘাট বানিয়েছে। বিনি-বউ ধুচনি করে চাল ধুতে এল। বেড়ে আছে বড়দা, রাঁধা ভাত খাচ্ছে। রকমারি খাবার মাছ রেখে দেয় রোজ, হাঁসে ডিম পাড়ে, তার উপর এটা-ওটা ফাইফরমাশ করে পচা-বলাইকে—কুমিরমারি থেকে তারা কেনাকাটা করে আনে। ভাত বেড়ে অষ্টব্যঞ্জন চতুর্দিকে সাজিয়ে পিঁড়ি পেতে গগনকে ডাক দেয়, ভাত খেতে এস গো। সামনে বসে 'এটা খাও, ওটা খাও' বলে, দাঁত খোঁচাবার জন্য খড়কে-কাঠি এনে দেয় আঁচাবার সময়। বউ-বোন-শালায় সংসার পাতিয়ে দিব্যি মজায় আছ নতুন-ঘেরি ও খাতার মালিক শ্রীযুক্ত বাবু গগন চন্দ্র দাস।

বত্রিশ

জগা সত্যি সত্যি চলে গেল চৌধুরিগঞ্জের আলায়। অনিরুদ্ধ কালোসোনা এবং আরও যারা আছে—হাঁ করে সবাই তাকিয়ে থাকে। চোখে দেখেও যেন চিনতে পারছে না। এমন আচমকা

এসে পড়া—কোন্ মতলব নিয়ে এসেছে, কে জানে? বসতে বলে না তাকে কেউ। অনিরুদ্ধ তামাক খাচ্ছিল, হাতের কলকেটা অবধি এগিয়ে দিল না। অর্থাৎ সেই যে জাতক্রোধ নৌকো সরানো থেকে, এত দিনেও সেটা কিছুমাত্র নরম হয় নি।

জগাই তখন কৈফিয়তের মত তুটো চারটে কথা খাড়া করে: চলে যাচ্ছি তোমাদের তল্লাট ছেড়ে। তাই ভাবলাম, কে কেমন আছ খবরটা নিয়ে যাই।

ফাঁকা কথা বলেই বোধহয় কানে নিচ্ছে না। আরও তাই বিশদ করে বলতে হয়। উদাসী মন নিয়ে এসেছে, কোনরকম বদ মতলব নেই—ভাল করে শুনিয়ে দিয়ে ওদের নিশ্চিত করবে। বলে, বয়ারখোলা যাচ্ছি, আর আসব না। গগন দাস তো কালকের মানুষ, বাদাবনে এই সেদিন এল। যাবার আগে, বলছিলাম কি, আমাদের পুরানো আড্ডা জমানো যাক কয়েকটা দিন। সেই আমাদের পুরানো সবাইকে নিয়ে।

এতক্ষণে অনিরুদ্ধ মুখ খুলল। জগার দিকে চেয়ে সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করে, বয়ারখোলায় কেন?

যাত্রার দল খুলছে ওরা। খুব ধুমধাড়াক্কা।

কালোসোনা বলে, পাঠশালা খোলে তো ওরা বছর বছর। এবারে যাত্রার ঝোঁক উঠল?

ক্ষেতের ফলন যে তুনো-তেতুনো। মা-লক্ষ্মী ঝাঁপি উপুড় করে ঢেলেছেন। মনে বড্ড সুখ। তাই বলছে, পাঠশালা শুধু ছেলেদের নিয়ে। যাত্রা হলে ছেলে-বুড়ো সবাই গিয়ে বসতে পারবে। বিবেক পাচ্ছে না, আমায় ধরে তাই টানাটানি। আর সত্যিই তো—গাঙে-খালে বার মাস মেছোনৌকো বেয়ে বেড়াবার মানুষ কি আমি? গলাখান শুনেছ তো—বল তোমরা সব। মনে শখ হয়েছিল, তিনটে-চারটে বছর এই সব করা গেল। এ মুলুকে মাছের খাতা ছিল না, পাইকারে মাছমারায় মুখদেখাদেখি হত না—গড়েপিটে দিয়ে গেলাম একটা। বড়দা'র হাতে পয়সা-কড়ি আসছে এখন—রক্তের গন্ধে

ছিনেজোঁকের মত গাঁ-ঘর থেকে কিলবিল করে সব এসে পড়েছে। করে থাক ওরা সগোষ্ঠী মিলে। আমি আর ওর মধ্যে নেই দাদা। ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। যাত্রার মানুষ আমরা হলাম বসন্তের কোকিল। যে বাড়ি মচ্ছব, সেইখানে ডাক আমাদের। নেচে গেয়ে আমোদস্ফূর্তি করে ঘুরব।

কালোসোনা অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, যাচ্ছ কবে এখান থেকে ?

পা বাড়িয়ে আছি, গেলেই হল। কিন্তু যে জন্যে এসেছি শোন। যাবার আগে ক'টা দিন গলাখান মেজেঘষে শান দিয়ে নেব। গানবাজনা একলা মানুষের ব্যাপার নয়। সন্ধ্যের সময় যে যে পার চলে যেও আমার বাড়ি—সাঁইতলার সেই চালাঘরখানায়। পথ তো এইটুকু। আলায় মাছ উঠবার সময় হলে ফিরে আসবে।

অনিরুদ্ধ বলে, আমরা যাব তোমার ওখানে ?

জগা অনুনয় করে বলে, পুরানো রাগ মনে পুষে বেখ না। ন্যায়-অন্যায় যা-কিছু হয়েছে, সব ঐ গগন দাসের জন্য। তোমরা যেমন চৌধুরি-বাবুদের জন্য করে থাক। কাজ করতে এসেছি—হুকুমের নফর। নিজের ইচ্ছেয় কি কিছু করি আমরা ? কাজের গরজে করতে হয়, আমাদের হাত ধরে করিয়ে নেয়। নিজেদের মধ্যে কি জন্যে তবে গরম হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে থাকব ?

বুঝিয়েসুজিয়ে একরকম মিটমাট করে জগা ফিরে এল। সে যেন আপাদবালাই—বিদায় হয়ে গেলেই তল্লাটের মানুষ বাঁচে। লোক-দেখানো ভাবে মুখের কথা ওরা কেউ বলতে পারত, একেবারে চলে যাবে কি জন্যে জগা, এস ফিরে আবার। তা কেউ বলল না—যাওয়ার ব্যবস্থা পাছে সে বাতিল করে দেয় অনুরোধের অজুহাত পেয়ে। চৌধুরিগঞ্জ শত্রুপক্ষ, তাদের কথা থাক—কিন্তু নতুন-আলায় গগনের দলবলই বা কী ! কাজকর্ম দিব্যি চালু হয়ে গেছে, বলাই-পচা মেছোডিঙি নিয়ে নির্গোলে কুমিরমারি যাচ্ছে, আর জগাকে কোন্ দরকার ? একটা মানুষ চালাঘরে একলা পড়ে পড়ে

গজরায়, সে কথা মনে রাখার গরজ নেই এখন ওদের।

সেইটেই বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার বাঞ্ছা। চালাঘরের মধ্যে ভিন্ন একটা দল হয়ে ঢোল পিটিয়ে গান গেয়ে জানান দেওয়া যে আমরাও আছি অনেক জন—তোমরা সমস্ত নও। তোমাদের বড় বাইন হয়েছে বলাই, আর বড় গায়েন বোধ করি গগন দাস নিজে। ওই তো মজাদার গান হয়ে থাকে—আর কান পেতে একটুখানি আমাদের গানও শুনো।

চৌধুরিগঞ্জ থেকে ফিরে করালী পার হয়ে একবার বরাপোতার দিকে যেতে হল। মানুষজন এসে জুটবে, পান-সুপারি চাই। তামাক বড়-তামাক দুটোরই ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর কিছু ছাঁচ-বাতাসা আনলেও মন্দ হয় না, আড্ডা ভাঙার পর হরির লুঠের নামে আরও কিছু হুল্লোড় করা যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। জগা ফিরে আসছে বরাপোতা থেকে। খালের ঘাটে ডিঙি। ফিরেছে তবে পচা-বলাই। গাঙে গোন পেয়েছে, পিঠেন বাতাস—তাই এত সকাল সকাল ফিরল। আলায় ঢুকে মালিক গগন দাসের সঙ্গে হিসাবপত্র মেটাচ্ছে। ফিরে এসে নৌকো ধোবে এখনই। ভাল হয়েছে, পচা-বলাই আলা থেকে বেরোক, ধরবে তাদের। ধরে সোজাসুজি বলবে, আজকের আড্ডা নতুন-আলায় নয়, সাঁইতলার পাড়ার মধ্যে—নিজেদের চালাঘরে। গাওনা-বাজনা সেখানে আজ। চৌধুরিগঞ্জ থেকে ওরা সব আসবে—ঘরের মানুষ তোমরা থাকবে না, সেটা কোন মতে হতে পারে না।

বাঁধের ধারে ঝোপের একটু আড়াল হয়ে সে দাঁড়াল। আচমকা বেরিয়ে অবাক করে দেবে। আলার কাজ সেরে পচা-বলাই বাঁধে এসে পড়ল। দু-হাতে দুটো কলসি প্রতি জনের। কলসি নিয়ে চলল কোথা এখন এই অবেলায়?

খালে নেমে যাচ্ছে। জগা ডাকল, বলাই!

বলাই থমকে দাঁড়াল।

নৌকোয় আবার বেরোবি নাকি ? এই তো ফিরে এলি।

মুখ কাঁচুমাচু করে বলাই বলে, আলার মিঠে জল ফুরিয়ে গেছে। একেবারে নেই। রাত্তিরে খাবার মতও নেই। না এনে দিলে নয়। ঘুরে আসি বরাপোতার পার থেকে। কতক্ষণ আর লাগবে!

আবার বলে, কুমিরমারি থেকে খালি ডিঙি বেয়ে আনলাম। সকালে যদি বলে দিত, টিউকলের জল ধরে আনতাম ওখান থেকে। যত কলসি খুশি। এই ভোগ ভুগতে হত না।

জগা বলে, চার কলসি নিয়ে চললি—এত জল কে খাবে ? সান্নি-পাতের তেষ্টা কার পেল রে ?

পচা বলে, রান্নাবান্না করবে—

চানও করবে নাকি ? বাদাবনে এত নবাবি কার—চারি ঠাকরুনের ?

বলাই বলে, কলসি-মাপা জল—চান করে আর কেমন করে ? চানটান সেরে এসে কলসির জলে গামছা ভিজিয়ে ননদ-ভাজে তার পরে গা-হাত-পা মুছে নেয়, গায়ে ঢালে এক ঘটি দু-ঘটি। নয় তো নোনা জলে ওদের গা চটচট করে।

জগা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, মরেছিস তোরা হতভাগা। একেবারে গোল্লায় গেছিস।

বলাই বলে, অভ্যেস নেই, কি করবে ? গায়ে নাকি কী সব উঠেছে নুনে জরে গিয়ে। অভ্যেস হয়ে গেলে তখন আর মিঠে-জল লাগবে না।

মরদ হয়ে মেয়েমানুষের নাওয়ার জল বয়ে বেড়াস, মুখ দেখাচ্ছিস কেমন করে তোরা ?

বলাই মুষড়ে যায়, মুখ নীচু করে। পচার কিন্তু কিছুমাত্র লজ্জা নেই। গালি শুনে দাঁত মেলে হাসে। কী যেন মহৎ কর্ম করেছে, পরমানন্দে তার যশোকীর্তন শুনছে।

বলাইকে ধরে ফেলল গিয়ে জগা। কঠিন মুষ্টিতে হাত চেপে ধরেছে। বলে, কলসি রাখ। মানুষজন আসছে আজ আমাদের ঘরে।

চৌধুরিআলা থেকেও আসবে। তোর এখন কোথাও যাওয়া হবে না। যায় পচা একলা চলে যাক।

বলাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে—হাঁ-না কিছু রা কাড়ে না। জগন্নাথ গর্জন করে বলে, ফেলে দে কলসি। ভালর তরে বলছি।

একটা কলসি কেড়ে নিয়ে রাগের বশে সত্যি সত্যি ছুঁড়ে দিল। চুরমার হয়ে গেল। পচা চেঁচিয়ে ওঠে, আচ্ছা মানুষ তো! কলসি ভেঙে দিলে, কদ্দূর থেকে যোগাড় করে আনতে হয় জান?

হাত ছেড়ে দিয়ে জগা বলাইকে বলে, আসবি নে?

পচা ইতিমধ্যে ডিঙিতে উঠে পড়েছে। পিছন ফিরে বলাই একবার তার দিকে তাকায়।

জগা বলে, জবাব দে বলাই।

বলাই বলে, ফিরে এসে তার পরে যাব। এক্ষুনি ফিরব, বেশী দেরি হবে না।

মরগে যা—

নাগালের মধ্যে পেলে জগা গলাধাক্কা দিত হয়তো। কিন্তু বলাইও ডিঙির উপরে তখন।

কাউকে দরকার নেই। ভারী তো কাজ! এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে একটা ছুটো হোগলার পাটি কিম্বা মাদুর চেয়ে এনে পেতে দেওয়া। না দিলেও ক্ষতি নেই, মাটিতে সব বসে পড়বে।

চৌধুরিগঞ্জ থেকে অনিরুদ্ধ এল তিন-চার জনকে সঙ্গে নিয়ে। একেবারে পাড়ার ভিতর জগার ঘরে জমায়েত—সাঁইতলার ও আশপাশের মাছমারারা সব এল। রাত গভীর হলে এইখান থেকে জালের কাজে বেরুবে। ছোট চালাঘরে জায়গা দিতে পারে না। খুব চলল। এখানে বসে যা মুখে আসে বলতে পারে. যে গান খুশি গাইতে পারে। শাসন-বাঁধন নেই—উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া। আড্ডার মাঝখানে উঠে একবার জগা চুপিচুপি বাঁধের উপরে ঘুরে দেখে আসে। নতুন-আলায় সাড়াশব্দ নেই, মিটমিট করে আলো জ্বলছে একটা। খালের ঘাটে ডিঙি—পচা-বলাই

অতএব ফিরে এসেছে। কিন্তু অন্য দিনের মত নাম-কীর্তন নয়, ভক্ত কটিকে নিয়ে গগন দাস আজকে বোধহয় ধ্যানে বসে গেছে।

আসর ভাঙার মুখে জাঁকিয়ে হরিধ্বনি। একবার তুবার নয়, বারবার। শ্মশানে মড়া নিয়ে যাবার সময় হরিবোল দিতে দিতে যায়, এই চিৎকার তারও চেয়ে ভয়ানক। তার সঙ্গে ঢপাঢপ ঢোলের বেতালা পিটুনি। জগাই বাজাচ্ছে। ছাউনির চামড়া না ছেঁড়ে পিটুনির ঠেলায়। সমস্ত মিলিয়ে জঙ্গলের প্রান্তে একটা তোলপাড় কাণ্ড। লোকজন বিদায় করে জগন্নাথ অনেক দিন পরে আজ মনের সুখে অঘোর ঘুম ঘুমাল।

পরের দিন জগা অনেক বেলায় উঠল। নতুন-আলার আসর কাল একেবারে বন্ধ গেছে—ঘুম থেকে জেগে উঠেও সেই আনন্দ। সকালবেলা ওদিককার গতিকটা কি দেখবার জন্য বাঁধে এসেছে। নিতান্তই প্রাতর্ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে, এমনি একটা ভাব। কোটালের কূলপ্লাবী জোয়ার। খাল ছাপিয়ে পাড়ের গাছগাছালি ডুবিয়ে দিয়ে বাঁধের গায়ে জল ছলাৎ-ছলাৎ করছে।

কাত হয়ে-পড়া একটা বড় বানগাছের গুঁড়ি জলে ডুবে গেছে। চার-পাঁচটা ডাল বেরিয়েছে চতুর্দিকে। ডালেরও গোড়ার দিকটায় জল। জগার নজর পড়ল সেখানে। কে মানুষটা দিব্যি ডাল ঠেসান দিয়ে বসে আছে কোমর অবধি জলে ডুবিয়ে? আবার কে—সেই নবাবনন্দিনীর চানে আসা হয়েছে, যার নাম চারুবালা। আলার ডোবায় কাদা-পচা জল—সে জল শ্রীঅঙ্গে লাগানো চলে না। আবার শোনা যায়, বিয়ে হতে না হতে পতিটি শেষ করে বিধবা হয়ে আছেন উনি। বিধবার এত বাহার! কেন যে এসব বাহারের মানুষ বাদাবনে আসে! দালান-কোঠায় বাক্সবন্দি হয়ে থাকলেই পারে, গায়ের চামড়ায় মরচে ধরার যাতে শঙ্কা নেই।

চারুবালার বড় পছন্দের জায়গা। জল ভেঙে এসে এই গাছের ডালে চড়ে বসেছে। হাতে ঘটি। স্রোতের জলে ঘটি ভরে ভরে গায়ে ঢালছে। ঘটি কখনো বা ডালের ফাঁকে গুঁজে রেখে গামছা ভরে

ভরে গায়ে দেয়। তালপাতার অন্তরালে লোকের হঠাৎ চোখ পড়ে না—আব্রু রেখে স্নান হয়। বলাইয়ের আনা কলসি-ভরা মিঠে-জল—বাড়ি ফিরে সেই জলে গায়ের নোনা ধুয়ে ফেলবে। কিন্তু আরও এক মেয়েলোক আছে—গগনের বউ। তার এত শখ নেই। ভয়ডর আছে বউটার, এমন ডাংপিঠে নয়।

জল বাড়ছে, কল-কল বেগে স্রোত এসে ঢুকছে। কোমর পর্যন্ত জলতলে ছিল, দেখতে দেখতে বুক অবধি ডুবে গেল। স্ফূর্তি চারুবালার বেড়ে যাচ্ছে ততই। ডাল ধরে পা দাপাচ্ছে। গাঁয়ের পুকুরে বুঝি সাঁতার কাটত। সুতীব্র স্রোতের মধ্যে ততখানি আর সাহস হয় না, দাপাদাপি করে সাঁতারের সুখ করে নিচ্ছে খানিকটা। গুনগুন করে গানও ধরেছে বুঝি।

আপন মনে ছিল চারুবালা। বাঁধের দিক দিয়ে হঠাৎ বাঘ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বুঝি। এসে কামড়ে ধরে উল্টো এক লাফ। এক লাফে ডাঙার উপর। তখন ঠাহর করে দেখে—কামড়ে ধরে নি, দুই বাহু দিয়ে ধরেছে জাপটে। বাঘও নয়, জগা। ছি-ছি, কী লজ্জা! চান করার মধ্যে কী অবস্থায় আনল টেনে! টেনে এনে বাঁধের উপর ফেলল। চারু কিল দিচ্ছে দমাদম জগার বুকের উপর, ঘুষি মারছে পাগলের মত হয়ে। জগাও কি ছাড়বার পাত্র—সজোরে চারুর মুখ ঘুরিয়ে ধরল যে ডালে বসে চান করছিল সেই দিকে: নয়ন তুলে দেখ একবার শ্রীমতী, কী কাণ্ড হয়ে যেত এতক্ষণে!

স্রোতের উপর ভয়াল আবর্ত তুলে কুমীর ভেসে উঠেছে ডালের ভিতরে।

দেখছ? এটা হল বাদাবন। গাঙ-খাল মেয়েমানষের সুখ করে সাঁতারের জায়গা নয়। শিকার তাক করে অনেক দূর থেকে কুমির ডুব দেয়। জলের নীচে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে এসে ভেসে উঠবে ঠিক তার সেই তাক-করা জায়গায়। আমি দেখেছিলাম তাই। এতক্ষণে, নয় তো, কুমীরের মুখে কাঁহা-কাঁহা মুলুক যেতে হত।

প্রাণ বাঁচিয়ে দিল, চারুবালা হতভম্ব হয়ে গেছে। ক্ষণপরে সামলে

নিয়ে করকর করে উঠল ঃ তা মরতাম আমি—মরে যেতাম। তোমার কি ? তুমি কেন তক্কেতক্কে থাকবে ? যেদিকে যাই, তুমি ঘুরঘুর করতে থাক। কানা বুঝি আমি—দেখতে পাই নে ?

জগা বলে, ভুল হয়েছে আমার। বাঁধে টেনে না এনে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলে ঠিক হত। আপদের শান্তি হত, সাঁইতলা জুড়োত, বাদার মানুষ মনের সুখে কাজকর্মে লাগতে পারত।

গজর-গজর করতে করতে যাচ্ছে জগা। নিমকহারাম মেয়ে-মানুষ। কলিকাল কিনা—ভাল করলে মন্দ হয়, গোসাঁই পূজলে কুড়ি হয়। বাগে পেলে আলটপকা যার মুণ্ডুটা কাঁধের উপর থেকে ছিঁড়ে নেবে, সেই মানুষের পিছন পিছন ঘোরে নাকি জগা! পচা-বলাই শুনতে পেলে কত না হাসাহাসি করবে কলঙ্কের কথা নিয়ে!

আশ্চর্য ব্যাপার, উঠানের উপর বড়দা। প্রথমটা মনে হয়েছিল গুণময়ী ভগিনী কিছু লাগানি-ভাঙানি করেছে, তেড়ে এসেছে ঝগড়া করবার জন্য। জগা তৈরি আছে ষোলআনার উপর আঠারআনা। অনেক দিন ধরে জমে জমে মনের আক্রোশ বিষের মত ফেনিয়ে কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছে। দাওয়া থেকে উঁকি মেরে দেখে জগা খাতির করে ডাকে ঃ এস এস—কী ভাগ্যি, নতুন ঘেরির খুদ মালিক গগনবাবু আজ বাড়ির উপর এসেছেন!

পরিহাস গগন কানে নেয় না। চারুবালার ব্যাপারও কিছু নয়। বলে, নৌকোর কাজ একেবারে ছাড়লে জগন্নাথ ? ঘর থেকে তো নড়ে বস না।

জগা বলে, কাজ তা বলে আটকে নেই। অন্যেরা কাজ শিখে গেছে। কুমিরমারির গঞ্জে মাছের ঝোড়া নামিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে আসে, টাকা বাজিয়ে তুমি হাতবাক্সে তুলছ। কাজকর্ম তো দিব্যি চলেছে।

গগন বলে, সে যাই হোক, তিনটে-চারটে দিন তুমি ঠেকিয়ে দেবে জগা। মেছোডিঙি কাল সকালে তুমি নিয়ে যাবে।

কেন, পচা-বলাই গেল কোথা ? মরে গেছে ?

বলাই আছে। পচা আর আমার শালা নগেনশশী বরাপোতার হাটুরে-নৌকোয় রওনা হল গাইগরু কিনতে। গোয়াল হল, গরু তো চাই এবারে। পচা হাঁটিয়ে নিয়ে আসবে গরু, কবে ফেরে ঠিক-ঠিকানা নেই।

জগা এক কথায় কেটে দেয়ঃ আমি পারব না। অন্য মানুষ দেখ।

গগন বলে, মানুষ একজন হলেই তো হল না। কোটালের টান—জলে কুটোগাছটা ফেললে ভেঙে দুই খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। যে সে মানুষ পারবে কেন এই টান কাটিয়ে নৌকো ঠিক মত নিয়ে যেতে।

অনুনয় করে আবার বলে, তোমার পাওনাগণ্ডা পুষিয়ে দেব জগা। একেবারে হাত-পা কোলে করে বসলে হবে কেন ? নিত্যি দিন না পার, দায়ে-বেদায়ে দেখতে হবে বই কি ! না দেখলে যাই কার কাছে ? ধর, তোমার উয্যুগেই তো সমস্ত।

জগা হেসে ওঠেঃ গরু কিনতে গেছে, সে গরুর দুধ খাওয়াবে আমায় এক ছটাক ?

হাসতে হাসতে বলছিল। বলতে বলতে স্বর কঠিন হলঃ উয্যুগের কথা তুললে—যখন ছিল, তখন ছিল। পুরানো সেসব দিন মনে রাখ তুমি বড়দা ?

রাখি নে ?

না। ছাড়াছাড়ি পুরোপুরি হয়ে গেছে। আজকে দায়ে পড়ে তোমার আসতে হয়েছে।

বলে জগা কথার মধ্যেই প্রশ্ন করে, কাল গান শুনলে কেমন বড়দা ? দুই দল হয়ে গেল আমাদের। আমার একটা, তোমার একটা।

গগন বলে, দল দুটো হোকগে, কিন্তু আমার কোন দল নয়। আমি তোমার দলে জগা।

চারিদিক তাকিয়ে দেখে গগন মনের কথা ব্যক্ত করে : তোমাদের পাড়া বলে কেন, কোনখানেই যাই নে। দেখেছ কোনদিন আলার

বাইরে? আমি মরে আছি জগন্নাথ। বেরুতে পারি নে ঐ নগেন শালার জন্যে। 'বিষম খচ্চর। দিবারাত্রি চোখ ঘুরিয়ে পাহারা দেয়। খোঁড়া মানুষ নিজে বেশী দৌড়ঝাঁপ করতে পারে না, অন্যে করলে হিংসে হয়। কী জানি, তোমায় সে একেবারে পয়লা নম্বরের শত্রু ঠিক করে বসে আছে। নগনা নেই বলেই আজ তোমার কাছে আসতে পারলাম।

জগা বলে, সে জানি। আমি শত্তুর সকলেরই। তোমার বোনটাও বড় কম যায় না। তাই তো ভাবি বড়দা, কত কষ্টের জমানো আড্ডা—সে দিকে এখন চোখ তুলে তাকাবার উপায় নেই। এ জায়গায় পোকা ধরে গেছে—থাকব না এখানে। মন ঠিক করে ফেলেছি। তোমরা থাক পয়সাকড়ি আর সংসারধর্ম নিয়ে।

গগন বলে, তা আমায় দুষছ কি জন্যে? আমি কি ওদের আনতে গিয়েছি। জান তো সবই। আসবার আগে মুখের কথাটা আমার জিজ্ঞাসা করেছিল?

কিন্তু তোমায় দিব্যি তো তেল-চুকচুকে দেখাচ্ছে। মুখের বচনের সঙ্গে চেহারায় মিলছে না। খুব যে দুঃখের পাথারে ভাসছ, চেহারা দেখে মনে হয় না বড়দা।

গগন বলে, বেটা তো মার খেতে পারে--আরে, ধরে মারে তবে উপায়টা কি? শুধু নগনা কেন, নগনার বোনটাও চোখে তুলে নাচায়। চানের আগে আচ্ছা করে তেল রগড়াতে হবে, নয়তো ছাড়ে না। খাওয়ার সময় সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও—করবে। খাওয়া না হতে তামাক সেজে নিয়ে আসবে চারি। খেয়ে তার পরেই বিছানায় গড়ানো। শোওয়ার পরে দেখে দেখে যায় ঠিকমত ঘুমুচ্ছি কিনা। দেহে তেল না চুঁইয়ে যায় কোথা বল?

জগাও এমনি ভাবছে। নগনার বোনকে সে ভাল জানে না, কিন্তু গগনের বোনকে জেনেবুঝে ফেলেছে। গাই-বকনা কিনে এনে নতুন গোয়ালে ঢোকাবে। বাদারাজ্যের দুর্দান্ত মানুষগুলোকে মেয়েটা ইতিমধ্যেই জাবনা খাইয়ে শিষ্টশান্ত করে গলায় দড়ি পরিয়ে

টান জুড়ে দিয়েছে।

বেলা ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার। কথা বলতে বলতে গগন আর জগা বাঁধের উপরে এল। ভাঁটা এখন। কলকল স্বনে উচ্ছল আবর্তে জলধারা দূর সমুদ্রে ধেয়ে চলেছে। তারা-ভরা আকাশ, তারার আলো চিকচিক করছে জলে। মাটিতে নেমে-আসা মেঘের মত ওপারের ঘন কালো বাদাবন। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে জগার মনটা পিছনের কালে ঘুরে বেড়ায়। এই যেখানটায় ঘুরছে, এখানেও তো বন ছিল আগে। আস্তে আস্তে বসতির পত্তন হচ্ছে—জনালয় একটু একটু করে হাত বাড়িয়ে বনরাজ্য মুঠির মধ্যে চেপে ধরছে। এখানকার লীলাখেলার ইতি। নতুন চালা বাঁধতে হবে ভাঁটি ধরে আবার কোন নতুন জায়গা খুঁজেপেতে নিয়ে! সেই ফাঁকা বাদার মধ্যে হৈ-হল্লায় আবার কিছুদিন কাটাবে ঘরগৃহস্থালির বিষ-নজর যতক্ষণ সেই অবধি না গিয়ে পড়ছে।

তেত্রিশ

কুমিরমারির হাট সেদিন। মেছোডিঙি ঘাটে বেঁধে বোঠে রেখে জগা নেমে পড়ল। বলাই ভয়ে ভয়ে একবার বলেছিল, দাঁড়াও ভাই একটু। মাছগুলো উঠে যাক।

আমার কি দায় পড়েছে?

ভ্রূক্ষেপ না করে ভিড়ের মধ্যে চক্ষের পলকে সে অদৃশ্য। জগন্নাথ নিতান্ত পর-অপর এখন। গগনের খাতিরে ডিঙিটা বেয়ে এনে দিল, ডিঙি পৌঁছে গেছে—ব্যস, ছুটি। দু-জন ব্যাপারী এসেছে ঐ ডিঙিতে—তাদের সঙ্গে ধরাধরি করে বলাই মাছের ঝোড়াগুলো পাইকারী-বাজারে তুলে ডাক ধরিয়ে দিল। সমস্ত বলাইর ব্যবস্থা। কাজকর্ম সে সম্পূর্ণ শিখে গেছে।

বিকালবেলা হাট পাতলা হয়ে গেল। নানা অঞ্চলের নৌকো এসে জমেছিল, বেচাকেনা সেরে একে দুয়ে সব কাছি খুলে দেয়।

ঘাটের জল দেখবার জো ছিল না, আস্তে আস্তে আবার ফাঁকা হয়ে আসে। জগা সেই যে ডুব দিয়েছে—ফেরার সময় হয়ে এল, এখনো তার দেখা নেই। খুঁজে খুঁজে বলাই হয়রান। কোথায় গিয়ে পড়ে আছে—হোটেলের ভাত না-ই হোক, মুড়ি-মুড়কি জলযোগ করতেও তো একটিবার দেখা দেবে মানুষটা!

জগা তখন ছই দেওয়া বড় এক হাটুরে নৌকোর ভিতরে। নৌকো ছাড়ো-ছাড়ো। যারা গাঙে-খালে ঘোরে, জগাকে চেনে তারা মোটামুটি সবাই। মাঝি বলে, এ নৌকোয় উঠলে কেন তুমি? আমরা মোটে একটুখানি পথ যাব—বয়ারখোলা।

জগা বলে, এই যাঃ। বয়ারখোলার নৌকোয় উঠে বসেছি?

তুমি কি ভাবলে বল দিকি?

জগা দাঁত বের করে হাসেঃ যাব সাঁইতলা। চৌধুরিগঞ্জ হোক বরাপোতা হোক—ঐদিককার একখানা হলে চলে।

মাঝি বলে, জলের পোকা হলে তুমি। তোমার এমনিধারা ভুল!

হল তো দেখছি। তামাক খাওয়াও দিকি, ও বোঠেওয়ালা ভাই।

মাঝি বলে, তামাক খাবে কী এখন! গোন বয়ে যাচ্ছে, নৌকো ছাড়ব। নেমে যাও তুমি তাড়াতাড়ি।

জগন্নাথ বলে, যা কাদা! উঠে যখন বসেছি, নেমে কাদায় পড়তে ইচ্ছে যাচ্ছে না। একেবারে বয়ারখোলা গিয়েই নামা যাবে।

মাঝি বুঝে ফেলে এইবারে হেসে উঠলঃ বুঝলাম, বয়ারখোলাতেই যাবে তুমি। মতলব করে উঠেছ। মস্করা না করে গোড়ায় সেইটে বললে হত। নাও, বোঠে ধরে বসোগে। শিশুবর, জগার হাতে বোঠে দিয়ে জুত করে তুমি কলকে ধরাও।

হাটুরে-নৌকোর নিয়ম হল, উটকো যাত্রী টাকাপয়সায় ভাড়া দেবে না, গতরে খেটে দেবে। জগন্নাথ হেন পাকা লোক নৌকোয়, তাকে না খাটিয়ে ছাড়বে কেন?

বয়ারখোলার নৌকোয় জগন্নাথ বোঠে বেয়ে চলেছে। আর

বলাই ওদিকে সমস্ত হাট পাতিপাতি করে খুঁজছে তাকে। যাকে পায় জিজ্ঞাসা করে, জগা গেল কোন্ দিকে, জগাকে দেখেছ? কটা দিন জগা নৌকোয় আসে নি, শুয়েবসে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে। নতুন ছাঁটের গরুর মত জোয়াল আর কাঁধে রাখতে চায় না—ফাঁকে ফাঁকে ঘুরছে। ব্যস্ত হচ্ছে বলাই—আর দেরি করলে সাঁইতলা রাতের ভিতরেই পৌঁছনো যাবে কিনা সন্দেহ। মেছোডিঙি নিয়ে তো আসতে হবে আবার সকালবেলা!

বয়ারখোলায় নেমে জগন্নাথ সোজা পাঠশালা-ঘরের দিকে চলল, গগন দাস একদা যেখানে গুরু হয়ে বসেছিল। গাঁয়ের মধ্যে ঐ একটা বাড়ি শুধু চেনা, ঐখানে এসে সে গগনের সঙ্গে আড্ডা জমাত। চেনা ছিল তখন গগন ছাড়া আরও একজন মানুষ—তৈলক্ষ।

কী কাণ্ড! আলপথে চলার উপায় নেই। হলুদবরণ ধানগাছ ফসলের ভারে ঢলে পড়েছে দু-পাশ থেকে। পায়ে পায়ে ধান ঝরে পড়ে। ধানের ঘষায় পায়ের গোছার উপর খড়ির মতন ছাপ এঁকে যায়। অঘ্রান শেষ হয়ে যায়, এখনো কেটে তোলে নি ক্ষেতের ধান?

কত আর তুলতে পারে বল। খাটছে সকাল থেকে রাত দেড় পহর দু-পহর অবধি। দিনেমানে ধান কেটে এনে খোলাটের উপর ফেলে, রাতে মলন মলে। লক্ষ্মীঠাকরুন এত দিয়েছেন যে ধান তোলার খোলাটই খুঁজে পায় না। যেখানে যেটুকু উঁচু চৌরস জায়গা, লেপে-পুঁছে সেখানে খোলাট বানিয়ে নিয়েছে। পাঠশালা-ঘরের উঠানও দেখ পালায় পালায় ভরতি।

ডোবার ঘাটে গাছের গুঁড়িতে ঘষে ঘষে পা ধুয়ে হাতের চটি-জোড়া পায়ে পরে জগা এবার ভদ্র হল। তাইতে আরও গোলমাল। ক্ষিপ্ত হয়ে এক ছোঁড়া চেঁচিয়ে উঠলে, বড় যে জুতোর দেমাক। মা-লক্ষ্মীর ধান মাড়িয়ে চলেছ—খোল জুতো বলছি।

দাওয়ার উপরে তৈলক্ষ। সেখান থেকে জিজ্ঞাসা করে, কাকে

বলিস রে সূদন?

চিনি নে। ম্যাচ-ম্যাচ করে আসছে ধানের উপর দিয়ে।

তৈলক্ষ বলে, কে হে তুমি? জুতো পরে ধানের উপর দিয়ে আসতে নেই। ঠাকরুনের গোসা হয়।

চটি খুলে জগা আবার হাতে নিল। ঐখান থেকে চেঁচায়: আমায় চিনতে পারলে না তৈলক্ষ মোড়ল? সেই কত আসতাম! গগন গুরুকে আমিই তো জুটিয়ে দিয়েছিলাম।

তৈলক্ষ তড়াক করে উঠে পৈঠা অবধি নেমে এসে খাতির করে: এস এস জগন্নাথ। এদ্দিনে সময় হল? বলি, পাকাপাকি এলে তো? না, এসেই অমনি পালাই-পালাই করবে?

পাকা ছড়াদারের মত কথা বলে জগা: যাত্রার দলও কি পাকাপাকি তোমাদের? যতক্ষণ দিনমান, ততক্ষণ কমল দল মেলে আছে। রাত্তির হলে আর নেই। তোমাদের যাত্রাও গোলায় ধান যতদিন। ধান ফুরোবে, দলও যাবে। পাঠশালা নিয়ে যে ব্যাপার হত। সমস্ত ছেড়েছুড়ে হাত-পা ধুয়ে উঠে আসব তোমাদের এখানে, দল গেলে আমার তখন কি গতি বল?

চিনতে পেরে তৈলক্ষের বড় ছেলে সূদনও উঠে এসেছে দাওয়ায়। কল্কেয় তামাক সেজে গেঁয়োকাঠের কয়লা ধরাচ্ছে টেমির উপর ধরে। বলে, খাটতে পারলে ভাতের অভাব! গুরুমশায়ের কাছে যখন আসতে, ধানের ভরা নিয়ে হাটে হাটে ঘোরা ছিল তোমার কাজ। দল উঠে যাক কি যাচ্ছেতাই হোক গে, গাঙ-খাল তো শুকিয়ে যাবে না! নতুন রাস্তাপথে এরই মধ্যে গরুরগাড়ির চল হয়েছে। তোমার মতন লোকের কি ভাবনা?

তামাক টানতে টানতে তৈলক্ষকে জগা বলে, ক্ষেতখামার দেখতে দেখতে এলাম। চোখ জুড়িয়ে গেল। কিন্তু পাঠশালা বাতিল করলে কেন বল তো মোড়ল? নামডাক হয়েছিল বয়ারখোলার পাঠশালার। রাজী থাক তো বল—সেই গগন গুরুকে খবর দিয়ে দিই। এখন সে ঘেরিদার—টাকাপয়সা করছে, কিন্তু সুখ নেই।

খবর দিলে পালিয়ে এসে পড়বে। ফাটক-পালানো কয়েদীর মত।

তৈলক্ষ বলে, গোড়ায় আমাদের পাঠশালার কথাই হয়েছিল। গুরুর চেষ্টায় দু-এক হাট ঘোরাঘুরিও করেছিলাম। তারপরে মাত-ব্বরদের মন ঘুরে গেল : খরচপত্তোর দু-পয়সার জায়গায় চার পয়সা হলেও অসুবিধা হবে না—যাত্রার দল হোক এবারটা।

জগা বলে, যাত্রা আর পাঠশালা দু-রকমই তো হতে পারে।

তৈলক্ষ ঘাড় নেড়ে বলে, ওইটি বলো না। যাত্রার দলে ছেলেপুলেরও অনেক কাজ। জুড়ির দল—মুখোড়ে আটটা করে ধরলে চার সারিতে আট গণ্ডা। তার উপরে রাজকন্যা সখী কেষ্ট-রাধা গোপিনী—সবই তো ছেলেপুলের ব্যাপার। তারা পাঠশালায় বসে সকাল-বিকাল ক-ব-ঠ করতে লাগল তো পেরাক্ত সামলায় কে? লেখাপড়া আর পালাগান উল্টো রকম কাজকর্ম—দুটো এক সঙ্গে হয় না।

আবার নিজেই বলছে, পুরোপুরি উল্টো—তাই বা বলি কেমন করে? পাঠ পড়তেও পড়াশুনো লাগে। মোশান-মাস্টার কাঁহাতক পড়িয়ে পড়িয়ে দেবে, শুধু একজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে দল চলে না। তা এবারটা যাত্রা হল। দেখা যাক, কী রকম দাঁড়ায়। আয়েন্দা সনে আবার নয় একটু পাঠশালা করে নেওয়া যাবে।

জগাকে বলে, দরাজ গলাখানা তোমার। এক একটা গানে আসর ফেটে চৌচির হবে। বিবেক নিয়ে ভাবনা ছিল, মা বীণা-পাণি সুবুদ্ধি দিয়ে তোমায় হাজির করে দিলেন।

প্রশংসার কথায় জগা চুপ করে আছে।

তৈলক্ষ বলে, কি ভাবছ? ভাবনার কিছু নেই। জবর মাস্টার যোগাড় হয়েছে। সবাই তো নতুন। সকলের সঙ্গে তুমিও শিখে পড়ে নিও। ঠিক হয়ে যাবে।

জগার অভিমানে আঘাত লাগে : আমায় কাঁচা-লোক ঠাওরালে নাকি তৈলক্ষ মোড়ল? যাত্রার নামে ঘর ছেড়ে বেরুই—কতটুকু বয়স তখন! বিবেকই তো কত জায়গায় কতবার করেছি! মেডেল

আছে, আটঘরার রসিক রায় দিয়েছিল। বিষম খুঁতখুঁতে মানুষ —তার হাত থেকে মেডেল জিনে নিয়েছি আমি। চাট্টিখানি কথা নয়।

পরনে গেরুয়ারঙের আলখাল্লা, কপালে সিঁদুর আর চন্দন, গলায় এক বোঝা কড় রুদ্রাক্ষ আর কাঠের মালা-- এই হল বিবেকের সজ্জা। একটো নয়, কথাবার্তা একটিও বলে না, গান শুধুমাত্র। শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্য থেকে সম্রাটের শুদ্ধান্তঃপুর—বিবেকের গতি সর্বত্র। চক্ষের পলকে কোন্ কৌশলে পৌঁছে যাচ্ছে, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। মানুষজন যাত্রার আসরে বসে এই সব আজেবাজে বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাইরের দেশদেশান্তর শুধু নয়, মনের অন্ধিসন্ধিতেও বিবেকের অবাধ ঘোরাঘুরি। কোন্ লোক মনে মনে কি ভাবছে, সে তা সঠিক জানতে পারে। অত্যাচারীকে সাবধান-বাণী শোনায়, বেদনায় মুহ্যমান বিরহিণীকে প্রিয়-মিলনের ভরসা দেয়, দুঃখে ভেঙে-পড়া মানুষকে আশার বাণী বলে। যাত্রার দলে ভারী খাতির বিবেকের। আসর মুকিয়ে থাকে— যখন বড্ড সঙ্গিন অবস্থা, বুঝতে পারে এইবারে এসে পড়বে বিবেক। দুঃখ-বেদনায় মানুষ আর নিশ্বাস নিতে পারছে না—ঠিক সেই চরমক্ষণে দেখা গেল, আধ-খাওয়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটেছে বিবেক আসর পানে। আধা-পথেই গান ধরেছে—

তিষ্ঠ তিষ্ঠ ওরে দুষ্ট, (ও তোর) ইতো নষ্ট ততো ভ্রষ্ট,
ঘটিবে অনিষ্ট ঘোর, বুঝিবি কি মহা কষ্ট--

আসর জুড়ে বাহবা-বাহবা রব। উল্লাসে শ্রোতারা ফেটে পড়ছে। রক্ষে পেয়ে গেল এতক্ষণে। পাপের ক্ষয়, পুণ্যের জয়— আর কোন সংশয় নেই বিবেকের এই গানের কথার পরে। পুণ্যবান নায়কের মুণ্ড দুই খণ্ড হয়ে গেলেও শেষ অঙ্কে নির্ঘাৎ সে বেঁচে উঠবে। ঝোঁকের মাথায় বিবেকের নামে মেডেলই বা হেঁকে বসল মুরুব্বীদের কেউ।

এ হেন বিবেকের পাঠ আবার এসে যাচ্ছে। মানিক হাতের মুঠোয় পেয়ে ছাড়ে কেউ কখনো? চুলোয় যাকগে সাঁইতলা আর গগন দাসের ঘেরি। সাধ করে বানানো আলা পয়মাল করে দিল মানষেলা থেকে ছিটকে-পড়া ওরা ঐ তিনটি প্রাণী। বিশেষ করে মাতব্বর ঠাকরুনটি—ঐ চারু।

কুমিরমারির হাট থেকে জগা নিরুদ্দেশ। জীবনে এমন কতবার ঘটেছে। সাঁইতলার উপর তিতবিরক্ত, বয়ারখোলার দলের মধ্যে সে জুটে গেল।

চৌত্রিশ

ভাল যাত্রার দলে বারমেসে কাজকর্ম। বৃষ্টিবাদলার সময় তিনটে কি চারটে মাস ঘরে বসে কাজ। পালা ঠিক করে ফেলে পাঠ লেখাও, পেরাজ দাও, সাজপোশাক বানাও, বাক্সপেঁটরা গোছাও। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে দেয়া ডাকছে, ঘরের মধ্যে ঝুনুঝুনু ঝুনুঝুনু সখীদের পায়ের ঘুঙুর, রাজকন্থা ছোঁড়াটার নাকিস্বরের একটো। সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি একনাগাড় চলেছে। তার পরে বৃষ্টিবাদলা বিদায় হল তো মজা এইবারে। দেশ-দেশান্তর চরে ফিরে গাওনা করে বেড়াও। নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন মানুষ। আজকে এই গাঁয়ে পাত পেড়ে খাচ্ছি, কালকের অন্ন কোথায় মাপা আছে সে জানেন দেবী অন্নপূর্ণা আর দলের ম্যানেজার।

এসব পেশাদারী পাকা দলের রীতি। বাদা অঞ্চলের শখের দলের পরমায়ু অখণ্ড নয় অমনধারা। এ বছর রমারম চলছে—কিন্তু ও-বছর চলবে কিনা, সেটা নির্ভর করে ক্ষেত কি পরিমাণ ফসল দেবে তার উপরে। খামার ভরা তো মনও ভরা। খামার খালি তো তিন বেলার তিন পাতড়া ভাত কোন্ কৌশলে জুটবে, মানুষ তখন তাই ভাববে—আমোদস্ফূর্তি উঠে যাবে মাথায়। ভিন্ন বছরের কথাই বা কেন, সামনের বোশেখ-জষ্টিতেই দেখা যাবে ধান যত গোলা-আউড়ির

তলায় এসে ঠেকছে, দলের মানুষ তুর্লভ হচ্ছে ততই। আয়ান ঘোষ আসে নি আজকের আসরে, যে লোকটা মৃত-সৈনিক করে তাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে আয়ানের কথাগুলো তার মুখে জুড়ে দেওয়া হল। কিন্তু পরের দিন খোদ রাধিকাই গর-হাজির। শখের দল, শখ হল তো আসবে। মাইনে খায় না যে কান ধরে বেত মারতে মারতে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে। তেমনি ওদিকে পালাগান দেওয়ার মানুষও ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। নিয়ম ছিল, বায়না পনের তঙ্কা নগদ এবং খাওয়া। পনের কমিয়ে দশ, তারপরে পাঁচ, ক্রমশ ষোলআনাই মকুব হয়ে গেল—শুধুমাত্র এক বেলা পেটে খাওয়া দলের লোক ক'টির। এত সুবিধা দিয়েও কাউকে রাজী করানো যায় না। এখন খোরাকির দাবিও তুলে নেওয়া হয়েছে। সামিয়ানা খাটিয়ে অথবা কোন রকম একটা আচ্ছাদন দিয়ে দাও উঠানে। পান-তামাক এবং লণ্ঠনের প্রয়োজনীয় কেরোসিনটুকু দাও—ঘরে খেয়ে তোমার বাড়ি গেয়ে আসব। তবু কালেভদ্রে কদাচিৎ গাওনার ডাক পড়ে।

তবে জগা করিতকর্মা লোক—দল একেবারে উঠে গেলেও সে বসে থাকবে না। বিবেক সাজা ছাড়াও কাজ জুটিয়ে নিয়েছে, পয়সা রোজগারের নতুন ফিকির। কুমিরমারির নতুন রাস্তা বয়ারখোলা ফুঁড়ে সোজাসুজি চলে চলে গেছে চৌধুরিগঞ্জের দিকে। তু-তিন বছর মাটি ফেলার পরে রাস্তা মোটামুটি চালু এখন। বাদার মানুষ দিনকে-দিন ভদ্র হয়ে উঠে ডাঙার পথে চলাচল শুরু করেছে। জলচরেরা স্থলচর হচ্ছে ক্রমশ। আরও দেখবে তু-চার বছর বাদে খোয়া ফেলে পাকা করে দেবে যখন এই রাস্তা—শহর-জায়গার মতন মোটরবাস ছুটাছুটি করবে আবাদের পাকা-রাস্তা দিয়ে। এখন কিছু গরুরগাড়ি চলে মাটির রাস্তায়। খামারের ধান গাড়িতে চাপান দিয়ে খোলাটে তোলে, এই কাজে মানুষ নৌকোর হাঙ্গামা নিতে যায় না। তবে ভগবতীর স্কন্ধে চেপে যাওয়া বলে মানুষ সোয়ারি কিছু দ্বিধা করে গরুরগাড়ি চাপতে। মেয়েলোক হলে তো কিছুতে নয়। কিন্তু কতদিন! উত্তরে-দক্ষিণে টানা পথ, জোয়ার-ভাঁটার তোয়াক্কা নেই

—অতএব জরুরী কাজকর্ম থাকলে এবং গাঙে বেগোন হলে নিতেই হবে গরুরগাড়ি।

তৈলক্ষ মোড়ল একখানা গরুরগাড়ি করেছে। সূদন চালায়। কাজকর্ম না থাকলে জগাও এক-একদিন গাড়োয়ান হয়ে গাড়ির মাথায় চেপে বসে। ডা-ডা ডা-ডা—খাসা লাগে গরুর লেজ মলে এমনি ধরনের মোলাকাত করতে। নৌকোর কাজে জগার জুড়ি নেই, গাড়ির কাজেও কটা দিনের মধ্যে দেখতে দেখতে ওস্তাদ হয়ে উঠল। আবার মোটরবাস চালু হয়ে গেলে জগা যদি ড্রাইভার হয়, তখনও দেখো তার সঙ্গে কেউ গাড়ি দাবড়ে পারবে না।

চৈত্রের গোড়া অবধি ধান বওয়াবয়ি চলল, গাড়ির তিলেক ফুরসত নেই। মাঠের কাজকর্ম সারা হয়ে গেলে সূদন গাড়ি নিয়ে কুমির-মারি যেতে লাগল। হয় কিছু কিছু রোজগার। বিশেষ করে হাটবারগুলো ফাঁক পড়ে না, ব্যাপারীদের মাল পৌঁছে দেবার ভাড়া পাওয়া যায়। অন্য ভাড়াও জোটে অবরেসবরে।

একদিন এক কাণ্ড হল। মানুষ সোয়ারি দু-জন। কুমিরমারি তারা মোটরলঞ্চে করে এসেছে। যাবে চৌধুরিগঞ্জ। এসেছে দেড় প্রহর বেলায়, গাঙে ভাঁটি তখন, সঙ্গে সঙ্গে নৌকো নিলে সন্ধ্যার আগে করালীর সাঁইতলা-খালের মোহানায় নামিয়ে দিত। তবু কিন্তু নৌকোয় গেল না তারা, অত সকাল সকাল পৌঁছতে চায় না। গদাধর ভটচাজের হোটেলে ভরপেট খেয়ে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে যখন উঠল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। হাটেরও শেষ হয়ে এসেছে। ভরা জোয়ার, নাবালে কোন নৌকো যাবে না। দেখ, কোথায় গরুরগাড়ি পাওয়া যায়।

খোঁজে খোঁজে সূদনকে গিয়ে ধরল। চরের উপর গরু ছেড়ে দিয়ে হাটখোলার প্রান্তে গাছের ছায়ায় গাড়ির চালার উপর সে শুয়ে আছে। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, জ্বর হয়েছে। ব্যাপারীর ধানের বস্তা বোঝাই দিয়ে গাড়ি দাবড়ে আসছিল ঠিক-দুপুরবেলা, পথের মধ্যে

জ্বর এসে গেল। বস্তাগুলো কোন গতিকে হাটে নামিয়ে সেই থেকে শুয়ে পড়ে আছে। হাটুরে অনেকেই তো বয়ারখোলা ফিরবে, তাদের একজন কেউ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে, সূদন শুয়ে পড়ে থাকবে অমনি—এই মতলব মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। এমনি সময় গদাধর মধ্যবর্তী হয়ে এসে ধরল: নৌকো নেই, অন্য গাড়িও পাওয়া যাচ্ছে না, এই দুটো মানুষকে চৌধুরিগঞ্জে নিয়ে যেতে হবে। জরুরী কাজ ওঁদের, পৌঁছতেই হবে। ন্যায্য ভাড়া পাবে, না হয় কিছু বেশী ধরে নেবে। নিতেই হবে মোটের উপর।

দর কষাকষি করে শেষ পর্যন্ত যে অঙ্কে রফা হল, তার পরে আর শুয়ে থাকা চলে না। উঠে বসল সূদন তড়াক করে।

গাড়ির ছই কিন্তু নেই মশায়। সেটা অবধান করুন।

ভুঁড়িওয়ালা মোটাসোটা ইয়া এক লাস—প্রমথ হালদার, চৌধুরি-এস্টেটের সদরনায়েব। প্রমথ বললেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি বাপু। চোখ আমাদের কানা নয়। ধানের বস্তা বোঝাই দিস, বেশ তো আমরাও বস্তা হয়ে যাচ্ছি। হেলব না, দুলব না, নড়াচড়া করব না—তবে আর কি! সুখ করতে কে চাচ্ছে, গিয়ে পৌঁছলেই হল।

কত কষ্টে যে সূদন বয়ারখোলা অবধি গাড়ি চালিয়ে এল সে জানেন মাথার উপরে যিনি আছেন। বাপের পুণ্যের জোর, তাই মুখ থুবড়ে পড়ে নি। আর পারে না। বড় রাস্তা ছেড়ে বেশ খানিকটা আলপথ ভেঙে তৈলঙ্গ মোড়লের বাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে পড়ে গরুর কাঁধের জোয়াল নামিয়ে সূদন বলে, আর যাবে না, নেমে পড়ুন এবারে—

রোগা লিকলিকে অন্য মানুষটা—আদালতের পেয়াদা, নাম নিবারণ। সে খিঁচিয়ে ওঠে: তেপান্তরের মধ্যে এসে বলে নেমে পড়ুন। ইয়ার্কি? আমাদের যা-তা মানুষ ভাবিস নে। উনি হলেন ফুলতলা এস্টেটের নায়েব। নায়েব জানিস তো—নবাব আর নায়েব এক কথা। দশখানা লাটের মালিক, প্রতাপে বাঘ আর গরু এক

ঘাটে জল খায়।

প্রমথও তেমনি মেজাজে নিবারণের পরিচয় দেন : আর এই যে এঁকে দেখছ, সরকারী লোক ইনি। চাপরাসখানা দেখাও না হে নিবারণ। সরকার নিজে আসেন না, মানুষ দিয়ে কাজকর্ম করান। এঁর পায়ে একখানা যদি কাঁটা ফোটে, সেটা সরকারের পায়ে ফোটার সামিল। জানিস?

বাদা রাজ্যের বোকাসোকা মানুষ সূদন —খুব বেশী বিচলিত, এমন মনে হয় না। বলে, চন্দ্র-সূয্যি যা-ই হোন হুজুর মশায়রা, মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি। নতুন ছাঁটের গরু, আপনাদের সুদ্ধ কোন্ খানাখন্দে নিয়ে ফেলব, ঠেকাতে পারব না। সেটাই কি ভাল হবে মশায়রা?

প্রমথর মেজাজ খাদে নেমে এল : তা হলে কি করব বাবা, উপায় একটা কর। চৌধুরিগঞ্জে যেতেই হবে, জরুরী কাজ। অত ভাড়া কবুল করলাম তো সেই জন্যে।

সূদন একটুখানি ভাবল। জগন্নাথের কথা ভাবছে। বলে, আছে একজন আমাদের বাড়ি। মেজাজ-মরজি ভাল থাকলে সে আসতে পারে। সে হলে ভালই হবে। ধাঁ করে পৌঁছে দেবে, তার মতন গাড়িয়াল এ পাইতক্কে নেই। এইখানে থাক একটু তোমরা, বাড়ি গিয়ে বলে কয়ে দেখি। গরু দুটো রইল, ভয় কি তোমাদের?

যাত্রার বায়না বিষম মন্দা এখন। পেরাজের ঘরে জগা বিনা কাজে একলা বসে ছিল। অত দরের মানুষ দুটি বিপাকে পড়েছে —শুনতে পেয়ে দ্বিরুক্তি না করে সে রাস্তায় ছুটল। গরুর কাঁধে জোয়াল তুলে দিল : ডা-ডা ডা-ডা—গরু তুই ভেবেছিস কোন্টা? হুজুরদের জরুরী কাজ। চাঁদ উঠবার আগে সাঁইতলার খাল পার করে দিবি। নয় তো কোন মতে ছাড়ান নেই।

গাড়ি চলেছে-চলেছে। মাঠ ছেড়ে জঙ্গলে এল। খানিকটা জায়গা হাসিল হয় নি এইখানে। হাসিল না হলেই বা কি—কাঠকুটো বেচেও পয়সা। বাদাবনের এই বড় মজা। যেমন-কে-তেমন বন রেখে দাও, পয়সা

গণে দিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে যাবে। হাসিল করে নোনা জলে বুড়িয়ে রাখ, গাঙ-খালের চারা মাছ এসে আপনি জন্মাবে। কঠিন বাঁধের ঘেরে নোনা জল ঠেকিয়ে রেখে লাঙল নামাও, লক্ষ্মীঠাকরুন সোনার ঝাঁপি উপুড় করে ক্ষেতময় ধান ঢালবেন, ডাঙা অঞ্চলে তার সিকির সিকি ফলন নেই।

দু-পাশে জঙ্গল, গরুর গাড়ি চলেছে নতুন মাটির রাস্তার উপর দিয়ে। ডালপালা ছাতের মতন মাথার উপরে। আকাশে চাঁদ নেই, ঘুবঘুট্টি অন্ধকার।

রাস্তাও তেমনি এই দিকটায়। উঠছে, উঁচুমুখো উঠে চলেছে—স্বর্গধামে নিয়ে তোলবার গতিক। হুড়মুড় করে তক্ষুনি আবার পাতালের তলে পতন। ভেঙেচুরে গাড়ি উলটে পড়ে না, লোহা দিয়ে ধুরো বানানো নাকি হে?

নিবারণ সুমিষ্ট স্বরে বলেন, পথ ভুল করে হিমালয় পর্বতে ওঠ নি তো বাবা? দেখ দিকি ঠাহর করে।

আর প্রমথ হালদার গর্জন করে উঠলেন, কোথায় আনলি? হাড়-পাঁজরার জোড় খুলে মারবি নাকি রে হারামজাদা?

গালিগালাজে জগার স্ফূর্তি বেড়ে যায়। কানের কাছে মধুকণ্ঠে যেন তার তারিপ হচ্ছে। হি-হি করে হেসে বলে, গরুর খাবার খড় রয়েছে পিছন দিকে। আঁটিগুলো টেনে গদি করে নিয়ে গতর এলিয়ে দিন। ঝাঁকুনি লাগবে না, আয়েসে ঘুম এসে যাবে।

সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রমথ নির্নিরীক্ষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখেন। শঙ্কিত কণ্ঠে বলেন, রাত দুপুরে কোন্ অজঙ্গি জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেললি, পথ বলে তো মালুম হয় না। সে বেটা গাড়িতে তুলে মাঝপথে চম্পট দিল। ভাড়ার লোভে ভাঁওতা দিস নে—সত্যি কথা বল, পথঘাট চিনিস তো স্যতি সত্যি?

জগন্নাথ বলে, বাদা রাজ্যি হুজুর। ফুলতলার মতন বাঁধা শড়ক কোথা এখানে? এ-ও তো ছিল না এদ্দিন। সাপ-শুয়োরের চলাচলে পথ পড়ত, তাই ধরে আমরা যেতাম।

প্রমথর সর্বদেহ সিরসির করে ওঠে : বলিস কি, সাপ-শুয়োর খুব বেরোয় বুঝি ?

জগা বলে, ওঁরা তো সামান্য। বড়রাও আছেন। রাতের বেলা নাম করব না হুজুর।

জঙ্গল আরও এঁটে আসে। রাত্রিচর পাখির ডাক। গাছগুলো জোনাকির মালা পরেছে। পাতায় ডালে হাওয়া ঢুকে অনেক মানুষের ফিসফিসানির মত শোনা যায় চতুর্দিকে।

সজোরে গরুর লেজ মলে জগা চেঁচিয়ে ওঠে : ডা-ডা ডা-ডা — নড়িস নে যে মোটে ! বেতো রুগী হলি নাকি রে নায়েব মশায় ?

প্রমথ হালদার নিজের চিন্তায় ছিলেন। চমকে উঠে বললেন, নায়েব কাকে বলিস রে হতভাগা ?

জগা ভালমানুষের ভাবে বলে, গরুর নাম হুজুর। মানুষজন কেউ নয়। এই ডাইনের ইনি। খেয়ে খেয়ে গতরখানা বাগিয়েছে দেখুন। তিন মনের ধাক্কা। তোয়াজের গতর পারতপক্ষে নড়াতে চান না। শুয়ে শুয়ে খালি জাবর কাটবেন, আর লেজে মাছি তাড়াবেন। পিটুনি দিই হুজুর, আবার নায়েব মশায় বলে তোয়াজও করি। যাতে যখন কাজ হয়।

নিবারণ শুনে ফিকফিক করে হাসে। রসটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। বলে, বড্ড ফাজিল তুই তো ছোঁড়া। নায়েব হলেই বুঝি গায়ে-গতরে হতে হবে ? কটা নায়েব দেখেছিস তুই শুনি ?

জগা সঙ্গে সঙ্গে বলে, দেখব কোথায় হুজুর ? সে সব ভারী ভারী মানুষ বাদাবনে কি জন্য মরতে আসবেন ? নায়েব দূরস্থান, চাপরাসীই বা কটা দেখেছি ? এদ্দিন বাদে মানুষের গতিগম্য হওয়ায় এখনই যা একটি-দুটি আসতে লেগেছেন। বাঁয়ের এই এনারে দেখছেন, রোগা প্যাঁকাটি, পাঁজরার হাড় গণে নেওয়া যায়—কিন্তু ছোটে একেবারে রেলের ইঞ্জিনের মতন। চুঃ-চুঃ ! চাপরাসী ভাই, অত ছুটলে নায়েব পেরে উঠবে কেন ? মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

অর্থাৎ ডাইনের গরু নায়েব, বাঁয়ের গরু চাপরাসী। কাউকে বাদ দেয় নি। নিবারণও অতএব চুপ। অন্ধকারে গা টেপাটেপি করছেন দুজনে। গাড়োয়ান টের পেয়ে গেছে, একজন হলেন চৌধুরি এস্টেটের সদর নায়েব, অপরে আদালতের চাপরাসী। সেই আগের ছোঁড়াই নিশ্চয় বলে দিয়েছে। মেজাজ হারিয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে ফেলা উচিত হয় নি তখন। পাকা-লোক হয়ে বিষম কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন, তার জন্য মনে মনে পস্তাচ্ছেন এখন। গাড়োয়ান কৌতুক করে গরু দুটো এঁদের দুই নামে ডাকছে। তা সে যা-ই করুক, কানে তুলো আর মুখে ছিপি আঁটলেন আপাতত। ভালয় ভালয় চৌধুরিগঞ্জে পৌঁছানো যাক, তার পরে শোধ নেওয়া যাবে। পথের মাঝখানে এখন কিছু নয়।

চলেছে। এক সময় প্রমথ বললেন, দু-ঘণ্টায় পৌঁছে দেবে বলেছিলে কিন্তু বাবা।

ঘাড় নেড়ে জগা সজোরে সমর্থন করে, দেবই তো—

প্রমথ দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরালেন। অমনি ট্যাঁক থেকে ঘড়িটা বের করে দেখে নিলেন ঃ এগারটা বেজে গেছে।

জগা বলে, কলের ঘড়ি যদি লাফিয়ে লাফিয়ে ছোটে। গরু তার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন হুজুর?

কথার তুবড়ি, জবাব দিতে দেরি হয় না। নিবারণের ধৈর্য থাকে না। খিঁচিয়ে উঠল ঃ একের নম্বর শয়তান হলি তুই।

পরম আপ্যায়িত হয়েছে, এমনি ভাবে দন্ত মেলে জগা বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সবাই বলে থাকে একথা। আপনারাও বলছেন।

নিবারণের গা টিপে প্রমথ হালদার থামিয়ে দিলেন। বলেন, ভালই তো, দেরি তাতে কি হয়েছে! দিব্যি ডাঙায় ডাঙায় যাচ্ছি —জলে পড়ে যাই নি। খাসা আমুদে লোক তুমি বাবা, হাসিয়ে রসিয়ে কেমন বেশ নিয়ে যাচ্ছ। চৌধুরিগঞ্জের একটা লোক কিন্তু বলে এসেছিল, কুমিরমারির নতুন-রাস্তায় ডাঙাপথে দু-ঘণ্টা হদ্দ আড়াই ঘণ্টার বেশী লাগে না।

কে লোক—অনিরুদ্ধ ?

তাকেও চেন তুমি ? বাঃ বাঃ, সবই দেখছি চেনাজানা তোমার। কিন্তু দু-ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা হতে চলল, পথ ঠিক মত চেনা আছে তো ? মানে বড্ড আঁধার কিনা, আর চলেছ জঙ্গল-জাঙাল ভেঙে—

জগা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, আমি ভুল করলেও গরু কখনো ভুল করবে না হুজুর। কত ধান বওয়াবয়ি করেছে, ছেড়ে দিলে চরতে চরতে কত দূর অবধি চলে যায়। পথঘাট গরুর সব নখদর্পণে থাকে।

সশঙ্কে নিবারণ বলে ওঠে, কী সর্বনাশ! সে ছোঁড়া তো জ্বরের নাম করে বাড়ি গিয়ে উঠল। তুই তবে কি গরুর ভরসায় এই রাত্রে আমাদের বাদার পথে ঘোরাচ্ছিস ?

আজ্ঞে হুজুর, ভয় করবেন না। মানুষের চেয়ে গরুর বুদ্ধি বেশী। চাপরাসী হুটকো মতন আছে, তার কথা বাদ দিলাম। কিন্তু নায়েব-মশায়টি হল ভারী সেয়ানা—দেখেশুনে হিসেব করে চরণ ফেলে। পিটিয়ে খুন করে ফেলেন, কিছুতে বেপথে যাবে না। এক কাজ করেন আপনারা—এক এক আঁটি খড় মাথার নীচে বালিশ করে নিয়ে ঘুম দেন। উতলা হবেন না, ভাবনা করবেন না। আলার উঠোনে হাজির হয়ে আপনাদের ডেকে তুলে দেব।

বলে মনের ফূর্তিতে জগা গান ধরে দেয়—

ও ননদী পোড়াকপালি,
মিথ্যে বলে মার খাওয়ালি ?
আসুক তো শ্বশুরের বেটা,
বলে দিব তারে—
ভাত-কাপড় না দিবার পারে,
বিয়া কেন করে ?

প্রমথ ডাকছেন, শোন বাপধন—

কলি কয়েকটা সমাধা করে থেমে গিয়ে জগা বলে, আজ্ঞে ?

বলছি কি, চুপচাপ চল। গান-টান আলায় গিয়ে হবে।

জগা বলে, ভাল লাগছে না হুজুর? আমার গানের সবাই তো সুখ্যাতি করে।

খুব ভাল লাগছে। ভারী মিঠে গলা তোমার। তবে ঐ যে বললে, এ পথে আরও অনেকের চলাচল। রাতে নাম করতে নেই, তাঁরাও সব ঘোরাফেরা করেন। দরকার কি, গান শুনতে তাঁরা যদি গাড়ির কাছ ঘেঁষে আসেন!

এবারে জগা রীতিমত ধমকে উঠল: তবে বাদাবনে আসতে গেলেন কেন হুজুর? পাকা ঘরের মধ্যে মেয়েমানষের মত ঠ্যাং ধুয়ে বসে থাকুন, সেই তো বেশ ভাল। ভরদ্বাজ মশায় কিন্তু এদিক দিয়ে বেশ জবর। বনবাদাড় গ্রাহ্য করে না, একলা চরে বেড়াতে ভয় পায় না রাত্তিরবেলা।

প্রমথও চটেছিলেন। কি-একটা জবাব দিতে গিয়ে সামলে নিলেন। ভারী যেন রসিকতার কথা—হেসে উঠলেন তেমনি ভাবে। বললেন, ভরদ্বাজকেও জান তুমি? খাসা লোক তুমি হে—দুনিয়ার সকলের সঙ্গে ভাবসাব, সব কিছু জানাশোনা!

ঢাকের আওয়াজ আসছে। আওয়াজ মৃদু—অনেকটা দূর বলেই। জগা বলে, শুনতে পাচ্ছেন? কালীতলায় পূজো দিচ্ছে কারা।

প্রমথ বলেন, জায়গাটা কোথায়?

করালী গাঙের উপর। আসল সাঁইতলা—সাঁইয়ের যেখানটা আসন ছিল। আপনাদের চৌধুরিগঞ্জ'এর আগেই পেয়ে যাব। গরু তবে ভুল পথে আনে নি, বুঝতে পারছেন?

প্রবল উৎসাহে গরু দুটোর পিঠে পাঁচনির খোঁচা দিয়ে জগা জিভে টক্কর দেয়: টক-টক! চল সোনামানিক ভাইরা আমার, টেনে চল পথটুকুন। বাবুরা বখশিশ দেবেন। খইল মেখে সরেস জাবনা খাওয়াব। চল।

হুড়মুড় করে, পড়বি তো পড়, গরুর গাড়ি একেবারে জলের মধ্যে। ছিটকে উঠল জল—মুখে-চোখে কাপড়ে-জামায় জল এসে পড়ল। প্রমথ শুয়ে পড়েছিলেন গামছার পুঁটুলি মাথার নীচে গুঁজে

দিয়ে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন।

কোথায় এনে ফেললি রে?

পথে জল জমেছে সন্দ করি।

ব্যাকুল কণ্ঠে প্রমথ বলেন, দু-মাসের ভিতর আকাশে এক কুচি মেঘ দেখলাম না, জল জমবে কেমন করে? কি গেরো, কোন্ অথই সমুদ্দুরের মধ্যে এনে ফেলেছিস। এখন উপায় কি বল?

জগন্নাথ ইতিমধ্যে লাফিয়ে পড়েছে। জল সামান্য, কিন্তু হাঁটু অবধি কাদায় ডুবে গেল। সেই যাকে বলে প্রেম-কাদা—সমস্ত রাত্রি এবং এক পুকুর জল লাগবে ছাড়াতে। এদিক-ওদিক ঠাহর করে দেখে সে হেসে উঠল: সমুদ্দুর নয় আজ্ঞে, খাল—সাঁইতলার খাল যাকে বলে। প্রায় তো বাড়ি এনে ফেলেছে।

আবার কৈফিয়তের ভাবে বলে, নতুন রাস্তা তেলিগাতি হয়ে গেছে। অনেকখানি ঘুরপথ। খালের উপর পুল বানাচ্ছে, এখনো শেষ হয় নি। নায়েব মশায় তাই বোধ হয় ভাবল, খাল ভাঙতে হবে তো একেবারে সোজাসুজি গিয়ে উঠি। চাপরাসীর সঙ্গে যড় করে কখন ডাইনে নেমে পড়েছে, গানের মধ্যে সেটা ঠাহর করে উঠতে পারি নি।

নিবারণ দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে: বেশ করেছে! রাত দুপুরে গামছা পরে খাল সাঁতরাতে হবে কিনা, সেইটে জিজ্ঞাসা কর এবার তোর নায়েব মশায়কে।

জগন্নাথ অভয় দেয়: নির্ভাবনায় বসে থাক চাপরাসী ভাই। নায়েব মশায় নড়াচড়া করো না—ওজনে ভারিক্কী কি না, নড়াচড়ায় চাকা বসে যাবে। গরু মানষের মতন বেয়াক্কিলে নয়। এনে ফেলেছে যখন, ঠিক ও-পারে নিয়ে তুলবে।

পঁয়ত্রিশ

চেষ্টার কসুর নেই। দুই গরুতে টানছে, আর জগন্নাথও ঠেলছে পিছন থেকে প্রাণপণে। কাদা মেখে ভূতের চেহারা। গাড়ি হাত দশেক এগুল এমনি ভাবে। জল আরও বেড়েছে। তার পরে কাদায় চাকা এমনি এঁটে গেল, ধাক্কাধাক্কিতে আর এক চুল নড়ে না। প্রমথর ভিতরটা রাগে টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু পথের মাঝখানে বিপদ—ঐ ছোঁড়া ছাড়া অন্য কোন মানুষ কাছেপিঠে নেই। অতএব ঠোঁটে কুলুপ এঁটে আছেন তিনি, এবং বাপু-বাছা করছেন। একবার কোন রকমে চৌধুরিগঞ্জের চৌহাদ্দির ভিতর নিয়ে তুলতে পারলে হয়। তখন নিজমূর্তি ধরবেন, ফ্যা-ফ্যা করে হাসার মজা দেখিয়ে দেবেন।

কি হল রে বাপধন?

এতখানি কাদা, আগে ঠাহর হয় নি। চাকা একেবারে কামড়ে ধরেছে। যেন কুমিরের কামড়, ছাড়ছে না।

প্রমথ বললেন, ঘুর হয় হোকগে। সোজা সড়কে কাজ নেই। গাড়ি ঘুরিয়ে নে তুই বাবা। তেলিগাঁতির পুল হয়েই যাব।

জগা হেসে ওঠে: বললেন ভাল কথাটা। চাল বাড়ন্ত—তবে ভাতে-ভাতই চাপিয়ে দিগে। গাড়িই যদি ঘুরবে, আর দশ হাত গেলেই তো কাদা পার হওয়া যেত।

নিবারণ হাত-মুখ নেড়ে বলে, বলিহারি গাড়োয়ান তুই বাপু! যেন মাংনা-সোয়ারি তুলেছিস। খালের মাঝখানে গাড়ি নামিয়ে বলে, আর নড়বে না। আমরা এখন কি করব, সেটা বল তবে।

জগা বলে, ঘাবড়ান কি জন্যে? পৌঁছেই তো গেছেন। চৌধুরিগঞ্জ কতই বা হবে—দু-ক্রোশ কি আড়াই ক্রোশ বড় জোর। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে যান দিব্যি ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায়। গাড়ি-গরুর কপালে যা আছে তাই হবে।

প্রমথ সকাতরে বলেন, সে এই চাপরাসী মশায় পারবে। সমন নিয়ে জলজাঙাল ভাঙা অভ্যাস, গায়ে লাগবে না। আমার তো বাপু ফরাসে বসে হুকুম ঝাড়া কাজ—কলের ইঞ্জিন নই যে কল টিপলে অমনি পোঁ করে বেরিয়ে পড়লাম।

জগা দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরাল। কাঠিটা ধরে প্রমথর দিকে চেয়ে থাকে। বলে, সে কথা একশ বার। ফরাসে বসে বসে গতরখানা পর্বত করেছেন। এতখানি গতর আমি বুঝি নি, গরুও বোঝে নি। গাড়ি তা হলে খালে নামাত না। অ্যাদ্দিন ঘর করছি ওদের নিয়ে, হেন অবিবেচনার কাজ ওরা কখনো করে নি।

প্রমথ বলেন, গরু একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল মনে হচ্ছে। হাল ছেড়ে দিস নে বাপু, পিঠে দু-চারটে বাড়ি দে, আরও খানিক টানাটানি করে দেখুক।

জগা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল: না, হুজুর, ঠিক উল্টো। বিগড়ে যাবে গরু। ডাইনের এই যে নায়েবটাকে দেখেন—বেটা বিষম মানী। মান করে শুয়ে পড়বে জলের মধ্যে। গাড়িও কাত হয়ে পড়বে, শুয়ে বসে জুত হবে না হুজুরদের। তার চেয়ে যেমন আছেন, চুপচাপ থাকেন। গরু ঘাঁটাতে যাবেন না, ওরাও এমনি থির হয়ে থাকবে।

আবার বলে, থাকেন একটু বসে। আমি বরঞ্চ লোকজন ডেকে আনি। আর জোয়ার অবধি থাকতে পারেন তো নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ হয়ে যাবে। জল বেড়ে গিয়ে কাদার আঁটাআটি থাকবে না। দু-দশ ঠেলায় গাড়ি উঠে যাবে। ঠেলতেও হবে না, গরু দু-জনে টেনে তুলে ফেলবে।

প্রমথ বলেন, আরে সর্বনাশ—জোয়ার অবধি ঠায় বসিয়ে রাখবি? লোক ডেকে নিয়ে আয় তুই।

নিবারণ বলে, লোক কদ্দূর?

তার কোন ঠিকঠিকানা আছে? চৌধুরিগঞ্জ অবধি যেতে হতে পারে, কপালে থাকলে পথে মাছ-মারা লোক পেতে পারি।

জগাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা নয়। কিন্তু তা ছাড়া উপায়ও দেখা যায় না কিছু। প্রমথ পৈতে বের করলেন: দেখ বাবা, ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি। ভাঁওতা দিয়ে সরে পড়ছিস নে, পা ছুঁয়ে দিব্যি করে যা। তবে ছেড়ে দেব। ছুটে যাবি আর ছুটে চলে আসবি—কোনখানে জমে যাবি নে। কেমন বাবা, এই কথায় রাজী?

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলে, মানষেলায় যাচ্ছিস তো চিঁড়েমুড়ি যা-হোক কিছু নিয়ে আসবি। খালি হাতে আসিস নে। তুপুরবেলা কখন সেই গদাধরের হোটেলে গণ্ডা কয়েক ভাতের দানা পেটে পড়েছিল, তার পরে গরুর-গাড়ির ধকল—ক্ষিধেয় নাড়ি পটপট করছে।

কুড়ুক-কুড়ুক কুড়ুক-কুড়ুক ড্যাডাং-ড্যাং ড্যাডাং-ডাং—ঢাকের বাজনায় জোর দিয়েছে এখন। জগা ছুটল সেই বাজনায় কান রেখে। কালীতলার বাজনা, সন্দেহ নেই। নিশিরাত্রে করালীর কূলে বাতাসের বড় জোর, বাজনা তাই নিতান্ত কাছে মনে হচ্ছে। তীরের মতন ছুটেছে জগা বাঁধের নীচে দিয়ে—কাদার মধ্যে পড়ছে, কাঁটা-বনে গিয়ে পড়ছে। তা বলে উপায় নেই—সরু বাঁধের উপর দিয়ে ছোটা যায় না, পড়ে গিয়ে এতক্ষণে হাড়গোড়-ভাঙা দ হয়ে থাকত। ব্রাহ্মণসন্তান প্রমথর কাছে কথা দিয়ে এসেছে, সেই জন্যেই বুঝি ছুটোছুটি এত!

সাঁইতলা এসে গেল। পাড়ার মধ্যে পা দিল কত দিনের পর। কী আশ্চর্য, কেউ নেই। পুরুষ না হয় জালে চলে গেছে, কিন্তু বউ-ঝিরা? ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে গেছে কেউ কেউ। বেশির ভাগ ঘরে আবার দরজাই নেই। মানষেলার ভদ্রপাড়া হলে চোর-ছ্যাঁচোড়ের মজা বেধে যেত। পাড়া ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেলেও তো কথা বলার কেউ নেই। কিন্তু বাদারাজ্যের পাড়ায় চোর আসে না। ধন-সম্পত্তির মধ্যে মাটির হাঁড়ি-কলসি, কলাইয়ের বাসন দু-একখানা আর কাঁথা-মাদুর। ঝাঁটপাট দিলে দেদার ধূলো মিলবে, অন্য-কিছু

নয়। দিন আনে, দিন খায়। চাল-ডাল নুন-তেল ঘরে কিনে মজুত করে রাখে না। কপাল জোরে বেশী লভা হলে খাওয়াটা ভারিক্কী রকমের হবে সেদিন, দুটো পয়সা বাঁচল তো পানে এলাচের মশলা দিয়ে খাবে। আর রোজগার কম হল, তো সেদিন আধপেটা ভাত। মোটে না হল তো কাঠ-কাঠ উপোস। চোরকে তাই খোশামোদ করেও এদের পাড়ার মধ্যে নেওয়া যাবে না।

কিন্তু বৃত্তান্ত কি? পুরুষ না হোক মেয়েরা সব গেল কোথায়?

গগনের নতুন-আলার দিকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। সেখানেও চুপচাপ একেবারে। ছাড়া বাড়ির মত। আগে কত দিন তো পুরাদমে কীর্তনানন্দ চলেছে এমনি সময় অবধি। জগা ছিল না—এরই মধ্যে রাক্ষসে এসে মেরে ধরে রূপকথার রাজবাড়ির মত করে রেখে গেল নাকি? ভাল হয়, চারুবালার ঘাড় মুচড়ে রেখে গিয়ে থাকে যদি—মুখ দিয়ে দেমাকের ফড়ফড়ানি না বেরোয় আর কখনো!

ঢুকে পড়ল জগা আলার সীমানার মধ্যে। যেতেই হবে। এত ছুটোছুটি করে এল এদেরই জন্যে তো—গগন দাসের কথা মনে করে, নিজের কোন গরজ ভেবে নয়। তাকিয়ে দেখে, কামরার ভিতরে যেন আলো। বন্ধ কবাটের জোড়ের ফাঁক দিয়ে আলো আসে। আলো যখন, মানুষও তবে আছে ভিতরে। এবং খুব সম্ভব ননদ-ভাজ মেয়েলোক দুটি। জগা তখন ডোবার ধারে। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে। কাদা-মাখা দেহটার দিকে হঠাৎ নজর পড়ে যায়। অতিশয় বিশ্রী দেখাচ্ছে। এতদিন পরে এসেছে—নেয়েধুয়ে মেয়েলোকের সামনে হাজির হওয়া উচিত। চারুটা নয় তো হি-হি করে হাসবে। বলে বসবে হয়তো কোন একটা অপমানের কথা—রক্ত চড়ে যাবে জগার মাথায়।

নেয়েধুয়ে ভিজা কাপড়ে জগা আলাঘরে উঠল। এদিক-ওদিক তাকাল একবার। গগন, নগেনশশী, এমন কি ব্যাপারীদেরও একজন কেউ নেই কোনদিকে। দরজায় ঘা দিল। সাড়া নেই। জোরে

জোরে ঝাঁকাচ্ছে। ভিতর থেকে তখন করকর করে উঠল—আবার কে ?—চারুবালা।

এসে জুটেছ কালীতলা থেকে ? যেটা ভেবে এসেছ—একলা নই আমি, শড়কি আছে। যে ঠ্যাংখানা আছে, সেটাও নিয়ে নেব আজকে।

একখানা ঠ্যাঙের কথা তুলেছে, মধুবর্ষণ অতএব নগেনশশীর উদ্দেশে। আনন্দে জগা থই পাচ্ছে না। ওরা একদল হয়ে বাদাবনে চড়াও হয়েছিল, দলের মধ্যেই এখন ঝুটোপুটি বেধেছে।

কবাটে জোরে জোরে করাঘাত করে জগা বলে, আমি গো, আমি জগন্নাথ। বয়ারখোলায় পড়ে ছিলাম যাত্রা গাইতাম, কারও কোন ক্ষতিলোকসান করি নি, আমার কেন ঠ্যাং ভাঙতে যাবে গো ? দোর খোল। বডড জরুরী খবর, সেজন্যে ছুটতে ছুটতে এসেছি।

চারুবালা দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়াল ঃ তুমি কোথা থেকে হঠাৎ ?

কাপড়ের জলে তোমাদের নিকানো ঘর কাদা-কাদা হয়ে গেল। আগে শুকনো কাপড় দাও। বলছি সব।

চারু খোঁজাখুঁজি করল একটুখানি। বলে, ধুতি পাচ্ছি নে। হর খড়ুইয়ের সঙ্গে দাদা সদরে গেল। একটা ধুতি পরনে, আর গোটা দুই পুঁটলি বেঁধে নিয়ে গেছে।

নগনা-খোঁড়ার ধুতি নেই ?

ওর জিনিসে হাত দিতে ঘেন্না করে আমার।

ভারী খুশী জগন্নাথ। অনেকদিন পরে আজ আলাঘরে পা দেওয়া অবধি নগেনশশী সম্পর্কে চারুর মনোভাব পাওয়া যাচ্ছে—বডড ভাল লাগছে চারুর কথাবার্তা। সায় দিয়ে জগা বলে, ঠিক বলেছ। পাজী লোক।

তাই তো, কাপড়ের কী করা যায় ! সরু-পেড়ে শাড়ি আমার, এটাই পর।

ফিক করে হেসে রসান দেয়, শাড়ি পরে মেয়েমানুষ হয়ে বসো, আর কি হবে। জগন্নাথ নয়, জগমোহিনী।

জগন্নাথ বলে, দু-বেটাকে খালের মধ্যে রেখে এলাম। পরোয়ানা নিয়ে তোমাদের এখানে সীল করতে আসছে। বড়দা নেই—তার কাছেই ছুটতে ছুটতে এলাম। চৌধুরিরা বড় মোকর্দমা সাজিয়েছে। ওরা বলাবলি করছিল, গাড়ি চালাতে চালাতে কানে গেল।

চারু বলে, দাদাও তো গেল ওই মোকর্দমার ব্যাপারে। গোপাল ভরদ্বাজ এসে দেখেশুনে জেনেবুঝে গেল, সে-ই গিয়ে শয়তানি করছে। খবরটা বেরুল আবার চৌধুরি-আলা থেকেই। কালো-সোনা তড়পাচ্ছিল : গাঙ আর খালের এদিকে যত-কিছু সমস্ত নাকি চৌধুরিদের খাস-এলাকা। খাল-পারে সাপ-বাঘের মুখে নাকি ছুঁড়ে দেবে আমাদের। হর ঘড়ুই বলল, সদর ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়, সাপ-বাঘও নেই সেখানে। কালোসোনার মুখে ঝাল না খেয়ে নিজেরা সেরেস্তায় খোঁজখবর করে আসি গে। ঘড়ুই আর দাদা খাঁটী খবর আনতে গেছে।

জগা বলে, নগনাটা গেল না যে! তারই তো এই সবে মাথা খেলে ভাল।

সে যাবে রাজ্যিপাট ছেড়ে—তবেই হয়েছে! দশজনে তোমরা যোগাড়যন্তোর করে দিলে, দাদা তো মালিক শুধু নামেই। তৈরি রুটি ফয়তা দিচ্ছে ওই লোক এখন।

চোরার মুখে ধর্মের কাহিনী—এ সব কী বলে চারুবালা! গগন দাসের দশ জন হিতার্থীর অন্তত একজন তবে জগন্নাথ। চারু স্বীকার করল। আর নগেনশশীকে তো দাঁতে-দাঁতে চিবাচ্ছে। উল্লাসে কী করবে জগা ভেবে পায় না। আগেকার দিন হলে মনেও যা ভাবতে পারত না, সেই কাজ সে করে বসল। খাওয়ার কথা বলল চারুবালার কাছে। আমার মুখে নিবারণ যা বলে দিয়েছে—প্রায় সেই কথারই আবৃত্তি করে বলে, ক্ষিদেয় নাড়ি পটপট করছে। চাট্টি ভাত বাড় চারুবালা। খেয়েদেয়ে বিষম জরুরী কাজ আছে। বিস্তর খাটনির কাজ।

ভাত কোথা? ছ-মাস পরে আজকে আসা হচ্ছে, খবর দেওয়া

ছিল কি কাউকে দিয়ে ?

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে জগা বলে, জানব কেমনে যে বাদা-রাজ্যের মধ্যে মশায়রা শহুরে বাবু হয়ে গেছেন। সন্ধ্যের ঝোঁক না কাটতে রান্না-খাওয়া খতম। আগে তো দেখে গেছি, হরির লুঠের হরিধ্বনি পড়তে পোহাতি-তারা উঠে যেত।

চারিদিক ইতস্তত তাকিয়ে দেখে আবার বলে, আসর বসে না আজকাল ? বড়দা সদরে, তা বউঠাকরুন গেল কোথা ? চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নগেন-কর্তাও তদারক করছে না। ব্যাপার কি বল দিকি ?

চারু বলে, রক্ষেকালীর পূজো কালীতলায়। বাজনা শুনতে পাও না ? পাড়াসুদ্ধ সেখানে চলে গেছে। বউদিদির উপোস, সে তো সেই বিকাল থেকে কালীতলায় পড়ে গোছগাছ করছে। রান্নাবান্না হয় নি, ভাত দিই কোথা থেকে ? ও-বেলার চাট্টি পান্তা ছিল, তাই খেয়ে আমি ঘরে দুয়োর দিয়ে রয়েছি।

জগা বলে, রান্না হয় নি তো হোক এখন। হতে বাধা কিসের ? চৌধুরিদের নায়েব চাপরাসী আর মানুষজন নিয়ে ভোরের মুখে সীল করতে এসে পড়বে। তার আগে সারা রাত্তির ধরে খাটনি। পেটে না খেয়ে খাটতে পারব না।

পাড়াগাঁয়ের লোকের—পুরুষ হোক আর মেয়ে হোক—সীল কথাটা বুঝতে দেরি হয় না। আদালত-ঘটিত ব্যাপার—সাধুভাষায় যার নাম অস্থাবর ক্রোক। দেনার বাবদ ডিক্রি হয়ে আছে—চাপরাসী এসে দেনদারের মালপত্র ধরবে, সেই সমস্ত নিলামে বিক্রি হয়ে টাকা আদায় হবে। রাত্রিবেলা বাড়ি ঢোকবার নিয়ম নেই। অতএব ভোরবেলা এসে নিশ্চয় তারা হানা দেবে। আর এই পক্ষের কাজ হল, ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র এবং গোয়ালের গরু-বাছুর রাতারাতি অন্যত্র সরিয়ে ফেলা। জগন্নাথ এই খাটনির কথা বলছে। নায়েব সদলবলে এসে দেখবে, বাড়ির জিনিসপত্র কিছু নেই, মানুষ কটি আছে কেবল। মানুষেরা ফ্যা-ফ্যা করে হাসবে, বেকুব হয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকে সরে পড়বে পাওনাদারেরা। খালি পেটে

এত সমস্ত হবে কেমন করে ?

চারু বলে, চিঁড়ে খেয়ে নাও। ঘরে চিঁড়ে আছে।

চিঁড়ে তো দোকানেও থাকে। চিঁড়ে খাব তো গৃহস্থবাড়ি এসে উঠলাম কেন ? চিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে মাড়িতেই শুধু খিল ধরে, পেটের কিছু হয় না। চিঁড়ে আমি খাই নে।

চারু বলে, চিঁড়ে কুটতে গিয়ে ঢেঁকিতে হাত ছেঁচে গেছে। রাঁধাবাড়া করি কেমন করে বল।

হুঁ, বুঝলাম—

কি বুঝলে শুনি ?

দুয়োর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ডেকে তুলেছি। ঘুমের ঝোঁক কাটে নি। ঘুম-চোখে ছাই ঘেঁটে উনুন ধরাতে মন নিচ্ছে না।

ভারী গলায় চারু বলে, মরছি হাতের যন্ত্রণায়—বলে কিনা ঘুম! ঘুমোবার জো থাকলেও তো ঘুমোতে দিত না। তবে আর বলছি কি। নগনা-খোঁড়া দু-বার এর মধ্যে এটা-ওটা ছুতো করে কালীতলা থেকে এসে ঢুঁ মেরে গেছে।

চারুবালা কাপড়ের নীচে থেকে ডান-হাত বাড়িয়ে ধরল। বলে, হাত ফুলে ঢাক হয়েছে, দেখ—

খাল-পারে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ, হাল্কা জ্যোৎস্না দোর-গোড়া অবধি এসে পড়েছে। নগেনশশীকে দোষ দেওয়া যায় না, বাদাবনের নির্জন রাত্রে যুবতী মেয়ে দেখে মাথার ঠিক রাখা দায়।

বলছে, হাতের টাটানিতে বসে বসে পিদিমের সেক দিচ্ছি। নইলে ঘরে থাকতাম বুঝি! তল্লাটের সব মানুষ কালীতলায়, আমি একলা পড়ে থাকবার মানুষ!

জগা বলে, টাটানি-জ্বলুনি বাইরের লোকে দেখে না। আস্ত একখানা কাপড় জড়িয়েছ তো হাতে—সত্যি বটে, ও-হাত উঁচু করে তুলে ধরে থাকতে হয়, কাজকর্ম করা যায় না ও-হাত দিয়ে।

দেখাচ্ছি তবে খুলে। মানুষকে রেঁধে খাওয়ানোর ব্যাপার—তাই নিয়ে বুঝি ছুতো ধরে কেউ কখনো!

গরগর করতে করতে চারুবালা ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলতে যায়। জগা হি-হি করে হাসে। হাত ধরে ফেলে বলে, একটুখানি ক্ষেপিয়ে দেখলাম তোমায়। ঝগড়া না করলে মেয়েমানুষের বাহার খোলে না। মেনি-বিড়ালের মত মিন-মিন করছিলে, চেনা তখন মুশকিল। ভাবছিলাম বড়দার বোন কি এই—না অন্য কেউ ?

আবার বলে, আন চিঁড়ে—চিঁড়ে ভিজিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি কর, নয় তো নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাবে। খালের মধ্যে সে দু-বেটা পেটের জ্বালায় এতক্ষণ আমায় বাপান্ত করছে।

রান্নাঘরে গিয়ে চারুবালা জগাকে ডাকল। আয়োজন পরিপাটী। চিঁড়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। নলেনের সুগন্ধ পাটালি। কলাগাছের নতুন ঝাড়ে কাঁদি পড়ে পেকেও গিয়েছে এককাঁদি মর্তমান-সবরি। এর উপরে কড়াইতে সর-আঁটা দুধ আছে। ভাত নেই, তা বলে খাওয়ার কোন্ অসুবিধা গৃহস্থ-বাড়ি !

জগা খিঁচিয়ে ওঠে : রোগা না খোকা যে আমি দুধ খেতে যাব ?

এমনি সময় ডোবার জলে পরিষ্কৃত হয়ে তিন জোড়া পা চলে এল উঠানের উপর। জগা উঁকি দিয়ে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে, আরে ব্যস, বড়দা এসে পড়েছে, আর ভাবনা কিসের ? বড়দাকে না বলতে পেরে কথাগুলো টগবগ করে ফুটছিল গলা পর্যন্ত এসে।

গগন বলে, জগন্নাথ নাকি ? আহা, উঠছ কেন, খাও। চৌধুরি-বাবুদের কাণ্ড শুনেছ ? নতুন ঘেরির খাজনা বলে তিন-শ বাইশ টাকার একতরফা ডিক্রি করেছে আমার নামে। সায়ের থেকে উচ্ছেদের নালিশ করেছে। দেওয়ানি আর ফৌজদারি মিলে তিন নম্বর একসঙ্গে রুজু হয়ে গেছে।

জগা বলল, আরও বেশী জানি বড়দা। তুমি জান, যেটুকু এখন অবধি করেছে। আরও যা-সব করবে বলে মনে মনে মতলব ভাঁজছে, তা-ও জেনে এসেছি আমি।

গগনের সঙ্গে হর ঘড়ুই। আর একটা নতুন লোক—নিতান্তই

অস্থিসর্বস্ব, বিধাতা হাড়ের উপর মাংস ছোঁয়াতে ভুলে গেছেন, লোকটিকে দেখে তাই মনে হয়। নতুন লোক দেখে জগন্নাথ বলতে বলতে থেমে গেল।

গগন পরিচয় দেয়ঃ চক্কোত্তি মশায়। সদরের পুণ্ডরীক বাবু উকিল—তাঁর সেরেস্তায় বসেন। টৌর্নিগিরি কাজ। বরাপোতায় কিছু জমিজিরেত আছে, অবরে-সবরে আসেন। আমরা চক্কোত্তি মহাশয়কে এই অবধি টেনেটুনে নিয়ে এলাম। রাতটুকু থেকে কাল সকালে বরাপোতা যাবেন। মামলা-মোকর্দমা আমরা তেমন বুঝি নে তো। নগেনশশী বোঝে ভাল। দু-জনে শলাপরামর্শ করে উপায় বাতলে দিন। নগেন কি বলে শোনা যাক। সে-ও বুঝি কালীতলায় পড়ে? তাড়াতাড়ি সেরে নাও জগা, আমরাও যাই চল চক্কোত্তি মশায়কে নিয়ে। তুমি কি জেনে এসেছ, শুনতে শুনতে যাব।

চারু তিক্ত কণ্ঠে বলে, যেতে হবে না দাদা। চুপচাপ থাক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে-ই কতবার চক্কোর দেয় দেখতে পাবে।

গগন বলে, সে ভরসায় কী করে থাকা যায়! সকালবেলা চক্কোত্তি মশায় চলে যাবেন। পূজো দেখে সে হয়তো একেবারে রাত কাবার করে ফিরল।

জগাও যেতে চায় না। কষ্ট করে এল, চারুবালা সামনে বসে খাওয়াচ্ছে—আধ-খাওয়া করে ছোটে এখন কালীতলায়। বলে, তোমরা যাও বড়দা। আলায় জরুরী কাজ। সীল করতে আসছে, এক্ষুনি মাল সরাতে হবে। নগনা আসুক আর না আসুক পচা-বলাই ঐ দুটোকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাওগে। একলা হাতে পেরে ওঠা যাবে না।

গরুর-গাড়ির বৃত্তান্ত বলল। শুনে গগনের মুখ শুখায়। টৌর্নি চক্কোত্তি ইতিমধ্যে আলাঘরে গিয়ে উঠেছেন, হরঘড়ুই মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে। গগন ব্যস্ত হয়ে গিয়ে ডাকে, কালীতলায় গেছে আমার শালা। যাবেন?

মাদুর পেয়ে চক্কোত্তি গড়িয়ে পড়েছেন। বলেন, কিছু মনে করো না দাস মশায়। এককৌঁটা বুদ্ধি নেই তোমার ঘটে—ঘেরি কী করে চালাও জানি নে। পাটোয়ারী কথাবার্তা কালীতলায় একহাট লোকের মধ্যে হয় নাকি? না হওয়া উচিত? আমিও দেখা দিতে চাই নে। লোকে ভাববে, চক্কোত্তি মশায় যখন উপস্থিত, কী একখানা কাণ্ড ঘটেছে। তাড়াই বা কিসের এত? বুদ্ধি-পরামর্শ ভেবে চিন্তে দিতে হয়। এক কাজ কর, তামাক সেজে আন দিকি আগে। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নিই। থেকেই যাব না হয় কালকের দিনটা।

জগা ওদিকে বলছে, কি গো চারুবালা, ভাত রান্নার তো উপায় নেই—টৌর্নি চক্কোত্তি মশায়কে বড়দা ডেকে নিয়ে এল, এরাও সব চিঁড়ে খেয়ে রাত কাটাবে নাকি?

চারুবালা হারবার মেয়ে নয়। চোখ-মুখ নাচিয়ে সে বলে, ভালই তো হল চক্কোত্তিকে ডেকে এনে। বামুন মানুষ উনি রাঁধবেন, নীচু জাতের আমরা মজা করে খাব।

ছত্রিশ

জগা আর চারু দিব্যি তো হাসাহাসি করছে রান্নাঘরে চালের নীচে জমিয়ে বসে। চারুবালা সামনে বসে খাওয়াচ্ছে। মুশকিল ওদিকে খালের মধ্যে—প্রমথ আর নিবারণের নড়াচড়ায় গাড়ির চাকা আরও অনেকখানি বসে গেছে। জগা লোক ডাকতে গেছে তো গেছে। ক'ঘণ্টা কিম্বা ক'দিন লাগায় তাই দেখ। পৈতেধারী সদ্‌ব্রাহ্মণের কাছে কথা দিয়ে গেল, তা বলে দৃক্‌পাত নেই। গরুর-গাড় ঠেলাঠেলির পর পথের উপর কোনখানে গুঁটিসুঁটি হয়ে গড়িয়ে পড়ল নাকি? কিছুই বিচিত্র নয় জঙ্গলে এই বিচ্ছুগুলোর পক্ষে।

নিবারণ, কি করা যায় বল তো?

ভ-র্-র্-র্ করে নাক ডেকে নিবারণ জবাব দিল। বিচালির আঁটি ঠেশ দিয়ে আরামে দিব্যি সে গা ঢেলে দিয়েছে। রাগে প্রমথর সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে খালের জলে। কিন্তু চাপরাসী হলেও আদালতের কর্মচারী সরকারী মানুষ। সমীহ না করে উপায় কি!

নিবারণ, তুমি বাপু নরদেহে নারায়ণ। থই-থই ক্ষিরোদ সমুদ্দুর, তার মধ্যেও নাক ডেকে ঘুম দিচ্ছ। বালিশ অভাবে নারায়ণ একটা পটোল মাথায় দিয়েছিলেন, তোমার কিছুই লাগে না।

বাইরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখেন প্রমথ। আরে সর্বনাশ, মহা-প্রলয় আসন্ন, কিছুই ঠাহর করেন নি এতক্ষণ। জোয়ার এসে গেছে, খালের জল হু-হু করে বাড়ছে। খরস্রোত আবর্তিত হয়ে ছুটেছে। গাড়ির পাটাতনের উপর বসে তাঁরা—জল এরই মধ্যে ছোঁব-ছোঁব করছে। বেটা গাড়োয়ান ডুবিয়ে মারবার ফিকিরে এইখানে গাড়ি আটকে সরে পড়ল নাকি? মতলব করে খালে এনে ফেলেছে?

ওহে নিবারণ, উঠে দেখ কাণ্ড। জীবন নিয়ে সঙ্কট, এখনো চোখ বুজে পড়ে আছ।

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর নিবারণ অবশেষে চোখ কচলে খাড়া হয়ে বসল।

ডাঙায় ওঠ নিবারণ। আর খানিক থাকলে টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

তাই তো বটে!

তড়াক করে নিবারণ গাড়ির পাটাতন থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। এবং হালকা মানুষ—পাড়েও উঠে পড়ল পলকের মধ্যে। কিন্তু প্রমথর পক্ষে ব্যাপারটা সহজ নয়। নিবারণের পুরো দেহখানা পাল্লায় তুলে দিলে যা ওজন দাঁড়াবে, নায়েবের শুধুমাত্র ভুঁড়িখানাই বোধ করি তাই। তার উপর সাঁতারের কায়দাকানুন জানা নেই তাঁর। জানলেই বা কি—হিমালয় পর্বত জলে ভাসবে না যত কায়দাই করা যাক না কেন।

শুকনো ডাঙার উপর দাঁড়িয়ে নিবারণ হাঁক পাড়ছেঃ হল কি নায়েব মশায়! পা চালিয়ে আসুন। জায়গাটা গরম বলে মালুম হয়। বদখত একটা গন্ধ পাচ্ছেন না নাকে?

যেখানে বাঘের চলাফেরা, তেমনি সব জায়গাকে গরম বলে। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে প্রমথর কি অসাধ? কিন্তু এক একখানা পা ফেলছেন, ভারী দুরমুশের মত গিয়ে পড়ছে—সেই পা তারপর টেনে তোলা দায়। নিরাপদ ডাঙার উপর দাঁড়িয়ে নিবারণ ভয় ধরাবে না কেন—তার পালানোয় মুশকিল কিছু নেই।

ডাঙার কাছাকাছি হতে নিবারণ খানিকটা নেমে এসে হাত বাড়িয়ে হিড়-হিড় করে প্রমথকে টেনে তুলল। ভালমানুষের মত বলে, গন্ধ কেন বেরোয়, জানা আছে তো নায়েব মশায়।

বিরক্ত মুখে প্রমথ খিঁচিয়ে ওঠেনঃ না, জানি নে বাপু। রাত দুপুরে কে তোমায় ও-সব মনে করিয়ে দিতে বলছে?

নিঃশব্দে কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ নিবারণ দাঁড়িয়ে পড়ল। বারকয়েক সশব্দে নাক টেনে বলে, গন্ধটা বেশী-বেশী লাগে। আর এগোব না। ওই দিকে রয়েছেন নিশ্চয় ওত পেতে।

কিন্তু একা নিবারণই গন্ধ পাচ্ছে, প্রমথর নাকে কিছু লাগে না। রাগ করে তিনি বলেন, পথের উপরে কু-ডাক ডাকছ, হয়েছে কি বল তো চাপরাসী?

নিবারণ বলে, একটা-কিছু উপায় দেখবেন তো! চুপচাপ এগিয়ে চলব, আর পথের উপর থেকে জলজ্যান্ত দুটো প্রাণী টুক করে তিনি জলযোগ সেরে যাবেন, আপসে সেটা কেমন করে হতে দিই?

একটা উঁচু কেওড়াগাছ তাক করে বলে, আমি মশায় দোডালার উপর উঠে বসি গে। যদি কিছু দেখতে পাই, আপনাকে বলব। সমন নিয়ে রাত্তিরবেলা জঙ্গল ঠেলে পায়ে হাঁটতে হবে, এমনি কি কথা ছিল? বলুন।

দীর্ঘ গুঁড়ি—ডাল উঠেছে অনেকটা উপর থেকে। প্রমথ

অসহায়ভাবে গাছের দিকে তাকান। জায়গা নিরাপদ, সন্দেহ নেই। নিবারণের বড় সুবিধা—দেহ নয়, যেন লিকলিকে বেত একগাছা, যেদিকে যেমন খুশি নোয়ানো যায়। মালকোঁচা মেরে সে গাছে ওঠার যোগাড় করছে।

প্রমথ কাতর হয়ে বলেন, দু-জনে একসঙ্গে যাচ্ছি। আমায় বাঘে খাবে, আর ডালের উপর বসে বসে মজা করে দেখবে তুমি! এই বাপু ধর্ম হল? ভাল লাগবে দেখতে?

নিবারণ হাঁ-হাঁ করে ওঠে: সর্বনাশ, কী করলেন, অসময়ে বড়-নিঞার নাম ধরে ডেকে বসলেন! গাছ তো কেউ ইজারা নিয়ে নেয় নি, সবাই উঠতে পারে। আপনিও উঠে পড়ুন না মশায়।

প্রমথ মুখ ভেংচে স্বরের অনুকৃতি করে বলেন, উঠে পড়ুন না মশায়! এমনি হবে না, মশায়কে উঠতে হলে কপিকল খাটাতে হবে গাছের মাথায়। উঠেও তার পরে ঐ সব ডাল ভর সইতে পারবে না, মড়মড় করে ভেঙে পড়বে।

যে-কেউ সেটা আন্দাজ করতে পারে। অলক্ষ্যে নিবারণ হাসি চেপে নিল। অদূরের জঙ্গলটায় কি-একটা শব্দ এমনি সময়। ভয়ার্ত কণ্ঠে নিবারণ বলে, পচা গন্ধ পান এবারে? বড্ড যে কাছে এসে গেল। কী হবে!

প্রমথ পিছনে তাকিয়ে বলেন, তুমি ঢিল ছুঁড়লে নাকি নিবারণ? আমায় ভয় দেখাচ্ছ?

নিবারণ কথা শেষ হতে দেয় না: দৌড়ন মশায়। এল। এবং গাছে না উঠে দিল সে চোঁচা দৌড়। দৌড়ানো কর্মেও ওস্তাদ—দুই পায়ে ঈশ্বর এত ক্ষমতা দিয়েছেন! সাঁ-সাঁ করে ছুটল। প্রমথ কি করেন—বিপুল দেহ নিয়ে যথাসাধ্য ছুটলেন পিছন ধরে। ব্যবধান বাড়ছে ক্রমেই—এমন হল, ভাল করে নজরেই আসে না। তবে জঙ্গলটা গিয়ে ফাঁকায় এসে গেছেন এবার। দু-পাশে বাঁধা ঘেরি, মাঝখানে বাঁধ।

এতক্ষণে সাহস পেয়ে প্রমথ হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকছেন:

দাঁড়াও চাপরাসী। আর পারছি নে। ফাঁকার মধ্যে আর এখন তেড়ে আসবে না।

নিবারণ বলে, আসবে না কি করে বলেন ? কপালে যদি থাকে ঘরের মধ্যে দুয়োরে খিল দিয়ে তক্তাপোশের উপর ঘুমুচ্ছেন, সেইখান থেকে মুখে করে নিয়ে যায়। এমন কত হয়ে থাকে !

প্রমথ আগুন হয়ে ওঠেন ঃ ভয় দিও না চাপরাসী, ভালর তরে বলছি। ঘোরাঘুরির কাজ তোমার, খাতাপত্তোর খুলে আমরা এক জায়গায় বসে থাকি। এমনি পেরে উঠি নে, তার উপরে আজেবাজে কথা বলে আরও ঘাবড়ে দিচ্ছ।

ঢাকের বাজনা থেমে ছিল অনেকক্ষণ, আবার বেজে উঠল। তাই তো, পাড়ার মধ্যে এসে গেছেন একেবারে। অদূরে আলো মিটমিট করছে, ঘরবাড়ি বলে মালুম হয়।

মাটির পাঁচিল। নিবারণ বলে, বাদাবনের এই রীত। ঘর হোক না হোক, পাঁচিল আগে তুলবে। পাঁচিল তুলে বাস্তুর গণ্ডি ঘিরে নেওয়া। রাতবিরেতে হাওয়া খেতে খেতে ওঁরা যাতে ঢুকে না পড়েন।

প্রমথ ঠাহর করে দেখে বলেন, কিন্তু এটা কি করেছে—সামনের দিকে আলগা কেন অতটা ? পাঁচিল দেওয়ার তবে কি ফল হল—যাদের যাবার তারা তো এই পথে ঢুকে পড়বে। এই যেমন আমরা।

নিবারণ বলে, শেষ তুলতে পারে নি, খানিকটা এই বাদ রয়ে গেছে। সামনের বার শেষ করে ফেলবে। তা বলে ফল কিছু হয় নি, অমন কথা বলবেন না। বাদাবনে যত আছেন, দুপেয়ে জীবকে ভয় করেন সবাই। তা সে জন্তুজানোয়ার হোন, আর জিন-পরীই হোন। গণ্ডি ঘিরে মানুষে ঘাঁটি করে আছে, এগোবার মুখে অনেক বার আগুপিছু করবে।

দু-জনে উঠানের উপর চলে এসেছে। মৃদু কথাবার্তা আসছিল রান্নাঘরের ভিতর থেকে। মানুষ দেখে চুপ।

তীক্ষ্ণ স্ত্রী-কণ্ঠের প্রশ্ন : কারা ওখানে ?

আমরা—

আমরা বললে কি বোঝা যায় ? কারা তোমরা ? আসছ কোথা থেকে ? বাড়ি কোথায় ?

সীল করতে বেরিয়ে আদালতের চাপরাসী মরে গেলেও আত্ম-পরিচয় দেবে না। দস্তুর এই। সীলের চাপরাসী এসেছে - খবর যেন বাতাসের আগে ছোটে। দেনদার সামাল হয়ে যায়। নিবারণ কাতর স্বরে বলে, পথ-চলতি মানুষ। ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়েছি। রাতটুকু কাটিয়ে যাব—খেতে চাই নে মা-জননী, শুধু একটু শুয়ে থাকব।

টেমি হাতে চারুবালা বেরিয়ে এল। আলাঘর দেখিয়ে দেয়। সর্বরক্ষে! নিবারণ সগর্বে তাকায় প্রমথর দিকে। দয়া হয়েছে তার কথা বলার কায়দায়। উহুঁ, দয়া ঠিক বলা চলে না -বাদা অঞ্চলের রেওয়াজ এই। রাত্রিবেলা অতিথি এলে ফেরাবার নিয়ম নেই। দিতেই হবে আশ্রয়—নইলে জানোয়ারের মুখে যাবে নাকি সে মানুষ। ঘুরতে ঘুরতে আসেও অনেকে—ভাগ্য খুঁজতে নতুন যারা জঙ্গলরাজ্যে এসে পড়েছে।

আলাঘরে পা দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে প্রমথ বলেন, কোথায় এসে পড়লাম মালুম হচ্ছে না তো।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে গগন অভ্যর্থনা করে : আসতে আজ্ঞা হয়। আসুন, বসুন—

প্রমথ বলেন, কোন্ জায়গা, কার বাড়ি ? এ দিকটা আমার এই প্রথম আসা কিনা!

সাঁইতলা ডাক এই জায়গার। অধীনের নাম শ্রীগগনচন্দ্র দাস। জঙ্গল কেটে নতুন একটু ঘেরি বানিয়েছি বলে সকলে আজকাল ঘেরিদার গগন বলে।

কী সর্বনাশ! প্রমথ ও নিবারণে চোখোচোখি হল। তখন

একেবারে ঘরের মধ্যে। এবং বাইরে বেরুলেই তো নিবারণ চাপরাসীর নাকে পচাগন্ধ আসবে, ও জঙ্গলে নড়াচড়া হবে। নইলে প্রমথ সেই মুহূর্তেই দুড়দাড় ছুটে বেরুতেন।

চক্রবর্তী দেয়াল ঠেস দিয়ে আধেক চোখ বুজে ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক টানছিলেন। আর গণ্ডগোল সম্পর্কে নিম্নকণ্ঠে উপদেশ দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। মানুষের সাড়া পেয়ে থেমে গিয়েছিলেন। সেই মানুষ দুটো ঘরে উঠে পড়ল তো সোজা হয়ে বসলেন তিনি। প্রমথ ব্রাহ্মণ বলে, নিজের মাদুরের প্রান্তে জায়গা দেখিয়ে দিলেন নিবারণ চাপরাসী ঘড়ুইয়ের মাদুরে গিয়ে বসল।

হুঁকোর মুখ মুছে চক্রবর্তী প্রমথর দিকে এগিয়ে দিলেন: তামাক ইচ্ছে করুন।

মউজ করে এবারে আলাপ-পরিচয়।

টৌর্নি মানুষ চক্রবর্তী—সেই হেতু রীতিমত এক জেরার ব্যাপার। আর প্রমথ হালদারও কম ব্যক্তি নন—তিনি এক মর্ম-ভেদী গল্প ফেঁদে বসেছেন। নাম হল তাঁর জনার্দন মুখুজ্জে। কাজকর্মের চেষ্টায় বেরিয়েছেন তিনি, এবং সঙ্গের এই লোকটি। আরও নাবালে কাঁটাতলা অঞ্চলে কারা নাকি লাট ইজারা নিয়ে বন কাটছে। এদিকে সুবিধা না হলে সেই কাঁটাতলা অবধি চলে যাবেন। লোকজন খাটানো হিসাবপত্র রাখা এই সমস্ত কাজ ভাল পারেন তিনি। মোটের উপর, ডাঙা-অঞ্চলে আর কিছু নেই। পোকার মতন মানুষ কিলবিল করে। পোকায়-জরো-জরো ঐ মানবেলায় পড়ে থেকে বাঁচা যাবে না। বাঁচতে হলে নতুন জায়গায় বসত গড়তে হবে। যেমন এই এঁরা সব করেছেন।

গগন তিক্তস্বরে বলে, সে-ও আর থাকছে কোথা ঠাকুর মশায়? মানুষের ক্ষিধের অন্ত নেই। দেদার খাবে, আবার ছেলেপুলের জন্য রাজ্যপাট বানাবে। ক্ষ্যাপা মহেশ বলে একজনে ঘোরাফেরা করে। ঝানু বাউলে, কথাবার্তাও বলে বেশ খাসা। সে বলে, বড়লোকের নজর লেগেছে—পোকায় ধরেছে, এ ঘেরির আর বাড়-

বাড়ন্ত হবে না। আরও নাবালে, একেবারে সাগরের মুখে গিয়ে দেখ। কিন্তু গিয়ে কি হবে, সেখানেও তো গিয়ে পড়বে বড় বড় মানুষ। কত হাঙ্গামা করে বনের মধ্যে ক-খানা ঘর তুলে নিয়েছি, এত দূরেও শনির দৃষ্টি।

জগন্নাথের চিঁড়ে খাওয়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কানাচে এসে একটুখানি ওদের কথাবার্তা শুনল। হাসে। চারুবালাকে চুপি চুপি বলে, শোনগে কী বলছে সেই বেটা নায়েব। ভারী ভারী সমস্ত কথা। ভূতের মুখে রামনাম। আমি সামনে যাচ্ছি নে। খালের মধ্যে রেখে পালিয়ে এসেছিলাম। গেলে ধরে ফেলবে। পচা-বলাই এখনো আসে না—পায়ে পায়ে এগিয়ে দেখি। বাড়িতে তোমাদের ভাল ভাল অতিথ—বিস্তর রান্নাবান্না হবে। আমিও কিন্তু অতিথ আজকে। চিঁড়ের ফলারে শোধ যাবে না, ভাতও খাব।

সাঁইত্রিশ

চারুবালা এসে প্রমথকে ডাকে: উঠুন ঠাকুর মশায়। উনুন ধরিয়ে চালডাল গুছিয়ে এলাম। চাপিয়ে দিন এবারে গিয়ে।

ছুটোছুটির কষ্টে ক্ষিধে খুব প্রবল। খেতে হবে তো বটেই। কিন্তু পরোপকারে প্রমথর ভারী বিতৃষ্ণা। উনুনের ধারে সেঁকা-পোড়া হয়ে তিনি রেঁধে দেবেন, অন্য সকলে মহানন্দে রাঁধা ভাত নিয়ে বসবে—ভাবতে গিয়ে দেহ যেন এলিয়ে আসে। আড়মোড়া ভেঙে বললেন, আমার অত হাঙ্গামা পোষাবে না। প্রাকটিসও নেই। গৃহস্থঘরে যা থাকে দাও। আর ঘটি দুয়েক জল। রাতটুকু স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।

নিবারণ বলে, ভাত বিনে আমার কিন্তু চলবে না। স্পষ্ট বলছি। আমি হাঙ্গামা পোহাব। রাঁধিও ভাল। চল মা, রান্নার জায়গা দেখিয়ে দেবে।

উদ্যোগী পুরুষ—মুখে বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। চারুবালার সঙ্গে রান্নাঘরে যেতে প্রস্তুত। প্রমথ খিঁচিয়ে উঠলেন : তোমার এ সাউখুরি কেন বল তো? রেঁধে খাওয়াবার শখ তো ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলে না কেন? তোমার রান্না কে খেতে যাচ্ছে? একা তুমি খাবে, আমরা সবাই চেয়ে চেয়ে দেখব—তাই বা কেমন হবে বিবেচনা কর।

নিবারণ বলে, কি করতে পারি বলুন মশায়? আপনাদের কারও তো গরজ দেখি নে।

চক্রবর্তীর দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রমথ বললেন, সদ্‌ব্রাহ্মণ আরও তো রয়েছেন আমি ছাড়া।

চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমার কথা বলেন তো নাচার। দুপুরবেলা বিষম খাওয়ান খাইয়েছে—গলায় গলায় এখনও। ভাত বেড়ে আসনে সাজিয়ে দিলেও খেতে পারব না।

টোর্নি মানুষ কত রকমের মক্কেল ভাজিয়ে খান। ধৈর্য সকলের বড় গুণ, জেনেবুঝে বসে আছেন। ধৈর্য ধরে চুপচাপ চেপে বসে থাকুন, গরজ দেখাবেন না, নড়াচড়া করবেন না—সিদ্ধি পায়ে হেঁটে আপনার কাছে হাজির হবে।

ঢেকুর তুলে চক্রবর্তী বললেন, দাস মশায় আর ঘড়ুই মশায় মিলে যা ব্রাহ্মণ-সেবাটা করল, তিন দিন আর জলগ্রহণ করতে হবে না। চারু, একটা পাশবালিশ দিতে পার তো এই মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ি। চক্রবর্তী ঠাকুর খান বা না খান, শোন ভাল। শিয়রের বালিশ না হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পাশবালিশ ছাড়া ঘুম হবে না।

নিবারণ রাগ করে বলে, বামনাই ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়ে আমি যে মশায় ক্ষিধেয় মারা পড়ি। পেটের নাড়িভুঁড়ি অবধি হজম হয়ে যাচ্ছে। আমার মতন আমি চাট্টি ফুটিয়ে নিই গে।

প্রমথ হালদার তড়াক করে উঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন : একটা মিনিট ক্ষিধে চাপতে পার না, তা বাইরে এত ঘোর কেমন করে? বসে থাক তুমি, আমি যাচ্ছি।

নিবারণ না-না করে ওঠেঃ মশায়ের যে প্রাকটিস নেই। হাত-টাত পুড়িয়ে ফেলবেন শেষটা। রান্নাও ভাল হবে না। মুড়ি খেয়ে থাকবেন, তাই থাকুন না মশায়।

প্রমথ ধৈর্য হারিয়ে বললেন, রান্না হয়ে যাক- খেয়ে দেখো প্রাকটিস আছে কি নেই। বকর-বকর কর কেন, শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছিলে তাই নাচাও আবার।

চারুকে বলেন, কোথায় কি যোগাড় করেছ, চল।

চারুবালার সঙ্গে প্রমথ রান্নাঘরে গেলেন। খিক-খিক করে চাপা হাসি হাসে নিবারণ। চক্রবর্তীর কাছে জাঁক করে বলে, জাতে ছোট হওয়ার কত সুবিধা, বুঝে দেখুন চক্কোত্তি মশায়। আমাদের হাতে কেউ খাবে না, আমরা মজা করে সকলের হাতে খাব। ঝামেলা পোহাতে হল না তাই। কিন্তু আপনি যে সত্যি সত্যি শুয়ে পড়লেন, একেবারে নিরম্বু রাত কাটাবেন?

চক্রবর্তী সে কথার জবাব না দিয়ে উচ্চকণ্ঠে চারুকে ডাকলেন, শুনে যাও তো মা একবার এদিকে?

চারু এলে বললেন, মুখুজ্জে মশায় রাঁধতে গেলেন তো আমারও একমুঠো চাল দিয়ে দিও।

চারুবালা হেসে বলে, সে জানি। চাল আমি বেশী করে দিয়েছি।

হর ঘড়ুই বলে, ব্রাহ্মণের প্রসাদ আমিও চাট্টি পাই যেন।

চারু বলে, তুমি একলা কেন, বাড়ি সুদ্ধ সবাই আমরা প্রসাদ পাব। হিসেব করে চাল মেপে দিয়েছি।

বেশ, বেশ! পরম উল্লাসে নিবারণ ঘাড় দোলায়ঃ এক যজ্ঞির রান্না রাঁধিয়ে নিচ্ছ তবে তো! খাসা রাঁধেন, আমি খেয়েছি ওঁর রান্না। এক দোষ, পরের উপকারে আসবে শুনলে মন বিগড়ে যায়। আজকের রান্নাই বা কী রকমটা দাঁড়ায় দেখ!

রান্নাঘরের ভিতরে প্রমথ ওদিকে তেরিয়া হয়ে উঠেছেনঃ আস্ত এক এক পশুরের গুঁড়ি— গোটা বাদাবন তুলে এনে রান্নাঘরে

ঢুকিয়েছে। এই কাঠ ধরাতেই তো রাতটুকু কাবার হয়ে যাবে।

নায়েবের অবস্থা বুঝে নিবারণের মায়া হল বোধ হয়। বলে, মাথা গরম করবেন না। রান্নায় তা হলে জুত হবে না। দা-কাটারি একখানা দাও দিকি ভালমানুষের মেয়ে, আমি কাঠ কুচিয়ে দিচ্ছি।

জগার কাছে শুনে পচা বলাই রাধেশ্যাম এবং আরও দু-তিন মরদ কালীতলার দিক থেকে এসে পড়ল। গগন আর হর ঘড়ুইও জুটেছে তাদের সঙ্গে। গোয়ালের গরু বের করে কোথায় নিয়ে গেল। কামরার তক্তাপোশটাও ধরাধরি করে নিয়ে চলল। প্রমথ রান্না করেন আর দেখেন। রাঁধেন তিনি সত্যিই ভাল। ভাত আর হাঁসের ডিমের তরকারি নেমে গিয়েছে, মুগের ডাল ফুটছে। আহা-মরি কী সুগন্ধ! রান্নাঘরের সামনে গগন এসে তাগিদ দেয়ঃ আর বেশী কাজ নেই, নামিয়ে ফেলুন দেবতা।

প্রমথ বলেন, খুব ক্ষিধে পেয়ে গেল?

গগন বলে, আজ্ঞে না, ক্ষিধের কারণে বলছি নে। গোলমালের ব্যাপার আছে আজ। আমাদের যখন হয় হবে, বিদেশী মানুষ আপনারা তাড়াতাড়ি সেবা শেষ করে নিন। তার পরে মশায়দের পার করে বরাপোতার দিকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ বলে, বেশ তো আছি ভাই, রাতদুপুরে আবার পারাপার কেন? একটা চট-মাদুর যা হোক কিছু দিও, তোমার ঐ আলাঘরে কিছু দিতে পার, তাতেও ক্ষতি নেই। মেজের পড়ে ঘুমব

গগন বলে, ঘুম হবে না এদিগরে থাকলে। তবে আর বলি কেন!

হর ঘড়ুই ঐ সঙ্গে যোগ দেয়ঃ একটা রাতের তরে অতিথ এসেছেন, গণ্ডগোলে থাকার কী দরকার? তাড়াতাড়ি চাট্টি খেয়ে নিয়ে গাঙ পার হয়ে সরে পড়ুন।

কী একটা বড় ব্যাপার আছে, মানুষগুলোর গতিক দেখে বোঝা যায়। এক দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, চরকির মত ঘুরছে। এই রকম আধাআধি বলে গগনও ছুটে বেরুল আবার কোন্ দিকে।

প্রমথ জানবার জন্য আকুলিবিকুলি করছেন। চারুবালাকে ইশারায় কাছে ডেকে বলেন, ওরা কি বলে গেল, মানে তো বুঝলাম না।

নিম্নকণ্ঠে চারু বলে, কালীতলায় পুজো হচ্ছে। নরবলি ওখানে।

সে কি গো!

বলবেন না কাউকে! খবরদার, খবরদার! আমার আবার মস্ত দোষ, পেটে কথা থাকে না। সমস্ত বলে-কয়ে অবসর হয়ে যাই। টের পেলে পাড়ার ওরা আমাকেই ধরে হাড়িকাঠে ফেলবে।

কিন্তু চারুকে নিয়ে যা-ই করুক অতিথিদের সেজন্য মাথাব্যথা নেই। নিবারণ বলে, বলছ কী তুমি! জলজ্যান্ত মানুষ ধরে বলি দেবে—থানা-পুলিসের ভয় করে না?

চারু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলে, এমন কত হয়ে থাকে! থানা তো একদিনের পথ এখান থেকে। কুমিরমারিতে এক চৌকি আছে—শুনেছি, জন দুই-তিন সিপাহি সেখানে তিন বেলা ঠেসে মাছ-ভাত খেয়ে নাক ডেকে ঘুমোয়। ধরবে কি করে? বলির পরে পূজোআচ্চা হয়ে গেলেই তো ধড়-মুণ্ডু গাঙে ছুড়ে দেয়। টানের মুখে সেসব দূর-দূরস্তর চলে যায়, কামটে খুবলে খুবলে খেয়ে দু-দশ খানা হাড় শুধু অবশেষ থাকে।

প্রমথ সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, এ যে বাবা মগের মুলুক একেবারে!

চারু বলে, বাদা মুলুক। বাদায় মানুষ কাটিতে হাঙ্গামা নেই। কাটে যত বাইরের মানুষ ধরে ধরে। বাদার বাসিন্দা তারা নয়। তাদের কোন খোঁজখবর হয় না। এই যত শোনেন, সাপে কাটল বাঘ-কুমিরের পেটে গেল—সবই কি তাই? মায়ের ভোগেই যাচ্ছে বেশির ভাগ। পাঁচ-সাতখানা বাঁক অন্তর এক এক মায়ের

খান—তাঁরা কি উপোসী পড়ে থাকেন! সমস্ত কিন্তু সাপ-বাঘের নামে চলে যায়।

শুনে প্রমথ হালদার থ হয়ে গেছেন। বাদা-রাজ্যের এ হেন পূজা-প্রকরণ বাইরের লোকের অজানা। মুগের ডাল কড়াইয়ে টগবগ করছে, প্রমথ দেখেও দেখছেন না। নিবারণ বলে, ডালে খানিকটা জল ঢেলে দাও ঠাকুর মশায়। ধরে যাবে, খাওয়া যাবে না।

প্রমথ বলেন, রাখ বাপু এখন ডাল খাওয়া। মানুষ কেটে মায়ের পূজো—কী সর্বনাশ! গা-মাথা আমার ঘুলিয়ে আসছে। খাওয়া মাথায় উঠে গেল।

চারু বলে, কিন্তু ভাল মানুষ কখনো বলি হবে না। বাদার যারা মন্দ করতে আসে, কালী করালী তাদেরই রুধির খান। তাদেরও ভাল—মায়ের ভোগে লেগে মুক্তি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

সহসা গলা নামিয়ে নিরীহ কণ্ঠে বলে, জানেন মুখুজ্জে মশায়, ভারী এক শয়তান-ফেরেব্বাজ আজ নাকি বাদায় আসছে। প্রমথ হালদার নাম—ফুলতলার কাঙালি চক্কোত্তির ছেলে অনুকূল চৌধুরি, তাদের নায়েব। আমাদের উচ্ছেদ করে এই নতুন-ঘেরি গ্রাস করবার নানা রকম প্যাঁচ কষে বেড়াচ্ছে সেই লোক।

প্রমথ তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেন। কিন্তু চারুবালা ছাড়ে না। বলে, অমন কূটকচালে লোক শুনেছি চাঁদের নীচে নেই। আমি দেখি নি মানুষটাকে। আপনারা দেখেছেন?

নিবারণের দিকে তাকিয়ে প্রমথ তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, না না, আমরা দেখব কোথায়?

চারুবালা সহসা খুব কাছে এসে ঘনিষ্ঠভাবে বলে, একটা কথা বলি মুখুজ্জে মশায়। দাদা আপনাদের বরাপোতা চলে যেতে বলছেন। কক্ষনো যাবেন না। কিম্বা গেলেও নরবলির সময়টা লুকিয়ে এসে চোখে দেখে যাবেন। এত বড় সুবিধা হয়ে গেল তো ছাড়বেন কেন? নরবলি আমাদের দেখতে দেবে না। কি করব—

মেয়েমানুষের রাত্তিরে একা-দোকা বেরুতে সাহস হয় না। ঘরে বসে বলির বাজনা শুনব।

প্রমথ বলেন, বলি দিচ্ছে কাকে ? কোথায় রেখেছে মানুষটাকে—দেখেছ তুমি ?

চারু ফিসফিস করে বলে, আপনাদের বলছি। চাউর হয়ে না যায়, খবরদার ! ওরা বলা-কওয়া করছিল, চুরি করে আমি শুনে নিয়েছি। নায়েব প্রমথ হালদারের কথা হল না—বলি দেবে সেই মানুষটাকে। মিথ্যে মামলা সাজিয়ে আমাদের দায়িক করেছে, জিনিসপত্তোর ক্রোক করে নিতে আসছে আজকে তারা।

নিবারণ আর ধৈর্য রাখতে পারে না।

সব মালই তো পাচার করে দিলে। পাড়াসুদ্ধ মিলে করলে তাই এতক্ষণ ধরে। রান্নাঘরে আছি, কিন্তু চোখ দুটো মেলেই আছি মা-লক্ষ্মী। জিনিসের মধ্যে আছে ওই মেটে-হাঁড়ি, ফুটো-কড়াই আর ছেঁড়া-মাদুর গোটাকয়েক। ক্রোক করতে এসে নৌকো-ভাড়াও তো পোষাবে না। কে এক বাজে খবর রটাল - তাই অমনি একদল মাল বওয়াবয়িতে লেগেছে, আর একদল হাড়িকাঠ পুঁতে খাঁড়া উঁচিয়ে আছে কালীতলায়।

চারু বলে, খবর বাজে নয়। দাদা নিজে গিয়ে সদর থেকে জেনে এসেছে। আসছিল নাকি সেই প্রমথ। তা আচ্ছা এক কায়দা হল—খালের ভিতর গরুর-গাড়িতে আটকে রেখে এসেছে। চার-পাঁচ জন বেরিয়ে পড়েছে, হাত-পা বেঁধে চ্যাংদোলা করে এনে ফেলবে এক্ষুনি।

প্রমথ সাহস করে বলে ফেললেন, এ-ও তো বিষম ফ্যাসাদ দেখছি। সরকারী হুকুম মতে আইন মোতাবেক পরোয়ানা নিয়ে আসেই যদি সত্যি সত্যি, এরা বলি দিয়ে ফেলবে ? লাটসাহেব যা, আদালতের চাপরাসীও তাই—সবাই ওঁরা ভারত-সরকার। সরকারের বিপক্ষে যাবে—তার পরের হাঙ্গামাটা কেউ একবার ভেবে দেখবে না।

চারু সহজ কণ্ঠে বলে, হাঙ্গামা কিসের! বললাম তো সে কথা। মানষেলা নয়—এখানকার রীতব্যাভার আলাদা। ছাগল বলি দিতে দিতে তার মধ্যে এক সময় মানুষটাও টুক করে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দেবে। বালিতে ধার দিয়ে দিয়ে মেলতুকখানা এমন করে রেখেছে, সে মানুষ নিজেই ঠাহর পাবে না কখন ধড়-মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেছে। কাটা মুণ্ডু পিটপিট করে তাকাবে। ততক্ষণে ঝপ্‌পাস করে মাঝ-গাঙে ছুঁড়ে দিয়েছে। জলের টানে পাক খেয়ে পলকের মধ্যে কোথায় চলে গেল মুণ্ডু—কোথায় বা চলে গেল ধড়! বলি তো তাই। যখন এসে পড়েছেন স্বচক্ষে দেখে যাবেন কেমন সে ব্যাপার।

বলে কি মেয়েটা! কী রকম সহজ ভাবে বলে যাচ্ছে! হামেশাই যেন ঘটে থাকে, মাটি কাটা কিম্বা মাছ মারার মতোই অতি-সাধারণ এক ব্যাপার। হবেও বা! বাদাবন এক তাজ্জব জগৎ—প্রাণের দাম কানাকড়িও নেই এখানে। মানষেলায় থেকে প্রাণ বাঁচাতে না পেরে তবে মানুষ প্রাণ হাতে করে এখানে এসে পড়ে। প্রাণরক্ষার শেষ চেষ্টা। টিকে থাকল তো মাছে-ভাতে সুখেই বাঁচবে। এমন কি কাঙালি চক্কোত্তির কপাল হলে মেছো-চক্কোত্তি নাম ঘুচিয়ে চৌধুরি খেতাবও হতে পারে কোন এক দিন। কিন্তু প্রাণ হারাতেও হয় গাদা গাদা মানুষের—জন্তু-জানোয়ারের মুখে যায়; আবার এই দেখা যাচ্ছে, সোজাসুজি মানুষের কবলেও।

চারু বলে, ডালে সম্বরা দেবেন না ঠাকুর মশায়? দাঁড়ান, কাল-জিরে এনে দিই। আর বিলাতি-কুমড়া আছে ঘরে, কুমড়ো-ছেঁচকি খেতে চান তো এক ফালি কেটে নিয়ে আসি।

চারু উঠে কামরার দিকে দ্রুত চলে গেল কালজিরা ও কুমড়া আনতে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার ফুরসত এতক্ষণে। প্রমথ বলেন, শুনলে তো? বিপদে উপায় কি বল।

নিবারণ হাই তুলে দু-বার তুড়ি দিয়ে বলে, আমি চুনোপুঁটি মানুষ—আমার বিপদ-টিপদ নেই। এত কথা হল, আমার নাম

একবারও তো করল না নায়েব মশায়।

আঃ—বলে প্রমথ ঠোঁটে আঙুল ঠেকালেন। বলেন, আমি হলাম জনার্দন মুখুজ্জে, মুখুজ্জে মশায়—ভুলে যাও কেন? নায়েব এখানে কেউ নেই।

তা নেই বটে। তবে আবার ভাবনা কিসের? ডাল নামিয়ে ফেলুন, পাতা করে বসে পড়া যাক।

প্রমথ আগুন হয়ে বলেন, বুঝেছি চাপরাসী। ভাবছ, তুমি ভাত-তরকারি সাপটাবে, বলি দেবে শুধু আমাকেই। সেটা হচ্ছে না। যেতে হয় তো তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে হাড়িকাঠে মাথা দেব। দুজনে এক সঙ্গে এসেছি তো তোমায় একলা ছেড়ে যাব কোন্ আক্কেলে?

নিবারণ বলে, আমার কি! বিবাদ-বিসম্বাদ আপনাদের মধ্যে, সরকারী মানুষ আমার কোন্ দোষ?

সমন বয়ে বেড়াচ্ছ তুমি। তোমার জোরেই তো আসা। নইলে একা আমার কী সাধ্য, কারও অস্থাবরে হাত ঠেকাতে পারি।

যে ডিক্রিজারি করবে, তারই সমন বইব আমরা। এই গগন দাসই কাল যদি চৌধুরিগঞ্জের মাল ক্রোক করে, গগনের আগে আগে ব্যাগ ঘাড়ে আমি গিয়ে আপনাদের আলায় উঠব।

কথাবার্তা নিম্নকণ্ঠে হচ্ছিল। হাত তুলে সহসা প্রমথ থামিয়ে দেন। চুপ, চুপ! অনতিদূরে ওদের তরফের আলোচনা। মরদগুলো খাল অবধি খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারাই বুঝি এইবার ফিরে এল। স্তব্ধ নিশিরাত্রে উত্তেজিত কণ্ঠের প্রতিটি কথা কানে আসে।

গাড়ি ডাঙায় তুলে এনে গরু দুটো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ সরে পড়েছে। বেঁধে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসব, সেটা বোধ হয় কেমন ভাবে টের পেয়ে গেছে।

যাবে কোথা! নতুন মানুষ—পথঘাট কিছু জানে না। আমাদের সব নখদর্পণে। পাখি হয়ে উড়ে পালাতে পারে না তো! আছে কোনখানে ঘাপটি মেরে। সবাইকে জিজ্ঞাসা কর, নতুন মানুষ

এদিগরে দেখা গেছে কি না। বড়দা কোথায় ?

হর ঘড়ুইকে নিয়ে কালীতলার দিকে গেল, দেখতে পেলাম।

চল তবে কালীতলায়। বলি পালিয়ে গেছে, খবর দিতে হবে। বেশী লোকে বেরিয়ে পড়ে খোঁজাখুঁজি করুক। মহাবলির সঙ্কল্প করে শেষটা চালকুমড়ো বলি না হয়।

আর একজন বলে, কামার দেবীস্থানে তৈরী থাকুক। ধরে আনা মাত্তোর কপালে সিঁদুর দিয়ে হাড়িকাঠে চাপান দেবে।

হুড়দাড় পায়ের শব্দ। ছুটল বোধ করি ওরা কালীতলায়। নিঃশব্দ। চলে গেছে তবে সবগুলো।

প্রমথ আর নিবারণ দম বন্ধ করে শুনছিল। আর নয়—নিবারণ তড়াক করে উঠানে লাফিয়ে পড়ে। ভাগ্য ভাল, মানুষজন কেউ নেই রান্নাঘরের এদিকটা। একটা বার পিছনে তাকিয়ে দেখল না, মোটা মানুষ প্রমথর অবস্থাটা কি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। অন্ধকারে সাঁ করে কোন্ দিকে মিলিয়ে গেল। প্রমথ তখন পাথরের খোরায় ডালটা ঢেলেছেন সম্বরার জন্য। রইল পড়ে ডাল আর ভাত—প্রাণের বড় কিছু নয়। বেঁচে থাকলে ঢের ঢের খাওয়া যাবে।

বাইরে এসে ভয় যেন হুমড়ি খেয়ে চেপে ধরল। যেদিকে তাকান, মনে হচ্ছে ওই বুঝি মানুষ। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাঁধ থেকে নীচে নেমে পড়লেন। ঝুপসি জঙ্গল আর মাঝে মাঝে জল ভেঙে চলেছেন। চৌধুরিগঞ্জ কতখানি দূর, পশ্চিম না উত্তরে—কোন রকম তার ধারণা নেই। যাচ্ছেন, যাচ্ছেন। আর নিবারণ যেন কর্পূর হয়ে উপে গেছে, কোন দিকে মানুষটার চিহ্ন দেখা যায় না। সন্ধানী মানুষগুলোর চোখ এড়িয়ে চৌধুরি-আলায় নিজের কোটে কোন গতিকে ঢুকে পড়তে পারলে যে হয়।

আটত্রিশ

সকলের আমোদস্ফূর্তি ছাপিয়ে গগন দাসের হাসি—সে হাসির তোড় ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়েছে। রান্নাঘরে সকলে এখন ঢুকে পড়েছে। গগন বলে, আশাসুখে নায়েব মশায় রাঁধাবাড়া করলেন। তা অতি নিষ্ঠুর তোমরা জগা। দুটো গ্রাস অন্তত মুখে তুলতে দিলে হত। বলি-টলির কথা না হয় পরে তুলতে।

জগা বলে, বড়লোকের নায়েব—কত মানুষকে নিত্যিদিন ওরা বেগার খাটায়। আজকে একটা বেলা খোদ নায়েবকে আমরা বেগার খাটিয়ে নিলাম। রান্না করে দিয়ে চলে গেল। ভাল ডাল রেঁধেছে হে, নাকে সুবাস লাগছে। মালপত্তোর টানাহেঁচড়া করতে খাটনি হয়েছে, বসে পড় সবাই। দু-গ্রাস চার গ্রাস যেমন হয় ভাগ করে খাওয়া যাক।

চারুবালা জগার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, পেটুক মানুষটা খাই-খাই করছে আসা অবধি। বউদি কালীতলায় পূজোআচ্চার যোগাড়ে আছে, আমার হাত ছেঁচে গিয়েছে—কী মুশকিলে যে পড়েছিলাম! পেট বাজিয়ে একটা মানুষ খেতে যাচ্ছে, স্পষ্টাস্পষ্টি না-ও বলতে পারি নে—

জগাও কথা পড়তে দেয় না: পিঠ পিঠ আবার এই চক্কোত্তি মশায় এসে পড়লেন। বড়দা আহ্বান করে এনেছেন, ব্রাহ্মণ মানুষ ভিটের উপর উপোসী পড়ে থাকেন। যার তার হাতের রান্নাও চলে না ওঁর। নায়েব মশায় নৈকষ্য কুলীন—তিনি এসে পড়ে সুরাহা করে দিলেন। এইদিকে চলে আসুন চক্কোত্তি মশায়, পরিবেশনটা বরঞ্চ আপনি করুন। চারুবালার হাতের টাটানি—আমি সকলের পাতা করে দিচ্ছি। আমরা ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে যাব না।

পাশাপাশি পাতা পড়ল অনেকগুলি। কত চাল দিয়েছে রে

চারু—এত জনের প্রায় ভরপেট হবে। কিসের পর কোন্‌টা ঘটবে আগেভাগে যেন ছকে ফেলে সাজানো। এরা দিব্যি খাওয়াদাওয়া চালাচ্ছে—আর পাকশাক সমাধা করে দিয়ে প্রমথ হালদার পশ্চিমের চৌধুরিগঞ্জের পথ না চিনে হয়তো বা উত্তরমুখোই ছুটছেন এখন। রংতামাশা হাসিমস্করা—তার মধ্যে খাওয়া বেশী এগোয় না।

এমনি সময় বিনি-বউ আর নগেনশশী এসে পড়ল। ধামা কাঁধে দশাসই এক পুরুষ খানিকটা পিছনে। ক্ষ্যাপা মহেশ। অনেক কাল আগে সেই যে মনোহর ডাক্তারের বাড়ি গগনের কাছে একদিন এসেছিল। পরনে তেমনি লাল চেলির কাপড়। গলায় কড় ও রুদ্রাক্ষের মালা, শুভ্র সুপুষ্ট উপবীত। এই বাদা অঞ্চলেও এক ডাকে চেনে তাকে সকলে। এসেছেও পূজোর নামে—কালীপূজোর পুরুত সে-ই। নৈবেদ্য ও গামছা-কাপড় নিয়ে নিয়েছে। দক্ষিণা বল আর যা-ই বল, নগদ সেই এক সিকি। সেটা এখনো মেলে নি। নগেনশশীর পিছু পিছু সেইজন্য আসছে। কর্তা-ব্যক্তি নগেনশশী, শুধুমাত্র মচ্ছবের মানুষ নয়, দায়দায়িত্ব অনেক তার কাঁধের উপর। বাজনদারের হিসাব মিটিয়ে ও প্রসাদ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে তবে আসতে হল। আরও অনেক কাজ পড়ে, সমাধা হতে হতে এই মাস পুরো লেগে যাবে। তার উপরে একখানা পা ইয়ে মতন তো নগেনের—বিনি-বউ ভাইয়ের হাত ধরে এতখানি পথ ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই জন্য দেরি।

আলায় ঢুকে কলরব শুনে নগেনশশী রান্নাঘরের ছাঁচতলায় এসে দাঁড়াল।

কি গো, ভোজে বসে গেছ যে সকলে?

গগনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। স্ফূর্তিবাজ মানুষ। দেশের বাড়ি থেকে বউ-বোন এসে পড়ার আগে ব্যাপারী আর মাছ-মারাদের কত দিন খাইয়েছে এটা-ওটা উপলক্ষ করে। এতগুলো তরকারি সহ এমন আয়োজন করে নয় অবশ্য, সে সাধ্য তখন ছিল না। কোনদিন

হয়তো শুধুই নুন-ভাত। তবু খেয়েছে অনেক মানুষ একত্র বসে। নগেনশশী জেঁকে বসার পর সে জিনিস হবার জো নেই। নিজের ঘরেই চোর যেন সে।

কৈফিয়তের ভাবে তাড়াতাড়ি বলে, কী করা যাবে! ঠাকুর মশায় রান্নাবান্না করে দিয়ে গেলেন। ভাত নষ্ট হয়। তাই বললাম, তোরা বাপু এগুলো খেয়ে শেষ করে দিয়ে যা।

চারুবালা কিন্তু দৃকপাত করে না। ঠেস দিয়ে বলল, পায়ের দোষে দেরি করে ফেললেন মেজদা। নইলে আপনিও তো এক সঙ্গে বসে যেতে পারতেন।

জগন্নাথ জুড়ে দেয়ঃ এখন বসে পড় না কেন একটা পাতা নিয়ে। ভাল বামুনে রেঁধেছে, জাত মরবে না।

চারু ও জগাকে একেবারে উপেক্ষা করে নগেনশশী গগনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, কোন্ বামুন ঠাকুর এসে রান্নাবান্না করে দিয়ে গেল?

জবাব দেয় জগাইঃ চৌধুরিদের নায়েব প্রমথ হালদার। মানুষ যেমনই হোক, লোকটার জ্যাত্যাংশে খুঁত নেই।

ঘরের ভিতরে উঠে এল নগেনশশী, কিন্তু খেতে বসল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরাখবর শুনে নেয়। শুনে হতবাক হয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

কী সর্বনাশ, কোন্ সাহসে এত বড় কাণ্ড করে বসলে জামাইবাবু? জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া! চৌধুরিরা লোক সোজা নয়, তাড়িয়ে তুলবে, হাত-পা ধুয়ে আবার গিয়ে দেশেঘরে উঠতে হবে। এই তোমারি ভবিষ্যৎ, সে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

গগন ভালমন্দ কিছু জবাব দেয় না। জগা বলে, কুমিরের যা স্বভাব সে তা করবেই। ঝগড়া না করে যাও না জলে কুমিরের সঙ্গে ভাব করতে। গিয়ে মজাটা বুঝে এস।

নগেনশশী আগুন হয়ে বলে, মতলবখানা কে পাকাল বুঝতে পারছি। বাউণ্ডুলেটা বিদেয় হয়ে গিয়েছিল, আবার কখন এসে

ভর করল ?

জগা বলে, তোমার বুক টনটন করে কেন ? তুমি কে হে ? তোমার বুকে চড়াও হয়েছি নাকি ?

কথাগুলো বলল যেন জগা নয়, গগন—গগনের উপরে নগেনশশী খিঁচিয়ে ওঠে : বলে দিয়েছি না জামাইবাবু, বাড়ির উপর কেউ না আসে। কাজকর্ম থাকলে বাইরে থেকে মিটিয়ে যাবে। তবে কি জন্য বাজে লোক ঢুকতে দাও ?

এর উচিত জবাব আর মুখের নয়, হাতের। তাতে জগা পিছপাও নয়। কিন্তু হঠাৎ কী হল তার—তুরন্ত অভিমানে সর্বদেহ অসাড় হয়ে গেল যেন। সকলে মিলে কত আশায় নতুন-আলা বানাল—এই নগেনরা কোথায় তখন ? আজকে সেই লোক হুমকি দিচ্ছে, জগন্নাথকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে কেন ? জবাব গগনই যা দেবার দিক।

গগনকে সে বলে, কী বড়দা, বলবে না কিছু ? নতুন-ঘেরি শাল্যাকে দানপত্র করে দিয়েছ বুঝি—কিচ্ছু তোমার বলবার নেই ?

তার পরে অন্য যারা খাচ্ছে, দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকায়। ঘাড় নীচু করে সবাই দ্রুত খেয়ে যাচ্ছে। জগা উঠে পড়ল।

বলাই বলে, ও কি, ভাত থুয়ে ওঠ কেন ?

সুখের মাছ-ভাত খেয়ে খেয়ে মেনিবিড়াল হয়ে গেছিস তোরা সব। মানুষ নেই এখানে। নয় তো পা ভেঙে লোকটা খোঁড়া হয়ে আছে, হাত ভেঙে নুলো করে দিতিস এতক্ষণ।

আলার সীমানা ছেড়ে তীরবেগে বেরুল। ইচ্ছে হচ্ছিল, যাবার আগে একটা থাবড়া মেরে যায় নগেনশশীর গালে। কিন্তু ঘেরি পত্তনের সেই গোড়ার আমল আর নেই। সবাই তাকে বাতিল করে দিয়ে নতুন-আলায় পড়ে খোশামুদি করে। সাঁইতলা কম দুঃখে ছেড়েছে সে! ফিরে যাবে বয়ারখোলা এই রাত্রেই। গরু দুটো, শোনা গেল, গাড়ি এপারে এনে ফেলেছে। গাড়ি ঘুরিয়ে তেলিগাঁতির পুল হয়ে যাবে এবার।

বাঁধের উপর এসেছে। নীরন্ধ্র অন্ধকার। ভাবছে, পাড়ার ভিতর তাদের চালাঘরে দু-দণ্ড বসে যাবে কিনা। মাছ-মারারা ঘোর থাকতে জাল নিয়ে ফিরবে, তাদের সঙ্গে দুটো-চারটে কথা বলে যেতে ইচ্ছে করে। জগাকে দেখে তারা নিশ্চয় খুশী হবে। তবে তো চালাঘরে পড়ে থেকে রাতটুকু কাটিয়ে যেতে হয়। মাছের সায়ের বসাল এই মুলুকে—মাছ-মারারা সেই থেকে দুটো চারটে পয়সার মুখ দেখছে। নাক সিঁটকে ভাললোকেরা বলেন, চোরাই কাজ-কারবার বাড়িয়ে দিল সায়ের বানিয়ে। তা সাধু পথের দিন না একটা ব্যবস্থা করে, চোর মাছ-মারারা খেয়ে-পরে যাতে সাধুসজ্জন হয়ে যায়।

ফাঁকায় এসে শীতল জলের হাওয়ায় রাগ কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন জগা এই সমস্ত ভাবছে। জঙ্গল কেটে ঘেরি বানালাম, জনালয় জমেছে—কার ভয়ে এক্ষুনি খাল পার হয়ে উল্টোমুখো বয়ার-খোলা ছুটব? অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ এক সময় চোখ তাকিয়ে দেখে, এদিকে-ওদিকে ছায়ার মতন মানুষ। বাদাবন—কত মানুষ মরে কত রকমে; অপঘাতে মরলে গতি হয় না, ভূত-প্রেত হয়ে বিচরণ করে। রোমহর্ষক কত কাহিনী! তাদেরই একটা দল এসে পড়ল নিশিরাত্রে!

একজন তার মধ্যে জগার হাত জড়িয়ে ধরল। বলাই। নগেন-শশীর হুমকিতে ওরাও সব আধ-খাওয়া করে উঠে এসেছে। বলাই বলে, ঘরে চল জগা।

কোন্ ঘরের কথা বলছিস?

তোমার ঘর—আমাদের সকলের সেই চালাঘর। ঘরের কথাও বুঝিয়ে দিতে হয়—বাপ রে বাপ, কী রাগ তোমার জগা ভাই!

ক্ষ্যাপা মহেশ এমন সময় দ্রুত পা ফেলে তাদের মধ্যে এল। জগার আর এক হাত ধরে বলে, ঘরে কেন, বাদায় চলে যাওয়া যাক। বাদার পথ একেবারে ছেড়ে দিলে—কত দিন যাও নি বল তো জগা-ভাই! মানুষের কুদৃষ্টি লেগেছে, এ জায়গায় আর জুত

হবে না। নতুন জায়গা খুঁজে নাও। ভগবানের এত বড় পিরথিমে জায়গায় অভাব কি!

পচা এসে আবার এর মধ্যে যোগ দেয়ঃ যেদিন যাবে, তখন সে কথা! কিন্তু নিজের ঘর-দুয়োর ফেলে বয়ারখোলায় পড়ে থাকবে, সে কিছুতে হবে না জগা। তুমি না এলে আমরাই সেখানে গিয়ে পড়তাম, গিয়ে জোরজার করে নিয়ে আসতাম।

জগা খোঁটা দিয়ে বলে, ঘরে থেকে তো রাতভোর একা একা মশা তাড়ানো? তার চেয়ে, যাত্রাদলের মানুষ—দিব্যি সেখানে জমিয়ে আছি।

বলাই বলে, এবার আর একলা থাকতে হবে না। সন্ধ্যের পর চালাঘরেই এখন গান-বাজনা আড্ডাখানা। নতুন-আলায় আমরা কেউ যাই নে।

পচা সোজা মানুষ, রেখে ঢেকে বলতে জানে না। বলে, যাই নে মানে কি? আলায় যাওয়া বারণ হয়ে গেছে। আলা আর বলি কেন, ষোলআনা গৃহস্থবাড়ি। গৃহস্থবাড়ি উটকো লোক কেন ঢুকতে দেবে? নগনা-খোঁড়া চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহারা দেয়। খালের মুখে এক নতুন ঘর বেঁধে নিয়েছে, সেইখানে সায়ের। কেনা-বেচার সময়টা মানুষ জমে, তার পরে সারা দিনরাত সে ঘরও খাঁ-খাঁ করে।

জগার হাত ধরে নিয়ে চলল পাড়ার দিকে। যেতে যেতে বলাই বলে, ঐ নগনাটা চারুকে বিয়ে করবে বলছে। বিধবা-বিয়ে। তা বাদা-রাজ্যে বিধবা-সধবা কি! এক বউ কোথায় নাকি পড়ে আছে, খোঁড়ার সঙ্গে ঘর করতে চায় না। ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে—বউঠাকরুনের খুব মত। বড়দা ভাল-মন্দ কিছু বলে না। অনিচ্ছে থাকলেও বলতে সাহস পায় না।

থমকে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ প্রশ্ন করে, চারু কি বলে?

মেয়েমানুষ তো! ধরেপেড়ে পিঁড়িতে তুলে দিলে সাতপাকের সময় সে কি আর লাফ দিয়ে পড়বে? অজঙ্গি বাদা জায়গা—লাফিয়ে

পড়ে যাবেই বা কোথায় ?

পচা আবার বলে, ভিন জায়গায় পড়ে থাকা হবে না কিন্তু জগা। কক্ষনো না। কি ভাবছ ?

আচ্ছা, গরুর-গাড়ি তো পৌঁছে দিয়ে আসি বয়ারখোলায়।

পচা বলে, তোমায় ছাড়ব না। গাড়ি-গরু আমিই কাল তৈলঙ্ক মোড়লের বাড়ি দিয়ে আসব।

ঊনচল্লিশ

রাত তো অনেক। তা বলে কেউ শুয়ে পড়ছে না। এমন রাত্রি কতদিন আসে নি। এত জনে আজ, একসঙ্গে জগাদের সেই চালাঘরে জমিয়ে বসা গেল অনেক দিন পরে। না, ঘরের জায়গা কতটুকু—উঠান জুড়ে বসা যাক। মায়ের পূজা উপলক্ষে সাঁই-তলার মাছ-মারারা কেউ জালে বেরোয় নি। কালকের দিন না হয় উপোসই যাবে। কাজকর্ম বারোমাস আছে, মায়ের নামে একটা দিনের এই ছুটি।

জমেছে খুব। জগন্নাথ এসে পড়ল কোথা থেকে, নতুন-ঘেরি পত্তনের মূলে যে মানুষটা। ঘেরি বানিয়ে আলা বেঁধে সায়ের চালু করে জঙ্গলে জনালয় বানিয়ে দিয়ে একদিন সরে পড়ল। আর আছে মহেশ, কালী করালীর পূজোয় পুরুত হয়ে এসেছে। এই এক মজা। ক্ষ্যাপা বাওয়ালীর কোথায় বসবাস, কেউ জানে না। অন্য সময় বুঝি সে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য হয়ে থাকে, মায়ের নামে ঢাকে কাঠি পড়লে অমনি মূর্তি ধরে উদয় হয়। বাদারাজ্যে এবং বাদার আশেপাশে যেখানেই পূজো হোক, মহেশ হাজির। জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে। বাঘ-কুমির পোষ-মানা গরু-ছাগলের মত। অন্যে যা দেখতে পায় না, তার নজরে সে সব এড়ায় না। এই যেমন, কথাবার্তা হচ্ছে আজ উঠানের উপর বসে—কথার মাঝখানে চোখ পাকিয়ে হঠাৎ

মহেশ আকাশ-মুখো তাকিয়ে পড়ে: এইও—দাঁড়িয়ে কি দেখিস? পালা, পালা—

গা সিরসির করে ক্ষ্যাপা-মহেশের কথা শুনে। তার কাণ্ড-কারখানা দেখে।

ঠিক মাঝখানে আগুন। আগুনের সামনেটায় মহেশ, তার পাশে জগা। মহেশ আজ জগাকে নিয়ে পড়েছে। বোঝা বোঝা শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে দিয়েছে। শীত কেটে গিয়ে ওম হচ্ছে আগুনে। আলো হচ্ছে। বাতাসের ঝাপটা আসে এক-একবার। রাত্রিচর পাখি হুশহুশ করে উড়ে যায় মাথার উপর দিয়ে। ক্ষ্যাপা-মহেশ কথা বলে, আর খলখল করে হাসে। সাঁইতলার মেয়েপুরুষ আগুন ঘিরে বসেছে।

কত সব আজব খবর। ক্ষ্যাপা-মহেশ যখনই আসে, এই সব শুনতে পাওয়া যায়। শোনবার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে থাকে। জানা-শোনার এই যত দেশভুঁই আর মানুষজন নয়। অগম্য অরণ্য—কালে-ভদ্রে কদাচিৎ যেখানে মানুষের পা পড়ে। পা ফেলে এই মহেশ আর আর তারই মতন দশ-বিশটা গুণীন বাওয়ালী। পা ফেলবার আগে পূজা দিয়ে এবং ভবিষ্যতের জন্য মানসিক করে বনের ঠাকুরকে তুষ্ট করে যেতে হয়। হরেক রকমের শত্রু, নজর মেলে কতক দেখা যায়—বাঘ-সাপ-কুমির। শুধুমাত্র অস্ত্রের ভরসায় গেলে হবে না। চোখ রয়েছে সামনে, পিছনে চোখ নেই তো তোমার—পিছন দিয়ে এলে কি করবে? চোখ থেকেই বা কি! কোন হেঁতালঝাড়ে কিম্বা গিলে-লতার ঝোপের মধ্যে গাছপালার রঙের সঙ্গে গায়ের রঙ মিলিয়ে ঘাপটি মেরে আছে—চোখ থেকেও তুমি যে বনকানা বনে গিয়েছ। অস্ত্র থাকে থাকুক, কিন্তু আসল হল মন্ত্র। ভাল গুণীন আগে আগে পথ দেখাবে—যাদের মুখের মন্ত্র ডেকে কথা বলে।

আর শত্রু আছে—যারা বাতাস হয়ে থাকে, গুণীনের তীক্ষ্ণ চোখই শুধু ঠাহর পায় তাদের। ভূটো-দানো জিন-পরী। জনালয়ের অত্যাচার এড়িয়ে নিঃশঙ্ক আরামে থাকে তারা। এককালে হয়তো

মানুষ ছিল—মরে যাবার পর মানুষের সম্বন্ধে ঘৃণা আর অবিশ্বাসের অন্ত নেই। মানুষকে কিছুতে ঢুকতে দেবে না তারা জঙ্গলে।

জগা এর মধ্যে সহসা মন্তব্য করে ওঠে ঃ বেঁচে থেকে আমাদেরও ঠিক তাই। মানুষ বড় পাজী। 'তাড়িয়ে তাড়িয়ে কোথায় এই এনে তুলেছে। তাড়া করছে এ-জায়গায় এসেও।

চোখ তুলে ক্ষ্যাপা-মহেশ তাকায় একবার তার দিকে। গল্প যথাপূর্ব চলছে ঃ নতুন যারা জঙ্গলে ঢোকে, সকল রকম শত্রুতা সাধে তাদের সঙ্গে। ঝড়-তুফান তুলে নৌকো বানচাল করে। বাঘ-সাপ-কুমির লেলিয়ে দেয়। নিজেরাই পশু-মূর্তি ধরে আসে কখনো বা। রূপসী মোহিনী হয়ে কোন জলাভূমিতে ভুলিয়ে নিয়ে ঘাড় মটকায়। অথবা সোজাসুজি উড়িয়ে নিয়ে দুর্গমতম অঞ্চলে একলা ছেড়ে দেয়। বড় দয়া হল তো মানবেলার ভিতর আবার উড়িয়ে রেখে আসে।

মহেশ বলে, আমায় সহায় ধর তোমরা। বড়লোকের বিষ-নজর লেগেছে, এ সাঁইতলা জায়গায় মজা নেই। সাপের ফণায় বিষ, আর মানুষের নজরে বিষ। কোনদিন আর এখানে সোয়াস্তি পাবে না। দক্ষিণের নতুন নতুন বাদায় নিয়ে যাব তোমাদের। মা বনবিবি আর বাবা দক্ষিণরায়ের আজ্ঞায় জীবজন্তু আমার হুকুমের দাস। কথা না মানলে মাটি আগুন করে দেব—গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে দৌড়ে পালাতে দিশে পাবে না। কামরূপ-কামিখ্যের আজ্ঞায় দানো-পরী সব মান্য করে চলে, আকাশের বায়ু নয় তো আগুন করে দেব। গুরু কাণ্ডারী ধরে লোকে ভবসিন্ধু পার হয়, গহিন বনের কাণ্ডারী হলাম আমরা ফকির-বাউলে। চল আমার সঙ্গে। কানা-গাঙ পার হয়ে গিয়ে কেশেডাঙা—দরিয়া সেখান থেকে পুরো বেলার পথও নয়।

সেই কেশেডাঙার তেপান্তর জুড়ে সাদা বালি চিকচিক করছে। আর কাশবন। মিঠাজল দূর-দূরন্তর থেকে বয়ে আনতে হবে না। গুপ্তস্থান আছে কাশবনের ভিতরে, সন্ধান জানে শুধুমাত্র মহেশ।

বালি সরিয়ে গর্ত করে চুপচাপ বসো গিয়ে—কাকের চোখের মত নির্মল জল এসে জমবে। আঁজলা ভরে খেয়ে দেখ, কী মিষ্টি! জলে যেন বাতাসা ভেজানো।

শুনতে শুনতে সকলে দোমনা হয়ে ওঠে। সাঁইতলা সত্যি আর ভাল লাগে না। এক জায়গায় অনেক দিন হয়ে গেছে। তা ছাড়া প্রবল শত্রু চৌধুরিরা নানা রকম প্যাঁচ কষছে। এতদিন নিজেরা করছিল, এবারে সদরের আদালত অবধি ধাওয়া করেছে। আদালতের চাপরাসী এসে পড়েছিল, পিছন ধরে আরও কত কী আসবে কে জানে! কিন্তু সকলের চেয়ে অসহ্য নগেনশশীর মাতব্বরি। নতুন-আলা এখন হয়ে গেছে গৃহস্থবাড়ি। জঙ্গল হাসিল করে গতরে খেটে যারা একদিন আলা বেঁধেছিল, বাইরের বাজে মানুষ তারা আজ—গৃহস্থবাড়ি ঢোকবার তাদের এক্তিয়ার নেই। তাদের যাওয়া-আসা খাল-ধারের সায়ের অবধি—মাছ নামিয়ে দিয়ে টাকাপয়সা মিটিয়ে নিয়ে ঘরে যাও। ব্যস্। কাজকর্ম ব্যাপার-বাণিজ্য ছাড়া অন্য সম্পর্ক নেই। তামাক খাওয়াটা এখনো মুফতে চলে বটে, তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে একদিন। খোঁড়া নগনা এমনভাবে চোখ ঘোরায়, ইচ্ছেও করে না বিনি-কাজে সেখানে দু-দণ্ড বসে থাকতে।

বলাই বলল, যেতে তো মন লয় গুণীন। কিন্তু এখানে বড়দা ছিল। হিসাবী মানুষ, লিখতে পড়তে জানে, হাতে-গাঁটে দু-চার পয়সা নিয়ে এসেছিল। তাইতে ঘেরি পত্তন হল। আমাদের সম্বল ফুলো-ডুমুর—শুধু কটা মানুষ গিয়ে নতুন জায়গায় কি করব?

মহেশ বলে, অথই দরিয়ার তলা থেকে দেবতা ডাঙা বের করে দিয়েছেন, মবলগ পয়সা লাগছে কিসে? ডিঙি যোগাড় করে নাও। চাল-নুন নাও। আর পূজোর বাবদ যা লাগে সেইগুলো নিয়ে নাও মিলঝিল করে। এইটে হল আসল, পূজো অঙ্গে খুঁত না থাকে। নৌকো কাছি কর গিয়ে চরের পাশে। গুণীন যাবে

পথ দেখিয়ে, মরদ-জোয়ানেরা তার পিছন ধরে। পা ফেলে জায়গা-জমির দখল নিয়ে নেবে। পায়ে হেঁটে যে যতদূর বেড় দিয়ে এল, জমি ততখানি তার। লেখাজোখা দলিলপত্তর নেই। এসব জমির মালিক মানুষ নয়, মালিক হলেন দেবতা। মালিক মা বনবিবি, বাবা দক্ষিণরায়। তাঁদের সঙ্গে লেখাজোখা লাগে না, খরচ-খরচার ব্যাপার নেই।

জগা জেদ ধরল: হবে না ঠাকুর। আগে এদের তাড়াব আমাদের সাঁইতলা থেকে। তাড়িয়ে দিয়ে তার পরে যেখানে যেতে হয় যাব।

জ্যোৎস্নার আলোয় নিষুতি আলা দেখা যায় দূরে। সেদিকে জগা আঙুল দেখায়: দেখ, কী রকম আয়েশ করে ঘুমুচ্ছে। কোন্ মুলুক থেকে বাঁশ জুটিয়ে এনে জঙ্গলের গোল-গরান কেটে ঘর বেঁধে দিয়েছি—মজা লুটছে বাইরের উটকো মানুষরা এখন। ওদের তাড়াব।

মহেশ বলে, তাড়িয়ে কি লাভ? এক জন গেল তো অন্য দশজন এসে পড়বে। রাস্তা হয়ে গেল, কলের গাড়ি এসে যাচ্ছে, মানুষের গাদি লেগে যাবে। থাকার সুখ আর রইল না হেথায়।

এ সমস্ত পরের ভাবনা, এক্ষুনি আর হচ্ছে না। এত জনে এক জায়গায়—আপাতত আনন্দ করা যাক কিছু। মস্তবড় রণজয় হয়েছে, নায়েব প্রমথ আর চাপরাসী নিবারণ রাঁধা-ভাত ফেলে ছুটে পালাতে দিশা পায় না। সেই ষড়যন্ত্রের ভিতরে যেমন জগন্নাথ তেমনি গগন দাস। এবং মেয়েলোক হয়ে চারুবালাও রয়েছে। সকলের বড় আনন্দ, খোঁড়া-নগনার তাড়া খেয়ে বলাই-পচা আবার এখন ষোলআনা পাড়ার মানুষ হয়েছে। বলাই ঢোল বের করে নিয়ে এল চালার ভিতর থেকে। জগা কোলের উপর টেনে নিয়ে দু-তিনটে ঘা দিয়ে বলে, বেশ তো আছে। খাসা আওয়াজ আছে

বলাই বলে, বাজাই যে আমরা।

বাজাবি ছাড়া কি! নতুন-আলায় খোল বাজাতিস—বাজনার বড় ওস্তাদ তুই এখন।

জগার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। বলে, আলায় ওরা মজা করে ঘুমুচ্ছে। সে হবে না।

ক্ষ্যাপা-মহেশ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। জানে এদের। কিছুই অসম্ভব নয় বাদা অঞ্চলের এই হুটকো ছোঁড়াদের পক্ষে।

কি করবি? হানা দিয়ে পড়বি নাকি আলায়?

জগা হাসতে হাসতে বলে, অন্যায়-অধর্মে আমরা নেই। ষোল-আনা ধর্মকাজ। একটা জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে কি হবে—ঘুরে ঘুরে গানবাজনা। নগরকীর্তন।

পচা বলে, ঢোল বাজিয়ে কিসের কীর্তন রে?

ঢোলে বুঝি খোলের বোল তোলা যায় না! শুনিস। ঢোলে আরও জোরদার হয়। এতগুলো জোয়ান-মরদের গলা—মিনমিনে খোল তার সঙ্গে মিশ খাবে কেন?

মহেশ চালাঘরে ঢুকে গেল। বাঁধের পথে বেরিয়ে পড়ল এরা সব:

নগরবাসী আয় তোরা
সংকীর্তনের সময় বয়ে যায়—
নেচে নেচে বাহু তুলে
হরি বলে ছুটে আয়।

আঠার-বিশ জন মানুষ—আঠার রকম সুর তাদের গলায়। তোলপাড় লেগে গেছে। কালীতলাটা আগে পরিক্রমা করে এল। নতুন-আলার সামনে বাঁধের উপর এসে পড়ে। নড়তে চায় না আর এখান থেকে। বাঁধের উপর পাশাপাশি দুটো কেওড়াগাছের নীচে পুরো আসর বসিয়ে নিয়েছে।

গান গায় আর উঁকিঝুঁকি দেয় জগা।

বলাই বলে, পাড়াসুদ্ধ আমরা জেগে, ওদের কিচ্ছু নড়াচড়া

নেই। দেখে আসব জগা, ভিতরে গিয়ে?

জগা বলে, দেখবি আর কোন ছাই, এর পরেও ঘুমুতে পারে? সে যারা মরে গেছে তারাই।

বলছে, তবু ষোলআনা ভরসা করতে পারে না। গানে আরও জোর দিয়ে দিল। প্রত্যাশা, নগেনশশী মেজাজ হারিয়ে যদি উঠানে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু চিৎকারে গলার নলি ছিঁড়ে যাবার দাখিল, বাজাতে বাজাতে আঙুল টনটন করছে—না রাম না গঙ্গা, তিলেক শব্দসাড়া নেই ওপক্ষ থেকে। হতাশ হয়ে বলাই বলে, ঘরে চল জগা-ভাই। কানে ছিপি এঁটে ওরা পড়ে আছে। পারবি নে। আমরাই মিছে হয়রান হচ্ছি।

পচা বলে, নগনা বুঝে নিয়েছে, এত মানুষ আমরা পিছু হঠব না। এক কথা বলতে এলে উল্টে বিশ কথা শুনিয়ে দেব। মরে গেলেও সে এখন বেরুবে না।

জগা বলে, তার উপরে আজ এক উপসর্গ এসে জুটেছে—টোর্নি চক্কোত্তি। কিন্তু ওরা কিছু না বলুক, চারুবালার কি হল বল দিকি? গলার তোড়ে জঙ্গলের বড়-শিয়াল লেজ তুলে দৌড় দেয়, সে মেয়েমানুষ ঠাণ্ডা হয়ে আছে কেমন করে?

বলাই হেসে বলে, আমি বলতে পারি।

কেন রে?

বলাই বলে, নগেনশশী জব্দ হচ্ছে, তাতে বড্ড সুখ চারুবালার। খোঁড়াটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। নিজের কষ্ট হলেও দু-কানে আঙুল ঢুকিয়ে দাঁত-মুখ চেপে পড়ে আছে।

জগা উল্লাস ভরে বলে, সত্যি? লাগাও তবে, জোর লাগাও—

কিন্তু কতক্ষণ! পোহাতি-তারা উঠে গেছে। একতরফা লড়াইয়ে মজাও পাওয়া যায় না। পাড়ায় ফিরে এল অবশেষে। দাওয়ায়, ঘরের মধ্যে, উঠানের উপর—যে যেখানে পারল গড়িয়ে পড়েছে।

চক্কোত্তি মশায় আর নগেনশশী কমবেশী উভয়েই পাটোয়ারী ব্যক্তি। পরিচয় অল্প সময়ের বটে, কিন্তু একে অন্যের গুণ বুঝেছেন। ভাব হয়ে গেছে দু-জনায়। আলাঘরে পাশাপাশি শুয়েছেন। একটু-খানি ঘুমের আবিল এসেছিল, গানের তোড়ে সে ঝোঁক অনেকক্ষণ কেটে গেছে।

নগেন বলে, এক ছিলিম হবে নাকি চক্কোত্তি মশায়? কলকে ধরাব।

চুপ! বলে চক্কোত্তি থামিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বলেন, কথা বলবে না, মোটে নড়াচড়া নয়, তা হলে পেয়ে বসবে। বেড়ায় চোখ দিয়ে দেখছেও হয়তো কেউ। যেমন আছ ঘুমিয়ে পড়ে থাক অমনি। আর ভাব।

রাত কেটে গিয়ে অবশেষে গান-বাজনা থামল। আলো হয়ে গেছে চারিদিক। বাঁধের পথে কেউ নেই। চক্কোত্তি তখন উঠে বললেন: তামাকের কথা বলছিলে না? এইবারে হোক।

হালকা গেঁয়োকাঠের কয়লা করা থাকে। টেমি জ্বেলে ধরানো যায়। নগেনশশী তামাক সেজে কয়েক টান টেনে ভাল করে ধরিয়ে দিল। ব্রাহ্মণের হুঁকো নেই, বাদা অঞ্চলে দরকার পড়ে না। নলচের মাথা থেকে কলকে নামিয়ে ডান-হাতে নিয়ে বাঁ-হাতটা চিতিয়ে নীচের দিকে ধরে চক্কোত্তির দিকে সম্ভ্রমভরে এগিয়ে দেয়।

চক্কোত্তি চোখ বুজে কিছুক্ষণ ধরে টানলেন। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সহসা চোখ তাকিয়ে বলেন, কেমন বুঝলে?

ঠিকমত অর্থ না বুঝে নগেনশশী বলে, আজ্ঞে?

দাস মশায় আমায় বললেন, শত্তুর পিছনে লেগেছে। শত্তুর কিসে নিপাত হয়, তার যুক্তি পরামর্শের জন টেনেটুনে নিয়ে এলেন। তা ভালই হল, সব শত্তুর স্বচক্ষে দেখে গেলাম। রাত দুপুরে এক শত্তুর দেখেছি, ভোররাত্রে আবার এই ভিন্ন দল দেখলাম। বেশী প্রবল কারা, দেখ এইবারে ভেবে।

নগেনশশী বিনয় দেখিয়ে বলে, আপনি বলুন, শুনি।

চক্কোত্তি বলেন, চৌধুরি বাবুরা ঘেরিদার, দাস মশায়ও তাই। বড় আর ছোট, এই হল তফাত। চিল বড় পাখি, তা বলে চড়ুই কি আর পাখি হল না? সামনাসামনি বসে এদের দু-পক্ষের খানিকটা বুঝসমঝ হতে পারে। অন্তত চেষ্টা করে দেখা যায়। কিন্তু হাঘরের দল পথে দাঁড়িয়ে গণ্ডগোল করে গেল, তাদের সঙ্গে মুখ-শোঁকাশুঁকি কিসের হে? আমি বাপু দাস মশায়ের ব্যাভারের মর্ম বুঝলাম না।

পুলকিত নগেনশশী ঘাড় নেড়ে বলে, দেখুন তাই। আলায় ওদের আসা বন্ধ করে দিয়েছি, তাই নিয়ে জামাইবাবু মন গুমরে বেড়ায়। বুঝিয়ে বলুন আপনি তাঁকে। আর প্রতিকার কোন্ পথে, সেটাও বলে দিন।

চক্কোত্তি হেসে উঠে বলেন, নতুন আর কি! সনাতন পথ—সদরের পথ। ঐ একটা পথ আজন্ম চিনে বসে আছি। পাঁচ-সাত নম্বর মামলা ঠুকে দাও। পয়লা নম্বরে ফৌজদারি—কাঁচা-খেগো দেবতা যাকে বলে। আইন মোতাবেক ওই চলল, আর আইনের বাইরে যা করবার এদিক থেকে চলুক। থানায় ভাল করে তদ্বির করে এস, কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে সবগুলোকে যাতে টেনে নিয়ে যায়।

নগেনশশী বলে, সবগুলোকে লাগবে না। পালের গোদা ঐ জগন্নাথকে নিলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বেটা ছিল না এখানে, কাল এসে পড়েছে। খালের মধ্যে গরুর-গাড়িতে ওঁদের আটকে রেখে চক্রান্ত করতে এল এখানে। বাঁধে দাঁড়িয়ে অমন হট্টগোল করা জগা না থাকলে কেউ সাহস করত না।

চক্কোত্তি লুফে নিয়ে বলেন, খপ্পরে এসে গেছে, ভালই তো হয়েছে। ঘাঁটা দেওয়া হবে না, বুঝলে? খেয়েদেয়ে ফুর্তিফার্তি করে বেড়াক। কোন-কিছু টের না পায়। আর দেখ, তোমাদের উপর ঝুঁকি রেখে কাজ নেই। তোমাদের কতটুকু মুরোদ? চৌধুরি-বাবুদের কাজে নামাতে হবে। নায়েব টং হয়ে রয়েছে—নতুন

কিছু করতে হবে না, খালি এখন বাতাস দিয়ে যাওয়া। দেখাতে হবে, তোমরাও চৌধুরিদের সঙ্গে—কালকের ব্যাপারের মধ্যে তোমরা ছিলে না, বাউণ্ডুলেগুলো করেছে।

বলতে বলতে চিন্তান্বিত হয়ে চক্কোত্তি একটু থামলেন। বলেন, তবে কিনা দাস মশায়ের বোনটাও জড়িয়ে পড়েছে। নায়েবকে ভয়-ভীত দেখাল সে-ই।

নগেনশশী আগুন হয়ে বলে, তাকে ঐ জগাই টেনেছে। আচ্ছা রকম জব্দ করতে হবে ওটাকে। রান্না-করা মুখের ভাত ফেলে ভদ্রলোক ছুটে বেরুলেন। সাপে কাটল, না গাঙে-খালে ভেসে গেলেন কে জানে!

সহাস্যে চক্কোত্তি ঘাড় নাড়েন: কিছু না, কিছু না। ও মানুষ মরবে না—প্রহ্লাদ। নামটা শোনা ছিল, কাল পরিচয় হল। নাম ভাঁড়িয়ে কত খেল খেলতে লাগল। চৌধুরিগঞ্জে গেলে খবরবাদ পাওয়া যাবে। যাবে তো চল। আমি যেতে রাজী আছি।

টৌর্নি মানুষ, মামলা-মোকদ্দমা বাধাতে জুড়ি নেই। এই হল পেশা। গণ্ডগোল দু-পক্ষে যত জমে আসবে, তত মজা লুটবেন।

বলেন, দাস মশায়কেও নিয়ে চল। খোদ মালিক তো বটে—তোমার আমার চেয়ে তার কথার দাম বেশী। ভেবে দেখছি, কালকের কাজটা ভালই হয়েছে মোটের উপর। ঠিক মত খেলাতে পারলে নায়েব আর জগন্নাথে লেগে যাবে। সেই যে বলে থাকে, বাঘ মারতে শত্তুর পাঠানো। বাঘ মরে ভাল, শত্তুর মরে আরও ভাল।

উৎসাহে নড়েচড়ে চক্কোত্তি উঠে দাঁড়ালেন: কি হে, দাস মশায় ঘুম থেকে ওঠে নি এখনো? খোঁজ নাও।

কামরার ভিতরে গগন শোয়। অনেকক্ষণ সে উঠেছে, ডোবার ঘাটে গুঁড়ির উপরে বসে বাবলার ডাল ভেঙে দাঁতন করছে। নগেনশশী বলে, ঐ যে জামাইবাবু। জিজ্ঞাসা করে আসি।

বেরুতে গিয়ে দেখে বেড়ার ওধারে মানুষ চারুবালা। ঝাঁটা হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে কি ?

চারুবালা করকর করে ওঠে, তামাক-টামাক বাইরে গিয়ে খেলেই তো হয়। এতখানি বেলা হল, ঝাঁটপাট হবে আর কখন ?

না, রাজী হল না গগন। চৌধুরিগঞ্জে সে কিছুতে যাবে না। অস্থাবর ধরতে এসে কাল ওরা পেরে ওঠে নি, দৌড়ে পালাতে দিশা পায় না। কিন্তু ছাড়বে না, আবার আসবে। মামলা-মোকদ্দমায় নাস্তানাবুদ করে শোধ তুলবে। যতদূর সাধ্য লড়ে যাবে গগন। নিতান্ত না পেরে ওঠে তো বাস তুলবে এ জায়গা থেকে। পালা গেয়ে যাত্রার দলের মানুষ যেমন এক গ্রাম ছেড়ে বিদায় হয়; রং মেখে আবার ভিন্ন গাঁয়ের আলাদা আসরে গিয়ে নামে। দুনিয়ার মধ্যে ভাগ্য খুঁজে নিতে একদিন খালি-হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল—সেই দুনিয়া একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে না সাঁইতলায় করালীর কূলে এসে। আবার বেরুবে। তা বলে কাল রাত্রে এত সব কাণ্ড, সকালবেলা চোখ মুছতে মুছতে শত্রুর পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে পড়বে কোন্ আক্কেলে ?

নগেনশশী নানা রকমে বোঝাবার চেষ্টা করে: ক্ষেপে গেলে কেন জামাইবাবু ? ব্রাহ্মণমানুষ অতিথ হয়ে হাত পুড়িয়ে রাঁধাবাড়া করলেন। তোমরাই রাঁধা-ভাত কেড়ে নিলে তাঁর মুখ থেকে। হাঁ, কেড়ে নেওয়া ছাড়া আবার কি! মামলা-মোকদ্দমা চুলোয় যাক—কিন্তু মনের কষ্টে ব্রাহ্মণ শাপশাপান্ত করে গেলেন, তার একটা প্রতিবিধান চাই তো! গিয়ে পড়ে দুটো মিষ্টিকথা বলে বুঝসমঝ করা।

গগনের এমনি স্বভাবটা নরম, কিন্তু গোঁ ধরল তো একেবারে ভিন্ন মানুষ। বাড়ি থেকে বেরুবার দিন সেই যে বলেছিল,

গাড়ালের গোঁ আর মরদের গোঁ—একবার যে পথ নিয়েছে, কারও ক্ষমতা নেই ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেবার। যার বলে ঘর ছেড়ে এসে এত দুঃখকষ্ট পেয়েছে, কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবার কথা মনে কখনো ওঠে নি। যাবেও না আর—সেই কথা গগন যখন-তখন বলে থাকে।

নগেনশশী তখন ভিন্ন দিক দিয়ে তাতিয়ে তুলছেঃ শত্রু-শত্রু করছ—চৌধুরিগঞ্জের কাছে তো দণ্ডবৎ হবে না। কিন্তু চৌধুরিরা যে শত্রুতা-ই করুক, টাকার মানুষ—ভদ্রলোক। যত সব ছ্যাঁচড়া শত্রু যে তোমার ঘরের দুয়োরে। সুবিধা পেলেই বুকে বসে দাড়ি উপড়াবে। তাদের ঠাণ্ডা করাটা হল বেশী জরুরী।

গগন বোকা নয়। বুঝে ফেলেছে নগেন কি বলছে। ন্যাকা সেজে তবু প্রশ্ন করে, ঘরের দুয়োরে কাদের কথা বলছ তুমি—হ্যাঁ?

ভোর অবধি কীর্তন গেয়ে যারা আমাদের গঙ্গাযাত্রা করে গেল। ঘরের সামনে বাঁধের উপর এসে হানা দেয়—একা-দোকা নয়, পাড়াসুদ্ধ জুটেপুটে এসে। কাল ঢোল পিটেছে, এর পরে লাঠি-পেটা করবে। টোনি ঠাকুর বলে দিলেন, ভয় এদেরই কাছে, এদের কি করে সামলাবে সেইটে ভাব।

গগন উড়িয়ে দেয়ঃ আমার ভয়টয় নেই। তোমাকেই ওরা দুচক্ষে দেখতে পারে না। আর চারুকে বিয়ে করব-করব করছ—তাই যদি হয়, বিয়ে-থাওয়া সেরে দু-জনে বিদেয় হও দিকি। গাঁয়ে না ফিরবে তো আর যেখানে হোক যাও চলে। আগে সাঁইতলায় আমরা যেমন ছিলাম, ঠিক আবার তেমনি হব।

রাগ ও বিরক্তির ভাব গিয়ে নগেনশশীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হলঃ বেশ, তাই। যোগাড়যন্তর করে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও। তুমি বোনাই আছ, আমিও বোনাই হয়ে যাই তোমার। দেশে-ঘরে ফেরা যাবে না—হুঁকো-নাপিত বন্ধ, মরলে কাঁধ দেবে না কেউ। তা যেখানেই থাকি সেই তো দেশ। আবাদ অঞ্চলে ঘরবসত

করব, যেখানে সমাজের বায়নাক্কা নেই। সাঁইতলায় না পোষাল তো কত কত জায়গা রয়েছে।

গগন বলে, তোমার ভাবনা কি! বড় গাছে লা বাঁধবে গিয়ে। খবর পেলে চৌধুরিরা লুফে নেবে তোমায়।

গগন যাবে না তো, নগেনশশী ও চক্কোত্তি চললেন। সেই যে দুটো বিদেশী মানুষ রাত্রিবেলা অচেনা পথে ছুটে বেরুল—অন্য-কিছু না হোক, তাদের খবরাখবর নিয়ে আসা কর্তব্য। খবর ঐ চৌধুরি-গঞ্জে না মেলে তো চলে যাবেন ফুলতলা অবধি। ও-তরফের সামনে গিয়ে দোষ-অপরাধ ঝেড়ে ফেলতে হবে একেবারে: আমরা নেই ওসব বজ্জাতির মধ্যে, আমরা কিছু জানি নে।

নায়েব ও চাপরাসী পৌঁছে গেছেন চৌধুরিগঞ্জের আলায়। অনেক কষ্ট পেয়ে, অনেক অপথ-বিপথ ঘুরে। নিবারণ ভোরবেলা মাছের ডিঙিতে সদরে রওনা হয়ে গেছে। আছেন প্রমথ হালদার। আয়েশী মানুষ, ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। রাত্রিবেলা নিরম্বু উপোস গেছে, মুড়িও ছিল না ঘরে। এই মেছো-রাজ্যে দরকার মতন ছাইটুকুও পাওয়া যায় না। সব কিছু আগে থাকতে যোগাড় রাখতে হয়। কালোসোনা সকালবেলা চিঁড়ে-মুড়ির চেষ্টায় গেছে। গেছে তো গেছেই—দেখ, কোথাও রস গিলতে বসে গেল কিনা। মেছোঘেরির এই ভূতগুলোকে বিশ্বাস নেই।

প্রমথ শুয়ে ছিলেন। নগেনশশীকে আগে দেখেন নি, চক্কোত্তিকে দেখে চিনলেন। তড়াক করে উঠে বসে গর্জন করে উঠলেন: সকালবেলা কোন্ মতলবে আবার? কালীতলায় আমাদের বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছিল, আইন তো জানা আছে মশায়ের—ক'বছর জেলের ঘানি ঘোরাতে হবে সেইটে ভাল করে ওদের বুঝিয়ে দিন গে।

টোনি চক্কোত্তি বলেন, শুধু আপনি হলেও তো ভাল ছিল নায়েব মশায়। আদালতের চাপরাসী সঙ্গে। সরকারী কাজে ব্যাঘাত-সৃষ্টি—সরকারী লোকের উপর জুলুম ও খুনখারাবির চেষ্টা। শ্রাদ্ধ কদ্দূর অবধি

গড়াতে পারে, গোঁয়ারগুলো কিছু কি তলিয়ে দেখে ?

নগেনশশী স্তম্ভিত ! কী মানুষ চক্কোত্তি। ঠাণ্ডা করতে এসে আরও যে বেশী করে তাতিয়ে দিচ্ছে। হালদার ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, কাউকে ছাড়ব না, সবশুদ্ধ জড়িয়ে ফৌজদারি হচ্ছে। নামধাম যোগাড়ের জন্য আজকের দিনটা আছি।

উঁহু, উঁহু—সবেগে ঘাড় নেড়ে ওঠেন চক্কোত্তি : পাকা লোক হয়ে কাঁচা কাজ করে বসবেন না। তবে তো জুত পেয়ে যাবে। গগন দাস যতই হোক ঘেরিদার মানুষ। শাঁস আছে, ছ্যাঁচড়া কাজে সে কক্কনো যাবে না। এ সব করে বেড়ায় উড়ো মানুষ যারা। বলে দিল মুখে মুখে ফুক্কুড়ি কথা, বাতাসে উড়ে চলে গেল। সে কথার দায়ঝক্কি নিতে যাবে না। এবারে কায়দায় পাওয়া গেল তো দলটা ধরে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিন। আপনাদের বৈষয়িক বিরোধের মীমাংসা হতে তার পরে দেখবেন দু-দণ্ডের বেশী লাগবে না।

আসল মারপ্যাঁচ নগেনশশী এতক্ষণে বুঝতে পারছে। চক্কোত্তিকে মনে মনে তারিফ করে। চক্কোত্তি আবার বলেন, পুরো দল নিয়ে পড়তে হবে না। পালের গোদা একটা আছে, তার নাম জগন্নাথ। ওটাকে ফাটকে পুরে দিন, দেখবেন সব ঠাণ্ডা।

কিন্তু প্রমথও গভীর জলের মাছ—এক কথায় মেনে নেবেন, সে পাত্র নন। ঘাড় নেড়ে বলেন, ও বললে শুনি নে মশায়। খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে। গগন দাস প্রকাশ্যে না হোক তলে তলে ছিল। ওই যে ছুঁড়ীটা—গগন দাসের বোনই তো—হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল আমরা যখন বেরিয়ে আসি। স্বকর্ণে শুনে এসেছি।

চক্কোত্তি বলেন, ফচকে ছুঁড়ী—মজা পেলেই হাসে। ও হাসি ধর্তব্যের মধ্যে নাকি ? ইনি নগেনশশী, গগনের সম্বন্ধী—মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছেন। বিয়ে করে রান্নাঘরে পুরে হেঁসেলে জুতে দেবেন। হাসতে হবে না আর, জীবন ভোর ঘানি টেনে মরবে।

প্রমথ কঠিন হয়ে বলেন, আমি ওসব বুঝি নে মশায়। বাছাবাছির কী দরকার ! সবসুদ্ধ জড়িয়ে দেব। নির্দোষী হলে আদালতে

প্রমাণ দিয়ে ছাড়িয়ে আসবে।

কথা এমনি দাঁড়াবে, চক্কোত্তিরও আন্দাজে ছিল সেটা। নগেনের দিকে তিনি চোখ ইশারা করেন: নায়েব মশায় বুঝতে পারছেন না, বুঝিয়ে দাও নগেনবাবু।

নগেনশশীর কোমরে গাঁজিয়া। চক্কোত্তির পরামর্শে নিয়ে এসেছে। গাঁজিয়া খুলে টাকাপয়সা বের করে। ইতিমধ্যে কালো-সোনা ফিরেছে কোথা থেকে মুড়ি সংগ্রহ করে। লেনদেনের ব্যাপার দেখে একটুখানি দাঁড়িয়ে। তামাক আনল, পান সেজে এনে দিল, কথাবার্তা চলল আরও কিছুক্ষণ। যাওয়ার সময় প্রমথ এগিয়ে বাঁধ অবধি দিয়ে এলেন। নগেনকে বলেন, মহাশয় মানুষ চকোত্তি মশায়। আটঘাট বাঁধা কাজকর্ম। এঁর জন্যে তোমাদের রক্ষে হয়ে গেল। তোমার বোনাইকে বলো সে কথা। আমরা ঘেরিদার, তোমরা ঘেরিদার—আমাদের উভয় তরফের শত্রু জগন্নাথ। ঐ শত্রু নিকেশ করি আগে। চোর-ছ্যাঁচোড় চেলাচামুণ্ডাগুলো তার পরে ফুঁয়ে উড়ে যাবে! বুঝিয়ে বলো সমস্ত দাসমশায়কে।

·

চৌধুরিগঞ্জ থেকে ফিরে এসে গগনকে মাঝে বসিয়ে ফলাও করে সমস্ত খবর বলছে। বড় শত্রু এইবারে মিত্র হয়ে মাথায় মাথায় এক হয়ে লাগছে। নতুন-ঘেরির বিপদ কাটল।

নজর পড়ল, চারুবালা ঘুণ হয়ে শুনছে। নগেনশশী বলে ওঠে, বোনের জন্যেই তুমি জাহান্নামে যাবে জামাইবাবু। মান পশার নষ্ট হবে। ম্যানেজার আর চাপরাসীকে কালীতলায় বলি দেবার কথা চারু বলেছিল, কোমরে দড়ি বেঁধে ওকেই তো সকলের আগে থানায় টানত। খরচপত্র করে বিস্তর কষ্টে আমরা ঠেকিয়ে এলাম। সামাল কর এখনো বোনকে, ওদের দলের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে দাও। আমরা সেই কথা দিয়ে এসেছি। ঝামেলার নয় তো পার থাকবে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো চকোত্তি মশায়ের কাছে শোন।

চারু চলে গেল। বেরিয়ে গেল সে পাড়ার দিকে। সারারাত্রি হুল্লোড়ের পর নিশ্চয় সব মজা করে ঘুম দিচ্ছে। চৌধুরি-আলা আর নতুন-আলায় মিলে গলা কাটবার মেলতুকে শান দিচ্ছে, নির্বোধ গোঁয়ারগুলো সে খবর জানে না।

ক্ষ্যাপা-মহেশ শুধুমাত্র জেগে। লম্বা কলকেয় গাঁজা সেজে এক-মনে নুড়ি ধরাচ্ছে। ঘাড় তুলে চারুবালাকে দেখে বলে, দুপুরের সেবা তোমাদের ওখানে দিদি। বাদাবনে আর শ্রীক্ষেত্রে জাত-বেজাত নেই। তোমাদের হেঁসেলের ভাত খাব। হাঁদারাম যেগুলো, বাদা-রাজ্যে তারাই কেবল হাত পুড়িয়ে রান্না করতে যায়।

চারুবালা এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে বলে, সে লোকটা কোথায় গেল ঠাকুর মশায়? সেই যে নাটের গুরু—দুশমন দুটোকে গরুর-গাড়িতে তুলে নিয়ে আসছিল।

জগন্নাথ? গাড়ি ফেরত দিতে বয়ারখোলা গেল। যাত্রাদলে আবার পাছে জুটে যায়—বলাই আর পচা পাহারাদার হয়ে গেছে। ওরা টেনেটুনে নিয়ে আসবে।

কবে আসবে?

আমি তো রয়ে গেলাম ওদের জন্যে। বলে-কয়ে ছাড়ান করে আনবে তো—আজকে পেরে উঠবে না। কাল নয় তো পরশু। বয়ারখোলায় আর যাবে না, এইখানে থাকবে।

চারু দৃঢ় স্বরে বলে, এখানেও থাকবে না। সেই কথা বলতে এসেছিলাম। ওদের পেলাম না, তোমায় বলে যাচ্ছি ঠাকুর। নতুন কোন্ জায়গার কথা বলছিলে, সেইখানে নিয়ে তোলগে। আমার দাদা ঘেরিদার এখন। আগের দিন আর হবে না। হাঙ্গামায় পড়ে যাবে, ধরে নিয়ে ফাটকে পুরবে। বলে দিও সকলকে।

মহেশ বড় খুশী: আছি আমি সেই জন্যে। নেহাত পক্ষে নতুন জায়গাটা একবার দেখিয়ে আনব। মানুষের নজর খাটো কেন জানি নে। দূরের দিকে দেখতে পায় না। পিরথিমে ঠাঁইয়ের অভাব নেই, হাঙ্গামাহুজ্জুতের কী দরকার তবে বল। ওরা যদি না যায়, তখন

ভিন্ন এলাকার মানুষ দেখব। সেবা এই ক'দিন কিন্তু তোমাদের ওখানে। জঙ্গলের মানুষের গৃহস্থ-বাড়ি খাওয়া —এমন খাওয়া খেয়ে নেব, মাসাবধি তার ঢেঁকুর উঠবে।

চল্লিশ

জগারা গেছে তো গেছে। দুটো দিন দুটো রাত্রি কাটল, ফিরবার নাম নেই। মহেশ ঠাকুরকে চালাঘরে রেখে গেছে। ঘরবাড়ি পাহারায় আছে ঠাকুর। পাহারার মানুষই বটে! গাঁজা টানে, আর মানুষ পেলে বনের গল্প জুড়ে দেয়। মানুষ না থাকলে পড়ে পড়ে ঘুমোয়।

রাধেশ্যাম জুটেছে ক্ষ্যাপা ঠাকুরের সঙ্গে। গাঁজার গন্ধ তাকে টেনে নিয়ে তুলেছে। কিন্তু এমন মানুষটার সঙ্গে মউজ করে ভালমন্দ দুটো কথা বলবে তার ফুরসত কই? সুমুখ-আঁধারি রাত বলে সকাল সকাল এখন জালে বেরুতে হয়। কড়া ব্যবস্থা অন্নদাসীর। সন্ধ্যা হতে না হতে যা-হোক দুটো খাইয়ে জালগাছ কাঁধে দিয়ে বাঁধের উপর তুলে দেবে। ঠিক ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে, কিম্বা পাড়া মুখো ফিরল—পরখ করবার জন্য নিজেও পিছু পিছু সঙ্গে যায়। বউ বটে একখানা! ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে এক সময় ফিরে আসে একলা মেয়েমানুষ—ডর লাগে না। বউ সত্যি সত্যি ফিরে গেছে—রাধেশ্যাম তবু ভরসা করতে পারে না। কোন্ হেঁতাল-ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, কে জানে! পতি-দেবতার একটু বেচাল দেখলে ক্যাঁক করে অমনি টুঁটি চেপে ধরবে: তবে রে হাড়-ফুটো, এই তোমার জালে যাওয়া!

মহেশের মত গুণিজন পাড়ার মধ্যে বর্তমান, তা সত্বেও রাধেশ্যাম বউয়ের ভয়ে সারা রাত ভেড়িতে ভেড়িতে জাল বেয়ে বেড়াল! ব্যাপার-বাণিজ্যও নিন্দের হয় নি—টাকা পুরে তার

উপরেও তিন আনা। অন্নদাসী শেষ রাত্রে উঠে যথারীতি সায়েরে চেপে বসেছে। ডাক শেষ হয়ে ব্যাপারীর ঝোড়ায় মাছ পড়তে না পড়তে দামের টাকা-পয়সাগুলো ছোঁ মেরে আঁচলে বেঁধে সে ফরফরিয়ে চলল। রাধেশ্যাম হাঁ করে দেখছে। বে-আক্কেলে মেয়েমানুষ বিড়ি খাওয়ার জন্যেও ছুটো পয়সা হাতে দিয়ে গেল না!

রাতটা গেল তো এই রকমে। আলা থেকে তারপর সোজা সে মহেশের কাছে চলে গেল। কিন্তু গিয়ে হবে কি! সারারাত ভূতের খাটনি খেটে চোখ ভেঙে আসছে, ভাল করে ছুটো কথা বলার তাগত নেই এখন মানুষটার সঙ্গে। ঢুলতে ঢুলতে শুয়ে পড়ে শেষটা। মড়ার মত ঘুমোয়। পরের রাতে বেরুতে আর মন চায় না। ভাগ্যবশে মহেশ ঠাকুর আজকের দিনও রয়ে গেছে। তবু, হায় রে, বউয়ের তাড়ায় জাল ঘাড়ে রওনা হতে হল। এখানে ওখানে ঝুপ-ঝুপ করে জালও ফেলে পাঁচ-দশ ক্ষেপ। শীত ধরে আসে, দেহে কাঁপুনি লাগে। এই কাঁপুনির প্রতিষেধক আছে মহেশের কাছে। তার বড় কলকেয়। আজকের খরচের সিকিটা হর ঘড়ুই দিয়েছে। সায়েরের মধ্যে রাধেশ্যামের চোখের উপরেই দিয়ে দিল। মরীয়া হয়ে এক সময় রাধেশ্যাম বাঁধ ধরে আবার ফিরে চলল। ভারী তো বউ—বউ-টউ সে গ্রাহ্য করে না।

আলো নেই, অন্ধকার চালাঘরের ভিতর কলকের মাথা জ্বলে জ্বলে উঠছে। ছায়ামূর্তির মত ক্ষ্যাপা-মহেশ ও ছু-তিনটি লোক গোল হয়ে বসে। হর ঘড়ুই এসে বসেছে, দেখা গেল। ব্যাপারী মানুষ—পয়সা দিয়েছে, যতখানি এর ভিতরে উশুল করা যায়। রাধেশ্যামও গিয়ে একপাশে ঠাঁই নিল।

শীতে মারা যাই ঠাকুরমশায়, প্রসাদ দাও।

ভেবেছিল ছুটো-তিনটে টান টেনেই আবার বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু গা এলিয়ে দিচ্ছে। এ নেশায় একবার বসে পড়লে হঠাৎ আর ওঠা যায় না। চলছে। মহেশ আগে বেশ কথাবার্তা বলছিল। কিন্তু কলকে ঘুরে ঘুরে যতবার হাতে আসে, দম দিয়ে ততই সে

ঝিম হয়ে যাচ্ছে। রাধেশ্যাম ভাবছে, ক-খানা ঘরের পরেই তার ঘর। অন্নদাসী ঘুমিয়ে গেছে এতক্ষণে। রাধেশ্যাম জল ঝাঁপিয়ে মাছ মেরে বেড়াবে, আর অবলা নারী শুকনো-খটখটে ঘরে ঘুম দিচ্ছে মজা করে। ভোর থাকতে আলায় গিয়ে চেপে বসবে মাছের পয়সাকড়ি আঁচলে বাঁধবার জন্য। আঁচল কেন রে বউ, দু-মুখো থলি সেলাই করে নিয়ে যাস কাল। সেরেস্তারে যা পয়সাকড়ি রেখে ছিস, তাই কাল বের করতে হবে। নয় তো পেটে কিল মেরে পড়ে থাকা সকলের। বাচ্চাটা অবধি।

এমনি নানা রকম ভাবতে ভাবতে, বিশেষ ঐ বাচ্চার কথা মনে ভেবেই, রাধেশ্যাম আবার জাল কাঁধে বেরিয়ে পড়ে। চাঁদ উঠে গেছে, জুত হবে না আর। বাঁধে উঠলেই ভেড়ির যত পাহারাদার দূর থেকে দেখে ফেলবে। ঘিরে ধরবার চেষ্টা করবে নানান দিক থেকে। তার ভিতরে এক-আধ ক্ষেপ দেওয়া যায় যদি বড় জোর। মাছ-মারার দেবতা বুড়ো-হালদার---তিনি ইচ্ছে করলে কী না হতে পারে! উঠানের উপর কানকো হেঁটে মাছ আসছে, কত এমন দেখা যায়। সবই বুড়ো-হালদারের মরজি।

কিন্তু হল না আজ কিছুই। বউ ক্যার-ক্যার করে ঘরের চালে কাক পড়তে দেবে না। পাড়ার লোকের অশান্তি। বাচ্চাটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চেঁচাবে।

অন্নদাসী বলে, যাও নি তুমি মোটে জালে। গেলে নিদেনপক্ষে দুটো কুচোচিংড়ি জালে বেধে আসত না?

যাই নি, তবে জাল ভিজল কি করে?

খানাখন্দের জলে জাল ভিজিয়ে আনা যায়। গাঁজায় দম মেরে পড়েছিলে পাগলা ঠাকুরের ওখানে।

এমনি কথা উঠবে অনুমান করে রাধেশ্যাম সতর্ক হয়ে এসেছে। কুলকুচা করে এক মুঠো তুলসীপাতা চিবিয়েছে। বউয়ের নাকের কাছে মুখ নিয়ে যায় একেবারে। বলে, দেখ রে—গন্ধ শুঁকে দেখ মাগী।

ঠেলা দিয়ে অন্নদাসী মুখ ফিরিয়ে দিল। জোরটা বেশী হয়ে গেল রাগের বশে।

রাধেশ্যাম চেঁচিয়ে ওঠে, অ্যাঁ, মারলি তুই আমায়? পতির গায়ে হাত তুললি? পতি হল দেবতা, কাঁচাখেগো দেবতা—হাতে কুড়িকুষ্ঠ হয়ে খসে পড়বে।

এবং দেবতাটি শুধুমাত্র মুখে শাপশাপান্ত করেই নিরস্ত হয়ে যাবার পাত্র নয়। হাতও চলে। অন্নদাসী যথাসম্ভব প্রতিরোধ করে শেষটা কুক ছেড়ে কাঁদে। জেগে উঠে বাচ্চাটাও চেঁচাচ্ছে।

এদিককার রণে ভঙ্গ দিয়ে রাধেশ্যাম দু-হাতে বাচ্চা তুলে নেয়। নাচিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে শান্ত করে। কিন্তু পেটের ক্ষিধে ভুলে অবোধ শিশু নাচানোয় কতক্ষণ শান্ত হয়ে থাকবে? একটা উপায় এখন—আধুলিটা সিকিটা হাওলাত চাইতে হবে গগন দাসের কাছে। সায়েরে মাছের দাম থেকে পরে কেটে নেবে।

গণ্ডগোলে দেরি করে ফেলল, সায়ের তখন ভেঙে গেছে। গগন আলায় ফিরেছে। রাধেশ্যাম আলার সীমানার মধ্যে ঢোকে না। খোশামুদি করতে এসেছে আজ, ঝগড়াঝাঁটি নয়। ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, একটা কথা বলব, ইদিক পানে এস বড়দা।

চুপ হয়ে যায় হঠাৎ। নির্বাক ভালমানুষ হয়ে দাঁড়ায়। ধবধবে ফর্সা জমা-কাপড় পরে নগেনশশী বেরিয়ে আসছে। নগেনের আগে আগে সেই মানুষটি—চক্কোত্তি মশায়।

নগেনশশী রাধেশ্যামের দিকে ভ্রূকুটি করেঃ মতলব কি হে? জামাইবাবুকে ডাকছ কেন, কোন্ দরকার?

রাধেশ্যাম কাতর হয়ে বলে, জালে কিছু হয় নি। চার-পাঁচ আনার পয়সা না হলে তো বাচ্চাটা সুদ্ধ উপোস করে মরে।

নগেন বলে, সেটা ভাল। কাজ করবে, বেজুত হলে এসে হাত পাতবে। নয় তো আমরা সব আছি কী করতে। কিন্তু বলে দিচ্ছি, জগার ঐ শয়তানি-রাহাজানির মধ্যে কক্ষনো যাবে না। গেলে মরবে। পথে দাঁড়িয়ে সারারাত্তির হল্লা করল, তুমি তার মধ্যে ছিলে

নাকি রাধে ?

রামো ! আমি কেন থাকতে যাব, ছ্যাচড়া কাজে আমি নেই। তিনটে মুখের ভাত যোগাতে আমার বলে রক্ত জল হয়ে যাবার যোগাড়—

সেদিনের নগরকীর্তনের দলে রাধেশ্যাম ছিল তো বটেই, কিন্তু সজোরে সে ঘাড় নাড়ে। নগেনশশীও এক কথায় মেনে নেয়। শক্রর সংখ্যা যত কম হয় ভাল। বলে, যাচ্ছি পিণ্ডি চটকাতে ওদের। চক্কোত্তি মশায় সহায়। সদরে যাচ্ছি, ফুলতলা আগে হয়ে যাব। চৌধুরি-আলা আর সাঁইতলার নতুন-আলা এক হয়ে গেছে। ফিরে এসেই লাল-ঘোড়া দাবড়ে দেব—খাণ্ডব দাহন হবে।

লাল-ঘোড়া দাবড়ানো মানে আগুন দেওয়া। এত কথা বলেও রাগ শান্ত হয় না। কয়েক পা গিয়ে আবার দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বলে, সমঝে দিও পাড়ার সকলকে, নগেনশশীবাবু খোদ বেরিয়ে পড়ল। এস্পার-ওস্পার করে তবে ফিরব। সায়েরে আজ আমিও বলেছি সকলকে। তুমি এই দেখে যাচ্ছ—তোমার মুখে আর একবার শুনে নিক।

খালের ধারে ছয় দাঁড়ের পানসি বাঁধা। এ হেন বস্তু বাদাবনে হামেশা আসে না, উত্তর অঞ্চল থেকে জুটিয়ে আনতে হয়। দু-জনে সেই নৌকায় উঠছে। আরও লোক আছে ছইয়ের খোপে। রাধেশ্যাম উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে—কে মানুষটা ? মানুষটা এদের আহ্বান করে : এস গো। লাঠি ধরে খুব সামাল হয়ে ওঠ, খোঁড়া-মানুষ পা পিছলে না পড়। উঠে আসুন চক্কোত্তি মশায়।

রাধেশ্যামের মোটে ভাল ঠেকে না। যা বলেছে—কাণ্ড ঘটাবে একখানা সত্যিই। পানসি কি ফুলতলার চৌধুরি-বাবুদের—প্রমথ হালদার যাচ্ছে পানসিতে, ক'দিন আগে সকলে মিলে যাকে নাস্তানাবুদ করল ? কাজটা অন্যায় করেছে জগা—কেউটেসাপ ঘাঁটা দিয়ে রাখা।

পানসি চলে যাবার পর গগন আলা থেকে বেরুল। বেরিয়ে

বেড়ার ধারে আসে। রাধেশ্যামকে এইমাত্র যেন চোখে দেখতে পেল। কোমল সুরে বলে, কে, রাধে? পর-অপরের মত বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এস।

অপস্রিয়মাণ নৌকোর দিকে চেয়ে রাধেশ্যাম করুণ সুরে বলে, আগে তো যখন তখন চলে যেতাম ভিতরে। বলতে হত না। এখন ডর লাগে।

গগন ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ, কুকুর পুষেছি। পুষি নি, এমনি এসে জুটেছে। মানুষ দেখলে ঘেউ-ঘেউ করে। কিছু বলতে গেলে আমায় অবধি তেড়ে আসে।

রাধেশ্যাম বলে, এই মাত্তর চলে গেল—সেই জন্যে বলতে পারলে দাদা। কিন্তু আর একটি যে আছে—

আলাঘরের দিকে সভয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করে বলে, নিজের বোন বলে চেপে যাচ্ছ, কিন্তু ওটিও কম যায় না।

গগন ভারী এক ভরসার কথা বলে, তাড়াব। কোনটাকে থাকতে দেব না। চেষ্টা করছি এক সঙ্গেই তাড়াব দুটোকে—বিয়ে দিয়ে সরিয়ে দেব। এখন বুঝতে পারি, নগমাটা ওই লোভে ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করে এল। মানবেলায় হবে না, তাই বাদারাজ্যে এসে পড়ল বিয়ের মতলব করে। বড় ভাই আমি মত না দিলে কিছু হবে না, চেপে বসে থেকে তাই যত অঘটন ঘটাচ্ছে।

বড্ড ভয় দেখিয়ে গেল শালা। শুনে তো গা কাঁপে। —বলতে বলতে রাধেশ্যাম ফিক করে হেসে ফেলল। বলে, তোমার শালা সেই সুবাদে পাড়াসুদ্ধ আমাদের সকলের শালা।

গগন বলে, ভয়টা মিথ্যে নয়। আমে-দুধে মিশে যাচ্ছি, আঁঠি তোরা এখন তল। চৌধুরি ঘেরিদার আর গগন ঘেরিদার দুই এবার এক হয়ে গেছে—পাড়ার মধ্যে তোমরা কারা হে বাপু? রাতবিরেতে ঘেরিতে জাল বাওয়া চলবে না, সায়েরে চুরির মাছ বেচাকেনা হবে না। যত পুরানো নিয়মকানুন বাতিল। ঘেরির আইন আর সরকারী আইন দুটো এক হয়ে যাচ্ছে। চুরি করে

জাল বাইলে ফাটকে নিয়ে পুরবে।

রাধেশ্যাম সভয়ে বলে, বিয়েয় শিগগির মত দিয়ে দাও বড়দা। ঝুলিয়ে রেখো না। বিয়েথাওয়া চুকিয়ে আপদ-বালাই যেখানে হোক তাড়াতাড়ি বিদেয় কর।

বয়ারখোলায় পুরো দুটো দিন কাটিয়ে জগারা ফিরল। চুকিয়ে-বুকিয়ে আসা সহজ নয়। ছাড়তে কি চায়! যাত্রার দলটা এখন অসময়ে ঝিমিয়ে আছে বটে, কিন্তু কটা মাস গিয়ে আবার তো পৌষমাস। উঠোন-ভরা ধানের পালা, দলও চাঙ্গা হবে সেই সঙ্গে। বিবেক তখন কোথায় খুঁজে বেড়াবে?

সুদন কপাল চাপড়ায়। খানিকটা মস্করা, খানিকটা সত্যি সত্যি। বলে, ইস রে! জ্বর হোক বিকার হোক, ধুঁকতে ধুঁকতে কেন আমি গাড়ি নিয়ে গেলাম না! কোটে গিয়েই জগা-দার মন গেঁথে গেল। কেন রে? কী আছে সেখানে?

জগা বলে, কোট আমার কোন্‌টা দেখলি তোরা? দুনিয়ার উপর জন্মে পা দুখানা শক্ত হতে যে কটা বছর লেগেছিল। তারপর থেকে কোট বদলে চলেছি। নামতে নামতে নাবালে নেমে যাচ্ছি। দেখি কদ্দুরে দুনিয়ার মুড়ো। যেখানে গিয়ে বিনি গণ্ডগোলে আয়েশ করে থাকা যায়। সেই হবে পাকা জায়গা। সে কি পাব? তেমন জায়গা আছে কি কোথাও?

সবাই বলে, চলে যাচ্ছ যখন একসঙ্গে চাট্টি শাক-ভাত খেয়ে যাও জগা। এ-বাড়ি খায়, ও-বাড়ি খায়। বলি, শীতকালে আসছ তো ঠিক? কথা দিয়ে যাও। হ্যাঁ, জগার কথার কানাকড়িও দাম আছে নাকি!

বলাই বলে, সবাই তোকে ভালবাসে জগা। যেখানে যাস, মানুষজন দু-দিনের ভিতর মাতিয়ে তুলিস।

জগা বলে, ভালবাসা সয় না আমার মোটে। মন ছটফট করে, লোহার শিকলির মতন লাগে।

অবশেষে তিনজনে রওনা হয়ে পড়ল। বলাই পচা আর জগা। সকলের হাত ছাড়িয়ে বেরুতে দেরি হল অনেক। পথ কতটুকুই বা! গাঙ-খালে আগে শতেক বাঁক ঘুরতে হত, তখন দূর-দুরন্তর মনে হত। সড়ক বানিয়ে বাঁকচুর সিধে করে দিয়েছে। রাস্তাঘাট বানিয়ে ছুনিয়া কত ছোট করে ফেলেছে মানুষ। সাঁইতলা সকাল সকাল পৌঁছানোর দরকার—পাড়ার মানুষ ডেকে ডুকে আসর বসাতে হবে। আজকেই। সেদিনের মতই আজ আবার তুমুল গান-বাজনা। আর কিছুতে না পারা যায়, গান গেয়েই জব্দ করবে খোঁড়া-নগনাকে। পা চালিয়ে চল। দেরি হলে সব জালে বেরিয়ে যাবে, আসরের মানুষ পাওয়া যাবে না।

সাঁইতলা এসে পড়ল, প্রহর রাতও হয় নি তখন। পাড়া নিষুতি। মানুষ খরচা করে কেরোসিন পোড়াবে না সেটা বোঝা যায়। কিন্তু মুখের উপর তো খাজনা-ট্যাক্স বসায় নি, কথা বলতে পয়সাও খরচা নেই—তবে কেন চুপচাপ এমনধারা? পাখ-পাখালি জীব-জানোয়ার সকলের ডাক আছে! কিন্তু সাঁইতলার পাড়া ভরতি এক গাদা মানুষ যেন ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। ছুটো রাত্রি ছিল না—সবসুদ্ধ তার মধ্যে মরে-হেজে গেল নাকি?

বলাই বলে, কেষ্টপক্ষ পেয়ে সকাল সকাল জালে বেরিয়ে গেছে।

জগা বলে, বেরুবে মরদমানুষ। মাগীগুলো কি করে? কাজকর্ম সেরে নিয়ে নিদেনপক্ষে একটু ঝগড়াঝাঁটি তো করবে! কী হল রে! বন না বসত, বোঝা যায় না।

উঠানে এসে গাঁজার গন্ধ নাকে পায়। তাতে খানিক সোয়াস্তি। পাড়ায় মানুষ থাকুক না থাকুক তাদের চালাঘরে আছে। অন্ধকারে ভূতের মত বসে আছে ক্ষ্যাপা-মহেশ। দাওয়ায় খুঁটি ঠেস দিয়ে ঝিম হয়ে একলাটি বসে। অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে, বুঝে দেখ তবে। গাঁজা একা একা খাবার বস্তু নয়। অথচ এমন পাড়ার ভিতর থেকে একজন কেউ বেরুল না। গন্ধ পাচ্ছে—মানুষের মন

ঠিক আনচান, তবু কেন আসে না— তাজ্জব ব্যাপার!

মহেশও ঠিক এই কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বোমার মত ফেটে পড়েঃ বেরিয়ে পড় ওরে শালারা, পায়ে মাথা কুটছি। এ জায়গায় শনির নজর লেগেছে। বাবু-ভেয়েরা ধাওয়া করেছে— আর সুখ হবে না। পালা, নয় তো মারা পড়বি একেবারে।

বৃত্তান্ত অতঃপর সবিস্তারে শোনা গেল। রাধেশ্যামকে ঐ যে শাসানি দিল, পাড়ার প্রতিজনকে ধরে ধরে অমনি বলে দিয়েছে। নতুন চৌকি বসে যাচ্ছে নাকি চৌধুরিগঞ্জে, পুলিস মোতায়েন হবে। রাত্রিবেলা ঘেরির খোলে জাল ফেলে মাছ মারা যা, সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে মাল পাচার করাও ঠিক সেই বস্তু। চুরি। চুরির আইনে বিচার হবে এবার থেকে, শুধুমাত্র জাল কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে না। হাতে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যাবে।

পচা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে, চলবে কি করে তবে মানুষের? খাবে কি?

মহেশ বলে, সে কথাও হয়েছিল। নগেনবাবু বলল, রাস্তাঘাট হচ্ছে, মাটি কাটবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে খেতে হবে। অসৎবৃত্তি চলবে না। শোন কথা! ওরাই যেন খাটনি খেটে রোজগার করে খায়!

পচা বলে, মাটি কাটুক, ভাল কথা। কিন্তু একদিন তো রাস্তা বাঁধা শেষ হয়ে যাবে। তখন?

মহেশ বলে, তখন মরবে। সময় থাকতে তাই তো পালাতে বলি। সে তো কানে নিবি নে শালারা।

চালাঘরে ঢুকে বলাই টেমি জ্বালে। বয়ারখোলা থেকে চাল নিয়ে এসেছে—তাই কিছু তাড়াতাড়ি ফুটিয়ে নেওয়া। পচাকে ডাকছে, উনুন ধরা পচা। ক্ষিধেয় পেটের মধ্যে বাপান্ত করছে—।

জগা বলে, খাওয়া হোক, শোওয়া কিন্তু হবে না। তাই বুঝে চাল নিবি। কুঁচকি-কণ্ঠা গিলে হাঁসফাস করবি, ঘুষি মেরে ভুঁড়ি ফাঁসাব তাহলে। সারা রাত জেগে গান-বাজনা। ঢোল বাজাব আমি,

আর গাইব তিনজন মিলে। দল ভেঙ্গে দিল তো বয়ে গেছে—আমাদের তিনটে মানুষের প্রতাপ দেখিয়ে দেব আজকে।

বলাই চাল ধুতে গেছে বাঁধের নয়ানজুলিতে। পচা উনুন ধরাচ্ছে। ক্ষ্যাপা-মহেশ উঠে এসে উনুনের আগুনে কলকের নুড়ি ধরিয়ে নিয়ে গেল। আর জগাই বা সময়ের অপব্যয় করে কেন—ততক্ষণ ঢোলক নামিয়ে নিয়ে বসলে তো হয়।

বেড়ায় ঢোলক টাঙানো থাকে—কী আশ্চর্য, ঢোলক নেই। গেল কোথায়? টেমি নিয়ে এল উনুনের ধার থেকে, বেড়ার চতুর্দিকে টেমি ঘুরিয়ে দেখে। নেই তো! ঢোলক বলে নয়—দড়ির উপর কাঁথা টাঙানো থাকে, তা-ও গেছে। দুটো-দিন ছিল না, মহেশকে পাহারাদার রেখে গিয়েছিল। ক্ষ্যাপা ঠাকুর গাঁজা খেয়ে ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে পড়েছিল, সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে সেই ফাঁকে।

জগন্নাথ গরম হয়ে মহেশকে বলে, তোমার জিম্মায় ছিল সব। চালাঘরের মধ্যে কে এসেছিল?

বড়-কলকেয় প্রবল এক টান দিয়ে চোখ পিটপিট করে মহেশ বলে, কে আসবে? চারুবালা এসেছিল বুঝি ক'বার। মেয়েটা বড্ড ভাল। ওঁদের আলায় এই ক'দিন আমার সেবা ছিল কিনা—ডাকতে আসত।

ডাকবে তো বাইরে দাঁড়িয়ে। কোন্ সাহসে ঘরে ঢোকে? ঢুকল তো ঠ্যাঙে লাঠি মেরে খোঁড়া করে দিলে না কেন?

মহেশ ভ্রূভঙ্গি করে বলে, এসে মন্দটা কী করল শুনি? ময়লা দেখতে পারে না মেয়েটা। কোমরে আঁচল বেঁধে ঝাঁটা নিয়ে লেগে যেত। গোবর-মাটি গুলে ঘরের মেঝে লেপত। বেড়ার নীচে ফুটো। বলে, মাটিতে পড়ে থাকে মানুষগুলো। ফুটো দিয়ে কবে সাপখোপ ঢুকে পড়বে। মাটি লেপে ফুটো বুজিয়েছে। ঘর কেমন ঝকঝক তকতক করছে। বড্ড দোষ হল মেয়েটার—উঁ?

কিছু নরম হয়ে জগা বলে, আমাদের কাঁথা কোথায় রেখে গেল ?

বলো না। যা দশা হয়েছিল কাঁথার! কটা আঙুল ছুঁইয়ে মেয়েটা তো হেসে খুন। বলে, বাদায় যাচ্ছ গুণীন ঠাকুর, তা তোমাদের বন্দুক লাগবে না। জন্তু-জানোয়ার দেখলে কাঁথা ছুঁড়ে দিও, কাঁথার গন্ধে পালাতে দিশে পাবে না। দানো-ঝুটোর জন্যেও তোমার ধুনোবাণ সর্ষেবাণের দরকার নেই—এই কাঁথা। নিয়ে গেল সেই কাঁথা বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে। ক্ষারে কেচে দেবে। কাচতে গিয়ে সূতো-সূতো হয়ে যায় তো গোবরমাটি দেবার ন্যাতা করবে। নয় তো ফেরত দিয়ে যাবে বলেছে।

আর ঢোলক ?

মহেশ হি-হি করে হাসতে লাগল : মেয়েটা ওদিকে স্ফূর্তিবাজ খুব। ঘর লেপে হাত ধুয়ে এসে ঢোলকটা গলায় ঝুলিয়ে ডুম-ডুম করে বাজাতে লাগল। আর ঠিক তোমার মতন গলা করে ভেঙচে ভেঙচে গান গায়। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়।

গেল কোথায় ঢোলক ? সে-ও ক্ষারে কাচতে নিয়ে গেল নাকি ?

মহেশ বলে, ভুল করে বোধহয় গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে গেছে।

জগা আগুন হয়ে বলে, নিয়ে গেছে মানে ? ঢোলক কি চেনহার যে গলায় পরে তার পরে আর খুলতে মনে নেই? চালাকি পেয়েছে ?

বলাইকে জগা হাঁক দিয়ে ডাকল।

বড় তো ব্যাখ্যান করিস চারুবালার। ওটা হল চর। গানে সেদিন অসুবিধা ঠেকেছে। আমরা ছিলাম না—খোঁড়া নগনা সেই ফাঁকে ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে দল ভাঙাল। আর মেয়েমানুষ চর পাঠিয়ে ঢোলক হরে নিয়ে গেছে। তিনটে মানুষ খালি গলায় চেঁচিয়ে কায়দা করতে পারব না।

পচা আর বলাইর হাত ধরে জগন্নাথ হিড়হিড় করে টানে : চল—

বলাই বলে, কোথায় রে ?

আলায়। ঘরের জিনিসপত্তর টেনে নিয়ে গেল, ভেবেছে কি ওরা !

মনে মনে রাগ যতই থাক, বলাই ঠিক সামনাসামনি পড়তে চায় না। বলে, ভাত চাপিয়েছি, ধরে যাবে।

পোড়া ভাত খাব আজকে। চল—

বলাইর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জগা বলে : মেয়েটাকে ভয় করিস, স্পষ্টাস্পষ্টি তাই বল না কেন। কাছা দিবি নে আর তুই, বুঝলি ? মাথায় ঘোমটা টেনে বেড়াবি এবার থেকে।

মহেশ এর মধ্যে বলে ওঠে : যেতে হবে না। তোমরা এসে গেছ, কাঁথা এবারে নিজে থেকেই এসে দিয়ে যাবে। বড্ড ভাল মেয়ে গো, সাধ্য পক্ষে কারও কষ্ট হতে দেবে না।

আর ঢোলক ?

তা জানি নে। ঢোলক অবিশ্যি না দিতে পারে। ঢোল্‌ক হাতে পেয়ে তো কান ঝালাপালা করবে তোমরা। সেটা বোঝে।

জগা আগুন হয়ে বলে, দেবে না, ইয়ার্কি পেয়েছে ? নতুন করে ছেয়ে আনলাম ফুলতলা বাজার থেকে। করকরে টাকা বাজিয়ে দিয়ে। দেখে আসি, কেমন দেবে না—ঘাড়ে কটা মাথা নিয়ে আছে !

টেনে নিয়ে চলল দু-জনকে। রোখের মাথায় আজকে আর সীমানার বাইরে নয়, একেবারে আলা-ঘরের ছাঁচতলায় গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে : বড়দা—

ঘরের ভিতর কথাবার্তা হচ্ছিল, ডাক শুনে চুপচাপ হয়ে গেল।

জগা বলে, কানে তুলো ভরে রেখেছ বড়দা, শুনতে পাও না ? বেরিয়ে এস, বলছি। নয় তো ঘরে ঢুকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব।

এইবারে দাওয়ার প্রান্তে গগন দাসকে দেখা গেল : চেঁচাও কি জন্মে ? হল কি তোমাদের ?

অন্ধকারে গগন দাসের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গলার স্বরে বোঝা যায়, ভয় পেয়ে গেছে খুব। বলে, কি বলবে বল। এত রাগা-রাগি কিসের ?

তোমার বোন শাসন কর বড়দা।

গগন অসহায়ের ভাবে বলে, কী করল যে আবার ? নাঃ, পারার জো নেই ওদের নিয়ে। খাসা শান্তিতে ছিলাম। জুটে-পুটে এসে এই নানান ঝঞ্ঝাট।

জগা বলে, ক'দিন সাঁইতলা ছিলাম না। সেই ফাঁকে চালাঘরে ঢুকে পড়ে মালপত্তোর পাচার করেছে।

চারুবালা বুঝি পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : মাল আর পত্তোর—কচু আর ঘেচু !

জগা বলে, ভালর তরে বলছি, আপসে দিয়ে দিক সমস্ত। নয় তো কুরুক্ষেত্তোর হবে।

চারুবালা দ্রুত ভিতরে চলে গেল। পরক্ষণে কাঁথা এনে দু-হাতে মেলে ধরে। কেচে ফর্সা করতে গিয়ে পুরানো কাঁথা ফেঁসে গিয়েছে। ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়ে হেসে ফেটে পড়ে।

দেখ দাদা, চেয়ে দেখ। ঘর থেকে দামী শাল-দোশালা নিয়ে এসেছি, সেই জন্মে মারমুখী হয়ে এসে পড়ল। মানুষ নয় ওরা, মানুষে এর উপরে শুতে পারে না।

জগা আগুন হয়ে বলে, আমাদের ঘরের ভিতর আমরা যেমন খুশী শোব, অন্য লোকে কেন মোড়লি করতে যাবে বড়দা ? দিয়ে দিক এক্ষুনি।

চারুবালা বলে, সেলাই করে তারপরে দিয়ে আসব। এ কাঁথায় শোওয়ার চেয়ে মাটিতে শোওয়া অনেক ভাল।

মাদুর গুটানো ছিল দোরের পাশে, চারুবালা ছুঁড়ে দিল। বলে, মাদুরে শুয়ে আজকের রাতটা কাটুক। কাঁথা দেব কাল।

জগা জেদ ধরে ঃ না এক্ষুনি। পরের মাছুরে পা মুছি আমরা।

সত্যি সত্যি পা মুছে পায়ের ঘায়ে মাছুরটা চারুর দিকে ছুঁড়ে দেয়।

আর গগন ওদিকে কাতর হয়ে বলছে, ওরে চারু, দিয়ে দে ওদের জিনিস। মিছে ঝগড়া করিস নে।

চারু কানেও নেয় না। জগার রাগ দেখে বরঞ্চ হাসে মিটিমিটি।

জগা বলে, ঢোলক কি জন্যে আনা হয়েছে, জিজ্ঞাসা কর তো বড়দা। ঢোলক ময়লা নয়, ছেঁড়াও নয়।

চারু বলে, ছিঁড়ে দেব সেই জন্যে নিয়ে এসেছি। ঢ্যাব-ঢ্যাব করে বেমক্কা পিটিয়ে কানে তালা ধরিয়ে দেয়। তবু যদি বাজাতে জানত!

জগা চেঁচিয়ে ওঠে ঃ ছিঁড়ে দেবে, জুলুম! তাই যেন দিয়ে দেখে। হাত মুচড়ে ভেঙে দেব না?

চারু বলে, মুচড়ে ভাঙতে আসবে, তার আগেই যে হাতকড়া পড়ে যাচ্ছে। তার কি উপায়—সেই ভাবনাটা ভাবলে এখন ভাল হয়।

বলাই হাত ধরে টানে ঃ চল রে জগা। ভাত ধরে গেল ওদিকে।

জগা বলে, ভয় পেয়ে গেলি?

বলাই ঢোক গিলে বলে, না, ভয় কিসের? তবে এরা লোক খারাপ, বলাও যায় না কিছু।

পচা এগিয়ে এসে আর এক হাত চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলে, গোঁয়ার্তুমি করো না জগা, চলে এস। ছিল নগনা-খোঁড়া, তার উপরে আবার টোর্নি চক্কোত্তি ভর করেছে। গতিক সুবিধের নয় মোটেই।

দু-জনে দু-হাত ধরে টেনেই নিয়ে চলল জগাকে।

মহেশ শোনে সমস্ত কথা, আর হা-হা করে হাসে ঃ চল রে,

বেরিয়ে পড়ি। বদর-বদর জকার দিয়ে কাছি খুলে দে নায়ের—তরতর করে নেমে চলুক। হিংলি বিংলি আর মোংলা—ঘোর জঙ্গলের তিন দেবতা। বাঘরূপী দেবতা ওঁরা। হন্তে মানুষ তোদের তাড়া করল, মানুষের রাজত্বে আর ঠাঁই হবে না। বাঘের রাজত্বে যাই চল। তাদের দয়া হবে, সেখানে ঠাঁই মিলবে।

সে রাত্রে গান-বাজনা হল না। ভালই হল। ক্ষ্যাপা-মহেশ ঘুমোয় না। ঘোর বাদার গল্প করে, আর গাঁজা খায় ক্ষণে ক্ষণে। এরা তিন জনে প্রসাদ পায়।

শোন, জল হল জীবন। জলে জলময় বাদাবনের চতুর্দিক—সে জল ডাকে, রোদের আলোয় ঝিকমিক করে দাঁত মেলে সে জল গ্রাস করতে আসে। ঝিলিক দেয় সে জলে রাত্রিবেলা। অন্তহীন আকাশের নীচে কূলহীন সেই জলের উপরে ভীত মানুষ আর্তনাদ করে: ঠাকুর, দুনিয়া-জোড়া তোমার দরিয়া। কত ছোট্ট আমাদের নৌকো। ডাঙা এনে দাও কাছাকাছি—ডাঙার জীব, শক্ত মাটির উপর পা রেখে রক্ষে পাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে, তবু এত জলের একটি ফোঁটা মুখে তোলবার উপায় নেই। উৎকট নোনতা। সেই সময়ে কেউ যদি বলে, এক ঘটি সোনার মোহর নিবি না এক ফেরো জল—জল চাইবে মানুষ। মিঠা জল—যার বিহনে কণ্ঠাগত জীবন।

সেই জীবন অফুরন্ত রয়েছে কেশেডাঙার চরে। মাটির নীচে লুকানো। আমি সন্ধান পেয়েছি। বালি খুঁড়ে খেয়েও এসেছি অঞ্জলি ভরে। নিজে গিয়ে দেখে এসে তবে বলছি।

আমি প্রথম নই। সকলের আগে গিয়েছিল শশী গোয়ালা। তার মুখে শুনে সমস্ত হদিস নিয়ে তবে আমি যাই। সরকার থেকে লাট বন্দোবস্ত নিয়েছিল শশী। সিকি-পয়সা সেলামি লাগে নি, খাজনাও নয় প্রথম আট বছর। আট বছর অন্তে দু-আনা নিরিখে নামে-মাত্র খাজনা। এমনি চলবে। ষোলআনা হাসিল হয়ে গেলে পুরো খাজনার কথা তখন বিবেচনা। কী দিনকাল ছিল—জমি-জিরেত ডেকে ডেকে দিয়েছে, নেবার লোক মেলে না। সাহস

করত না লোকে। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান ছিল, ইচ্ছেও হত না লোকের। ভাত-কাপড় পুড়ে-জ্বলে যায় নি তো এখনকার মত!

গাঙে-খালে ডাকাতি করে শশী পয়সা করেছিল। বয়স হয়ে গিয়ে এবং টাকাপয়সা জমিয়ে পাপবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে, পুলিস তবু ত্যক্ত-বিরক্ত করে। মোটা তঙ্কা গুণে যেতে হয়, নয় তো দশধারার মামলায় জুড়ে দেবে, নাজেহাল করবে নানা রকমে। ডাকাতির আমলে কাঁচা-পয়সা হাতে আসত, দিতে আটকাত না। এখন পুঁজি ভেঙে দিতে গায়ে বড্ড লাগে। শশী তাই ছেলেদের নিয়ে বাদায় চলে গেল। নিরিবিলি সেখানে সংসার পাতবে। চেষ্টাও করল অনেক রকমে। পেরে উঠল না। তিন-তিনটে জোয়ান ছেলে বাঘের মুখে দিয়ে টাকাকড়ি সমস্ত খুইয়ে শশী আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। উপযুক্ত গুণীন সঙ্গে নেয় নি, সেজন্য এই দশা। ভবসিন্ধুর কাণ্ডারী হলেন গুরু-মুর্শিদ, বনের কাণ্ডারী ফকির-গুণীন। আমার পিছন ধরে শশী যেতে চাচ্ছে আর একবার। বনের টান কাটে নি—ও নেশা কারও কোন দিন কাটে না।

যাওয়ার মতি হল অবশেষে ওদের। টিকতে না পারে তো ফিরে আসবে। কিম্বা আর যেখানে হয়ে চলে যাবে। দুনিয়ায় এতকাল থেকে যা সঞ্চয় করেছে, সেটা ভার-বোঝা কিছু নয়। এদের এই মস্ত সুবিধা, নড়তে চড়তে হাঙ্গামা নেই। বাদাবনে যায় নি কত কাল! অরণ্যের অন্ধিসন্ধিতে সাপের মত বুকে হাঁটা, বানরের মত ডালের ডগায় চড়ে বসা, আবার কখনো বাঘের মত চক্কোর দিয়ে ঘোরা। মনে পড়ে গিয়ে বুকের মধ্যে আনচান করে।

পচা বলে, নৌকোর কি হবে?

পচার বেকুবি কথা শুনে বলাই হি-হি করে হাসেঃ ছুতোর ডেকে নৌকোর বায়না দে। নয় তো আর কোথায় পাবি? বলি, হাটবারে কুমিরমারি গিয়ে ঘাটে তাকাস নি কখনো? নৌকোয়

নৌকোয় গাঙের জল দেখা যায় না। বনে যাবে, তাই নৌকোর ভাবনা করতে বসল!

মহেশ ঘাড় নেড়ে আপত্তি করে ওঠেঃ দুর্মতি করো না, খবরদার! অনিষ্ট হবে। আশামুখে যাচ্ছ, কেউ শাপমন্যি না দেয়। দুঃখ পেয়ে নিশ্বাসটাও জোরে না ফেলে যেন কেউ।

শশী গোয়ালার কথা উঠল আবার। শশীর পাপার্জিত পয়সা। ভোগান্তি সেই কারণে। গাঙ-খাল আর গহিন জঙ্গল একসঙ্গে যেন আড়েহাতে লাগল ডাকাত শশীর সঙ্গে। সন্ধ্যা অবধি লোক খাটিয়ে মাটি ফেলে বাঁধ বাঁধল—সকালবেলা দেখা যায় মাটি ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে; বাঁধের নিশানা পাওয়া যায় না। কুড়াল মেরে যে গাছটা কাটে, সাতটা দিন না যেতে গোড়া দিয়ে পাঁচ-সাতখানা ওজ বেরোয়। কেটে কেটে শেষ হয় না। ক্ষেপে গিয়ে শশী আরও টাকা ঢালে, জনমজুর দুনো-তেদুনো নিয়ে আসে। হল না, সর্বস্ব গেল। টাকা না পেয়ে মাটি-কাটার দল শেষটা একদিন বিষম মার মারল শশীকে। মার খেয়ে শশী পালাল। নির্বংশ নিরন্ন হয়ে ছেঁড়া তেনা পরে এখন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

জগা বলে, সদ্ভাবে নৌকো ভাড়া করব আমরা। জগন্নাথকে সবাই চেনে। ভাড়ার টাকা আগাম দিয়ে দেব।

বানগাছের কোটরের সেই ভাণ্ডারে কিছু এখনো অবশিষ্ট আছে। জোর সেইখানে জগার।

মহেশ ঠাকুর বলে, কুমিরমারি চল তবে একদিন। নৌকো ঠিক করা যাবে। বাদায় নেমেই তো পুজোআচ্চা, তার কেনাকাটা আছে। খোরাকিও সঙ্গে নিতে হবে।

বলাই পরমোৎসাহে বলে, ফর্দ করে ফেল ঠাকুর।

মহেশ বলে, লেখাজোখার ধার ধারি নে। ফর্দ মুখে মুখে। ফর্দ আমার মনে গাঁথা। কত বার কত লোক নিয়ে গেলাম।

জগা বলে, পরশু হাটবার আছে। পরশুদিন চল তবে। সাঁইতলা আর ফিরব না। ঐ পথে লা ভাসাব।

গোপন ছিল ব্যাপারটা। খেটেখুটে জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তুলে এক কথায় এমনি ছেড়ে চলে যাওয়া লজ্জার ব্যাপারও বটে। নগেনশশী নেই, শয়তানী প্যাঁচ কষছে কোন্‌খানে গিয়ে। কিন্তু চারুবালা আছে। টের পেলে মেয়েটা হাসাহাসি করবেঃ নেড়ী কুকুরের মতন লেজ তুলে পালায় কেমন দেখ।

সেইজন্য রা কাড়ে নি ওরা মুখে। রাধেশ্যামটা তবু কি ভাবে জেনে ফেলেছে। বেড়ায় আড়ি পেতে শুনে গেছে নাকি?

শেষরাত্রি। তারা ঝিকমিক করছে ওপারে বনের মাথায়। খালে ভাঁটার টান। জল নামছে কোন্‌দিকে অবিশ্রান্ত কলকল আওয়াজে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চারজনে বাঁধের উপর এসে উঠল।

বাঁধের নীচে গর্জনগাছের পাশ থেকে রাধেশ্যাম কথা বলে ওঠে, আমি যাব—

তুমি যাবে কোথা?

তোমরা যেখানে যাচ্ছ। ক্যাপা ঠাকুর যেখানে নিয়ে যায়।

তোমার বউ-বাচ্চা?

বউয়ের ভয়েই তো যাচ্ছি।

বাঁধের উপর সকলের মাঝখানে চলে এল। হাতে খেপলাজাল। বলে, মাছ আজও হল না। গালি দিয়ে ভূত ভাগাবে বউ। ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে। মরে গিয়ে জ্বালা জুড়াব, আগে সেই মতলব করেছিলাম। বউ বলে, আমি মরলে সে-ও সঙ্গে সঙ্গে মরবে। মরে গিয়ে পেত্নী হয়ে পিছু নেবে। তা ভেবে দেখলাম, এই ভাল। রাতে রাতে সরে পড়ি রে বাবা, বউ টের পাবে না। রোসো, জালগাছ দাওয়ায় রেখে আসি। মাগী ঘুমুচ্ছে এখন।

একচল্লিশ

প্রহরখানেক বেলায় তারা কুমিরমারি পৌঁছল। হাট বসে দুপুরের পর থেকে। বড্ড সকাল সকাল রওনা হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি করতে হল দায়ে পড়ে। বন কেটে বাঁধ বেঁধে বড় সাধে ঘেরি বানিয়েছিল। বসত গড়ে উঠল—মজা করে এবারে খাটবে, খাবে-পরবে, আমোদস্ফূর্তি করবে। এত দূরের বাদাবনে দিনগুলো শান্তিতে কাটবে। হল না, ভণ্ডুল ঘটাল জনপদের মানুষ এসে। সেকালে কত গরিব মানুষ নিঃসম্বল এসে গুছিয়ে নিয়েছে কাঙালি চক্কোত্তির মত। আর কিন্তু সে বস্তু হবার জো নেই। রাস্তা হয়ে গেল—মোটরগাড়ি চড়ে বাবুভেয়েরা এসে খোলামকুচির মত টাকা ছড়াবে। বাদার যত মানুষ কুকুরের মত পা চাটবে তাদের। জগা হেন লোকের ঠাঁই নেই এ-মুলুকে। লোকজনের চোখের সামনে পালাতে লজ্জা লাগে, রাত পোহাবার আগেই তাই পালিয়ে এল। দেরি করা চলল না।

হাটে কেনাকাটা আছে বিস্তর। জঙ্গলে যাচ্ছে, রসদ চাই কিছু দিনের মতন। তা ছাড়া নৌকো থেকে ভুঁয়ে পা দিয়েই পূজোআচ্চা—তার রকমারী উপকরণ। পথ হাঁটতে হাঁটতে ক্ষ্যাপা মহেশ তড়-বড় করে ফর্দ বলছিল। তীর্থের পাণ্ডার মত কতবার কত মানুষ নিয়ে এসেছে—রীতকর্ম সমস্ত তার নখদর্পণে। জগা বলে, বলেই যাচ্ছ তো ঠাকুর, খরচা যোগাবে কে? নৌকোও তো ডুবে যাবে তোমার ঐ গন্ধমাদনের ভারে। সংক্ষেপ কর, যার নীচে আর হয় না।

অত কে মনে রাখতে পারে? যদ্দূর মনে পড়ে কেনাকাটা করে চারজনের গামছায় বাঁধে। ফিরে আসুক মহেশ, তার পরে মিলিয়ে দেখা যাবে। মহেশ কুমিরমারি অবধি আসে নি। খানিকটা পথ এসে শশী গোয়ালার খোঁজে রাস্তা ছেড়ে আলপথে নেমে পড়ল। সর্বস্ব খুইয়ে এসে শশী এক দূরসম্পর্কের কুটুম্বর ভাতে পড়ে আছে এখন।

যথাসাধ্য খাটাখাটনি করে, ছুটো ছুটো খেতে দেয় তারা। নিঃসীম ধান-ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে মাদার উপর বসতি। জায়গাটার নাম শোনা আছে, মহেশ ঠাকুর সেই তল্লাসে চলল। একটুখানি গিয়ে আলেরও আর নিশানা নেই, মহেশ তখন জলে নেমে পড়ে। জল বাড়ছে, কাপড় হাঁটুর উপর তুলছে। তারপরে এক সময় হয়তো দিগম্বর হয়ে পরনের কাপড় পাগড়ির মতন মাথায় জড়াতে হবে। বাদা অঞ্চলে এই নিয়মে মানুষের চলাচল। রাস্তা বাঁধা হালফিল এই তো শুরু হল। ভাল রাস্তাঘাট হয়ে গেলে আর তখন বাদা থাকল কোথা?

জগারা এদিকে ভাড়ার নৌকো খুঁজে বেড়াচ্ছে! জগার মত দক্ষ মাঝির হাতে নৌকো দিয়ে শঙ্কার কিছু নেই। খুব বেশী তো বিশ-পঁচিশ দিন—ভাড়াটা পুরো মাসেরই ধরে দিয়ে নৌকো যথাসময়ে ঘাটে হাজির করে দেবে। এবারে কেবল দেখেশুনে আসা। জায়গা পছন্দ হলে তখন নিজস্ব নৌকোর ব্যবস্থা হবে।

ঘাটমাঝিদের ধরতে হয় নৌকো-ভাড়ার ব্যাপারে। তারা খোঁজ-খবর রাখে। ভাড়া থেকে দস্তুরি কেটে নেয় আর দশটা দালালী কাজের মত। সব ঘাটোয়ালই জগাকে চেনে ভাল মতে। জগা যে ভালমানুষ হয়ে ঘাটে ঘাটে ভাড়ার নৌকোর তল্লাসে ঘুরছে, ব্যাপারটা বড় ভাল ঠেকে না। নৌকো দিতে কেউ রাজী নয়। স্পষ্টাস্পষ্টি 'না' বলছে না, এটা-ওটা অজুহাত দেখায়ঃ এই দেখ, জানাশোনার মধ্যে সব কটা নৌকোই যে বেরিয়ে গেল। ক'দিন আগে বললে না কেন? অথবা বলে, নৌকো ফুটো হয়ে পড়ে আছে, মেরামত না করে ছাড়বার উপায় নেই।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শেষটা জগা ভরসা ছেড়ে দেয়। কেউ বিশ্বাস করে না তাদের। ভবঘুরে মানুষ—ক'বছর কোন রকমে ঠাণ্ডা হয়ে ছিল, মাথার মধ্যে ঘুর্ণিপোকায় আবার কামড় দিচ্ছে। ত্রিভুবন চক্কোত্তর দিয়ে বেড়াবে, কোন্ বিশ্বাসে ওদের হাতে নৌকো ছেড়ে দেয়।

একজনে তাদের মধ্যে বলল, আছে বটে নৌকো একটা কিন্তু

মালিকের বড় সন্দেহবাতিক, কাউকে বিশ্বাস করে না। তোমার ঘেরিদার গগন দাস জামিন হয় তো বল, চেষ্টা করে দেখি।

নিজের কথাটা অনুপস্থিত অজ্ঞাত মালিকের দোষ দিয়ে বলল। সকল ঘাটোয়ালের প্রায় এই রকম কথা। জগাকে কেউ বিশ্বাস করে না। এক ছটাক ভূসম্পত্তি নেই, জগার কোন্ মূল্য দুনিয়ার উপর ? গগন দাসেব মূল্য হয়েছে এখন।

জঙ্গলে যাবার নামে মহেশ ঠাকুরের অসাধ্য কাজ নেই। খুঁজে বের করেছে ঠিক শশীকে। আগের হাটে খবর দেওয়া ছিল হাটুরে লোকের মারফতে। শশী একপায়ে খাড়া, কেশেডাঙার চরে তার মনপ্রাণ পড়ে রয়েছে। রূপকথার রাক্ষসীর প্রাণ থাকত যেমন কৌটোর ভোমরার মধ্যে।

দুপুরেব পর হন্তদন্ত হয়ে মহেশ আর শশী কুমিরমারি পৌঁছল। হাট তখন জমজমাট। খুঁজে খুঁজে জগাদের পায় না। অবশেষে হাটের বাইরে নতুন চরের পাশে দেখা গেল গাছের ছায়ায় চারজনে গোল হয়ে বসে। কোঁচড় থেকে মুঠো মুঠো মুড়ি নিয়ে মুখগহ্বরে ফেলছে। একদিকে মাটির মালসায় মুড়ি জমা রয়েছে, কোঁচড়ের মুড়ি ফুরোলে নিয়ে নিচ্ছে মালসা থেকে।

মুখ তুলে এক নজর তাকিয়ে দেখে জগা বলে, বড্ড কাদা-জল ভেঙে এসেছ। জুত করে করে বসে মুড়ি ঠেকা দাও এবারে।

মহেশ বলে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক জগা। খাওয়া-টাওয়া সব নৌকোয়। উজোন বেয়ে—হল বা খানিক গুণ টেনে গিয়ে কয়রার মুখে নৌকো ধরতে হবে। রান্নাবান্না সেই জায়গায়।

নৌকোই তো হল না। গুণ টানবে কিসের ?

বলাই বলে ওঠে, তাই দেখ ঠাকুরমশায়। আমরা ভাল হতে চাইলে কি হবে ? দেবে না ভাল হতে। আগাম টাকাকড়ি দিয়ে নিয়মমাফিক ভাড়া নিতে গেলাম, কেউ দিল না। ঘাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো ঘুরেছি, ঘাটোয়ালের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তেল দিয়েছি।

মহেশ ব্যস্ত হয়ে বলে, সে কি গো! শশীকে আমি এত পথ টানতে টানতে নিয়ে এলাম। জগা নিয়ে যাচ্ছে শুনে কত আশা করে সে ছুটে এল।

জগন্নাথ বলে, আশা করে ঐ রাধেশ্যামও এসেছে। সবাই আমরা এসেছি। বেরিয়ে এসেছি যখন উপায় কিছু হবেই। নৌকো দিল না, কিন্তু আমরা ঠিক নিয়ে নেব।

হি-হি করে সে হাসতে লাগল। বলে, বাবুভেয়েদের কায়দা ধরি এবারে। নেমন্তন্নবাড়ি যায় বাবুরা। একজনের তার ভিতরে খালি পা। কিম্বা শতেক তালি-মারা জুতো পায়ে। ভাল একজোড়া জুতোয় পা ঢুকিয়ে ফাঁক মতন সে বেরিয়ে পড়ে। বলাই পচা আর আমি তেমনি এখন ফাঁক খুঁজে খুঁজে বেড়াব।

শশী বলে ওঠে, নৌকো চুরি করবে তোমরা? হাটেঘাটে গোঁয়ার্তুমি করতে যেও না। মার খেয়ে কুলোতে পারবে না। যাকে বলে হাটুরে-মার। বুড়োমানুষ আমরা শুদ্ধ মারা পড়ব।

ডাকাত শশীর বিগত যৌবনের কোন ঘটনা হয়তো মনে পড়ে। শিউরে উঠে সে না-না করে উঠল।

জগা হেসে বলে, সিঁদকাঠি হাতে এসে গেছে ঘোষ মশায়। কাজের তো পনের আনা হাসিল। কেউ কিছু করতে পারবে না। আমাদের হাতের কাজ দেখ নি তাই। সাফাই কাজকর্ম।

নৌকো না হোক, তিনটে বোঠে যোগাড় করে এনেছে। সিঁদকাঠি দিয়ে দেয়ালে গর্ত কেটে চোরে জিনিসপত্র সরায়, নৌকো সরানোর কাজে বোঠে হল সেই সিঁদকাঠি। নৌকো খুলে দিয়ে তিন মরদে বোঠে ধরে পলকের মধ্যে বেমালুম হবে। নৌকোয় সেজন্য কেউ বোঠে রেখে যায় না। কাঁধে করে নিয়ে হাটের মধ্যে ঢোকে, কোনখানে রেখে দিয়ে কেনাকাটা করে। নৌকো হল না দেখে এরা এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে বোঠে সরানোর তালে ছিল। বোঠে ভেঙে গেছে বলে একটা বোঠে চেয়ে এনেছে চেনাশোনা এক জেলের কাছ থেকে। অন্য দুটো চুরি। হারানো বোঠের খোঁজ

পড়বে হাট ভেঙে গিয়ে যখন বাড়ি ফিরবার সময় হবে। ততক্ষণ নিরাপদ।

জগা বলে, হাট বলে ভয় পাচ্ছ ঘোষ মশায়, কিন্তু হাট নইলে এত নৌকো পাচ্ছ তুমি কোথা ? ইচ্ছে মতন এর ভিতরে পছন্দ করে নেব। তবে মুরুব্বী মানুষ তোমরা এর মধ্যে থেকো না। হাঁটনা শুরু করে দাও। পূব মুখো ফুঁড়ে বেরিয়ে একটা দোয়ানি পড়বে, সেইখানে কাঁচা-বাদার ধারে দাঁড়াও গিয়ে। রাধেশ্যাম জানে সে জায়গা। তুই থেকেই বা কি করবি রাধে, ওঁদের সঙ্গে চলে যা। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি।

রাধেশ্যাম হাসতে হাসতে বলে, কুয়োপাখি ডাকবে—বনের মধ্যে আমরা পাখি ধরে বেড়াব।

হেসে জগা ঘাড় নাড়েঃ হ্যাঁ। কোনটা তোর অজানা! বেরিয়ে পড় এক্ষুনি, দাঁড়াস নে। আমাদের আগে গিয়ে পড়বি।

বড্ড জোরে হাঁটে রাধেশ্যাম। মহেশ ও শশী গোয়ালা পেরে ওঠে নাঃ আহা, দৌড়স কিসের তরে ? আমাদের কি, কে আমাদের তেড়ে ধরছে ?

কিন্তু টানের মুখে নৌকো ছাড়বে জগারা, প্রাণপণে বাইবে। আর এদের হল পায়ে হাঁটা। জোরে না হাঁটলে পেরে উঠবে কেন ? ঐ ছুটোছুটির মধ্যেও কুয়োপাখির বৃত্তান্ত বলে এক সময়। কাঁচা-বাদা হল গভীর বন—সেখানে কালেভদ্রে কাঠুরের কুড়াল পড়ে। বনের অন্ধিসন্ধি জুড়ে খাল। কে যেন খালের মস্তবড় খেপলাজাল ফেলেছে বনের উপরে—জালের ফুটোয় ফুটোয় বনের গাছ বেরিয়ে পড়েছে। ঠিক এই গতিক। জোয়ারবেলা বিঘত পরিমাণ ডাঙা জেগে থাকে না, গাছগুলো মনে হবে সমুদ্দুর ফুঁড়ে উঠেছে। নৌকো একবার তার মধ্যে ঢোকাতে পারলে কারো সাধ্য নেই খুঁজে বের করে। জগার কিন্তু নখদর্পণে সমস্ত—সেই জায়গার কথা বলে দিল সে। বলে তো দিল—কিন্তু এরা খুঁজে পাবে কোথায় ? নৌকোর মানুষ সাড়া দিয়ে তাই জানান দেবে—পাখির ডাক। লোকের

কানে গেলে ভাববে, কুয়োপাখি ডাকছে রাত্রিবেলা বনের ভিতর। ডাকছে কিন্তু বলাই। পাখির ডাক ছাগলের ডাক বেড়ালের ডাক মুরগির ডাক---কত রকম ডাক ডাকতে পারে। সেই ডাক নিরিখ করে জল ভেঙে শুলোর গুঁতো খেয়ে ওদের নৌকোয় উঠে পড়।

সন্ধানী চোখ, পাকা হাত, ঘাঁতঘোঁত অজানা কিছু নেই। এর চেয়ে কত ভারী ভারী কাজকর্ম হয়েছে আগে। এত নৌকো জমেছে, নৌকোয় নৌকোয় জল দেখবার জো নেই, তবু কিন্তু সহজে উপায়ে হয় না। গাঙের একেবারে কিনারা অবধি হাট, হাটুরে মানুষ ঘোরাফেরা করছে, ঠিক হাটের নীচে কিছু করতে গেলে ফ্যাসাদে পড়বে মনে হয়। একেবারে শেষ দিকে চার দাঁড়ের ছিপনৌকো একটা। জুত মতন ধোন্দল গাছ পেয়ে ঘাট থেকে কিছু সরিয়ে এনে ঐখানে নৌকো বেঁধেছে। লোহার শিকল গাছে জড়িয়ে ভারী তালা এঁটে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে।

প্রণিধান করে দেখে জগা বলে, দেখ তো পচা, কুড়াল কোথা পাস। কামারের দোকানে মেরামতের জন্য দেয়—ওদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে নিয়ে আয়।

পচা বলে, কুড়াল কি হবে।

বলবি যে রসুই-কাজের জন্য কাঠের ক'খানা চেলা তুলে নিয়ে এক্ষুনি দিয়ে যাচ্ছি।

বলাই বলে, গাছ কেটে ফেলবি। কিন্তু শব্দ হবে যে, কেউ না কেউ দেখে ফেলবে।

জগা বলে, শব্দসাড়া করেই কাটব। গরজ হয়েছে, সদরে তাই গাছ কেটে নিচ্ছে—দেখেও কেউ দেখবে না।

কুড়াল এল। কপাল ভাল, গাছ কাটা অবধি দরকার হল না। কুড়ালের উল্টো পিঠের কয়েকটা ঘা দিতেই লোহার শিকলের জোড় খুলে গেল। নোনায় জরে গিয়ে লোহায় পদার্থ থাকে কিছু?

কপাল আরও ভাল। এই টানের গাঙ, তার উপরে পিঠেন

বাতাস। মাঝগাঙে নিয়ে ফেলতে নৌকো যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল। বোঠে হাতে ধরে আছে বলাই-পচা, কিন্তু বাইতে হয় না। টানের জলে ছোঁয়ানোই যায় না বোঠে। নৌকোই যেন কেমন করে বুঝতে পেরে গাঙ বেয়ে চোঁচা-দৌড় দিয়েছে।

এই রকম ছুটে পালানো দেখেই বোধকরি হাটের মানুষের নজরে পড়েছে। কিম্বা নৌকোর মালিকও দেখে ফেলে চেঁচামেচি করতে পারে। গাঙের কিনার ধরে বিস্তর জমায়েত। একটা হৈ-হৈ রব আসছে বাতাসে। এরা অনেক দূরে। স্পষ্টাস্পষ্টি নজর হয় না — মনে হল, আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। দেখিয়ে কি করবে যাদুমণিরা? নৌকো খুলে পিছন নেবে, ততক্ষণে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে এরা। বাতাসে মিশে গেছে। বড়-গাঙে আর নয়, খালে ঢুকে পড় এইবার। খালের গোলকধাঁধা। তখন আর খুঁজে পায় কে! নৌকো মানুষজন এবং হয়তো বা লাঠি-বন্দুক নিয়ে সমারোহে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে— তাদেরই একেবারে পনের-বিশ হাতের মধ্যে হেঁতালঝাড়ের ফাঁকে নৌকো ঢুকিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। এই অবস্থায় মানুষ বলে কি—স্বয়ং যমরাজেরও তো খুঁজে বের করা অসম্ভব।

বিয়াল্লিশ

জঙ্গলে যাবে তারা ঠিকই। কয়েকটা দিন কেবল দেরি পড়ে যাচ্ছে। চোরাই নৌকোর প্রকাণ্ড ছই—ছইটা ভেঙে চুরমার করে গাঙের জলে ডুবিয়ে গোলপাতা দিয়ে নতুন একটু ছই করে নিতে হবে। আলকাতরা আর কেরোসিন মিশিয়ে পোঁচ টেনে নিতে হবে নৌকোর আগাগোড়া। আর এক ব্যাপার—গুড়োর কাঠের উপর নাম খুদে রেখেছে—'তারণ'। তারণ নামে ব্যক্তি নৌকোর উপর নাম খোদাই করে স্বত্ব-স্বামিত্ব পাকা করে রেখেছে। নামটা চেঁচে তুলে দিতে হবে। না হলে পুরো কাঠখানাই ফেলে দিয়ে নতুন একটা

বসিয়ে নেবে। নৌকোর ভোল এমন পালটে দেবে, খোদ মালিক সেই তারণ এসে স্বচক্ষে দেখলেও চিনতে পারবে না। এই সব না হওয়া পর্যন্ত লোকের সামনে বের হবে না নৌকো। ছইটা তো ভেঙে দেওয়া যাক সকলের আগে। বাকি কাজগুলো কোথায় নিয়ে করা যায়, তাই ভাবছে। সূদন ছাড়া অন্য কারো উপর আস্থা করা করা যায় না। তৈলক্ষর ছেলে সূদন। জগাকে বড্ড খাতির করে, জগার ইদানীং সে ডানহাত হয়ে উঠেছিল। সম্পন্ন চাষীঘরের ছেলে —দাঁও পেয়ে একটা নৌকো কিনে নিয়ে এসেছে, সেই পুরানো নৌকো ছুতার ডেকে মেরামত করাচ্ছে, ছই বাঁধছে। এতে কোন সন্দেহের কারণ ঘটবে না। জগা তারপর সরে পড়বে একদিন সেই নৌকো নিয়ে। জঙ্গলে ঢুকে গেলে তখন কে কার তোয়াক্কা রাখে! গণ্ডগোল যতক্ষণ এই মানুষের এলাকায় ঘোরাঘুরি করছ। ঘোর জঙ্গলের ভিতরে মানবেলার সব আইনকানুন গিয়ে পৌঁছতে পারে না।

কিছু দেরি অতএব হবেই। খুব বেশী তো পাঁচ-সাত দিন। এই এক বাগড়া পড়ে গেল, পথের উপর আটক হয়ে থাকা। সকলে মুষড়ে গেছে: রাধেশ্যামের কিন্তু একগাল হাসি। বলে, আমি ঘরে চললাম। বাচ্চাটাকে দেখে আসি। সাঁজ-রাতে সেদিন বড় কেঁদেছিল। নেড়েচেড়ে আসি এই ক'দিন।

পচা টিপ্পনী কাটে: বাচ্চার মা-ও রয়েছে, সেটা খেয়াল রেখো। জাল ফেলে পালিয়ে এসেছ, তুলোধোনা করবে এবার বাগে পেলে।

বললি ঠিক কথা বটে। মাগীর জন্যেই বিবাগী হয়ে যাওয়া। নইলে উঠোন পার হয়ে এক পা নড়তে চাই! মাগীটাকে জো-সো করে জঙ্গলে নিয়ে ফেলতে পারিস, তবে শান্তি পাই! বাচ্চাকে কোলে-পিঠে করে দিব্যি কাটাতে পারি।

ক্ষ্যাপা মহেশ বলে, শশীকে নিয়ে কী করা যায় এখন! আমার নিজের কথা ভাবছি নে। কালী-কালীমায়া গাজি-কালু উঠানে দাঁড়িয়ে যার নামে দোহাই পাড়ব, গৃহস্থ পুরো সিকির সেবা না দিয়ে

পারবে না। কিন্তু শশী ঘোষ যায় কোথায় বল দিকি ? পড়ে থাকত এক বাড়ি, তাদের আউড়ির ধান তলায় এসে ঠেকেছে। মানুষটার একদিন বিস্তর ছিল, নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় তারা কিছু বলতে পারছিল না। তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এসেছে, আবার এখন কোন্ মুখে ফিরে যায় সেখানে !

বলাই বলে, চলুন তবে আমাদের সাঁইতলায়। উপোস করে থাকতে হবে না। ঠাকুরমশায়, তুমিও চল।

জগা বলে, তুই সাঁইতলা যাচ্ছিস বলাই ?

বলাই বলে, নৌকো তো বয়ারখোলা নিয়ে চললে। পরের জায়গায় সবসুদ্ধ চেপে পড়ি কেন ? এঁরা সব যাচ্ছেন, রেঁধেবেড়ে খাওয়াবার মানুষ চাই তো একজন।

মহেশ তাড়াতাড়ি বলে, আমায় খাওয়াবার লোক আছে। আমার জন্যে ভাবি নে। চারুবালার মত মেয়ে হয় না। তোমরা ছিলে না, কী যত্ন করে যে খাইয়েছিল সেই কটা দিন ! তার উপর সেবার বাবদে দৈনিক এক সিকি। শশীকেও কারও রেঁধেবেড়ে দিতে হবে না। বাদায় ঘোরা মানুষ—চাল পেলে নিজেই সে ছুটো ছুটো ফুটিয়ে নিতে পারবে।

জগা বলে, শুধু চাল ফোটাতেই কি যাচ্ছে বলাইধন ? কত রকমের কাজ ! চারুবালার হুকুম তামিল করা—রান্নার কাঠ কেটে দেওয়া, খাবার জল বয়ে আনা। পায়ের কাদা গাড়ুর জলে ধুয়ে দিয়েছে কিনা, সেটা অবিশ্যি আমার চোখে দেখা নেই।

বলাই হাসতে হাসতে বলে, ফুলতলায় গয়নার নৌকোয় জগা আর চারুতে কী লগ্নে যে দেখা, সে রাগ আজও গেল না। সাঁইতলা ছাড়তে হল, চারুবালার কিন্তু কোন দোষ নেই। শয়তান ঐ খোঁড়া-নগনা।

মহেশ ঠাকুরও লুফে নিয়ে বলে, না জগন্নাথ, রাগ রেখো না। বড্ড ভাল মেয়ে। আমি বলছি, শুনে নাও। স্বয়ং রক্ষাচণ্ডী ঐ মেয়েটা, নষ্ট করে না কিছু, সমস্ত বজায় করে রাখে। মানবেলা থেকে

বাদায় চলে এসেছে সকল দিক রক্ষে হবে বলেই।

ফুলতলা থেকে চক্কোত্তি মশায় নতুন-আলায় ফিরে এলেন। সেই টোর্নি চক্কোত্তি।

একা যে! শালাবাবু কোথায় আবার আড্ডা গাড়ল?

চক্কোত্তি বলেন, কাজকর্ম না চুকিয়ে আসে কেমন করে! আরও কটা দিন থাকতে হবে নগেনবাবুর। দলিল রেজেস্ট্রি হয়ে কাজ ষোলআনা পাকা হয়ে গেলে তবে আসবে। সেই রকম বলে এসেছি। আমি আর দেরি করতে পারলাম না। পরের উপকারে গিয়ে আমার ওদিকে সর্বনাশ হয়—বরাপোতার ধান কটা হরির লুঠ হয়ে গেল বোধহয় এদ্দিনে। বরাপোতা চলেছি—তা ভাবলাম দাস মশায় উতলা হয়ে আছে, এই পথে অমনি খবরটা দিয়ে যাই। আমায় যখন সহায় ধরেছ, কাজের ব্যবস্থায় কোন দিক দিয়ে খুঁত পাবে না।

গগন এত সমস্ত শুনছে না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, দলিল কিসের বুঝলাম না তো?

চক্কোত্তি ভর্ৎসনা করে ওঠেন: কী কাণ্ড করে বসে আছ ভাব দিকি দাসমশায়। এত বড় জলকরের সম্পত্তি—আইনদস্তুর লেখা-পড়া চুলোয় যাক, ফস-কাগজের উপর দুটো-চারটে ক-ব-ঠ অক্ষরও তো ফেঁদে রাখ নি। নায়েবের কাছে কথাটা শুনে গোড়ায় তো বিশ্বাসই হয় নি আমার।

গগন বলে, প্রথম যখন এলাম, করালীর উপর তখন ছিটে-খানেক চটের জমি। যা নেবার চৌধুরিবাবুরা সমস্ত ঘের দিয়ে নিয়েছে। জমিটুকু বাতিল হয়ে বাইরে ছাড়া ছিল। জোয়ারের সময় এক-কোমর জল, ভাঁটার সময় হাঁটুভর কাদা। সাঁইবাবাকে পর্যন্ত বাঘে ধরে নিয়ে যায়, এমন গরম জায়গা। তখন কি কানাকড়ি দাম ছিল যে লেখাপড়ার কথা ভাবতে যাব?

চক্কোত্তি চুকচুক করে: ভাবতে হয় গো দাসমশায়। দলিল-

দস্তাবেজ করে আটঘাঁট বেধে তবে লোকে কাজে নামে। বিষয় নয় তো তু-দিন পরে বিষ হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়কর্ম শক্তব্যাপার, যে-সে লোকে বোঝে না। কিন্তু পুণ্ডরীকবাবু উকিল মশায় সদরে দপ্তর সাজিয়ে বসে আছেন কোন্ কর্মে? আমরা আছি কেন? শিক্ষিত মানুষ হয়েও এমন অবুঝের কাজ করলে দাসমশায়, ভাল লোকের পরামর্শ নেবার কথা একটি বার মাথায় এল না?

শিক্ষিত বলে উল্লেখ করায় গগনের গর্ব চাড়া দিয়ে ওঠে। বলে, সকলের আগেই তো ফুলতলায় গিয়েছিলাম, চক্কোত্তি মশায়। পাঁচ টাকা নজর দিয়ে দেখা করলাম ছোটবাবুর সঙ্গে। আর ভরদ্বাজ নিল তিন টাকা। তিন টাকা গাঁটে গুঁজে বলে দিল, কিছু করতে হবে না, কোন ভয় নেই। গাঙ থেকে চর উঠেছে—চরের মালিক সরকার না চৌধুরি তারই ঠিকঠিকানা নেই। বন কেটে তাড়াতাড়ি বাঁধ না হোক একটা পাতড়ি দিয়ে নাও গে। দখলই হল স্বত্বের বারোআনা—দখল কর গিয়ে আগে।

ঘাড় নেড়ে চক্কোত্তি বলেন, বলেছিল ঠিকই বটে। বারোআনা কেন সাড়ে-পনেরআনা। এবারে তাই মতলব পাকাল, রাতারাতি মাঝের বাঁধ উড়িয়ে দেবে, তোমার আলাঘরের চিহ্নও রাখবে না। চৌধুরিগঞ্জের সীমানা বলে গাঙ অবধি দখল করে নেবে। আদালতে মামলা উঠলে অমন বিশ জনে হলপ পড়ে বলে আসবে। নায়েব রেগে টং, ভরদ্বাজ তায় উস্কানি দিচ্ছে। আবার এদিকে সাঁইতলার মাছ-মারারা বিগড়ে আছে—তোমার লোকবলও নেই। সমস্ত খবর চলে যায় ফুলতলা অবধি। কোন্ তরকারি দিয়ে ভাত খেলে সেই খবর অবধি। সকল দিকে তোমার বেজুত, এমন সুবিধা কেন ছাড়বে? সমস্ত ঠিকঠাক, তু-দশ দিনের ভিতর এস্পার-ওস্পার হয়ে যেত। সেই সময়টা আমরা গিয়ে পড়লাম।

গগন আগুন হয়ে বলে, পাড়ার ওরা বিগড়াল ঐ নগনা-শালার জন্যেই। বাদাবনের মধ্যে খেটে খুটে সকলে মিলে একটা বাঁচবার পথ করছি, তা ভাঙনচণ্ডী এসে পড়ে তছনছ করে দিল সমস্ত।

চক্কোত্তি বলে, আঃ, নিন্দে কর কেন? খুব পাকা বুদ্ধি নগেন-বাবুর।

গগন আরও উত্তেজিত হয়ে বলে, মুখের নিন্দে শুধু নয়। পারলে ওকে নোনাজলে নাকানি-চুবানি খাওয়াতাম। আমার ডানহাত বাঁহাত হল জগা-বলাই—ওরা সমস্ত। হাত-পা কেটে ঠুঁটো করে দিল ঐ শালা। চৌধুরিরা সেইজন্যে সাহস পেয়ে যায়। তাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়ে এসেছি, এদ্দিন তো কিছু করতে পারে নি।

চক্কোত্তি শান্ত করছেন গগন দাসকে : আর কিছু করবে না তারা। মিটমাট হয়ে গেছে। চৌধুরির মালিকানা আপসে স্বীকার করে নেওয়া হল। নতুন-ঘেরি নগেনবাবুর নামে উচিত খাজনায় অনুকূল বাবু বন্দোবস্ত করে দিলেন।

গগন বলে, নগেনশশীর নামে কেন? সে আসে কেমন করে ঘেরির ব্যাপারে? সে কবে কি করল?

আহা, শালা-ভগ্নিপতি কি আর আলাদা? তোমার বদলে নগেনবাবুই না হয় হল। আসল যে কাজ—দুই পক্ষ এক হয়ে হুটকো বদমাইশগুলোকে এবারে শায়েস্তা করে ফেল দিকি। ভেড়ির উপরে যাতে অত্যাচার না হয়, রাত-বিরেতে কেউ জাল না ফেলতে পারে। যে মাছটা জন্মাবে, তার ষোলআনা বেচাকেনা হয়ে যাতে ঘরে উঠে আসে।

গগন বলে, তা হলে ওরা কি খাবে?

মাছ-মারাদের কথা তো? খাবে না। না খেতে পেয়ে উঠে যাবে তল্লাট ছেড়ে। আপদের শান্তি হবে। তাই তো স্বার্থ তোমাদের।

গগন বলে, ভেড়ি বাঁধার সময় দরকারে লেগেছিল ওদের! আমাদের ছোট্ট ব্যাপার, আমাদের কথা ছেড়ে দিন। চৌধুরি-বাবুদেরও লেগেছিল। বছর বছর বাঁধে মাটি দেবার সময় এখনো ওদের ডাকতে হয়।

চক্কোত্তি ভ্রূভঙ্গি করে বলেন, সে আর কতটুকু ব্যাপার! সব রকম কথা হয়েছে বাবুদের সঙ্গে। ছোটবাবু বললেন, রাস্তা তো শেষ হয়ে গেল। শুকনোর সময় মাটি-কাটা পশ্চিমা কুলী আসবে লরী বোঝাই হয়ে; কাজকর্ম চুকিয়ে চলে যাবে। তাদের কাজকর্ম ভাল, মজুরিও বেশী নয়। অবরেসবরে মেরামতি কাজের জন্য একজন দুজন বেলদার রেখে দিলে চলে যাবে।

হেসে ফেললেন চক্কোত্তি। হেসে বললেন, তোমার কথাও একবার যে না উঠেছিল তা নয়। দাসমশায় পুরানো ঘেরিদার, দলিলটা সেই নামে ক্ষতিটা কি? তা ছোটবাবুর ঘোরতর আপত্তি। এক সঙ্গে সকলে বন কেটেছে, গগন দাস ওদের কি ঝেড়ে ফেলতে পারবে? আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওদের বিরুদ্ধে জবানবন্দি দেবে? চক্ষুলজ্জার কারণ হবে তার পক্ষে। আর আমাদের হবে বেরাল কাঁধে নিয়ে শিকার করার মতন। আর প্রমথ হালদার এই মারে তো এই মারে। সেদিনে সেই যে নাজেহাল হল, তার মধ্যে তোমারও নাকি যোগাযোগ ছিল। শেষটা নগেনবাবুর নাম উঠে তখনই সব রাজী হয়ে যায়। ঘাবড়াচ্ছ কেন দাসমশায়? বিষয়-সম্পত্তি লোকে বেনামিও করে থাকে। ধরে নাও তাই করেছ তুমি সম্বন্ধীর নামে।

গগনও হয়তো সেই রকমটা বুঝে চুপচাপ হত। কিন্তু চারুবালা এসে পড়ল। বেড়ার কাছে এসে কখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। মারমুখী হয়ে এলঃ আপনিই এই সব করাচ্ছেন থোঁড়ার কাছে ঘুষ খেয়ে। দাদার কাছে এখন আবার ভালমানুষ হতে এসেছেন।

গাল খেয়ে চক্কোত্তির কিছুমাত্র ভাবান্তর নেই। এ সমস্ত অভ্যাস আছে ঢের। দন্ত মেলে হেসে আরও যেন উপভোগ করছেন। বলেন, করছি তো বটেই। নইলে তোমার সুদ্ধ হাতকড়া পড়ত। এত বড় একটা কাজ মাংনাই বা করতে যাব কেন? নগেনবাবু বলেছে খুশী করে দেবে। না দিলে ছাড়ছি নে। এই যখন পেশা

হল আমার।

আরও উত্তেজিত হয়ে চারুবালা বলে, পাপের পেশা। একজনের হকের ধন অন্যায় করে অন্যকে পাইয়ে দেওয়া।

পরম শান্তভাবে চক্কোত্তি বলেন, তা ঠিক। মক্কেলের জন্য সব সময় ন্যায়-অন্যায় বাছতে গেলে চলে না। কিন্তু আজকের এই ব্যাপারে তুমি কি জন্যে কথা বলতে এসেছ মা? যার জন্যে চুরি করি সে কেন চোর বলবে? জগন্নাথ মরদমানুষ—কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাক, জেলে নিয়ে পুরুক, কিছু যায় আসে না। কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ গোঁয়ারটার সঙ্গে জুটে সরকারী কাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করলে, সরকারী মানুষকে দেবীস্থানে বলি দেবার ষড়যন্ত্র করলে—তোমার ভাই বলে দাস মশায় পর্যন্ত চৌধুরি-বাবুদের কাছে দোষী। আর কোন্ উপায় ছিল বল, এমনি ভাবে মিটমাট করা ছাড়া?

সঙ্গে সঙ্গে আবার গগনের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন: ঘাবড়াবার কিছু নেই দাসমশায়। রেজেস্ট্রি-দলিল হলেই কি সম্পত্তিটা অমনি নগেনবাবুর হয়ে যায়? দখলিস্বত্বে স্বত্ববান তুমি। আইন-আদালত আছে কি করতে? আমরা আছি কেন? যেদিকে বৃষ্টি, সেইদিকে ছাতা তুলে ধরব। প্রবল শত্রু চৌধুরিদের সঙ্গে যখন মিটমাট যাচ্ছে, এবারে নিশ্চিন্তে নিজেদের মধ্যে লড়াপেটা কর।

চারু বলে, দাদাকে তাতিয়ে তুলে আবার নতুন গণ্ডগোল পাকাতে চান বুঝি? বরাপোতায় না গিয়ে সেইজন্য এখানে আসা? ছাতা ধরতে হবে না আপনাকে, রক্ষে করুন। যা করতে হয় আমরাই ভেবেচিন্তে দেখব। আপনি আসুন এবারে চক্কোত্তি মশায়।

দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, এর পরে চক্কোত্তি মাদুরের উপর ধপ করে বসলেন: এত বেলায় কে আমার জন্য সেখানে ভাত রেঁধে-বেড়ে বাতাস করছে? যেতে হয়, দুটো খেয়ে যাব তোমাদের এখান থেকে।

চারু মুখ-ঝামটা দেয়ঃ ঝঞ্ঝাট করে আমি পারব না।

বলে পাক দিয়ে পিছন ফিরে ফরফর করে সে চলে গেল।

চক্কোত্তি ভ্রূভঙ্গি করেনঃ ওঃ, উনি না হলে আর লোক নেই! যে দেশে কাক নেই, সে দেশে যেন রাত পোহায় না। নগেনবাবুর বোন তো রয়েছে। ঘরের গিন্নী যিনি। বলি, শুনতে পাচ্ছ ও ভাল-মানুষের মেয়ে? তোমার ভাইকে এর মধ্যে নিয়ে এসেই যত ফ্যাসাদ। ব্রাহ্মণ-সন্তান ভর দুপুরে নিরম্বু চলে যাচ্ছে তোমার বাড়ি থেকে। গৃহস্থর তাতে কি কল্যাণ হবে?

রান্না শেষ হল চক্কোত্তির। মাছের তরকারি আর ভাত বেড়ে নিয়েছেন পাথরের থালায়। আবাদে দেদার ধান—ভাত খাওয়া অতএব শহুরে মাপে নয়। পাহাড়ের চূড়া না হল, তা বলে নিতান্ত মোচার মাথাটুকু নয়। বিড়ালে লম্ফ দিয়ে বাড়া ভাত ডিঙোতে পারবে না। ভাতের পাশে চক্কোত্তি কড়াইসুদ্ধ তরকারি টেনে নিলেন। লোকে এই সব অঞ্চলে মাছ খেতেই আসে, বাজে তরকারি বাহুল্য। লোকালয়ে এক কুচি মাছ মুখে দিয়ে পরিতৃপ্তিতে জিভে টক্কর দেয়, বাদারাজ্যের মাছ খাওয়া সে ব্যাপার নয়। ভাতের পরিমাণ যা, মাছের তরকারিও তাই। বাটিতে হয় না, বড় খোরার প্রয়োজন তরকারি ঢালার জন্যে। তার চেয়ে কড়াইতে রাখা সুবিধা—কড়াই থেকে তুলে তুলে খাবেন। তৈলাক্ত পারশে মাছ—তরকারির চেহারাখানা যা দাঁড়িয়েছে, তাই থেকে স্বাদের আন্দাজ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ মানুষ—ভোজন আরম্ভের মুখে গণ্ডূষ করতে হবে, সেইটুকু সবুর সইছে না।

কিন্তু এক গ্রাস মুখে দিয়ে চক্কোত্তি থু-থু করে ফেলে দিলেনঃ নুনে পুড়ে গেছে। যবক্ষার।

বিনি-বউ বলে, একজনের মত রান্না, তাই নুনের আন্দাজ করতে পারেন নি ঠাকুরমশায়।

আন্দাজ ঠিকই আছে। রান্না আজ নতুন করছি নে মা-লক্ষ্মী।

নুন যা দেবার দিয়ে আমি একবার আলাঘরে গেলাম কলকের তামাক দিতে। শত্তুর এসে সেই সময় ডবল নুন ছেড়ে দিয়ে গেছে।

বলে হাসতে লাগলেন ঃ কাঁচা কাজ হয়ে গেল। রান্না চাপিয়ে উনুনের পিঠ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হয় নি। এ রকম কখনো করি নে। নুন না দিয়ে খানিক সেঁকোবিষও দিতে পারত রাগের বশে। রাগ না চণ্ডাল—সে অবস্থায় মানুষের হুঁশজ্ঞান থাকে না।

অতিথি-ব্রাহ্মণ নিয়েও এমনিধারা কাণ্ড। লজ্জায় আর ব্রহ্ম-শাপের ভয়ে বিনি-বউ দিশা করতে পারে না। চলে যান তো ইনি—তার পরে হবে একচোট চারুর সঙ্গে। বড্ড বাড় বেড়েছে। লজ্জা নেই, সকলের সঙ্গে পাঁয়তারা কষে বেড়ায়। ভাইয়ের ভাতে ধিঙ্গি এক মাগী হয়ে উঠল, দুনিয়ার আর কোন চুলোয় ঠাঁই নেই। কিসের দেমাকে তবে এত ফড়ফড়ানি?

চক্কোত্তি ওদিকে হাসতে হাসতে বলছেন, আমিও ছাড়ন-পাত্র নই বাছা। আসন ছেড়ে ওঠা যাবে না, ভাত মরে যাবে। এক ঘটি জল নিয়ে এস দিকি। ঝোলের মাছ জলে ধুয়ে ধুয়ে খাব। উঃ, কত নুন দিয়েছে রে বাবা—নোনা-ইলিশের মত মাছের কাঁটা অবধি জরে গেছে।

রান্নাঘরের দাওয়ার উপর সেই খাবারের জায়গায় গগন উঠে এল। থমথমে মুখ সেই তখন থেকে। বলে, পাট্টা কবে রেজেস্ট্রি হচ্ছে চক্কোত্তি মশায়?

চক্কোত্তি বলেন, বুধবার। সোম মঙ্গল দুটো দিন ছুটি—ইদের পরব পড়ে গেল কি না।

গগন বল্লে, ভাল হয়েছে। বুদ্ধীশ্বরকে ফুলতলায় পাঠাচ্ছি নগেনের কাছে। তার মুখে সমস্ত শুনব।

চক্কোত্তি আহতকণ্ঠে বলেন, আমার কথা বিশ্বাস হয় না—আমি কি মিথ্যে বানিয়ে বললাম? অত উতলা কেন হচ্ছ, তা-ও তো বুঝি নে। হয়ে যাক না রেজেস্ট্রি—যেমন খুশি লেখাপড়া করে

নিক গে। তার পরে রইলাম আমরা সব। তোমার ঘেরির উপর কোন শালা না আসতে পারে, পুণ্ডরীকবাবুকে দিয়ে আমি তার যাবতীয় ব্যবস্থা করব। অমন ছুঁদে উকিল সদরের উপর দ্বিতীয় নেই।

না, চলে আসুক নগেনশশী। আমার সামনাসামনি হোক। মতলবটা বুঝব। ঢাক-গুড়গুড় নয়, খোসা ছাড়িয়ে কথাবার্তা এবারে।

চক্কোত্তি একগাল হেসে বলে, আসবে না, দেখে নিও। নেহাত সাদা মানুষ তুমি দাসমশায়, কথাটা তাই ভাবতে পারছ। এ সময়টা সামনে আসে! বলি, মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে তো একটা!

গগন বলে, আসবে নিশ্চয়। চিরকুটে মন্তোর লিখে বুদ্ধীশ্বরের কাছে দিয়ে দিচ্ছি। মন্তোরে টেনে আনবে। বাঁদরকে কলা দেখিয়ে ডাকতে হয়। হাত মুঠো করে আ-তু-উ বলতে হয় কুকুরকে। তবে আসে। কয়েকটা দিন আপনাকেও থেকে যেতে হবে চাক্কোত্তি মশায়।

তেতাল্লিশ

জগন্নাথ আর পচা নৌকো নিয়ে বয়ারখোলা গেছে। ছুতোর ধরে কাজকর্মগুলো সারবে, আলকাতরা দেবে। বাকি চারজন এরা সাঁইতলায়। পাড়ায় এসে পা দিতেই একটা কলরব উঠল। অন্নদাসী চেঁচাচ্ছে। তার পরে কী কথায় রাধেশ্যাম ঠাণ্ডা করে দিল একেবারে। চুপচাপ আছে। স্ত্রী-পুরুষে এত নিঃসাড় হয়ে আর কখনো ঘর করে নি।

চালাঘরে পড়ে ক্ষ্যাপা-মহেশ ক্ষণে ক্ষণে গাঁজা খায়, আর ভেবে ভেবে ফর্দ বলে। শশী গোয়ালা কাগজে একটু-আধটু অক্ষর ফাঁদতে জানে। তাতে সুবিধা হল, টুকে রাখে ফর্দগুলো। মহেশ এক

চিলতে কাগজ এনে দিয়েছে চারুবালার কাছ থেকে। ফর্দের মধ্যে পূজোর উপকরণ আছে ; আর রসদ-সামগ্রী আছে জঙ্গলে থাকবার। হাটবাজারে যা মিলতে পারে, যেমন কুম্ভকার-সজ্জা, ফাঁক মতন এক দিন বরাপোতায় গিয়ে কিনল। কলা, শসা, নারকেল, বাতাসা—জগারা এসে পড়লে তারপরে এগুলোর ব্যবস্থা হবে। সেই একদিনে কুমিরমারি হাটে সমস্ত হয়ে যাবার কথা, কিন্তু নৌকোর অসুবিধার জন্য বাকি রয়ে গেল। ধীরেসুস্থে এখন সব যোগাড় হচ্ছে। চাল অনেক লাগবে—খোরাকির চাল ও পূজোর নৈবেদ্য। বয়ার-খোলার তৈলক্ষ মোড়লকে ধরে নিখরচায় চালটার যোগাড় হয় যদি। চাল, বলেছে, ওরা নিয়ে আসবে। নুন, তেল, ঝাল মোটামুটি একটা হিসাব করে সেদিন নিয়ে এসেছে। আর ডাল। ডাল অবশ্য এসব অঞ্চলে বাড়াবাড়ি রকমের বিলাসিতা। তবু কিছু ডাল সঙ্গে নেওয়া ভাল। জলের মাছের কথা তো—হয়তো জালে উঠল না কোন দিন। কিম্বা মাছ খেয়ে অরুচি হয়ে মুখ বদলাবার শখ হল। ডাল ঘুঁটে নেবে সেদিন।

কুম্ভকার-সজ্জা অর্থাৎ মেটে জিনিস কতগুলো রে বাবা! ঝাঁকা ভরতি হয়ে গেল। সাতটা ঘট, সাতটা পিদ্দিম, সাতটা জলের ভাঁড়, একটা ধুনুচি। তা ছাড়া ঘর-ব্যাভারি হাঁড়ি-কলসি মালসা-সরা কিছু আছে। রাত করে মাল নিয়ে আসতে হল, নয় তো লোকের নজরে পড়ে যায়। ছিটে-গরান কেটে চেঁচে-ছুলে লাঠি বানানো হল এগারখানা। এই লাঠির মাথায় নিশান উড়বে। দুই গজ লাল শালু কুমিরমারি থেকে সেদিন এনেছে নিশান ও পিদ্দিমের সলতের জন্য। কাপড় কেটে এগার খণ্ড নিশান বানিয়ে রাখ, আর টুকরোগুলো নিয়ে সলতে পাকাও। বনে নেমে পূজোর গণ্ডির পাশে নিশান তুলতে হয়।

এই সমস্ত হচ্ছে। অত্যন্ত গোপনে, কেউ না টের পায়। তাড়া খেয়ে সাঁইতলা ছেড়ে পালাতে হল—অপমানের কথা বটেই। তা ছাড়া চৌধুরিগঞ্জের শত্রুপক্ষ আগেভাগে খবর পেলে দারোগা নিয়ে

এসে জগাকে আটক করে ফেলতে পারে। দরকার কি জানান দিয়ে ? বয়ারখোলা থেকে চলে আসুক নৌকো, এদিকে সমস্ত ঠিকঠাক রইল। নতুন জায়গায় যাচ্ছে, ভাল দিনক্ষণ চাই অবশ্য। কিন্তু পাঁজির শুভদিন নয়। অন্তরীক্ষের পানে নিরিখ করে দেখে সুদূর বাদাবনের দিকে তাকিয়ে ক্ষ্যাপা-মহেশই বলে দেবেন সেটা। সময় ধরে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়বে। পীর-দেবতাদের তুষ্ট না করে গুণীন-বাউল সঙ্গে না নিয়ে হুট করে বাদায় নেমে গাছের গোড়ায় কুড়ুলের কোপ দেওয়া যায় বটে, গাছও পড়ে। পরিণাম কিন্তু শুভ হয় না। বাঘ-কুমিরে না-ও যদি খায়, টিকে থাকতে পারবে না সে জায়গায়। বনবিবি, দক্ষিণরায়, গাজি, কালু, রণগাজি, ছাওয়ালপীর—এঁরা সব কুপিত হয়ে থাকেন। ওদিকে দানো, ঝুটো, ভূধেরাও সব কায়দায় পেয়ে যায়। দু-পক্ষ মিলে তাড়িয়ে তুলবে। প্রাণে রক্ষা পেতে পার নিতান্ত পিতৃপুরুষের পুণ্যবল যদি থাকে—কিন্তু প্রাণটুকুই শুধু, অন্য কিছু থাকবে না। দেখতে পাচ্ছ না, আশাসুখে ঘর তুলে সাঁইতলা থেকে কেমন সরে যেতে হচ্ছে। গোড়ায় কোন রীতকর্ম কর নি, তার পরিণাম।

তিনদিনের দিন জগা-পচা এসে পড়ল। ত্বরিতে কাজ হয়েছে। কাজটা হয়েছেও খাসা। আলকাতরা মেখে নৌকো চকচক করছে। নতুন ছই। খোদ মালিক এসেও যদি এখন এই নৌকোয় চলাচল করে, নিজের বস্তু বলে চিনবে না।

পৌঁছেছে ঠিক দুপুরে। ভেবেচিন্তে নৌকো ওপারের পাশ-খালিতে নিয়ে গিলেলতার ঝোপের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। মানুষের নজরে না পড়ে। তাতে নানান ঝামেলা। নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে, মুখ ব্যথা হবে জবাব দিতে দিতে। কোথা থেকে আনলে, ভাড়া কত ? রওনা হচ্ছ কবে ? কোন্ মতলবে চলেছ, থাকবে কতদিন বনে গিয়ে ? চটপট জবাব বানাতে হবে—মিথ্যে বানিয়ে বানিয়ে কাঁহাতক পারা যায় !

কিন্তু নৌকো লুকিয়ে রেখেই বা কাজ হল কই ? চাউর হতে বাকি নেই কিছু। সাঁজের মুখে গগন এসে সাঁইতলার পাড়ার মুখটায় দাঁড়াল। উচ্চকণ্ঠে কাকে যেন বলছে, জগন্নাথ ফিরেছে শুনতে পেলাম। ঘরে আছে ? ডেকে দাও একবারটি। আমার নাম করে বল।

ডাকতে হল না। কানে গিয়ে জগা নিজেই বেরিয়ে এল। ভূমিকা না করে গগন বলে, ঠিকঠাক হয়ে গেল ?

জগন্নাথ হ্যাকা সেজে বলে, কিসের ঠিকঠাক বড়দা ?

বসত তুলে পাকাপাকি চলে যাবার।

কে বলল ?

সন্দেহটা পচার উপর। চারুবালার সে বড় অনুগত। চলে যাবার কথা সে হয়তো বলে দিয়েছে।

গগন বলে, বলে দিতে হয় না। বাদা জায়গা—শহর-বাজার নয় যে মানুষ কিলবিল করছে, ঘরের মানুষ উঠোনের মানুষটাকে জানে না। এ জায়গায় মানুষ লাগে না, গাছগাছালি বলে দিতে পারে। ঝোপের মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে রেখে এলে—মানুষে না দেখল তো পাখপাখালি দেখছে, তাইতে সকলের দেখা হয়ে যায়। সামাল করে দিতে এসেছি জগা। মহেশ তোমাদের ঘাড়ে লেগেছে, ক্ষেপিয়ে তুলছে। কোন্ অজঙ্গি জঙ্গলে নিয়ে তুলবে ঠিকঠিকানা নেই। ওর ঐ কাজ। কতবার কতজনাকে নিয়ে গেছে —হর ঘড়ুই অনেক জানে, তার কাছে শুনে দেখো। কাউকে বাঘে নিয়েছে, দানোয় ধরে তুলে কাউকে আছাড় মেরেছে, উড়িয়ে নিয়ে কাউকে বা সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। পাগল হয়ে কেউ কেউ আবার ফিরে আসে—ঐ শশী গোয়ালার হয়েছে যেমন।

জগা বলে, জেনে ফেলেছ তো খুলেই বলি বড়দা। চৌধুরিদের পেয়ারের লোক তুমি এখন। শালা আর বোনাই মিলে ষড় করছ—জেলে পুরবে আমাদের, ধরে ধরে ফাঁসি দেবে। জঙ্গলের বাঘ তোমাদের চেয়ে ভয়ের হল কিসে ?

খুব হাসতে লাগল জগা। গগনের আষ্টেপিষ্টে যেন ঐ হাসির বেত মারছে। হতভম্বের মত সে জগার দিকে চেয়ে থাকে। বলল, সেই কথাই তোমাকে বলতে এলাম। মেজ-শালা বিস্তর প্যাঁচ খেলছে। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। তোমাকে তাড়াল, আমাকেই কবে আবার বোঁচকাবিড়ে বাঁধতে হয়!

তাড়া খেয়ে চলে যাচ্ছে, এমন কথা জগন্নাথ কিছুতে মেনে নিতে পারে না। ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করে বলে, আমায় কি আজ নতুন দেখছ বড়দা? যত না দেখেছ, শুনেছ তো আমার কথা। নেড়ী-কুকুরের মতন লেজ গুটিয়ে পালাবার লোক আমি? কিন্তু পাড়ার মধ্যে বোকাশোকা আছে কতকগুলো—ঘরসংসারে জড়িয়ে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে। ঘেরিদার হয়ে তোমরা এবার বাদার চিরকেলে নিয়ম বাতিল করে দিচ্ছ। ঘেরিতে জাল ফেললে নাকি সরকারী আইন মতে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় চালান করবে। তখন আর উপায় থাকবে না মাছ-মারাদের। সেইজন্যে ভাবছি, আগেভাগে গিয়ে ওদের জন্য যদি একটা জায়গা করে নেওয়া যায়।

গগনের কথা হাহাকারের মত শোনায়ঃ বাদার মধ্যে তুমিই তো আমায় এনে বসালে। একা ফেলে সত্যি সত্যি চললে জগা?

জগা বলে, বন কেটেছে, ঘর বেঁধেছে—তখন কি চলে যাবে কেউ এরা ভেবেছিল? তোমরাই থাকতে দিচ্ছ না—থাকা যাবে কেমন করে?

হাসলঃ তুমিও যাবে বড়দা—ভাবনা কিসের? দুটো দিন আগে আর পিছে। জায়গা করে রাখি গে, গিয়ে যাতে উঠতে পার। সে জায়গায় কিন্তু ঘেরিদার কেউ নয়। ঠিক আর দশজনের মতন মাটি-কাটা মাছ-মারা হয়ে থাকতে হবে। পারবে? মানে মেজাজটা এখন উঁচুতে উঠে গেছে কিনা।

গগন সাফ বেকবুল যায়ঃ আমি কেন যেতে যাব? কাঁধে তোমার মতন ঘুরনপেত্নী চেপে বসে নেই, কোন একটা জায়গায় যে

সোয়াস্তিতে থাকতে দেয় না।

নিজের ইচ্ছেয় না যাও তো তাড়িয়ে তুলবে। সে মানুষ বাইরের কেউ নয়—তোমার পরিবারের আপন ভাই। চেপে যাচ্ছ কি জন্যে? তোমার কথাটাই ঘুরিয়ে বলছি—এ জায়গা শহরবাজার নয়, জানতে কিছু বাকি থাকে না। মানুষে না বললে গাছগাছালি বলে দেয় নগেন-শশী নতুন-ঘেরি লিখে-পড়ে নিচ্ছে। কুটুম্বমানুষ বলে একেবারে না তাড়িয়ে গোমস্তা করেও রাখতে পারে। ঘাড় হেঁট করে রাতদিন তখন খাতা লেখার কাজ, ঘাড় তুলে তাকাতে দেবে না।

গগন উত্তেজিত হয়ে বলে, শোন তবে। তেমন কিছু হবার আগে আমিই তাড়াচ্ছি। বুদ্ধীশ্বরকে ফুলতলায় পাঠিয়েছি। পরশু দিন দলিল রেজেস্ট্রি হবার কথা। সমস্ত ফেলে, দেখতে পাবে, আজ রাত্রে কিম্বা কাল সকালবেলা হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়েছে। ঝগড়া-বিবাদে পেরে উঠব না তো আলাদা এক মতলব ঠাউরেছি। উড়ো আপদ সাঁইতলা ছেড়ে গেলে আবার আমরা সেই আগেকার মতন থাকব।

জগন্নাথের হাত জড়িয়ে ধরে। বলে, যেও না তুমি। সেই কথা বলতে এলাম। ওরাই যখন চলে যাবে, তোমাদের কোন্ দায় পড়েছে। নৌকো যেখান থেকে এনেছ, ফেরত দিয়ে এস।

বলতে বলতে জগাকে টেনে নিয়ে চলল খালের দিকে। বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় না। অনেক কথা। নিরিবিলি একটা জায়গায় বসিগে চল।

শেষ পর্যন্ত গগনই নগেনশশীকে তাড়াচ্ছে, এ খবরটা নতুন। অমন ধুরন্ধর লোকটাকে কোন্ কায়দায় তাড়াচ্ছে, তারিয়ে তারিয়ে শোনার মতই ব্যাপার বটে।

খালের ধারে বাঁধের আড়ালে বসল এসে দু-জনে।

গগন বলে, নগনার টানের মানুষ হল চারি। আমার বোন চারু-বালা। তার জন্য মজেছে। মরুকগে যাক, বোনটা নিয়ে রেহাই দিক আমাদের। এমন বিয়ে তো আকছার হচ্ছে। বাদা অঞ্চল বলে

কেন, শহর-বাজারেও। বিয়ে না হয়েও কত জোড়া বেঁধে থাকে। শাস্তরেও শুনি বিধান রয়েছে। মানবেলায় সমাজের ভয়ে পেরে উঠি নে। পুরুত ডেকে মন্তর পড়ে, আমি ওদের বিয়ে দিয়ে দেব।

জোয়ারের জল অল্প একটু দূরে ছলছল করছে। সেদিকে তাকিয়ে জগা নিঃশব্দে শুনে যায়। অতএব চারুবালা বউ হচ্ছে নগেনশশীর। বিয়ের পর বিদায় হয়ে যাবে সাঁইতলা ছেড়ে। শত্তুর ওরা দু-জনেই —মতলবটা ভাল। এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

অনুকূল চৌধুরি নগেনের নামে নতুন-ঘেরির বন্দোবস্ত দিচ্ছেন, খবরটা টৌর্নি চক্কোত্তি মুখে করে নিয়ে এলেন। কিন্তু দলিল-দস্তাবেজ যতই করে আসুক, গগন দাস কি জন্যে দখল ছাড়তে যাবে? চক্কোত্তি বুদ্ধি দেয়, সাহস দেয়: কক্ষনো না, চেপে বসে থাক তুমি দাস-মশায়। মামলা লড়ে তবে উচ্ছেদ করতে হবে বাছাধনের। সে এখন পাঁচ-সাত-দশ বছরের ধাক্কা। কত রকম স্বত্বাস্বত্বির কথা উঠবে। করালীর চর-ওঠা ভুঁইয়ে কার মালিকানা—চৌধুরির না ভাবত-সরকারের? যাবতীয় দলিলপত্তর হাকিমের রায়ে চোতা-কাগজের শামিল হয়ে যাবে। মামলায় হেরে শালাবাবু অঞ্চল ছেড়ে পালাতে দিশা পাবে না! চৌধুরিদের বড়গাছে লা বেঁধেছে, বড়গাছ মড়াৎ করে ভেঙে ঘাড়ের উপর চেপে পড়বে। হা-হা-হা—

চক্কোত্তির প্রবল হাসির সঙ্গে গগন কিন্তু হাসতে পারে না। ভাবছে। টৌর্নি মানুষ—মামলা গড়েপিটে বানানো তাঁর পেশা। মামলা জমে উঠলে কোমর বেঁধে কোন এক পক্ষের হয়ে লেগে যাবেন। ভাল রকমের একটা জুড়ে দিতে পারলে কিছু দিনের মত নতুন রোজগারের পথ হল। ভাবতে ভাবতে তখন পন্থা এসে গেল গগনের মনে। চক্কোত্তি মামলার কৌশল বাতলে দিচ্ছেন, কিন্তু আরও এক ভাল উপায় আছে নির্গোলে নগেনশশীকে অঞ্চল-ছাড়া করবার। চারুবালার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। চারুর লোভে ঘুরঘুর করছে বিস্তর দিন ধরে, সেই দেশে-ঘরে থাকবার সময়েও। যার জন্যে ওদের পিছন ধরে বাদা-অঞ্চল অবধি চলে এসেছে। টৌর্নি হওয়া

সত্ত্বেও চক্কোত্তি মশায় জাত্যংশে ব্রাহ্মণ। অতএব বুদ্ধীশ্বরকে ফুল-তলায় পাঠিয়ে চক্কোত্তিকেও বলেকয়ে ধরে রেখেছে এখানে। অং-বং দুটো বিয়ের মন্তর উনি পড়ে দেবেন। বাদারাজ্যের বিয়েথাওয়ায় খাঁটী ব্রাহ্মণ কটা ক্ষেত্রে মেলে! গদাধরের মতন লোকেরাই পৈতে ঝুলিয়ে হঠাৎ-ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। ভাগ্যবশে এত বড় যোগা-যোগ। বুধবারটা দিনও ভাল—পাঁজির অভাবে স্মৃতি থেকে চক্কোত্তি বিধান দিয়েছেন। দলিল রেজেস্ট্রির কথা ছিল, তার বদলে নগেনশশী বর হয়ে বিয়ে করতে বসবে। চুক্তি থাকবে বউ নিয়ে যেখানে হোক বিদায় হয়ে যাবে বিয়ের তিন দিনের মধ্যে। সই করে নেওয়া হবে চক্কোত্তির মুকাবেলা। তবে বিয়ে।

আদ্যোপান্ত শুনে জগন্নাথ গুম হয়ে যায়। ক্ষণপরে বলে, শুনেছে তোমার বোন? সে রাজী?

গগন অবহেলার ভাবে বলে, ঘটা করে কে বলতে গেছে! কিন্তু আপত্তির কি আছে? বিধবা সে তো একটা গাল। কটা দিনই বা বরের ঘর করল! বামুন-কায়েতের ভিতরও তো শুনতে পাই, কত একছেলে দু-ছেলের মা দোজপক্ষের বিয়েয় গিয়ে বসছে। আমাদের বেলা কী দোষ হল? বড় ভাই আমি, ভাল বুঝে দিচ্ছি বিয়ে। ধড়িবাজ পাত্তর—যেখানেই যাক জমিয়ে নেবে সঙ্গে সঙ্গে। আমার বোন ভাত-কাপড়ের কষ্ট পাবে না।

জগা বলে, বোনটি তোমার সোজা নয় বড়দা। বললেই অমনি সুড়সুড় করে কনে হয়ে পিঁড়িতে বসবে, সেটা ভেবো না। পূজোর দিন সেই যে আমি আলায় এসে পড়লাম। চারুবালা ভেবেছে খোঁড়া-নগনা। যাচ্ছেতাই করে উঠল। যা কথার ধার—মোষ বলি-দেওয়া মেলতুকের ধার কোথায় লাগে তার কাছে!

গগন বলে, ও কিছু নয়। দুটো হাঁড়ি-মালসাও তো এক ঝাঁকায় রাখলে ঠনঠন করে। এক বাড়িতে একসঙ্গে সব রয়েছি, ঝগড়া-ঝাঁটি হবে না—বলি, বোবা তো কেউ নয়। ঝগড়া বিয়ের আগে হচ্ছে, বিয়ের পরেও হবে। কিন্তু সেজন্য কোন্ কাজটা আটকে

থাকে কার সংসারে ?

একটু চুপ করে থেকে নিজের কাছেই যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে : মন্দটা কিসে ? বর দোজবরে তো তোর বেলাতেও তাই। নগনার বিয়েও শুধু নামে হয়েছিল। বউ ঘর করল না। বিয়ের পরে এসেছিল, তারপরে একদিনের তরে শ্বশুরবাড়ি আর আনা গেল না। নানান কেলেঙ্কারি। সে বউ আসবে না কোনদিন, এলেও ঠাঁই পাবে না। বরের একটু পায়ে টান, বলবি তো তাই ? থাকল তো বয়েই গেল। অমন চালাকচতুর চৌপিঠে মানুষ কটা পাওয়া যায় ? যতই হোক, বছরখানেক এক বরের সঙ্গে ঘর করে এসেছিস। ষোলআনা নিখুঁত হলে সে পুরুষ রাজী হতে যাবে কেন ? বলি মায়ের পেটের বোনকে আমি কি খারাপ ঘরে দেব ? মায়াদয়া বুদ্ধি বিবেচনা নেই ?

জগন্নাথ বলে ওঠে, তা আমায় ওসব শোনাও কেন ? আমার কি ? যেখানে খুশি দাওগে। যার পাঁঠা সে লেজে কাটবে, অন্যের কী যায় আসে !

গগন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলল। বলে, দেখ, যার কপালে যেমন লেখা থাকে, মানুষের কিছু করবার নেই। নগনাটা কি আজকের থেকে চারির পিছনে লেগেছে ! গাঁয়ের উপরে সমাজের মধ্যে থেকে ঠেকিয়ে আসছিলাম। ঘরদুয়োর ছেড়ে তারপরে বেরিয়ে আসতে হল। বউ পরের ঘরের মেয়ে, তার কথা ধরি নে। কিন্তু নিজের বোন হয়ে চারুও আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে তুলল। হচ্ছেও তেমনি। আমি কি করব—জঙ্গলে পড়ে আছি। সমাজ নেই এখানে, বিয়ে-থাওয়ার কোন বাধা নেই। কিন্তু জঙ্গলে বরপাত্তর কোথায় ? যে আছে, তার হাতেই তুলে দেব।

খরকণ্ঠে বলে, দোষটা শুধু নগনার দেখলেই হবে না। বোন বলে ছাড়ব না—বাদায় পা দিয়ে ও-ই তো সকলের আগে গণ্ডগোল পাকাল। তোর সঙ্গে ভাঙাভাঙি ওরই কারণে। মেয়েলোক আরও একজন তো এসেছে। চোখে দেখতে পাস তাকে কখনো ? গলা

শুনতে পাস ? তা ভালই হল, জোড়া আপদ এদ্দিনে এক সঙ্গে বিদেয় হচ্ছে। ঘরে-বাইরে সোয়াস্তিতে থাকা যাবে।

অন্ধকার হয়েছে। আলাঘরে হ্যারিকেন-লণ্ঠন জেলে দিয়ে গেছে। গগন উঠে পড়ল। মাছের ডিঙি ফেরার সময় হল কুমিরমারি থেকে। অনেক কাজ। নগেনশশী নেই, একলাই আজ সমস্ত করবে। মাছের দাম হিসাবপত্র করে নেবে, খাতা লিখবে। জগার দল ডিঙির কাজ ছেড়েছে, কাজ তা বলে আটকে নেই। চৌধুরি-আলা থেকে অনিরুদ্ধ নৌকো বাওয়ার পাকা লোক দিয়েছে। বুদ্ধীশ্বর আছে—এই তরফের নতুন মাতব্বর। তা ছাড়া কথা আছে, দরকার মতন চৌধুরিগঞ্জের নৌকোয় মাছ বয়ে দিয়ে আসবে কুমিরমারি। পাকা লোক নগেনশশী, সে-ই সব ব্যবস্থা করেছে।

ডোবার ধারে গিয়ে একবার গগন মুখ ফিরিয়ে দেখে। জগন্নাথ আছে তখনো—নিশি-পাওয়া লোকের মতন খাল-কিনারে ছিটে-জঙ্গলের ভিতর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চুয়াল্লিশ

গগন যা ভেবেছে, মিথ্যা নয়। খানিকটা পরেই নগেনশশী বুদ্ধীশ্বরের সঙ্গে এসে পড়ল। তখন গা ধুচ্ছে গগন ডোবার ঘাটে বসে। নগেনকে দেখল। বাঁদরকে কলা দেখাতে হয়, সেই কলা হল চারুবালা। একা একা গগন খুব হাসছে।

আর হাসছে চারুবালা রান্নাঘরে বিনি-বউয়ের সঙ্গে। বলে, দেখ বউদি, কিসে কি হয়ে যায়। এত বড় শয়তান মানুষ, কিন্তু দাদার বুদ্ধির সঙ্গে পেরে উঠল না। দলিল করে সর্বস্ব নিতে যাচ্ছিল—দাদা এমনি চিরকুট লিখে পাঠাল, ছেড়েছুড়ে ছুটে এসে পড়ল।

বিনোদিনী বলে, কি লিখেছে জান না বুঝি ঠাকুরঝি ? তোমার যে বিয়ে।

হাসি আরও বেড়ে যায় চারুর : ওমা, তাই নাকি! মত ঘুরল তোমাদের এতদিনে? কার সঙ্গে বিয়ে গো, বনের মধ্যে বর পেলে কোথা?

বিনোদিনী হেসে বলে, ভিজে-বেরালটি—কিচ্ছু জানেন না! ঘর এই দুখানা মাত্তর—এত কথাবার্তা হচ্ছে, উনি যেন কানে তুলো দিয়ে থাকেন। কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশুদিন বিয়ে মেজ ভাইয়ের সঙ্গে। সেইজন্যে তাকে আনতে পাঠিয়েছিল।

এই চারু কৃত্রিম হতাশার সুরে বলে, সে মানুষ তো কত বছর ধরে ঘুরছে। বিয়ের তদ্বিরে বরপাত্তর আমাদের পিছন পিছন অজঙ্গি জঙ্গলে এসে উঠল। এদ্দিনে চাড় হল তোমাদের?

বিনোদিনী বলে, ফুল না ফুটলে কি জোর করে হয় ভাই! মানুষের হাত কিছু নেই, যা করবার বিধাতাপুরুষ করেন। যোগাযোগটা কী রকম! চক্কোত্তি মশায় এসে পড়লেন—ভাল বামুন, নৈকষ্যকুলীন। মন্তোর পড়াবার জন্য বলেকয়ে রাখা হল তাঁকে।

চারু বলে, শুধু বলাকওয়ায় হয় নি। টোর্নিমানুষ—মোটা দক্ষিণা কবুল করতে হয়েছে। বরকেও ছেড়ে কথা কইবে না, মোটা দালালি আদায় করবে তার কাছ থেকে।

নগেনশশী ইতিমধ্যে জামা খুলে হাত-পা ধুয়ে গামছা দিয়ে পরিপাটী করে মুছে চক্কোত্তির কাছে বসেছে। নীচু গলায় কথাবার্তা। চক্কোত্তি খবরাখবর নিচ্ছেন ফুলতলার। নগেনও শুনছে এদিককার খবর—তড়িঘড়ি এই বিয়ের আয়োজনের বিবরণ। গগনের মতলব যা আছে এর পিছনে। গগন না থাকায় দু-জনে খোলাখুলি কথাবার্তার জুত হয়েছে।

বিনি-বউয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে চারুবালা ডোবার ঘাটে গেল গগন যেখানে গা ধুচ্ছে। জলে নামবার উপায় নেই, বিষম কাদা। ঘাটের উপরে সেজন্য মাচা বানিয়ে নিয়েছে। জলের ভিতরে শক্ত দুটো খুঁটি পোঁতা, আড় বেঁধেছে ঐ খুঁটির সঙ্গে, লম্বালম্বি কতকগুলো কাঠ ফেলে নিয়েছে। ঐ মাচার উপরে বসে

ঘটিতে করে গায়ে জল ঢালছে। চারু এল খান দুই থালা হাতে করে। থালা ধুতে এসেছে। সেটা উপলক্ষ, গগন বুঝতে পারে। মুখ খুলবে এইবারে চারু।

গগন কিছুমাত্র আমল না দিয়ে মুখের উপর সোয়াস্তির ভাব টেনে এনে বলে, যাক, এসে গেল তবে মেজবাবু। নিজের ঘর-বর হবে এতদিনে। ওদের সঙ্গে পুরানো কুটুম্বিতে ঝালিয়ে নতুন কুটুম্বিতে।

চারু বলে, তোমার মেছো সম্পত্তিটা রক্ষে হল দাদা। যদি অবশ্য তোমার নতুন কুটুম্ব সত্যি সত্যি সাঁইতলা ছেড়ে যায়।

গগন জাঁক করে বলে, বন কেটে জন্তুজানোয়ার তাড়িয়ে সম্পত্তি বানানো। হেঁ-হেঁ, এ সম্পত্তি নিয়ে কেউ জিনোতে পারবে না। চক্কোত্তি মশায়কে জিজ্ঞাসা করে দেখিস।

তারপরে একেবারে আলাদা স্বরে বলে, তোকে নিয়ে কত উদ্বেগে যে দিন কেটেছে! মায়ের পেটের বোন এমনি দশায় চোখের উপর ঘুরঘুর করছে। শহরবাজারে থাকলে কাজকর্ম খোঁজা যায়, বাদাবনে সে উপায় নেই—

চারু বলে, উদ্বেগের কথা আমায় বল নি কেন দাদা? আমি উপায় করতাম।

কি উপায় করতিস? বর ধরে আনবি, কিন্তু জঙ্গলে মানুষ কোথা? হাটবার দেখে তাহলে কুমিরমারি যেতে হত। কিম্বা সেই ফুলতলা অবধি।

রসিকতা করে গগন খুব এক চোট হেসে নেবে, কিন্তু চারুবালার মুখে চেয়ে স্তম্ভিত হল। চারু বলে, কোথাও যেতে হত না দাদা। এইখানে করালী গাঙে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। বোনের দায় মোচন হয়ে যেত তোমার।

গগন আহত কণ্ঠে বলে, শুভকর্মের আগে তুই জলে ঝাঁপ দেবার কথা বললি চারু?

জল অনেক ঠাণ্ডা দাদা। রাতে ঘুমিয়ে থাকতাম—সেই সময় কেন হাত-পা ধরে ছুঁড়ে দাও নি? দায় চুকে যেত।

গগন চটে গিয়ে বলে, এখন এই বলছিস, কিন্তু নগেনকে তুই-ই তো নিয়ে এলি লোভ দেখিয়ে। দাদার মত ছাড়া হবে না—দাদার কাছে মত নিতে এসেছিস তোরা। তা ভেবেচিন্তে দিচ্ছি আমি মত। চক্কোত্তি মশায়কে ঐ জন্ম ধরে রেখেছি। এখন উল্টোপাল্টা বললে হবে কেন ?

কেন বলেছি সে-ও তো জান দাদা। নিজের গরজ বুঝে আজকে অবুঝ হচ্ছ। তুমি খবরবাদ দাও না, একলা ছুটো মেয়েমানুষ আসতে পারি নে জঙ্গলরাজ্যে। কী করা যায়—বানিয়ে বলতে হল একটা-কিছু। নয় তো খোঁড়া পা টানতে টানতে মানুষটা এদ্দুর অবধি কোন্ স্বার্থে আসতে যাবে ? কিন্তু পৌঁছবার পর থেকেই দূর-দূর করছি। তিতো কথাবার্তা দিনরাত। ভেবেছিলাম, রাগ করে দেশ-ভুঁয়ে ফিরে যাবে— তা একেবারে উল্টো ব্যাপার, জোঁকের মতন লেপটে রয়েছে।

গগন বলে, লেপটে থেকে প্যাঁচ কষে কষে এবারে সবসুদ্ধ ধরে টান দিয়েছে। আমার এত বছরের নোনা জল খাওয়া বরবাদ করে দেয়।

হঠাৎ সে চারুর দিকে খিঁচিয়ে ওঠেঃ তোদের জন্মেই তো! হাতে-গাঁটে মানষের সব সময় টাকাপয়সা থাকে না। চিঠি লিখেছিলি, আরও না হয় পাঁচ-দশখানা লিখতিস। হুট করে এসে পড়বার কোন্ দায় হল ? সব গণ্ডগোলের মূলে তোরা। বলি, নগনাটা এসে না জুটলে এসব কোন হাঙ্গামা হত না। উল্টে আবার টকটক কথা বলিস আমার উপর।

দু-খানা থালা ধুতে আর কত সময় লাগে! হয়ে গেছে। থালা হাতে নিয়ে অন্ধকার উঠানে চারুবালা ম্যাচ-ম্যাচ করে চলল। বাদারাজ্যে কতরকম সাপখোপের কথা শোনা যায়। একটা সাপ ফণা তুলে এসে ছোবল দিলেও তো পারে।

চিরকুট পেয়েই নগেনশশী আ-তু-উ ডাকা কুকুরের মতন ছুটে

এসেছে, মুখের তম্বি কিন্তু ষোলআনা। গগন গা ধুয়ে এসে দাঁড়াতেই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: কী কাণ্ড! বুধবারটা ছাড়া দিন খুঁজে পেলে না? কাজটায় বাধা পড়ে গেল।

নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিরাসক্ত ভাব দেখাতে হয়। সবাই বলে থাকে এমনি। গগন বলে, শুভকর্মটা অনেক দিন ধরে ঝুলছে। সেইজন্যে ভাবলাম—

কথা শেষ হতে না দিয়ে নগেন বলে, এদ্দিন ঝুলেছে তো আরও না হয় দু-দশ দিন ঝুলত। লোক পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা—বিয়ের তারিখ ঐ বুধবারের পর আর যেন আসবে না!

গগন বলে, তারিখ কতই আসছে যাচ্ছে। কিন্তু বাদার মধ্যে পুরুত মেলে কোথা? ভাগ্যিভোগায় চক্কোত্তি মশায়কে পাওয়া যাচ্ছে। খাঁটী ব্রাহ্মণ—হোটেলওয়ালা গদাধরের মত ভেজাল বামুন নন।

চক্কোত্তি মশায় এখন বরাপোতা থাকবেন। দরকারে খবর দিলে কি আসতেন না? নাঃ, কাজটা ঠিক হল না জামাইবাবু। পাকা-দলিল হয়ে যাচ্ছিল। বড়লোকের ব্যাপার তো—কোন কোটনা কী মন্ত্রণা দেয়, মন ঘুরে না যায় অনুকূল বাবুর!

দলিল না-ই বা হল! এদ্দিন বিনি-দলিলে চালিয়ে এসেছি, হঠাৎ দলিলের কোন্ গরজ পড়ল? আসল মালিক কে, তারই তো সাকিন নেই।

নগেনশশী জাঁক করে বলে, দলিল হবে না মানে? ইয়ার্কি? ঠিকঠাক করে এসেছি বাবুর সঙ্গে। এ বুধবারে হল না তো আসছে বুধবারে। স্ট্যাম্পের উপর লেখাপড়া আছে, খালি এখন সই মেরে হাকিমের সামনে তুলে ধরা। কেন যে লোকে অনুকূল বাবুর নিন্দে করে—আমি তো কই খারাপ দেখলাম না। তিনি আরও ঠাট্টা করে বললেন, বিয়ে করতে যাচ্ছ, মিষ্টিমিঠাই নিয়ে এস। নয় তো কাজের ভণ্ডুল ঘটিয়ে দেব।

কী সব উল্টোপাল্টা কথা! গগন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিয়ে হয়ে

গেলেই বাদা থেকে বিদায় হবে—এমনি ধরনের কথা কত হয়েছে। শতমুখে বাদার নিন্দে করত নগেনশশী : সাপ-শুয়োর থাকতে পারে এখানে, মানুষের বসবাসের জায়গা নয়। বিনিটা নাছোড়বান্দা — তার জন্যে আসা। পালাতে পারলে বেঁচে যাই রে বাবা। বিনি-বউ আর এক রকম বলে : আসতে চাচ্ছিল না মেজদাদা। যে-ই বলেছি, আমায় একেবারে তাড়িয়ে তুলল। তখন ঠাকুরঝি বলে, যাবে না কী রকম! নাকে-দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাব। ঠাকুরঝির চক্কোরে পড়ে মেজদাদা এল, আমার কথায় নয়। তাকে পাওয়ার লোভে।

কিন্তু বিয়ের পরেও এখন তো নড়ে বসবার মতলব দেখা যাচ্ছে না সেই নগেনশশীর।

গগন বলে, এ কী রকম কথা! রীতকর্ম আছে তো একটা! দলিল হোক না হোক আমি বুঝব। তার জন্য ফিরে বুধবার অবধি হাঁ করে থাকতে হবে না। বিয়ের পরদিনই বউ নিয়ে জোড়ে চলে যাও। যা নিয়ম, যে রকম কথা তোমার সঙ্গে।

নগেনশশী বলে, বউ নিয়ে ভিন্ন জায়গায় যেতে বল, তার জন্যে আটকাবে না। এখান থেকে গিয়ে ঐ চৌধুরিগঞ্জের আলায় পাঁচ-সাত দিন জোড়ে থেকে আসতে পারি। অনুকূল চৌধুরি আমার গুণ বুঝেছেন। নতুন-ঘেরির একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে তার পরে চৌধুরিগঞ্জের ভারও হয় তো আমায় নিতে হবে। অনিরুদ্ধকে দিয়ে হয় না, ফুলতলা থেকে এসেও সুবিধা করতে পারে না। ভালই হবে, কি বল জামাইবাবু? একচ্ছত্র হয়ে বসব। অঞ্চল জুড়ে চেপে বসে তখন দেখা যাবে কত শক্তি ধরে পাড়ার ঐ হাঘরেগুলো। ভিটে-ছাড়া করে তাড়াব।

গগন ব্যাকুল হয়ে বলে, না গো, দেশে ফিরে যাও তোমরা। কি অন্য কোথাও যাও। কথাও তো তাই। বিয়ে দিচ্ছি আমি সেই কারণে।

কিন্তু নগেনশশী কিছুমাত্র আমল না দিয়ে চক্কোত্তির সঙ্গে পুনশ্চ কথাবার্তায় মগ্ন হল। কেমন ভাবে কি রকম শর্তে চৌধুরিগঞ্জের

কাজটা নেয়া যায়, কাজ নেবার পরে কোন্‌খানে ঘাঁটি করা যাবে—সাঁইতলায় না চৌধুরিগঞ্জে, তারই সব জরুরী শলাপরামর্শ।

আচ্ছা মজা! বিয়ে করবে চারুবালাকে—এবং বিয়ের পরে নতুন ঘেরি ও চৌধুরিগঞ্জ উভয় জলকরের কর্তা হয়ে বাদারাজ্যে আধিপত্য করে বেড়াবে। ধান ছাড়াতে গিয়ে চাল বেধে আসে—উপায় কি এই বিপদে?

পঁয়তাল্লিশ

বলাই-পচার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে নতুন-আলায় বুদ্ধীশ্বর গিয়ে জুটেছে। ওঠাবসা আগেও ছিল, সে হল আর দশটা মাছ-মারার মতন। এবারে চাকরি দিয়েছে নগেনশশী। নতুন ঘেরির বেলদার। বেলদার বুদ্ধীশ্বর। মাস মাস নগদ তঙ্কার মাইনে। এয়ার-বন্ধুদের মাঝে বুদ্ধীশ্বর চাকরির কথা তুলে জাঁক করে। সকলের থেকে স্বতন্ত্র—তুচ্ছ মাছ-মারা নয়, চাকুরে মানুষ।

বেলদারের প্রধান কাজ দিবারাত্রি ভেড়ি পাহারা দিয়ে বেড়ানো। ঘোগ হল কিনা ঠাহর করে দেখা। গাঙ-খালের নোনা জল ঝিরঝিরিয়ে ঘেরির ভিতর আসে, সেই ছিদ্রপথের নাম হল ঘোগ। ঘেরির তলদেশে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র—সেই পথে জল এসে ঢুকছে, খুব নজর না করলে বোঝা যাবে না। কিন্তু অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়ে পড়ে একদিন এই ছিদ্রটুকু। সুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনো—বাদাবনের এই ঘোগের ব্যাপারে সেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। জল চুঁইয়ে এসে মাটি ধুয়ে আস্তে আস্তে পথ বড় হয়ে ওঠে। তারপর কোটালের সময় প্রচণ্ড স্রোত সেই পথে মাথা ঢুকিয়ে বাঁধ ভেঙে ফেলে চারিদিক একাকার করে দেয়। দীর্ঘ দিনের তৈরি-করা মাছ বেরিয়ে চলে যায়, মালিকের মাথায় ঘা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় থাকে না। আবার তখন নতুন করে ভেড়ি বেঁধে নতুন ডিম

ও চারামাছের মরশুম অবধি বসে থাক চুপচাপ। এতদিন যা-কিছু করছিলে, সমস্ত বরবাদ। বেলদার তাই সতর্ক চোখে যোগ পাহারা দিয়ে বেড়ায়। তিলেক সন্দেহ ঘটলে দুষ্ট জায়গাটুকু খুঁড়ে নতুন মাটি শক্ত করে চাপান দেবে। ভেড়ির কোনখানে যদি দৈবাৎ ভেঙে গেল, লোকজন জুটিয়ে এনে ত্বরিতে সেটা মেরামত করে ফেলবে। তার আগে বাঁশের পাটা পুঁতে ঘিরে দেবে ছেঁড়া জায়গাটা। কিছু পরিমাণ বাইরের জল আসে আসুক, কিন্তু ভেড়ির খোলের একটি কুচো-চিংড়ি বেরিয়ে যেতে না পারে।

বেলদারের অতএব হেলাফেলার কাজ নয়। কঠিন দায়িত্ব। এর উপরে ফাইফরমাশ আছে হরবখত। আলায় রান্নার জন্য কাঠ কেটে আন বন থেকে। কাঠ চেলা করে দাও। কলসি ভরে মিঠা জল নিয়ে এস—নৌকোর সুবিধা হল না তো কাঁধে বয়ে আন। পথ কতই বা—তিন-চার ক্রোশ বই তো নয়। বেলদারের কাজের কোন লেখাজোখা নেই। যেমন এই বিয়ের পাত্র নগেনশশীকে খবর দিয়ে আনতে হল ফুলতলা অবধি ছুটে গিয়ে।

তাই নিয়ে বুদ্ধীশ্বর জাঁক করছিল বলাইয়ের সঙ্গে ঃ যার যেখানে আটকাবে, অমনি বুদ্ধীশ্বর। চারখানা হাত আমার, আর চারটে চোখ। এই কোদাল ধরে ভেড়ির মাটি কাটছি, এই আবার শিল-নোড়া নিয়ে রান্নাঘরে ঝাল বাটতে সে গেলাম। কালী পূজোর পাঁঠা কিনে এনেছি বড়দলের হাটে গিয়ে, আবার এই দেখ ফুলতলা গিয়ে বরও এনে হাজির করে দিলাম। তোমাদের কী-ই বা কাজ ছিল—কুমিরমারি মাছের ডিঙি পৌঁছে দিয়ে ছুটি। ডিঙি নিয়ে যেতে তা-ও তিনজনে মিলে।

বুদ্ধীশ্বর নামখানা খুব জাঁকালো, কিন্তু মানুষটা হাবাগবা। ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে তার কাছ থেকে লোকে মজার কথা শোনে।

বাদাবনে বিয়ে—কী কাণ্ড হচ্ছে বল দিকি বুদ্ধীশ্বর! মানষেলা থেকে তফাতটা তবে কি রইল। দুটো-পাঁচটা মেয়েমানুষ যা এদিকে আসে,—হয় তারা বিয়েথাওয়া চুকিয়ে এসেছে, না হয় তো আর

ঐ পথে যাবে না।

বুদ্ধীশ্বর বলে, কিন্তু হচ্ছে তাই এবারে। না হয়ে আর রক্ষে নেই। কনে মজুত, চক্কোত্তি পুরুতমশায় মজুত। বরকে আমি হাজির করে দিলাম। ফুলতলা থেকে ঐ সঙ্গে বিয়ের বাজারও সেরে এসেছি। বড্ড ঘড়েল বর—হিসেবপত্তর করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কেনাকাটা করল, একটা পয়সা এদিকওদিক না হয়। টোপর পছন্দ করে মাথায় বসিয়ে মাপ দেখে নিল। সমস্ত হয়ে গেছে, বাকি এখন শুধু মন্তোর পড়ে কনের পিঁড়ি সাতটা পাক ঘুরিয়ে নেওয়া।

জগন্নাথ শুনছিল বলাই আর বুদ্ধীশ্বরের কথাবার্তা। এবারে কাছে চলে এসে বলে, কনে যা দজ্জাল, পিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়বে না তো সাতপাকের সময়? খোঁড়া-বর ছুটে গিয়ে কনে চেপে ধরবে, সে ক্ষমতাও নেই।

বুদ্ধীশ্বর বলে, বর না পারুক—অত বড় চৌধুরি-আলার সবশুদ্ধ নেমন্তন্ন—বাছা বাছা মরদজোয়ানরা থাকবে। তারা গিয়ে ধরে ফেলবে।

বলাই বলে, নেমন্তন্ন আমাদের হবে না?

হাত ঘুরিয়ে বুদ্ধীশ্বর বলে, সব সব। বরমশায় বলে দিয়েছে, সাঁইতলা আর চৌধুরিগঞ্জ মিলে কতই বা মানুষ! কেউ বাদ থাকবে না।

জগা হেসে বলে, ঢালাও হুকুম। বাপরে বাপ, বেসামাল হয়ে পড়েছে স্ফূর্তির চোটে। মজা টের পাবে। ঐ মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করা আর জাত-গোখরো নিয়ে ঘর করা এক কথা। যেমন শয়তান নগনাটা, তেমনি তার উচিত শাস্তি। অন্য কিছুতে এত শাস্তি হত না। দেখিস বলাই, বিয়ের যেন কোনরকম বাগড়া না পড়ে। নির্বিঘ্নে যেন হয়ে যায়।

হেসে হেসে চলে গেল জগন্নাথ। দিনটা কাটল। সন্ধ্যার দিকে শশী ঘোষকে ডেকে নিয়ে খালের ধারে গেল, জঙ্গলের পাশে। বলাইও আছে।

শশীকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি তো ডাকাত ?

শশী ঘাড় নেড়ে না-না-করে ঃ না জগা, হিংসুটে লোকে বদ্‌নাম রটায়। দেখতে পাবে, থাকব তো বরাবর একসঙ্গে। গরু-চুরির মামলায় মিথ্যেমিথ্যে জড়িয়ে একবার ফাটকে পুরেছিল।

জগন্নাথ গম্ভীর হয়ে বলে, একজন খুনে-ডাকাত দরকার আমার। বনে গুচ্ছের ভালমানুষ নিয়ে গিয়ে কী হবে! তবে তো তোমায় দিয়ে হয় না। দেখি আর কাকে পাওয়া যায়।

শশী তাড়াতাড়ি বলে, ফাটকে একবার ঘানি ঘুরিয়ে এলে আর তো ভালমানুষ থাকবার জো নেই। খুন যদি হয়েও থাকে, ইচ্ছে করে করি নি। কাজে-কারবারে আপনি খুন হয়ে গেছে।

তেমনি কাজ আবার একটা করতে হবে। আজকেই।

জিভ কাটে শশী ঃ পাপের ফল কক্ষনো ভাল হয় না জগন্নাথ। খারাপ পথে যেও না। কাঁচা বয়সে আজ হয়তো মনে ধরবে না, কিন্তু আমায় দিয়ে দেখ। আমার পরিণামটা দেখ। টাকাকড়ি যা-হোক কিছু করেছিলাম, আজকে একেবারে ঢনঢন। পরের ভাতে থাকি। ছেলে নেই, বউ নেই, নির্বংশ মানুষ। রোগপীড়েয় পড়ে থাকলে এক ঝিনুক জল এগিয়ে দেবার মানুষ নেই। নিড়ানি নিয়ে ক্ষেতে বসে বেলান্ত ঘাস বাছলে তবে তারা একমুঠো ভাত দিত।

জগা বলে, খুন করতে হবে না। মালপত্তর লুঠেরও দরকার নেই। একটা মানুষ চুরি করতে হবে শুধু। অল্পবিস্তর মারধোর দিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

বলাই অবাক হয়ে যায়। মতলব সমস্ত একলা জগার, বলাই কিছু জানে না। তাকে বলে নি। প্রশ্ন করে, কোন্ মানুষ রে জগা— কোথায় থাকে ?

নগনা খোঁড়া।

বলাই আন্দাজ করেছিল তাই। শশী বলে, খোঁড়ামানুষের উপর আক্রোশ কেন গো ?

জগা বলে, ও খোঁড়া একগুণ বাড়া। পুরো দুই ঠ্যাংওয়ালাদের

কান কেটে দেয়। বড়দাকে উৎখাত করে নিজে মালিক হবে। সর্বনাশ ঠেকাবার জন্য বোনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বড়দা ভাব জমাচ্ছে। কিন্তু ভবী ভোলে না—পাশাপাশি দুই ঘেরির মাতব্বর হয়ে আরও জাঁকিয়ে বসবে। সর্বনাশ যা হবার হবেই, মাঝে থেকে মারা পড়বে ঐ মেয়েটা।

বলাইয়েরও রাগ খুব নগেনশশীর উপর। বলে, জঙ্গলে বওয়াবয়ির কী দরকার জগা ? ও-লোকের উপর মায়া কিসের ? পারে তো শশী-দা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে বস্তায় পুরে মাঝগাঙে ছেড়ে দিয়ে আসুক। জ্বালাতন করতে আর যাতে না ফিরে আসে।

শশী ঘোষের স্ফূর্তি লাগছে। অনেক দিন পরে মজাদার কাজ একখানা এসে পড়ল বটে। হাত নিশপিশ করে। একগাল হেসে বলে, একই তো দাঁড়াল বলাই-ভাই। জঙ্গলে ছেড়ে এলেও ফেরার ভয় নেই। বাঘে ধরবে। এক দিক দিয়ে বরঞ্চ ভালই—আমাদের উপর নরহত্যার পাপ অর্সাবে না। বাঘে খেলে আমরা কি করতে পারি ?

বলাই ঘাড় নেড়ে বলে, ওকথা মনেও ঠাঁই দিও না শশী-দা। খোঁড়া-নগনার মাথা-ভরা শয়তানির বিষ। হাড়-মাস বিষে তিতো। বাঘ যদি আসে, এক কামড় দিয়ে থু-থু করে ফেলে দিয়ে যাবে। গিলতে পারবে না।

জগা বলে, শোন শশী-দা, বড়দার উপরে বড্ড অত্যাচার হচ্ছে। বাদাবন এটা। সমাজ নেই যে পঞ্চায়েতে পাঁচ মাতব্বর মিলে একটা ফয়সালা করে দেবে। সরকারী উপরওয়ালার কথা যদি বল, তিন জো মেরে উঠে তবে থানা। থানার গাছতলায় তোমায় বসিয়ে রেখে দিল। দারোগাবাবুকে একটা খবর পৌঁছে দেবে, তার জন্যেও শালার সিপাহিগুলো হাত পেতে আছে। পুরো বাক্স সিগারেট—বিড়ির বাণ্ডিলে হবে না। তবে বোঝ, যা-কিছু করতে হবে নিজেদেরই। বয়সকালে নিজের মুনাফার জন্যে বিস্তর করেছ—বুড়ো বয়সে পরের জন্য কিছু কর, পুণ্যি হবে। আমরা সাথেসঙ্গে আছি। পাকা মাথার বুদ্ধি বাতলে দাও, হাতে-নাতে না হয় আমরাই করি।

শশী ঘোষ কিছু চিন্তিত হল।

বিয়েটা কবে?

বুধবার।

যা করবার, আজকেই তবে করে ফেলতে হবে। একটা রাত্তির হাতে রাখতে হয়। যদি ধর কোন গতিকে পয়লা মুখে বাগড়া পড়ে গেল।

চুপচাপ আরও একটুখানি ভেবে নেয় শশী। বলে, মক্কেল শোয় কোথা? ভাল করে দেখা আছে জায়গাখানা?

বাঁধের উপরে উঠে এল তিনজনে। নতুন-আলার কাছাকাছি এল। শশী বলে, আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না। এমনি বল, আমি আন্দাজ করে নেব।

বলাই বলে, পূবের পাশে খোলা জায়গা—ঐখানটা আমরা আড্ডা জমাতাম। বড়দা আর নগনা ওখানে শোয়। ক'দিন আবার চক্কোত্তি জুটেছে ওদের সঙ্গে। মেয়েলোক দুটো কামরার ভিতর থাকে।

শশী প্রণিধান করে বলে, সেটা ভাল। দুয়োরে শিকল তুলে দিলে বেরোতে পারবে না। মেয়েমানষে বড্ড চেঁচায়।

আবার বলে, তিন জনের বেশী তো নয় বাইরে—ঠিক জান? বাইরের কেউ এসে থাকে না—এই ব্যাপারী-মহাজন মাঝিমাল্লারা সব?

বলাই নিশ্বাস ফেলে বলে, থাকতাম তো কতজনে আমরা। কিন্তু খোঁড়া-নগনা মানবের ঘেঁষ সইতে পারে না। একে একে তাড়িয়েছে। মজা বুঝুক এই বারে। গুণতিতেই ঐ তিন জন বটে। ওর মধ্যে টোর্নি চক্কোত্তিটা মানুষ নয়, শামুক একটা। সেদিনের নগর-কীর্তনে টের পাওয়া গেছে। হাঁক শুনলেই আগপাস্তলা কাঁথা চাপা দিয়ে মড়ার মতন পড়বে।

জগা বলে, বড়দাও তাই। পয়সা হয়ে ভয় ঢুকেছে মনে। প্রাণের বড্ড মায়া।

শশী ঘোষ বলে, তোমাদের নগেনশশীও অমনিধারা হবে। এদিক-ওদিক চরে বেরিয়েছি তো এককালে—অনেক রকম মানুষ দেখা আছে। যে মানুষ যত শয়তান, সে তত ভীতু। জঙ্গল অবধি যেতে হবে না, হাত-পা বেঁধে গাঙপারে ফেলে দিয়ে এলে আর কখনো পার হয়ে আসবে না। দেশ-ঘরের পানে হাঁটবে।

অনেক রাত্রি। কী ভয়ানক অন্ধকার! জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে এদিকে সেদিকে। বেরুল তারা। আগে শশী ঘোষ, পিছনে বলাই আর জগন্নাথ। মহেশ ঠাকুর এসব কিছু জানেন না, অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। পচাকেও খুলে বলে নি। একটা কিছু হবে এই মাত্র সে বুঝেছে, জগা নিজে থেকে না বললে সাহস হয় না কিছু জিজ্ঞাসা করবার। নৌকো এপারে আঘাটায় এনে চুপচাপ আছে বসে সে প্রতীক্ষায়।

পাকালোক শশী। দেহ একটু কুঁজো হয়ে পড়েছে, কিন্তু রাত্রি-বেলা কাজের মুখে এখন সে দেবদারুর মতন খাড়া। চোখের মণি দুটো জ্বলছে। বিড়ালের চোখ যেমন। নতুন-আলার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায়। ফিসফিসিয়ে বলে, দেখে এস। আজকেও তিন জন, না বাইরের আরও কেউ এসে জুটেছে। নগেন কোন্ পাশে, সেটাও দেখে এস ঠাহর করে।

জগা বলে, বলাই চলে যাক। এসব ব্যাপার পাঁচ কান না হয়। জানলাম আমরা এই তিনজন। আর পচা জানবে একটু পরে। যা বলাই, আমরা এইখানে রইলাম। রাধেটাকে ডেকে নিলে হত না ঘোষ মশায়? হবে তো তিন জনে?

শশী ঘোষ অবহেলার ভাবে বলে, তিনই তো অনেক। কাজ দেখ নি আমার হাতের। পচার মতন তোমাদেরও নৌকোয় বসিয়ে দিয়ে একলা চলে যেতাম। কিন্তু আনকোরা নতুন জায়গা, ঘাঁত-ঘোঁত বুঝে নেবার একটা দিনও তো ফুরসত দিলে না। তার উপর বয়সও খানিকটা হয়ে গেছে। ডান-হাতে বাঁ-হাতে সেজন্য তোমাদের

ছুটিকে নিয়ে যাচ্ছি।

বলাই সাঁ করে চলে গেছে আলা-ঘরের কানাচের দিকে। ছায়ার মতন একটা মানুষ বাঁধ ধরে এদিকে আসে। মাছ-মারাদের ফেরবার অনেক দেরি। ঘেরির কাছাকাছি এই তল্লাটে জাল ফেলতেও কেউ আসবে না। কে তবে মানুষটা? শশী আগে দেখেছে; দেখতে পেয়ে জগার হাত ধরে টানে। একটুখানি সরে গিয়ে দুজনে গেঁয়ো-বনের আড়ালে দাঁড়াল। হাঁটনা দেখেই জগা আন্দাজ করেছে। অন্য কেউ নয়, বুদ্ধীশ্বর। কাছাকাছি হল মানুষটা—বুদ্ধীশ্বরই বটে! বেরিয়ে এসে জগা বলে, বিয়ের কাজে তোর বড্ড খাটনি। সারা হল যোগাড়যন্তর?

বুদ্ধীশ্বর বলে, পনেরআনা তো ফুলতলা থেকেই যোগাড় হয়ে এসেছে। চক্কোত্তি মশায় দেখেশুনে যা দুটো-একটা এখন বলছেন, চৌধুরিগঞ্জের ওরা কুমিরমারি থেকে কেনাকাটা করে এনে দেবে।

ফিক করে হেসে বলে, বরের বাড়ি তো চৌধুরিগঞ্জ হয়ে গেল। সাঁইতলা কনের বাড়ি। চৌধুরি-আলা থেকে সেজেগুজে ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে বরযাত্রী-পুরুত সঙ্গে নিয়ে বিয়ে করতে আসবে। বরপাত্তর সেইখানে গিয়ে উঠেছে।

জগন্নাথ স্তম্ভিত হয়ে বলে, নগনা এখানে নেই?

এই তো চৌধুরি আলায় রেখে এলাম। মেজবাবু আর চক্কোত্তি মশায় দু-জনকেই। কম হাঙ্গামা! আমাদের শালতি নেই, হেঁটে যায় কেমন করে—চৌধুরিগঞ্জ গিয়ে সেখানকার শালতি নিয়ে আসতে হল। ফিরে আসছি, অনিরুদ্ধ আটকে ফেলল। কুটুম্ববাড়ির লোক হলাম কিনা—না খাইয়ে ছাড়ল না।

জ্বালা-ভরা সুরে জগা বলে, এইটুকু হাঁটতে পারে না, শালতি নিয়ে আসতে হয়—পা তো একখানা খোঁড়া ছিল, আর একখানা কেউ খোঁড়া করেছে নাকি?

একগাল হেসে বুদ্ধীশ্বর বলে, বিয়ের বর হয়েছে যে! তোমরাও হবে একদিন জগা। বরপাত্তর পায়ে হাঁটলে লোকে কি বলবে!

চক্কোত্তি মশায়ও সেই ব্যবস্থা দিল : হেঁটে যাওয়া চলবে না। হোঁচট খেয়ে পড়লে চিত্তির। রক্তপাত হলে বিয়েয় ভণ্ডুল পড়ে যাবে। এই দুটো দিন সামাল সামাল—মন্তোর কটা পড়া হয়ে গেলে তার পরে আর ভাবনা নেই।

আলায় ঢুকে গেল বুদ্ধীশ্বর। বর ও পুরুতের নির্বিঘ্নে পৌঁছানোর খবর দেবে। এবং গগন একলা আছে বলে বুদ্ধীশ্বরও থাকবে হয়তো আলায়। কিন্তু বলাই যে ফেরে না—কোনখানে ডুব দিয়ে আছে বুদ্ধীশ্বরকে দেখতে পেয়ে।

শশী বলে, বলাই এসে নতুন কি বলবে? সবই তো জানা হয়ে গেল।

ফিরে চলল দু-জনে। জগন্নাথ গুম হয়ে আছে। তারপর বলে ওঠে, আচ্ছা, ঠিক আছে—

কি বলছ?

মেয়েটাই চুরি হবে। ঐ চারুবালা। কনে না পেলে বিয়ে করবে কাকে?

এক মুহূর্ত থেমে বলে, মেয়েটা আরও বিচ্ছু। নগনা-খোঁড়াকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। এখন ভাবছে, দু-দুটো ঘেরি নগনার হাতে এসে গেলে মুলুকের মালিক হয়ে মাতব্বরি করে বেড়াবে। সেই লোভে চুপ করে গেছে। নইলে রণচণ্ডী একবার হুঙ্কার ছাড়লে বড়দার সাহস হত কাজে এগোবার?

শশী ঘোষের দোমনা ভাব : গণ্ডগোলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে জগন্নাথ। বেটাছেলে চুরি আর মেয়েছেলে চুরি একরকম কথা নয়। সোমত্ত মেয়ে ঐ ভাবে জঙ্গলে ছেড়ে আসা যাবে না।

জঙ্গলে না হয়, মানষেলায় নিয়ে ছাড়ব। ফুলতলায়, না হয় একেবারে কলকাতা শহর অবধি গিয়ে।

শশী বলে, মানষেলা বেশী ভয়ের জায়গা জঙ্গলের চেয়ে। জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের থাবা তবু হয়তো এড়ানো যায়, কিন্তু একলা সোমত্ত মেয়ে দেখে মানষেলার মানুষ হামলা দিয়ে পড়বে।

জগা বিরক্ত কণ্ঠে বলে, জান না ঘোষ মশায়, সেই জন্যে অমন কথা বললে। এ মেয়ে আলাদা—মেয়েই তো হামলা দিয়ে বেড়ায় যত পুরুষের উপর। ফুলতলায় নিয়ে গিয়ে কিছু পয়সাকড়ি হাতে গুঁজে দেব, রেলগাড়ি চড়ে তারপরে যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক।

শশী ভেবে নেয় একটু ঃ সিঁদকাঠি চাই তবে একটা। কামরায় খিল দিয়ে শুয়ে আছে। ভিতরে ঢুকতে হবে। ঢুকে পড়ে দুয়োর খুলে দেব। দেয়াল খুঁড়ে পথ করে দাও, তার পরে তোমাদের আর-কিছু দেখতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু, খোঁড়াখুঁড়ির কাজ পেরে উঠবে না তোমরা। পোক্ত হাত ছাড়া হয় না, আওয়াজ করে ফেলবে। সিঁদকাঠি যোগাড় করে দাও, আমি সব করছি। আমার নিজেরই একটা ভাল জিনিস ছিল, পয়লা নম্বরের পোলাদে গড়ানো। দারোগার ভয়ে পুকুরে ফেলে দিলাম। সে কী আজকের কথা! দারোগার অত্যাচারেই দেশভুঁই ছেড়ে জঙ্গলে এসে পড়েছি।

বলাই এসে পিছন ধরল। আলার উল্টো দিকে পগার পার হয়ে জল ভেঙে এসে বাঁধে উঠেছে। জগা বলে, সিঁদকাঠির কী করা যায় বলাই? ওদের কামরার দেয়াল ফুটো করবে।

বলাই বলে, সিঁদকাঠি না-ই হল, খন্তা দিয়ে হবে। মাটির দেয়াল। হবে না ঘোষ মশায়?

কাঁচা-বাদায় বন কাটতে চলেছে। ঘরও বাঁধবে সেখানে। খন্তা আছে, হেঁসো-দা আছে, কুড়াল আছে। তা ছাড়া শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য আছে লেজা কোচ ছোরা। আর ঠারেঠোরে শশী ঘোষ ভরসা দিয়েছে, দেশী-বন্দুকও মিলতে পারে একটা; বন্দুক সেরেসামলে রাখা আছে বাদাবনে কোথায়। অস্ত্রের ভরা যাচ্ছে, নৌকোর খোলে রয়েছে সব।

বলাই বলে, সিঁদই বা কেন কাটতে যাবে ঘোষমশায়? কামরার কানাচে জানলা। জানলায় কাঠের গরাদে, ধারালো কিছু দিয়ে

গরাদে কাটা যাবে। তুমি একবার নৌকোয় চল, যা দরকার নিজে বেছেগুছে নিয়ে এস।

তাই উচিত বটে। ওস্তাদ মানুষ শশী ঘোষ অনেকদিন বাদে কাজে নামছে। পুরানো সাকরেদ কেউ নেই, একলা হাতে সমস্ত করতে হবে। স্বচক্ষে দেখে নেওয়া ভাল। কিন্তু জগা যাবে না নৌকোয়। তার যাবার কি প্রয়োজন? এখন তার অন্য কাজ। ঐ যে কথা হল কিছু টাকাপয়সা দিতে হবে চারুবালার হাতে—সেই ব্যবস্থায় যাচ্ছে। সেদিন কুমিরমারি থেকে ফিরে এসে বান গাছের গোপন ভাণ্ডারে আবার সব রেখে এসেছে। বের করে আনবে এখন।

বলে, চলে যাও তোমরা। আমি একটা কাজ সেরে আসছি। দেরি হবে একটু। দেয়াল-খোঁড়া জানলা-কাটা—ঐ কাজগুলো করতে লাগ, তার মধ্যে এসে পড়ব। আর আমায় বাদ দিয়ে যদি না করতে চাও, নৌকোয় থেকো তা হলে।

শশীর পৌরুষে লাগে। বলে, তোমার জন্য কেন বসে থাকতে যাব, তোমায় কোন্ কর্মে লাগবে? করব তো আমিই। শুধু বলাই থাকলে হবে, হাতের কাছে এটা-ওটা এগিয়ে দেবে। মুখ বেঁধে মাল নৌকোয় এনে ফেলবার সময়টা তোমাদের দরকার। জোয়ান-যুবার কাজ। তার মধ্যে চলে এস।

শশী আর বলাই নৌকোয় চলল। শেষ এইবারে চারুবালার ছলকলা। বাদাবন থেকে জন্মের মতন বিদায়। ফুলতলার ঘাটে সেই প্রথম দেখা। কোন্ লগ্নের দেখা গো—সাপে-নেউলে লেগে গেল একেবারে। সর্বনাশী মেয়ে শেষ পর্যন্ত জগাকে দেশান্তরী করে ছাড়ল। বন কেটে মাটি তুলে ঘেরি বানানো—এমন সাধের জায়গা ছেড়ে বয়ারখোলায় যাত্রার দলে চলে যেতে হল তাকে। শোধ এত দিনে। জগারা না-ই বা থাকল—কিন্তু তাদের নতুন-ঘেরিতে চারু-বালাও নগেনশশীর সঙ্গে জাঁকিয়ে সংসারধর্ম করবে না, এই ভাবনায় বড্ড আরাম পাচ্ছে।

হন-হন করে জগা চলেছে। ক্ষিদে পেয়েছে বড্ড। পা টলছে ক্ষিদেয়। সাঁঝবেলায় ওরা সবাই খেয়ে নিল, জগা খায় নি। খেতে ইচ্ছে হল না কিছুতে। আসন্ন শুভকর্মের একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া অবধি ক্ষিধে-তেষ্টা উপে গিয়েছিল। এখন সেই ব্যাপারের খানিকটা বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়ায় ক্ষিধে চাড় দিয়ে উঠেছে। অনেক হাঙ্গামা তো এইবারে—নৌকো নিয়ে কি ভাবে কত পথ যেতে হবে, ঠিকঠিকানা নেই। খালি পেটে বোঠে বাওয়া যাবে না।

ভাতে জল ঢেলে পান্তা করা আছে। ঝাঁপ সরিয়ে ঘরে ঢুকে কলাইয়ের থালায় পান্তা নিল ঢেলে, আর খানিকটা গুড়। খেতে খেতে শান্ত হয়ে এখন ভাবে কাজটা ভাল হচ্ছে কিনা। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে কোন্ জায়গায়? টাকাপয়সা কি পরিমাণ দেওয়া হবে তাকে? যেমন রাগী মেয়ে, পয়সা যদি ছুঁড়ে মারে তার গায়ের উপর? ঝাঁপিয়ে পড়ে গাঙের জলে? বন্দোবস্ত সারা, কাজে লেগে গেছে দু-দুটো মানুষ। এখন জগা এমনি সমস্ত আবার ভাবছে।

মেঘে থমথম করছে আকাশ। বাতাস বন্ধ, গাছের পাতাটাও নড়ে না। মাদুরের উপর মহেশ ঠাকুর বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন। টেমি জ্বালিয়ে রেখেই ঘুম, নিভোবার কথা মনে নেই। গাঁজাটা ঠাকুর আজ বড় বেশী মাত্রায় টেনেছেন। কেরোসিন ফুরিয়ে দপদপ করে উঠে টেমি নিভে গেল। চুলোয় যাকগে—মাছ বেছে খেতে হবে না, আলোর কি দরকার? ভালই বরঞ্চ। আলো দেখে পাড়ার কেউ হয়তো ঢুকে পড়ল। রাধেশ্যাম হয়তো—ক্ষ্যাপা-মহেশের কল্কের প্রসাদ পাবার লোভে। এসেই বকর-বকর জুড়ে দেবে, মুশকিল তখন সামাল দিয়ে বেরুনো। ওরা এতক্ষণে কাজ অনেক দূর এগিয়ে ফেলেছে। পাকালোক শশী ঘোষ—বয়সে বুড়ো হলে কি হবে, জোয়ানযুবাদের হার মানিয়ে দেয়। বাইরের কাজকর্ম সেরে কামরায় ঢুকতে পারছে না হয়তো তারা, জগন্নাথের পথ তাকাচ্ছে। জগা গোগ্রাসে গিলছে, পান্তা কটা শেষ করে লহমার মধ্যে বেরিয়ে

পড়বে।

চমকে যায়। মানুষ যেন বাইরে। খুটখাট আওয়াজ। ঝাঁপ একটু ফাঁক করল। দেখবে কি, বিষম অন্ধকার। এমন অন্ধকার ডানহাত মুখে তুলে তুলে খাচ্ছে—সেই হাতখানা অবধি ভাল দেখা যায় না। কিন্তু ছায়ার মত মানুষটাকে বোঝা যাচ্ছে। বলাই চলে এল নাকি দেরি দেখে? গণ্ডগোল ঘটল কোনরকম? হয়তো বা ধরে ফেলেছে শশী ঘোষকে, খবর নিয়ে বলাই ছুটেছে।

ঝাঁপ সরিয়ে ঘরে ঢোকে মানুষটি—কী আশ্চর্য, ঝাঁপ ঠেলতে চুড়ি বাজে ঝিনমিন করে। ভাতসুদ্ধ হাত থেমে যায় জগার—নিজেদের চালাঘরে নিঃসাড় হয়ে, একেবারে চোর হয়ে রইল।

ঘরে এসে চারুবালা বলে, আলো জ্বাল নি কেন?

বিরক্তস্বরে জগা বলে, নিবে গেছে, তেল নেই।

ও—

কী মুশকিল, চেপে বসল চারুবালা সামনে। বসে প্রশ্ন করে, খাওয়া বন্ধ করলে কেন?

হয়ে গেছে খাওয়া।

তাহলে উঠে পড়।

সে যখন হয় উঠব। কিন্তু ঘুরকুট্টি আঁধারে এদ্দূর এসে একলা পুরুষমানুষের ঘরে উঠে পড়লে, কেমন মেয়েছেলে তুমি?

বোঝ তবে কেমন! চারুবালা খিলখিল করে হেসে ওঠে। এমন হাসি হাসতে পারে, সেটা জানা ছিল না। হাসি এমন মিষ্টি লাগে অন্ধকারে!

হাসির রেশ মিলিয়ে যেতে বলল, গরজে পড়ে আসতে হল। নৌকো নিয়ে এসেছ, কী শলাপরামর্শ হচ্ছে তোমাদের শুনি?

জগা ঢোক গিলে বলে, না তো। নৌকো কোথায় দেখলে?

চকচকে ঝকঝকে নৌকো, ওপারে গিলেলতার ঝোপে ঢুকিয়ে রেখেছিলে। খবর জানতে কিছু বাকি নেই।

জগন্নাথ স্তম্ভিত হয়ে যায়। গোপনতা সত্ত্বেও নৌকো লোকের নজরে পড়েছে, স্ত্রীলোক চারুবালা অবধি জানাজানি হয়ে গেছে।

চারুবালা বলে, রাতদুপুরে এইবারে নৌকো এপারে নিয়ে এল। বড়-গাঙ পাড়ি দিয়ে দূর-দেশে কোথায় চলে যাবে। আমি জানি।

থমথমে আকাশ। আসন্ন ভাঁটায় অদূরে খালের জলও থমথমে হয়ে আছে। সর্বনাশ! এই রাত্রে চুপিসাড়ে পচা নৌকো বেয়ে এপারে নিয়ে এল, সেটা পর্যন্ত জেনে বসে আছে। হাত গুণতে পারে নাকি মেয়েটা? কিম্বা ডাকিনী-হাকিনী কেউ খালপারের বাদাবন থেকে চারুবালার মূর্তি ধরে এল?

চারু বলে, আমি সমস্ত জানি। আজ রাত্রে তোমরা সাঁইতলা ছেড়ে চলে যাচ্ছ। মহেশ ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছেন। চিরকালের মত যাচ্ছ, আর আসবে না। কেন যাবে, তাই জিজ্ঞাসা করি। নিজের হাতে কুড়ুল মেরে গাছ কেটেছ, কোদাল মেরে ভেড়ি বেঁধেছ—এত গোছগাছ করে সমস্ত পরের হাতে তুলে দেবে, সেই জন্যে কি অত খেটেছিলে?

সর্বরক্ষে রে বাবা! পচাই ফাঁস করেছে, নিঃসংশয়ে এবারে বোঝা গেল। পচা ছাড়া কেউ নয়। চারুবালাকে তোয়াজ করে সে এখনো। কোন এক দূরের জায়গায় যাওয়া হবে, ভাঁটার মুখে নৌকো এনে এপারে রাখবে—এই অবধি জানে শুধু পচা, ভিতরের ব্যাপার কিছু জানে না। জানে না ভাগ্যিস।

জগাও এবারে খানিকটা জো পেয়ে যায়। ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি একলা একজন নই। যত এই মাছ-মারা দেখ, কত স্ফূর্তিতে সবাই মিলে খাটাখাটনি করল। কিন্তু থাকবার মতন রইল কোথা এ জায়গা! মানষেলা থেকে তোমরা এক দল এসে পড়লে সুখের গন্ধ পেয়ে। পিছন পিছন চৌধুরিদের ভরদ্বাজ এল, নায়েব প্রমথ হালদার এল। আদালতের পেয়াদা এল। টোনি চক্কোত্তি এসে আড্ডা গাড়ল মাথাভরা শয়তানী বুদ্ধি নিয়ে। পাকা রাস্তা হচ্ছে, গাড়ি-মোটর আসতে লাগবে দু-দিন পরে। গাড়ি চড়ে কত কত দরের বাবুরা আসবে। দুটো বছর পরে আর কেউ ছাতা ছাড়া বেরুবে না এ-জায়গায়, জুতো ছাড়া হাঁটবে না। রক্ষে

কর বাপু, আমাদের পোষাবে না। আমরা চললাম—দেখি, পিরথিমের মুড়ো আর কত দূর।

চারুবালা সহসা কাতর হয়ে বলে, আমিও থাকব না। আমায় নিয়ে যাও এখান থেকে। একটা মানুষ তুমি একটু মাথা খাড়া করে চলতে। তুমিও শেষ করে দিয়ে যাচ্ছ, তবে আর কোন্ ভরসায় থাকা ?

জগা অবাক হয়ে বলে, সে কি গো! উড়ে এসে জুড়ে বসলে—আমাদের খেদিয়ে দিয়ে তোমাদেরই তো দিনকাল। কিন্তু নগেনশশী যা মানুষ, বড়দাকেও রেহাই দেবে না। খেদাবে—দুটো দিন আগে আর পরে।

চারুবালা বলে, দাদা বুঝেছে সেটা। সেই আপদটা বিদায় হবে বলেই তো বিয়েথাওয়া। দাদার সংসারের ভারবোঝা এখন আমি। বড় লোক হয়েছে দাদা, আগের সে দিনকাল নেই।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। বলে, দাদা ভেবেছিল, এক ঢিলে দুই পাখি নিকেশ করবে। কিন্তু খোঁড়া নগনা অনেক বেশী সেয়ানা—সে গাছের খাবে তলারও কুড়োবে। বুঝেছে দাদা এখন। বুঝেসমঝে হাত কামড়াচ্ছে। পিছোবার উপায় নেই।

কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আসে। বলে, ভেবেচিন্তে তোমার কাছে চলে এসেছি। তুমি উপায় করে দাও। দাদা দেশ ছেড়ে এল। নগেনের জ্বালাতন সইতে না পেরে ছলেছুতোয় শেষটা আমরাও বাদাবনে পাড়ি দিলাম। সে পিছন ধরে এল। তারপরে দেখতেই পাচ্ছ সব। সহোদর বড়ভাই মাথার উপরে থেকেও নেই—দাদা আর বউ দু-জনেই আজ শত্তুর।

চারুবালার কথাবার্তায় জগা অবাক। মনে মনে কষ্টও হচ্ছে। কায়দায় পেয়ে তবু একটা লাগসই জবাব না দিয়ে পারে না : তুমিই তো সকলের মাথায় চড়ে বেড়াও। কার ঘাড়ে কটা মাথা যে তোমার মাথার উপরে থাকতে যাবে!

ব্যঙ্গবিদ্রূপ চারুবালা কানে নেয় না। বলে, যত খুশি গালি-

গালাজ কর, আমি তা বলে ছাড়ব না। তক্কেতক্কে থাকব, নৌকো ছাড়বার সময় জোর করে উঠে পড়ব। এই যে রাতদুপুরে এসে তোমার ঘরে উঠে পড়লাম, ঝাঁপ চেপে ধরে পারলে ঠেকিয়ে রাখতে ?

জগা বলে, যাব আমরা অজঙ্গি জঙ্গলে। আমাদের নৌকোয় তুমি কোথা যাবে ?

তার আগে মানখেলার মধ্যে নিয়ে যে জায়গায় হোক আমায় একটু ছেড়ে দিয়ে এস। যেমন করে পারি আমাদের গাঁয়ে গিয়ে উঠব। এমনি ভাত না জোটে, দশ দুয়োরে ভাড়া ভেনে বাসন মেজে খাব। সে অনেক ভাল। এখানে এসে পড়ে কয়েদখানায় আটকে গেছি। তুমিই এক উদ্ধার করতে পার। তোমার সঙ্গে যাব আমি।

যেন আলাদা এক মানুষ—এত দিনের দেখা চারুবালা থেকে একেবারে ভিন্ন। ভিতরে কোন মতলব আছে কিনা কে জানে। প্যাঁচে ফেলার কৌশল ? সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে জগা সাফ জবাব দিল, বাইরের কাউকে নৌকোয় নেওয়া যায় না। মানখেলার দিকে যাচ্ছিই নে মোটে, যাব উল্টোমুখো।

তবে কি হবে ?

হেঁটে চলে যাও, সাঁতার কেটে যাও। রাতবিরেত মান না, গাঙ-খালই বা মানবে কিসের তরে ? সাপে কাটুক, কুমিরে নিক—আমি কিচ্ছু জানি নে।

তড়াক করে জগা উঠে পড়ল। বেরিয়ে যাবে। ভ্যানর-ভ্যানর করে সময় যাচ্ছে, আর অকারণে দেয়াল খুঁড়ে মরছে শশী-বলাই ওদিকে। গিয়ে তাদের সরিয়ে আনবে।

কিন্তু ঝাঁপের দুয়োর আগলে বসে চারুবালা। বলে, যাও কেমন করে দেখি। যেখানে যাও, আমি পিছন পিছন চলব।

বিষম মুশকিল, কাঁঠালের আঠার মতন লেপটে রইল। জগা কঠিন হয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে : আমি লোক খারাপ। বদনাম

শোন নি আমার ?

খুন করবে ? তাই কর তুমি। জ্যান্ত আমায় খোঁড়া-নগনার হাতে ফেলে কিছুতে এখান থেকে যেতে দেব না।

সেই অন্ধকারে চারুবালা জগন্নাথের পা এঁটে ধরেছে। পায়ের উপর মাথা খোঁড়ে। বিনুনি বাঁধে নি কেন কে জানে, গোছায় গেরো দিয়ে ঝুঁটি করে রেখেছিল। গেরো খুলে আলুল চুল ছড়িয়ে পড়েছে দুই পায়ে। পা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়বে জগা, কিন্তু বড্ড জোরে ধরেছে যে! বলিষ্ঠ পুরুষ ঢলঢলে একটা মেয়ের সঙ্গে পেরে ওঠে না। কথায় ও কলহে যেমন কোনদিন পারে নি তার সঙ্গে। ডাকাতি করে মুখ বেঁধে আনতে যাচ্ছিল, সে-ই এখন হামলা দিয়ে পড়েছে তারই ঘরে তার পায়ের উপর।

কতক্ষণ রইল এমনি। তারপর জগন্নাথ বলে, চল তোমায় আলায় রেখে আসি।

সে কণ্ঠে কী ছিল, দ্বিরুক্তি না করে চারুবালা আগে আগে উঠানে নামল। উঠানের আঁধার গাঢ় নয়, নজর চলে একরকম। ঝাপসা আঁধারে, মরি মরি, কী অপরূপ দেখায় চারুবালাকে!

জগা বলে, চল, দাঁড়িয়ে থেকো না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আজকে যাচ্ছি নে কোথাও। কাল রাত্রে—ঠিক এমনি সময়।

চারুবালা কথা বিশ্বাস করেছে। চলল নতুন-আলায়। জগন্নাথ তার পাশে। বান গাছের ভাণ্ডার থেকে টাকাপয়সা তোলার আজ কোন দরকার নেই। শশী আর বলাইকে এবার চুপিসাড়ে ফিরিয়ে আনবে। চারুবালা টের না পায়। সিঁদ কাটা শেষ করে ফেলেছে হয়তো বা এতক্ষণ। কামরায় ঢুকেই গর্ত দেখে চারুবালা চেঁচামেচি করবে। কাদের সেই কাজ, বুঝতে না পারে যেন কোনক্রমে। কোন দিন না টের পায়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চারুবালা বলে, তোমরা যেখানে যাচ্ছ, আমিও সেইখানে যাব। একা একা মানখেলায় থেকে কি হবে ?

জগন্নাথ বলে, আমিও ভাবছি তাই। মানখেলার উল্টো দিকে

যাত্রা আমাদের। নৌকো ঘুরিয়ে উজান অতদূর যেতে হাঙ্গামা অনেক। কাজে দেরি পড়ে যাবে। অন্য লোক সব যাচ্ছে, তারাও রাগারাগি করবে।

দৃঢ় কণ্ঠে চারুবালা বলে, তাই কথা রইল কিন্তু। কোথাও আমি যাচ্ছি নে, তোমার সঙ্গে যাব।

জগা প্রীত হয়ে বলে, কেশেডাঙার চরে এবারের নতুন বসত। ভাল হবে। সুন্দর করে তুমি ঘরের ডোয়া নিকাও, ফুল-নৈবিদ্যি দিয়ে লক্ষ্মীপূজো কর, গোয়াল তুলে গরুর সেবা কর।

একটুখানি হেসে বলে, কিন্তু একটা মুশকিল চারুবালা, বাঘ এসে পড়ে তোমার গরু মুখে করে নিয়ে যাবে। নিকানো ডোয়ার মাটি নোনা লেগে ঝুরঝুর করে পড়বে। তোমার পূজাআচ্চায় বামুন-পুরুত মিলবে না।

হেসে উঠে চঞ্চল সুরে চারুবালাও তেমনি জবাব দেয়, পুরুত না হলেও লক্ষ্মীপূজো হয়, বউ-মেয়েরা করে। ঘরের ডোয়া আমি রোজ লেপাপোঁছা করব। বাঘও কি আর থাকতে দেবে তোমরা? বন কেটে কোন্ মুলুকে বাঘ তাড়িয়ে তুলবে।

ঘাড় নেড়ে জগা বলে, উঁহু। বন কিছু রেখে দেব, তাতে বাঘ থাকবে। মানুষ পড়শীর চেয়ে বাঘ পড়শী ভাল। বাঘেরা পাহারা দেবে—আবার কোনদিন খোঁড়া-নগনা, গোপাল ভরদ্বাজ, প্রমথ নায়েব, আদালতের চাপরাসী আর অনুকূল চৌধুরিরা ঢুকে পড়তে না পারে।

ছেচল্লিশ

চারুবালার তর সয় না। আলার মানুষ শুয়ে পড়ল। বিনি-বউকে বার দুই ডেকে দেখে, সাড়াশব্দ নেই। অমনি সে টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ল। চোরের বেহদ্দ।

নৌকো কাল এপারে এনে কোন্ জায়গায় রেখেছিল, তা সে জানে। চর হল পচা, চারুবালার সে বড় অনুগত। জগার অনুমান মিথ্যা নয়, দূরদেশে যাবার গোপন খবর চারুবালাকে সে-ই এনে দিয়েছিল।

বড্ড তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। হরগোজা-ঝাড়ের পাশে ওপারের দিকে চোখ রেখে বসে আছে—কখন পচা নৌকো নিয়ে আসে। বড় জন্তু-জানোয়ার এদিকে না-ই এল, সাপ তো পায়ে পায়ে দেখা যায়। কিন্তু এখন কেবল পালানোর চিন্তা, অন্য কথা মনে আসছে না।

নৌকো ডাঙার কাছাকাছি এলে পুঁটুলি হাতে জলকাদা ভেঙে চারুবালা গলুইয়ে উঠে বসে। জলে পা ঝুলিয়ে দিয়ে কাদা ধুচ্ছে। একলা পচা। পচা হেসে বলল, ভাবলে বুঝি তোমায় ফেলে চলে যাব।

চারু বলে, হচ্ছিল তো তাই।

যাচ্ছ—টের পাবে মজা। এই যেখানে আছ, এ সব হাসিল-করা জায়গা। এর সঙ্গে কিছুই মেলে না। সে হল কাঁচা-বাদা—বাঘ বুনো-শূয়োর বুনো-মোষ—

মিলবে না কেন? এখানে তেমনি নগেনশশী। আমার ভাই-ভাজও বড় কম যায় না।

ছইয়ের ভিতরে ঢুকে চারুবালা চুপচাপ বসল। তার পরে আর সকলে এসে যায়। গুণীন মহেশ আগে আগে, পিছনে শশী গোয়ালা বলাই আর জগা।

চারুবালাকে দেখে শশী ঘোষ বড্ড খুশী: দিব্যি হয়েছে। দেখ, আমি ভুল করেছিলাম। মেয়েমানুষ হল রক্ষাচণ্ডী। জঙ্গলের যত পীর-ঠাকুর বেশির ভাগ হলেন মেয়ে। যদি সেবারে বউকে সঙ্গে নিতাম, ছেলে কটা অমন বেঘোরে যেত না। কাঠুরে-মউল বাদায় যায়—যায় তারা, কটা দিন পরে ভরা নিয়ে চলে আসে। তাদের কথা আলাদা। বসতঘর বাঁধার যখন মতলব, মেয়েমানুষ বাদ দিয়ে

হবে না।

তা যেন হল, রাধেশ্যামটা বড্ড দেরি করছে। কি হল তার? বউ মাগী ধরে ফেলেছে না কি বেরোনোর মুখে? যা দজ্জাল বউ! ভাঁটা হয় নি অবশ্য এখনো, জোয়ার চলছে। কিন্তু চারুবালা আগেভাগে এসে পড়েই মুশকিল করল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে বিনি-বউ দেখবে, চারু বিছানায় নেই। খোঁজ-খোঁজ পড়ে যাবে। গগন তো অনেক খবরই রাখে—বোনের খোঁজে তক্কেতক্কে এই অবধি এসে পড়বে হয়তো। হামলা দেবে নৌকোয়। আর কিছু না হোক, চেঁচামেচি হৈ-হল্লার ব্যাপার তো বটে! রাধেশ্যাম এসে পড়লেই নৌকো ছেড়ে দেবে, ভাঁটা অবধি দেরি করবে না। গুণ টেনে উজান বেয়ে যাবে খালের পথটুকু। করালীতে পড়ে জোয়ার মেরে উঠবে। তার পরে দোয়ানিতে ঢুকে ভিন্ন মুখ দিয়ে বেরোবে। ধানের পালার নীচে ইঁদুরের গর্তের যেমন নানান মুখ—এক মুখে খোঁড়াখুঁড়ি লাগালে অন্য মুখে ইঁদুর ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পালায়। বাদাবনের গাঙে-খালেও অবিকল সেই গতিক।

আসে কই রাধেশ্যাম? বলাই খানিকটা এগিয়ে দেখে আসবি নাকি?

বলতে বলতে হরগোজা-ঝাড় বেড় দিয়ে উদয় হল রাধেশ্যামের ছায়ামূর্তি। পচা তাকিয়ে দেখে বলে, জাল আনিস নি কেন? তোর ভরসায় আলাদা আর জালের ব্যবস্থা হয় নি।

রাধেশ্যাম বলে, আছে জাল। আরও সব আছে।

রাধেশ্যামের পিছন ধরে আসে বাচ্চা ছেলেটা। আরও কতক দূর পিছনে ফুটফাট করে কাদায় আওয়াজ তুলে আসে—অবাক কাণ্ড, অন্নদাসী। অন্নদাসীই তো! জালও আছে। রাধেশ্যাম পোঁটলপুঁটলি ঘাড়ে নিয়েছে, অন্নদাসী জাল বয়ে আনছে।

জগা অবাক হয়ে বলে, আস্ত সংসার সঙ্গে নিয়ে এলি যে!

রাধেশ্যাম আমতা-আমতা করে বলে, ছেলেটা বড্ড স্যাওটা!

ছেড়ে যাওয়া যায় না, মন হু-হু করে। আবার মা না হলে বাচ্চারই বা সামাল দেয় কে? ক্ষারে কেচে কাপড় ফর্সা করে বসে আছে, ছেড়ে এলে বউ রক্ষে রাখত!

জগা বলে, গিয়ে তো কোন্দল বাধাবি সেই জায়গায়?

না নিলে এখনই যে লেগে যায়। পাড়া তোলপাড় হবে— জানতে কারো কিছু বাকি থাকবে না।

ঘাড় নেড়ে শশী ঘোষ খুব তারিফ করেঃ ভালই তো, ভালই তো। কথা-কথান্তর কি ঝগড়াঝাঁটি না হল তবে আর বসত কিসের? সে হল বনবাস। ভাল করেছে রাধে, বউ নিয়ে বুদ্ধির কাজ করেছে।

জোয়ারে নৌকা ছাড়ল। যাবে কিন্তু দক্ষিণে—বিস্তর দক্ষিণে। ভাঁটির শেষ যেখানে। কালাপানির মুখে। হালে বসেছে জগন্নাথ, উজান কেটে এগুচ্ছে। রাত্রিবেলা কাদাজলে জঙ্গলের মধ্যে গুণ টেনে কাজ নেই। দাঁড় রয়েছে চারখানা—বলাই পচা আর রাধেশ্যাম তিন জোয়ান লেগে গেছে। বুড়ো শশী স্ফূর্তির চোটে বসে গেছে বাকি দাঁড়খানায়। সে-ও টানছে। কয়েক টানে কাতর হয়ে বসে বসে হাঁপায়।

রাধেশ্যাম হেসে বলে, তোমার এ কাজ নয়। কলকেটা নিয়ে এক ছিলিম জুত করে সাজ দিকি। সারা পথ তুমি তামাক খাইয়ে যাবে মুরুব্বী মশায়।

করালীতে পড়ে এইবার। হাত শক্ত করেছে জগা। হালের মুঠোয় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ ওঠে, দড়ি কড়কড় করে। ফালুকফুলুক কেন করে সে ছইয়ের দিকে—ছইয়ের তলে কি? দাঁড় তুলে ধরে সকৌতুকে বলাই একনজর জগার দিকে তাকায়, কথাটা জিজ্ঞাসা করলে হয়। কিন্তু মুখ খোলবার উপায় নেই। মরদমানুষের এলো-মুখের কথাবার্তা এ জায়গায় চলবে না। মেয়েলোক রয়েছে। শুধু অন্নদাসী থাকলেও হত—চারুবালা রয়েছে। মানষেলার ভাল ঘরের মেয়ে—আজেবাজে কথা শুনে কি ভাববে? হয়তো বা করকর করে

উঠবে এই মাঝগাঙের উপরে।

দোয়ানির মধ্যে ঢুকে পড়ে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত। আর কেউ নিশানা পাবে না। যে খালের দুটো মুখই বড়-গাঙে পড়েছে, তার নাম দোয়ানি—দুই মুখে একই সময় জোয়ার ওঠে, একই সঙ্গে ভাঁটা নামে। দোয়ানি বনের মধ্যে শাখাপ্রশাখা ছেড়ে যায়। কেউ তাড়া করলে কোন একটা শাখার ভিতর ঢুকে পড়, নৌকো ঠেলে দাও ঝোপঝাড়ের মধ্যে। দিয়ে নিঃসাড় হয়ে বসে থাক যতক্ষণ না বিপদ কেটে যাচ্ছে।

দোয়ানির অন্ধিসন্ধি ঘুরে এইবারে আবার বড়-গাঙ পড়বে। সকাল হল। খাল বড় হচ্ছে ক্রমশ। আর সুবিধা, জোয়ার শেষ হয়ে ভাঁটার টান ধরেছে; উজান বেয়ে মরতে হবে না আর। আবাদ এখন দু-ধারে। মানুষজন। খালে বেড়-জাল পেতেছে। জালের মানুষ নৌকোয় বসে গল্পগুজব করছে, তামাক খাচ্ছে। ডাঙায় দাঁড়িয়ে খেপলা-জাল ফেলছে কেউ কেউ। জলের সন্তান—কালোকোলো চেহারা, বাবরি চুল। রুপোর পদক কারো গলায়, হাতে তামার কড়। সাদা মাটির বাঁধ চলে গেছে এদিক-ওদিক অজগর-সাপের মতন। মরদমানুষ মেয়েমানুষ যাচ্ছে সব বাঁধের উপর দিয়ে। মেটে-দেয়ালের ঘর একটা—দেয়ালে নুন ফুটে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে পড়ছে। ভাঙা গাছের গোড়া—জলের তফরা খেয়ে খেয়ে কয়লার মতন কাল হয়ে গেছে। সাদা বক একটা এখানে, একটা উই ওখানে—ভাঁটা সরে-যাওয়া চরের উপর কুচো মাছ ধরে ধরে খাচ্ছে।

চলেছে নৌকো। পিঠেন বাতাস পেয়ে বাদাম তুলে দিল। সাঁ-সাঁ করে ছুটে চলেছে—জল ছোঁয় কি না-ছোঁয়। দাঁড় তুলে ফেলল। এই বেগের মধ্যে দাঁড় জলে পড়তে পায় না। পার হবার জন্য ঘাটে বসে জন কয়েক। খেয়ানৌকো ডাকছে চিৎকার করে। ওপারে একজন আনমনে দড়ি পাকাচ্ছে, বাবলাগাছে দড়ির অন্য প্রান্ত বাঁধা। খেয়ার মাঝি বোধহয় ঐ লোকটাই। ডাকছে ডাকুক

না—ভাবখানা এই। আরও মানুষ জমুক, এক খেয়ায় সকলকে তুলে আনবে।

চরের কাদা অনেকটা ভেঙে এসে তবে জল। ব্যস্তবাগীশ ক-জনে সেই কাদার মধ্যে জলের ধারে এসে চেঁচাচ্ছে। ভাল কথায় হচ্ছিল এতক্ষণ, এইবারের স্বর বাঁকা। দড়ি পাকানো বন্ধ করে হাতে-বোঠে মাঝি তড়াক করে নৌকোয় উঠে কাছি খুলে দিল। অজস্র আলকাতরার টিন ভাসছে জলে, জালের মাথা ওর সঙ্গে বেঁধে ভাসিয়ে রেখেছে। বানগাছের সারি এইবারে জলের কিনারা ধরে। চলেছে, নৌকো চলেছে। উঁচু বাঁধের ওদিকে বসতি—খোড়ো চালের মাথা অল্পসল্প দেখা যায়। টিনের ঘরও আছে যেন—টিনে আর খড়ে একত্র ছাওয়া। গরমে গা জ্বালা করে, সেই জন্যে কোন্ শৌখিন জোতদার টিনের উপরে খড় বিছিয়ে নিয়েছে।

নৌকো বড়-গাঙে পড়ল। বেলা হয়েছে বেশ খানিক। গেরে-মাঠ ; মাঠ ভরতি গেরে-গুল্ম। মাঠের রং সবুজ নয়, সাদা নয়—গোলাপী। গাঙ ক্রমেই বড় হচ্ছে। এপার ঘেঁষে চলেছে, ওপার ধোঁয়া-ধোঁয়া। ঠাহর করে দেখলে অস্পষ্ট সবুজ টানা-রেখা নজরে পড়বে। ওপারে বন। মানষেলার একেবারে শেষ—কাঁচা-বাদার শুরু এখান থেকে।

অন্নদাসীর বাচ্চা ছেলে আর চারুবালা ছইয়ের ধারে উবু হয়ে বসে জল দেখছে। কুমির গা ভাসান দিয়েছে ঐ দেখ পুরানো গাছের গুঁড়ির মতন। বকবক করছে দু-জনে মৃদুকণ্ঠে। বাচ্চার সঙ্গে চারুবালার ভাব জমেছে। উনুন ধরাচ্ছে ওদিকে অন্নদাসী। পোড়া মাটির তিন ঝিকের উনুন। নৌকো দুলে দুলে যাচ্ছে দাঁড়ের টানে। হাওয়ার জন্য উনুন ধরে না—চোঙার মুখে ফুঁ দিতে দিতে দপ করে একবার যদি বা জ্বলে উঠল, নিভে গিয়ে আবার ধোঁয়ায়। গোটা দুই বস্তা ঝুলিয়ে দিল তখন ওদিককার হাওয়া ঠেকাবার জন্য। এমনি করে কোন গতিকে চালে-ডালে দুটো ফুটিয়ে নিতে পারলে যে হয়। বেশী গরজ বাচ্চাটার জন্য। এখন বেশ কুমির দেখছে, চেঁচানি জুড়বে

হয়তো একটু পরে। ছেলেমানুষ চারুবালাও তো—ভাত নামলে হাপুসহুপুস করে সে-ও চাট্টি খেয়ে নেবে। অন্য কেউ এখন খাচ্ছে না। টানের গাঙ, পিঠেন বাতাস। ধনুকের তীরের মত নৌকো ছুটছে। জলে ভাসছে না বাতাসে উড়ছে—ঠাহর হয় না। এই জল থমথমে হবে, বাতাস পড়ে যাবে—খাওয়ার কথা তার আগে নয়। তখন কোন পাশখালিতে নৌকো ঢুকিয়ে গাছগাছালির সঙ্গে কাছি করে নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে বসবে।

দাঁড়ের মচমচানি, ছলাৎছলাৎ করে জল ঘা দিচ্ছে নৌকোর তলিতে। এই রকম চলল একটানা বিকাল অবধি।

দুদিকে বন এবারে। আসল বাদাবন। ঘন সবুজ। গাছের মাথা সব এক সমান—যেন কাঁচি দিয়ে মাপসই করে গাছগুলো ছেঁটে দিয়েছে। বড় একঝাঁক পাখি বনের উপর কিচিমিচি করছে। চরের কেওড়াগাছে বানরের হুটোপাটি—ডাল ভেঙে ভেঙে নীচে ফেলছে। হরিণের সঙ্গে বানরের বড় ভাব—হরিণের দল ডেকে আনে এমনি-ভাবে, কেওড়াপাতা খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু আসে না কেন একটা হরিণ ? নৌকো নজরে পড়ে গেল নাকি ? অথবা কাছাকাছি বোধ হয় বাঘের আনাগোনা—গন্ধ পাচ্ছে। বাঘের গন্ধ অনেক দূর থেকে হরিণ নাকে পায়।

মানুষের এলাকা গিয়ে বাঘের এলাকা বুঝি এইবারে ? ঠিক তাই। বানরের দল এখান থেকে ওখানে—ছুটোছুটি করে পালাচ্ছে। বাঘ দেখতে পেয়েছে। বাঘের আস্তানা, সেটা গাছের বানরের রকম-সকম দেখে টের পাওয়া যায়।

মহেশ তাই বলছিল, মানুষ এবারে বড় আর চোখে দেখবে না। মানুষের বসত ছেড়ে এলাম।

তিক্তকণ্ঠে জগা বলে, সেই তো ভাল ঠাকুর। বাঘের চেয়ে বেশী সাংঘাতিক হল মানুষ। মানুষ ঐ খোঁড়া-নগনা, গোপাল ভরদ্বাজ, প্রমথ নায়েব। ঝাঁটা মারি মানুষের মুখে—যে ক-জন এই আমরা যাচ্ছি, মানুষে আর কাজ নেই এর ওপর।

বহুদর্শী শশী ঘোষ হেসে বলে, খানিকটা গোছগাছ করে নাও, কত মানুষ হামলা দিয়ে পড়বে দেখো। পাকা কাঁঠাল ভাঙলে মাছি গন্ধ পেয়ে আসে। মানুষও তেমনি ঠেকাতে পারবে না।

জোয়ার আসন্ন। শেষরাত্রে আবার ভাঁটি মিলবে, সেই অবধি নৌকো বেঁধে থাকা কোন এক জায়গায়। নৌকো বেঁধে তারপরে খাওয়া-দাওয়া। খাওয়ার পরে গা গড়িয়ে পড়া। কিন্তু যত্র তত্র নৌকো বাঁধা যাবে না রাত্রিবেলা। জায়গাটা গরম অর্থাৎ ব্যাঘ্র-সঙ্কুল কিনা জেনে-বুঝে নেবে ভাল করে। একা না বোকা— যেখানে আর পাঁচখানা নৌকো, তুমিও গিয়ে চাপান দেবে সেই শাবরে। একসঙ্গে অনেক নৌকো থাকার নাম শাবর। কিন্তু শাবর পেয়েই নিশ্চিন্ত হয়ো না—অন্য সব নৌকোর মানুষগুলো কেমন, কাজকর্ম দেখে কথাবার্তা বলে আন্দাজ করে নাও। নিরীহ মাঝি-মাল্লা হয়ে নৌকো নিয়ে ঘুরছে, আসলে তারা হয়তো ঠগ-ডাকাত। সামাল, খুব সামাল ভাই। সমস্ত কেড়েকুড়ে নিয়ে মানুষ কটাকে চরের উপর নামিয়ে নৌকোর কাছি কেটে দিয়ে সরে পড়বে। এমন অনেক হয়েছে। দক্ষিণে, একেবারে দক্ষিণে যাচ্ছে—ভাঁটির প্রায় শেষ যেখানে, দরিয়ার মুখ। সেদিকে মানুষজন কালেভদ্রে কদাচিৎ যায়, শুধু জন্তুজানোয়ার। তাদের রীতপ্রকৃতি চেনাজানা হয়ে গেছে, তাদের সহজে সামাল দেওয়া যায়। পোড়া মানুষেরই মনের তল আজ অবধি পাওয়া গেল না।

কত খাল-দোখালা ছেড়ে যাচ্ছে। জগা বারম্বার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে মহেশ ঠাকুরের দিকে। ঘাড় নেড়ে মহেশ 'উঁহু' বলে দেয়। বাদাবন তার নখদর্পণে—এসব খালে ঢোকা যাবে না, বিপদ আছে। ধৈর্য ধরে বেয়ে চলে যাও, ঠিক জায়গায় এসে সে বাতলে দেবে। সেই পাশখালিতে ঢুকে তিনখানা বাঁক গিয়ে বনকরের বাবুদের ছোটখাটো আস্তানা। খালের সিকি আন্দাজ জুড়ে মাচান,

তার উপরে ঘর। ঐ মাচানের খুঁটির সঙ্গে নৌকো বাঁধা চলে। বন্দুক আছে বাবুদের। আছে সাদা বোট। নিঃশঙ্ক নিরাপদ এমন জায়গা কাছাকাছি রয়েছে—সেইখানে গিয়ে ওঠ। কাল কিন্তু এমন জায়গা পাবে না। জায়গার জন্য কাল থেকে হিসাবকিতাব ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন হবে; কড়া মন্তোর পড়ে নৌকোয় চাপান দিতে হবে। আজকে কোন হাঙ্গামা নেই।

পাশখালি ঢুকে হঠাৎ বা দেখা যায় দাঁড় পোতা রয়েছে। দাঁড়ের মুঠো মাটিতে, চওড়া মাথা উপর দিকে। মাঝে মাঝে এমনিধারা দেখা যায় জঙ্গলে। পোতা-দাঁড়ের মাথায় সাদা কাপড় বাঁধা, কাপড়ের এক প্রান্তে চাট্টি চাল বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে, অপর প্রান্ত বাতাসে উড়ছে নিশানের মতন। নৌকোর কোন দাঁড়ি বা মাঝি পড়েছিল এই জায়গায়। বাদাবনে মরাছাড়ার বলতে নেই, বলবে পড়েছে অমুক মাঝি, কিম্বা ভাল হয়েছে অমুক কাঠুরে। বাঘের নামও নয়—বলবে বড়-শিয়াল বড়-মিঞা ভোঁদড় বা অমনি একটা-কিছু। নৌকো বেয়ে মানুষ কাঁচা-বাদার গাঙে-খালে ঘোরে, আর আচমকা ঐরকম পোঁতা দাড় দেখে হায়-হায় করে মনে মনে। গাছের দোডালায় মাদুর-কাপড়-হাফপ্যাণ্টও দেখা যায়। খেয়েদেয়ে বাঘ হয়তো মুণ্ডটা কি আধখানা হাত উচ্ছিষ্ট ফেলে গেছে, তাই সব খুঁজেপেতে কবর দিয়ে গেছে গাছের গোড়ায়। কাদের ঘর খালি করে বাদায় এসেছিল গো, সে মানুষ আর ফিরল না।

বাইতে বাইতে হয়তো বা তোমার হাতের দাঁড় ভেঙে গেল মচাৎ করে। কিম্বা বেসামাল হওয়ার দরুন দাঁড় জলে পড়ে স্রোতে ভেসে গেল। বিপদের মুখে তখন কি করবে—পাড়ে নৌকো ধরে নিয়ে নাও ঐ পোঁতা দাঁড়খানা। কিন্তু একটানে উপড়ানো চাই—দাঁড় হাতে নিয়েই চক্ষের পলকে নৌকোয় উঠে পড়বে। একটানের বেশী লাগলে কিম্বা ডাঙার উপরে তিলেক দেরি হলে রক্ষে নেই। বাঘের পেটে যাবে নির্ঘাত। বনবিবি স্বয়ং যদি মূর্তি ধরে আগলে দাঁড়ান, তবু ঠেকাতে পারবেন না।

দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে। যাবে দরিয়ার মুখে—ডাঙা সেই অবধি গিয়ে শেষ। ছুটো দিন তুই রাত্রে পুরো চার ভঁাটি নৌকো বেয়েছে। তিলেক জিরোয় নি।

রাত্রিবেলা বিষম কাণ্ড হঠাৎ। দানো-ঝুটোরা বুঝি বনে হামলা দিয়ে পড়ল। এক রকমের ঘোরতর আওয়াজ—লাখখানেক জাঁতা ঘোরাচ্ছে কোন দিকে যেন। ক্ষ্যাপা-মহেশ বহুদর্শী লোক—তিনি বুঝেছেন। শশী ঘোষও জানে। দু-জনে পাল্লা দিয়ে চেঁচাচ্ছে: নৌকো লাগাও—শিগগির, শিগগির—

ভাগ্যক্রমে নৌকো তখন সরু খালে। জল অগভীর। জগা বলাই আর পচা লাফিয়ে পড়ে টেনেটুনে কাছি করল মোটা এক পশুর-গাছের সঙ্গে। নৌকোর সবাই হুটোপুটি করে নেমে পড়ল। ছুটে যায় এক-একটা গাছ নিরিখ করে। বাচ্চা নিয়ে অন্নদাসীও ছোটে। এই দানোর দল সামাল দেওয়া যায় শুধুমাত্র মাটির উপরে দাঁড়িয়ে। জলের উপরে নয়, গাছের উপরে তো নয়ই। প্রাণপণ শক্তিতে গাছ এঁটে ধরে দাঁড়াল সকলে।

চক্ষের পলকে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। মড়মড় করে ডাল ভেঙে পড়ছে। পাতা উড়ছে, ডালের উপরের পাখির বাসা উড়ছে। কলরব করে পাখির দল খাল পার হয়ে অঞ্চল ছেড়ে উড়ে পালায়। বানরের দল ছুটে পালাচ্ছে মাটিতে নেমে এসে, হরিণ পালাচ্ছে। বাঘও পালায়—

বাঘ অবশ্য নজরে এল না, নজর ফেলবার ফুরসত কোথা এখন? গাছের গুঁড়ি এঁটে ধরে আছে—কারা এসে প্রবল জোরে টান দিচ্ছে, গাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবে। টুকরো ডাল আর পাতার রাশি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে, লাগছে গায়ে চাবুকের মতন। তবু ছাড়বে না গাছের আশ্রয়। ছাড়লে তো বলের মত লোফালুফি করে হাতে পিষে পায়ে দলে মানুষ ক'টিকে ছুঁড়ে দেবে এদিক-সেদিক।

রক্ষা এই, হুটোপাটি বেশীক্ষণ থাকে না। পাঁচ-সাত মিনিটে শেষ। বন আবার পরম শান্ত। কিন্তু তার মধ্যে তছনছ করে দিয়ে

গেল চারিদিক। বড় লড়াইয়ের পর রণক্ষেত্রের যে অবস্থা, বনের অবস্থা তেমনি। দরিয়ার ঘূর্ণি এই বস্তু—ডাঙা অঞ্চলে যে ঘূর্ণিঝড় দেখেন, তার সঙ্গে কোন মিল হয় না। বাউলে-কাঠুরে, মাঝি-মাল্লারা বলে দানো-ঝুটোর কাজ। বঙ্গোপসাগরের কোনখানে ঘাঁটি হয়েছে। হঠাৎ একসময় হাজার হাজার লাখো লাখো দল বেঁধে এসে পড়ে অরণ্যরাজ্যে। বনের ঝুঁটি ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে আক্রোশ মিটিয়ে আবার ফিরে যায় সমুদ্রতলের গোপন বিবরে।

পরের দিন কেশেডাঙার চর দেখা দিল বাঁকের মাথায়। সন্ধ্যার অল্প বাকি। শশী ঘোষ যথারীতি দাঁড়ে বসে, কিন্তু একটা টানও দেয় নি আজ সমস্ত দিন। তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। এসব চেনা জায়গা তার, বড় আপন জায়গা। কতকাল এ পথে আসে নি! দু-চোখ দিয়ে যেন পান করতে করতে এসেছে এই অকূল জল আর সীমাহীন জঙ্গল। কেশেডাঙা দেখা দিতেই উত্তেজিত হয়ে সে আঙুল দেখায়ঃ ঐ, ঐযে আমার কেশেডাঙা। বন্দুক পুঁতে রেখে গিয়েছি চলে যাবার দিন। বিষখালির যদু কর্মকারের গড়া। বিশ্বম্ভর কর্মকার ঈশ্বরীপুরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বন্দুক গড়ত, যদু হল সেই বংশের মানুষ। বিলাতী বন্দুক দাঁড়াতে পারে না দেশী-লোহায় গড়া যদুর হাতের জিনিসের কাছে। যদু মরে গেছে। কিন্তু ছেলে-পুলেরা কেউ বিদ্যেটা শিখে নিল না। আর ও-জিনিস হবে না।

আবার বলে, শিখেই বা কী হত! দেশী বন্দুক মানষেলায় নিতে দেবে না, বাদাবনে চোরাগোপ্তা নিয়ে বেড়ানো। মানষেলায় এলে শতেক বায়নাক্কা, হাজার রকমের আইন। ধরতে পারলে কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে ফাটকে পুরবে। কেশেডাঙা ছেড়ে যাবার সময় মাটির নীচে পুঁততে হল আমার এমন বন্দুকটা। সে কী আর আছে এদ্দিন! নোনা মাটিতে খেয়ে লোহা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। জায়গাই খুঁজে পাব না। নতুন গাছপালা জন্মে জঙ্গল

ডেকে উঠেছে। কিম্বা জয়াল নিয়ে ভেঙেই পড়েছে হয়তো গাঙের খোলে।

ফোঁস করে শশী নিশ্বাস ফেলে। বারম্বার বন্দুকের কথা বলছে, বন্দুকের জন্যই শোক। আরও যে কত কী ফেলে গিয়েছিল— টাকাপয়সা, দৈত্যের মতন তিন-তিনটে ছেলে—এ সব কথা একটি-বার মুখে আনে না।

চর জায়গা, বড় গাছপালা নেই। সাদা কাশফুল ফুটে আছে অনেক দূরের নীল বনের ঘের অবধি। কাশবন নয়, দুধসাগর— দরিয়ার বাতাস এসে এই নির্জন সাগরে ঢেউ তুলছে এক-একবার। রাত হল, আকাশে চাঁদ নেই। তবু জ্যোৎস্না হয়ে চরভূমিতে কাশের ফুল লুটিয়ে আছে। গাছগাছালির যে বন, তার তলদেশ ফাঁকা—নজর করে বসে থাকলে জীবজন্তুর চলাচল বোঝা যায়। কাশ-বনে ভয় অনেক বেশী। জলের নীচে কুমির-কামটের মতন একেবারে নিকটে অলক্ষ্যে ওৎ পেতে থাকে। কোন দিক দিয়ে কখন যে কোন্ প্রভু লম্ফ দিয়ে ঘাড় মুচড়ে ভাঙবেন, তার কিছু ঠিকঠিকানা নেই।

ডাঙায় নৌকো ধরতে যাচ্ছে, ক্ষ্যাপা-মহেশ মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠেঃ ঘটে একফোটা বুদ্ধি নেই তোমাদের? এ তোমার কুমিরমারির হাটখোলা পেয়েছ, নৌকা বেঁধে নেমে পড়লেই হল! অষ্টবন্ধন না সেরে নাম দেখি কত বড় বাপের বেটা! টপ করে গালের মধ্যে কামড়ে ধরে ঘাসবনে ডুব দেবে। বুঝতেই পারবে না। বুঝবে যখন দুখানা ঠ্যাং এক সঙ্গে সজনের ডাঁটার মত কচরমচর চিবাতে লেগেছে।

কাঁচা-বাদার উপর প্রথম পা ছোঁয়ানো চাট্টিখানি কথা নয় রীতকর্ম বিস্তর। স্নান করতে হবে সকলের আগে। গাঙের জলে ঝুপ করে পড়ে ডুব দিয়ে নাও গোটাকতক। কুমির-কামটের ভয় থাকলে ডালির উপর বসে ঘটি ভরে মাথায় জল ঢাল। অস্নাত অশুচি অবস্থায় বাদায় পা দিলে রক্ষা নেই।

দেহবন্ধন করে নাও। গুণীন মন্তোর পড়ে ফুঁ দিয়ে দেবেন, তোমার

দেহ কেউ ছুঁতে পারবে না। জন্তুজানোয়ারে পারবে না, দানো-ঝুটোরাও নয়। বড় বড় গুণীন মাটি গরম করে দেন মন্ত্রবলে। ঐহিক মানুষ তুমি-আমি কিছু টের পাচ্ছি নে—মাটি কিন্তু আগুনের মতন তপ্ত হয়ে গেছে, বাঘে পা রাখতে পারছে না, বন ছেড়ে পালাচ্ছে। এমনি কত আছে। যথানিয়ম আটঘাট বেঁধে এগোয় না বলেই এত লোক ভাল হয় ফি বছর, লোকের এত ক্ষতি-লোকসান। নইলে তিল পরিমাণ অনিষ্ট হবার কথা নয়। বাদাবন মানষেলার চেয়ে নিরাপদ।

রাতবিরেতে অতএব ডাঙায় নামা চলবে না। জলে থাকবে নৌকো। জলের মধ্যে ধ্বজি পুঁতে কাছি করে রাখ। সকালবেলা ডাঙার উপরে পীর-দেবতাদের বিস্তর পূজোআচ্চা। উপকরণ সব এসেছে। আগ-নৌকোয় বের করে এনে মহেশ ঠাকুর সেইসব উপকরণ পুনশ্চ মিল করে দেখছেন। কোন অঙ্গে খুঁত না থাকে—মিলিয়ে দেখে তবে নিশ্চিন্ত। পাঁচ সের বাতাসা আর আড়াই সের চিনি—এই দুটো পৌঁটলায় তো? শসা হলগে এক দুই তিন চার—হ্যাঁ, দশটাই হয়েছে। দুটো নারকেল, নৈবেদ্যের পাঁচ সের আতপ-চাল। পাকা-কলা দু-কুড়ি—ইস, কলা যে পেকে উঠেছে। ডাঁসো দেখে কিনতে হয়, এত পথ আসতে আসতে পেকে ওঠে। সিঁদুর পুরো দু-বাণ্ডিল তো? অনেক কাজ সিঁদুরের, কাল দেখতে পাবে। সাতটা পিদ্‌দিম, সাতটা জলের ভাঁড়—ঠিক আছে। ধুনুচি আছে, ধুনো এসেছে তো? বেশ, বেশ! পাঁচ গজ সাদা থান—নতুন এই থান কাপড় পরে আমি পূজোয় বসব।

আয়োজন নিখুঁত। মহেশ ভারী খুশী। যেখানটা নৌকো রেখেছে, তার কয়েক হাত দূরে জলের ধারে শরবন হঠাৎ খড়খড় করে উঠল। পূজোর জিনিসপত্র নিয়ে মহেশ ব্যস্ত ছিলেন, চমকে ওঠেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়লেন। না, সে সব কিছু নয়। বাতাস কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল—এক ঝাপটা হঠাৎ এসে পড়ায় শব্দ হল অমনি। কিন্তু শরবন এত কাছাকাছি থাকবেই বা কেন? বেহুঁশ হয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে এক্ষুনি—মন্তোর পড়ে নৌকো অবশ্য চাপান দেওয়া

থাকবে—তা হলেও অজানা জায়গায় সতর্ক বেশী হওয়া উচিত।

গলুয়ে চলে গিয়ে মহেশ গাঙ থেকে একঘটি জল তুলে মাথায় ঢেলে দিলেন। জগাকে ডাকেন ঃ ওরে বাপ জগন্নাথ, তুই আর বলাই এক এক ঘটি ঢেলে নে। মুরগিটা কোনখানে রেখেছিস, বের কর।

বলাই আশ্চর্য হয়ে বলে, বল কি ঠাকুর, এখনই নামবে?

হ্যাঁ বাবা। ভেবে দেখলাম, নামা উচিত একটিবার। লণ্ঠন আর ম্যাচবাক্স নিয়ে নে। চট করে সামনের ওখানটায় আগুন দিয়ে আসি। চল্।

মুরগি লাগে বনবিবির পূজোয়। মা-কালী পাঁঠায় তুষ্ট, মা-বনবিবি তেমনি মুরগিতে। বনরাজ্যে সকলের বড় ঠাকরুন—বনে পা দিয়েই তাঁর পূজো। এ পূজোয় হাঙ্গামা কিছু নেই। পুরুত-বামুন মন্তোর-তন্তোর পাঁজির দিনক্ষণ কিছুই লাগে না। দুটো ফুল জোটাতে পার ভালই, নয় তো গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পূজো দাও। তাতেই চলবে। একটা গাছ বেছে নিয়ে খানিকটা সিঁদুর মাখাও ডালের উপর। গাছ ঘিরে দাঁড়িয়ে বল, হেই মা বনবিবি, দোয়া লাগে, দোয়া লাগে। মুরগি জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দাও বনবিবির নামে। ব্যস, হয়ে গেল পূজো।

মুরগি ছেড়ে তারপরে তারা শরবনে আগুন দিয়ে দিল। দেখতে দেখতে প্রবল আগুন। সারারাত ধরে জ্বলবে। আগুন দেখে জন্তু-জানোয়ার শতেক হাত দূরে চলে যায়। একেবারে নিশ্চিন্ত। বাতাসে বিষম জোর দিয়েছে, কাঁচা ঘাসবনও উত্তাপে শুকিয়ে পুড়তে পুড়তে যাচ্ছে। ফুলকি উড়ছে এদিক-সেদিক। এখন একটা ভয়, এই আগুন ধেয়ে এসে এসে নৌকোর উপরে ছিটকে না পড়ে। নৌকোর গুড়োয় ধরে গেলে সর্বনাশ। রাত্রি জেগে নজর রাখার প্রয়োজন। আগুন পড়লে জল ঢেলে নিভিয়ে দেবে সঙ্গে সঙ্গে। তা রাত্রি জাগবার মানুষও রয়েছে—কী ভাবনা! শশী ঘোষ নিষ্পলক চোখ মেলে নৌকোর কাড়ালে একভাবে বসে রয়েছে। ভাত খেয়ে নিল, তা-ও ঐ

একজায়গায় বসে—ঐখানে ভাত এনে দিতে হল। আর জেগে রইল ক্ষ্যাপা-মহেশ। গাঁজায় দম দিয়ে কলকের মাথায় দস্তুরমত আগুনের শিখা তুলে বম-বম রব তুলছে পহরে পহরে। সে আছে গলুয়ে। গলুই আর কাড়াল—নৌকোর ছ-মাথায় ছুই পাহারাদার। নির্ভাবনায় ঘুমাক আর যারা রয়েছে।

সাতচল্লিশ

রাত পোহাল। পোহাতে কি চায়! শশী ঘোষ কতবার তাগিদ দিয়েছে: ঝিম ধরে আছ ক্ষ্যাপা-ঠাকুর—কাককুলি ডাকছে, শুনতে পাও না? বনের দিক থেকে পাখির কলরব আসে বটে অল্পসল্প। শেষরাত্রের তরল জ্যোৎস্না দিনমান বলে ভুল করেছে। পাখিরা শশী ঘোষেরই সমগোত্র আর কি! শশীর তাড়নায় মহেশকে স্নান করতে হল পোহাতি-তারা থাকতেই। নতুন থানকাপড় পরেছে, ডগমগে সিঁছুরের ফোঁটা দিয়েছে কপালে ব্রহ্মতালুতে বুকে ছু-বাহুতে। নৌকোর অন্য সকলেও স্নান করে পরিশুদ্ধ হয়ে নিল।

শরবন সারারাত পুড়েছে। ধিকি-ধিকি জ্বলছে এখনো দূরের দিকে। ছাই ছড়ানো সমস্ত জায়গায়, ছাইয়ের নীচে আগুনও থাকতে পারে। ছাইয়ের উপর দিয়ে যাওয়া হবে না। পা পুড়ে যেতে পারে, সে এক কথা। তা ছাড়া আশাসুখে বসত বাঁধতে যাচ্ছি, ছাই মাড়িয়ে কেন যেতে যাব?

জগন্নাথ হাল ধরেছে। পাশে দাঁড়িয়ে মহেশ নির্দেশ দিচ্ছেন ঠিক কোন্ জায়গায় লাগাতে হবে নৌকোর মাথা। দৃষ্টি তাঁর কেশে-ডাঙার চরেই বটে—কিন্তু মহেশ দূরবিস্তীর্ণ কাশবন দেখছেন না, সকলের অলক্ষ্য আর কোন বস্তু ঠাহর করে দেখছেন। ঘাড় নেড়ে এক এক বার আপত্তি করে ওঠেন: না, এখানেও নয়। হুকুম হল না। এগিয়ে চল জগন্নাথ, হরগোজা-ঝাড় ছাড়িয়ে ঐ ওঁর

এলাকায় গিয়ে যদি হুকুম মেলে। ইনি তো দিলেন না, উনি যদি সদয় হন।

হরগোজা-ঝাড় পার হয়ে নতুন কার এলাকা, সদয় হয়ে যিনি নৌকো বাঁধতে দেবেন—কেউ এসব প্রশ্ন করে না। সাধারণের বোঝবার বস্তুও নয়। গুণীন-বাউলের ব্যাপার—বাদাবনের যাঁরা কাণ্ডারী। হুকুম-হাকাম যার কাছে যা নেবার, তাঁরাই নিয়ে নেবেন। বিনা তর্কে কাজ করে যাবে তোমরা শুধু।

কিন্তু খোদ গুণীনকেও বাঘে নিয়ে যায়, এমন হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। মূঢ় লোকে এই নিয়ে সংশয় তোলে। বাঘে নিয়েছে ঠিকই—কিন্তু খবর নিয়ে দেখ, সেখানে গুণীনেরই দোষ। বড় রকমের গোনাহ্ ছিল। রোজার উপর অপদেবতার রাগ—মন্তর পড়ে ধুনোবাণ সর্ষেবাণ নিক্ষেপ করে সর্বক্ষণ তাদের শাসন করে বেড়ায় বলে। বেকায়দায় ফেলবার জন্য তক্কে তক্কে থাকে। রোজাও তাই বুঝে অষ্টবন্ধন সেরে তাগাতাবিজ নিয়ে তবে বাড়ির গণ্ডির বাহিরে যায়। বন্ধনের কোন অঙ্গে দৈবাৎ ভুল হয়ে গেলে নির্ঘাত রোজার ঘাড় মটকাবে। এই বাদার ব্যাপারেও ঠিক তেমনি। বনের বাঘ জলের কুমির কিম্বা বায়ুবিহারী দানো-ঝুটোরা মুকিয়ে থাকে। পীর-ঠাকুরদের যথানিয়ম দোয়া করে আসে নি হয়তো, কিম্বা মন্তোরে কিছু ছুট হয়ে গেছে—আর তখন রক্ষে রাখবে? বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবারে ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ।

ভূঁয়ের গায়ে নৌকো বেঁধে নৌকোবন্ধন সকলের গোড়ায়। মা-কালীর দোহাই পেড়ে গলা ফাটিয়ে মহেশ চড়বড় করে মন্ত্র পড়ছেন :

> বাঘ তাড়িয়ে দাও মা, আমার নৌকোর ত্রিসীমানার মধ্যে না আসে! বাঘ এসে পড়ে যদি কোন রকম ক্ষতির কারণ হয়, কালী তুমি কামরূপ-কামিখ্যের মাথা খাবে।

মা কালীর এর পরে বাঘ না খেদিয়ে উপায় কি?

এদিক-সেদিক কাছাকাছি বাঘ আছে কিনা, তাও মহেশ ঠাকুর

বলে দেবেন মন্ত্রের জোরে ঃ

> বাঘ আমার ডাইনে যদি থাক, ডান দিকে হাঁক ছাড়; বাঁদিকে থাকলে বাঁয়ে হাঁক দাও।

মন্ত্রপাঠের পর বাঘের সাধ্য নেই মাথা গুঁজে বোবা হয়ে থাকবে। ঠিক হাঁক ছাড়তে হবে।

দেহবন্ধন হবে প্রতি জনার—দেহ ছুঁয়ে ওরা মন্দ করতে পারবে না। উল্টো রকমে আবার বাঘের চোখ বন্ধ করার কায়দাও আছে। ধূলো-পড়া। ধূলো পড়ে বাঘের মাথায় ছুঁড়ে মার। বাঘ দৃষ্টি হারাবে, অন্ধ হয়ে গিয়ে পালাতে দিশা পাবে না। আবার নিদ্রাবতীর দোহাই পেড়ে ঘুম পাড়ানো যায় বাঘকে ঃ

> বাঘের চোখে নিদ এনে দাও মা নিদ্রাবতী। কালী আমার ডাইনে, দুর্গা আমার বাঁয়ে। কালীর সন্তান আমি—হেলা করলে টের পাবে মজা।

বনের যেখানে বাঘ থাকুক মন্ত্রের সম্মোহনে ঢলে পড়বে।

বাঘের হামলায় বুক কাঁপে যদি তারও ব্যবস্থা আছে। মুখ-বন্ধনের মন্ত্র। মাড়ি এঁটে যাবে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুবে না বাছাধনের।

চালাক বাঘ থাকে, তারা মন্ত্র কাটান দিতে জানে। ডাইনে বন্ধ করলে তো বাঁয়ে ঘুরল। বাঁয়ে বন্ধ করলে তো ডাইনে। এদের নিয়েই বিপদ। মাটি গরমের মন্ত্র ছেড়ে দেবে তখন। যেখানে যেখানে বাঘ পা ফেলছে—মাটি নয়, যেন অগ্নিকুণ্ড। বিপন্ন বাঘ গাঙে খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ের জ্বালা জুড়াবে।

মন্ত্র পড়ছে ক্ষ্যাপা-মহেশ। একেবারে ভিন্ন মানুষ এখন। ভয় করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। মন্ত্রের কথা জ্বলন্ত তুবড়ির মত মুখগহ্বর থেকে যেন ছিটকে বেরোয়। অশ্লীল আর অসভ্য। মানমেলার ভদ্রমানুষ কানে আঙুল দেবে। কিন্তু মিনমিনে ভদ্র-বাক্যের কতটুকু জোর। মন্ত্রের কথার আগুন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেন চোখের উপরে।

নৌকোয় কাজ শেষ হয়ে গিয়ে এইবারে ডাঙায় নামছে। মহেশ প্রথম পা ঠেকালেন। পীর-দেবতার পূজো—একটি ছুটি নন, গুণতিতে পনের। চলল সকলে গুণীন মহেশের পিছন ধরে। কোন ভয় নেই। কি গো শশী ঘোষ, তুমি করেছিলে এ সব? কক্ষনো না। কর নি বলেই তো ওঁদের কোপ-নজরে পড়লে। যথাসর্বস্ব গেল।

পূজোর জায়গা পছন্দ কর। গাঙ থেকে অনেকখানি দূরে—জয়াল নিয়ে ধ্বসে না পড়ে যেন গাঙের গর্ভে। যতদিন মানুষের ঘরবসত, ঐ পূজাস্থানও থাকবে ততদিন। একটা গাছ চাই সেখানে, পূজোর মধ্যে গাছের ব্যবহার আছে। অন্য গাছপালা কেটে ঘাসবন তুলে জায়গা সাফসাফাই কর। মহেশ একটা ডাল ভেঙে নিয়ে জায়গাটুকু বেড় দিয়ে বৃত্তাকারে দাগ কেটে নিলেন। গণ্ডি। দাগের উপর দিয়ে মহেশ ঠাকুর সবেগে চক্কোর দিচ্ছেন, আর মন্ত্র পড়েন তড়বড় করে:

> গণ্ডি আঁকলাম ভূয়ে। মৌচাকের মতন। দোনো ভুধ দেও পরী আছ তোমরা তের হাজার। সবাই গণ্ডির বাইরে থাকবে। বাঘ যদি গণ্ডিতে ঢুকে উৎপাত কর তো কামরূপ-কামিখ্যের মাথা খাও।
>
> উপরে আকাশের মেঘ, আর নীচে মাটির গণ্ডি—এই হল আমার সীমানা। আশি হাজার বাঘ শুয়োর জিনপরী আছ, সবাই সীমানার বাইরে থাকবে। ভিতরে এস তো দেবীর রক্ত খাও।
>
> কালী কপালিনী, আমি তোমার ছেলে। এই গণ্ডি আঁকলাম। অন্ধকারে তুমি ঘিরে থাকবে আমায়। আর আমার এই লোকজনদের (বাঁ-হাত ঘুরিয়ে মহেশ দেখিয়ে দেয় সকলকে)। রামের মুখের এই বাক্য।
>
> রামের ধনুক ওপারে। এপারে রামের গণ্ডি। মন্তোর না খাটে তো মহাদেবের শির যাবে।

গণ্ডি ঘেরা হল তো গণ্ডির ভিতরে পূজোর ব্যবস্থা এবারে। মেয়েরা ভোগ সাজাও। মরদেরা ঘর বাঁধ, নিশান পোঁত। বাচ্চাটাকে নামিয়ে রাখ অন্নদাসী। নির্ভাবনায় কাজ করে যাও, এই গণ্ডি পার হয়ে আসবে হেন সাধ্য বনের বাসিন্দা কারো নেই। লতাপাতা

ডালপালা দিয়ে ঘর বানিয়ে ফেল ছোট ছোট। গুণতিতে সাতটা। বাঁধাধরা নিয়ম রয়েছে। এই ডান দিক দিয়েই ধর—পয়লা ঘর জগন্নাথের। পাশে মহাদেবের। ঘরের চার কোণে নিশান পুঁতে দাও চারটে করে। সেই যে গবানের লাঠির মাথায় লাল কাপড়ের নিশান বেঁধে রেখেছ। ঘরের সুমুখে পিদিম জ্বাল, বাতাসা শশা আর চাল-কলা দিয়ে ঠাকুরের ভোগ সাজিয়ে রাখ।

হয়ে গেল। পরের ঘরে মনসাঠাকরুন। ভোগ সাজাবে আগেকার মত। কিন্তু মাটির পাত্রে নয়, কলাপাতার উপর। বিধি এই রকম। বাড়তি এখানে চাই পূর্ণকুম্ভ ও আম্রপল্লব। আর নারকেল একটা। পূর্ণকুম্ভের উপর সিঁদুর দিয়ে মা-মনসার ছাঁদ একে দেবে।

এর পরে ঘর নয়—মাটি তুলে একটু ভিটের মতন গাঁথা। রূপ-পরীর থান। রূপ ঝলসে ঘুরঘুব করেন তিনি, ঘরের মধ্যে ঢুকে সুস্থির হয়ে পূজো নেবার ধৈর্য নেই। মুক্ত আকাশের নীচে বড় জোর এক লহমা থমকে দাঁড়াবেন। ফাঁকায় তাই পূজোর ব্যবস্থা। এখানেও মাটির পাত্র নয়, কলাপাতায় ভোগ।

ভিটের বাঁয়ে আবার ঘর। তুই দেবী এক ঘরে—তাই ঘর একটু বড়-সড় করতে হবে। মা-কালী আর কালীমায়া। কালীমায়া হলেন মা-কালীর বেটী। ঘরের চার কোণে লাল নিশান—ভিতরে তু-দিকে তুই দেবীর ঠাঁই। পূর্ণকুম্ভ বসাবে মুখে আম্রপল্লব দিয়ে। কালীমায়ার ঘটে সিঁদুরের নারীমূর্তি, হাতে লাঠি। মহাদেবের যে ভোগ, এঁদেরও ঠিক ঠিক তাই। কর্তার যা ভোগ, মা-মেয়ের তার চেয়ে কোন অঙ্গে কমতি হবে না। বরঞ্চ বাতাসার পরিমাণ বেশী দেবে কালীর ভোগে। মিষ্টিটা পছন্দ করেন বোধ করি মা-জননী।

আবার ভিটে—ওড়পরীর থান। বাদাবন ব্যেপে ওড়পরী উড়ে উড়ে বেড়ান। ভোগের বিধান অবিকল রূপপরীর মতন।

তার পরে লম্বাটে বড় আকারের ঘর। তুই দেবীর ঠাঁই একসঙ্গে এখানেও। কামাখ্যা আর বুড়ীঠাকরুন। এই বুড়ীঠাকরুনটি কে, শাস্ত্র-পুরাণে হদিস মেলে না। তবু পূজো পেয়ে আসছেন।

গাছ এইবারে। মহেশঠাকুর সেই যে গাছ রেখে দিতে বলেছিলেন। সিঁদুর লেপেছে গাছের গুঁড়িতে। গাছ আর নন এখন। রণচণ্ডী। রণচণ্ডীকে ভোগ দিতে হয় না, তাঁর নামে পূজো নেই।

'পর পর দুটো ঘর এবারে। ঘরের চার কোণে লাল নিশান উড়ছে। প্রতি ঘর দুই কামরায় ভাগ করা। গাজি কালু দুই ভাই —দুই পীরের আসন পড়েছে প্রথম ঘরে। পরের ঘর ছাওয়ালপীর ও রণগাজির। ছাওয়ালপীর হলেন গাজির ছেলে, আর রণগাজি ভাইপো। গাজি-কালুর বিষম কেরামত বাদাবনে। বাঘ তাঁদের হুকুমের গোলাম, বাঘের সওয়ার হয়ে এ-বনে সে-বনে ছুটে বেড়ান। জঙ্গলে ঢুকে আর হিন্দু-মুসলমান নেই। যেই হও, গাজির দোহাই দেবে, পীরদের তুষ্ট করবে। পাঁচটা করে মাটির ঢেলা লাগে পীরের পূজোয়। পিদ্‌দিম জ্বালবে। চিনি-বাতাসা-নারকেলের ভোগ তো আছেই।

সর্বশেষ বাস্তুদেবতা। ঘর লাগবে না, ফাঁকা জায়গায় তাঁর থান। ভোগ কলাপাতায়।

দেবতা-পীর এতগুলি পাশাপাশি—এক পুরুত বা এক ফকিরে পূজো করে যাচ্ছেন। পূজো করলেন ক্ষ্যাপা-মহেশ। মন্ত্র সংস্কৃত কিম্বা আরবী নয়, গ্রাম্য ছড়া। ফুল জোটাতে পার ভাল—নইলে বনবিবির বেলা যেমন হল, পাতালতা ছিঁড়েই পূজো। মানখেলার দেবতাগোসাঁইর মতন এঁদের অত বায়নাক্কা নেই। পূজো সেরে নির্ভাবনায় চরে বেড়াও জঙ্গলে। গাছ কাট, মৌচাক ভাঙ, আবাদ কর, ঘর বাঁধ। পূজোয় যদি ভুলচুক না হয়ে থাকে আর মনে ভক্তি-ভাব থাকে, কেউ ক্ষতি করতে পারবে না তোমার। যেখানেই থাক সাতটা দিন অন্তর কেবল এই পূজাস্থানে এসে গড় করে যেও। পীর-দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে যেও।

সাঙ্গ হতে বেলা দুপুর। নিখুঁত পূজো হয়েছে। কোন রকম

বাগড়া আসে নি বনের দিক থেকে। পীর-দেবতা অতএব প্রসন্ন। মনের স্ফূর্তিতে আবার সবাই নৌকোর উপর উঠল। মিঠাজলের জায়গা দেখে এসেছে, বালি সরিয়ে জল নিয়ে এসেছে এক কলসি। নৌকোর উপর রাঁধাবাড়া এখন, নৌকোয় খাওয়া। শশী ঘোষের আমলের ভিটে আছে, তার উপরে একখানা ঘর তুলে নেবে। সেই ক'দিন নৌকোর উপর বাস। খানিকটা গুছিয়ে আরও লোকজন আনতে যাবে। কত লোক মুকিয়ে আছে, খবর পেলে হুড়মুড় করে এসে পড়বে। বসতি জমজমাট হবে।

খাওয়াদাওয়া হতে হতে বেলা ডুবে গেল। ভালই হল—দিনের খাওয়া রাতের খাওয়া একপাকে। বারম্বার ঝামেলা করতে হবে না। অধিক রাত্রে কারো যদি ক্ষিধে পায়, পূজোর প্রসাদ রয়েছে। ভাবনা নেই।

আকাশে একটু চাঁদ দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যা জ্বালল চারুবালা। ছইয়ের বাইরে এসে প্রদীপ হাতে ডালির উপর দাঁড়িয়ে বনের দিকে ঘুরিয়ে সন্ধ্যা দেখায়। অন্নদাসী মুখ ফুলিয়ে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে তখন। শঙ্খ অবধি নিয়ে এসেছে চারুবালা। আচ্ছা গোছানি মেয়ে।

শশী ঘোষ বলে ওঠে, আমরা কত কাল কাটিয়ে গেছি। এসব কখনো করি নি। খেয়ালই হয় নি।

মহেশ বলেন, মেয়েলোক নইলে হয় না। নিয়ে এসেছিলে তুমি হুটকো জোয়ান কতকগুলো। গৃহস্থবাড়ির রীতকর্ম কী তারা জানে, আর কী করবে! এসেও ছিলে ঘরবসত করতে নয়, বনের ধন লুঠপাট করতে। মতলব খারাপ। বনও তাই তাড়িয়ে তুলল।

সমুদ্র নতুন ছেড়েছে এই জায়গাজমি। বালু আর বালু। আর কাশবন। গাছগাছালি দু-চারটে মাঝে মাঝে। কাঁচা বাদাবন অনতিদূরে—থাবার পর থাবা ফেলে ধীরে ধীরে সেই বন এগিয়ে আসছে। গ্রাস করবে চরের জায়গা। সে বনের জীবজন্তুরা নির্ভাবনায় বেরিয়ে এসে এখানে চরেফিরে বেড়ায়। সমুদ্রের হাওয়া নিশিদিন হুটোপাটি করে, কাশবনে ঢেউ ওঠে সমুদ্র-জলে ঢেউ ওঠার মতন।

এবারে মানুষ এসে চাপল—বন কেটে বসত গড়বে যেসব মানুষ। পায়ের নীচে বালুমাটি, যে মাটি এক মুঠো ফসল দেয় না। সুমুখ-পানে বনের গাছগাছালি, যে গাছ একটা খাদ্যফল দেয় না। পিছনে দিগ্‌ব্যাপ্ত নোনা জল, যে জল মুখে ঠেকানো চলবে না।

মজা জমে আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে। বালির নীচে অমৃতের ধারা। বালি খানিকটা সরিয়ে ফেল, মিঠা জল এসে জমবে। আঁজলা ভরে তুলে খাও। খাও যত খুশি, গায়ে ছিটাও। দেহ শীতল হবে, মন আরামে ভরবে। অরণ্য নিষ্ফলা কিন্তু বনলক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডার ঐ অরণ্যের ভিতর। খালপথের দু'ধারে গোলঝাড়। গোল-পাতা কেটে কেটে গাদা কর, লোকে ঘর ছাইবে। দিক্‌চিহ্নহীন পাতিবন কোন এক মোহানার উপর—পাতি কেটে চরের উপর শুকাতে দাও, লোকে মাদুর বুনবে। কাঠ কত রকমের—সুন্দরী, বান, পশুর, ধোন্দল, কেওড়া, গরান, গেঁয়ো, গর্জন, হেঁতাল, সিঙড়, গড়ে, কাঁকড়া, খলসি, ভাঁড়ার, করঞ্জ, হিঙে—গাছের কি অন্ত আছে! গাছ কেটে বোঝাই কর নৌকো। বড়দলে নিয়ে তোল পুরো দিবা-রাত্রে দুই জোয়ার ও সিকি ভাঁটি বেয়ে। অথবা চোত-বোশেখে মউল হয়ে মৌমাছির পিছন ধরে ছোট। চাক বেঁধেছে গাছের ডালে ডালে—মধুতে টলমল করছে, কাচের মতন রং। ধামা ভরে চাক কেটে আন, নৌকো বেয়ে হাটে নিয়ে তোল। অভাব কি তোমার! চাল-ডাল, পান-তামাক, কাপড়-চোপড় কেনো। ঐশ্বর্যের বন, শান্তির বন, আরামের বন। দায়ে পড়েই বনের বাইরে আসা; যেইমাত্র দায় চুকল, বনের ভিতর ঢুকে পড় আবার। মাছ যেমন দুটো-পাঁচটা আকালি করে পলকের ভিতর জল-তলে চলে যায়; মাছের আর নিশানা মেলে না।

বনের বাঘ, জলের কুমির, গাছের পাখপাখালি, অগুন্তি আরও কত রকমের বনের বাসিন্দা—এরাই এবারে নতুন পড়শী। চেনা-জানা করে নাও পড়শীদের সঙ্গে। মানুষ পড়শী তো জেনে এলে এতকাল, এদের গতিক বোঝ এইবারে। ডালে জড়িয়ে কোথায়

সাপে দোল খাচ্ছে, সবুজের এক-মিশাল—সবুজ লতাই ঝুলছে যেন হাওয়ায়। কাছে গিয়েছ কি টুক করে আদর করে দেবে। ছটফটিয়ে মর সেই চুম্বনের জ্বালায়।

হরিণ কাছে ডাকবে তো নিজে তুমি গাছের মাথায় চড়, গাছে চড়ে বানর হও। কু-উঁ-উঁ—বানরের ডাক ডাকবে, মানুষের গলা না বেরোয়। মানুষ বুঝলে হরিণ পালাবে। বনে এসে পড়েছ তো বনের জীব তুমি, মানবেলায় ফিরলে তখন মানুষ।

নিরিখ করে দেখ, হেঁতাল-ঝোপের আড়ালে বুঝি চকচকে দুটো চোখ। মানুষের এলাকা ছেড়ে এদেরই এলাকায় তুমি এখন। একনজরে তাকিয়ে আছে। ভাব বুঝে নিচ্ছে। বাঘ বলে ভয়ের কী আছে! কাপুরুষের যম হল বাঘ, শক্তসমর্থকে বাঘ রীতিমত ডরায়। পিঠ ফিরিও না খবরদার—মুখোমুখি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। ঝোপের বাইরে এসে সামনের পা ভেঙে তখন বাঘও মুখোমুখি বসল। ডোরাকাটা হলদে দেহ—কী সুন্দর, কী সুন্দর—বিজলী-ডুরে পরে যেন সাজ করে এসেছে। অর্-র্-র্ আওয়াজ করছে, লালা ঝরছে গালের কষ বেয়ে। চোখে চোখ রেখে হাতের লাঠি দমাদম জঙ্গলে পেটাও। বাঘও ঠিক অমনি লেজের ঝাপটা দিচ্ছে মাটিতে। চেঁচাও জোরে—টগবগ করে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মত গালি দিয়ে যাও অবিশ্রান্ত। ছেদ না পড়ে। তার যে আওয়াজ, তার দুনো তেদুনো গর্জন তোল। বাঘের মুখে পড়ে তুমিও আর এক বাঘ হয়ে গেছ। বাঘ তখন অবহেলার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে শরবনের মধ্যে ঢুকে পড়বে, ফিরেও তাকাবে না আর তোমার পানে।

বনবিবির আদরের দুলাল বাঘ—গাজি-কালু যার পিঠে সওয়ার হয়ে বন-বনান্তরে ঘোরেন। বাঘ নইলে আবার বাদা কিসের! বাঘ মেরে সদরের কর্তাদের দেখালে মোটা বখশিশ। কিন্তু পুরোপুরি বাঘটা সেই সদর অবধি নিয়ে হাজির কে করতে পারে? বনের মানুষ তোমায় নিতে দেবে না। বাঘের যে বিস্তর গুণ! মরা বাঘের জিভটা টেনে উপড়ে নেবে তারা সকলের আগে। পেট-জোড়া প্লীহা ফুলে

ধামার মত হয়েছে—কণিকাপ্রমাণ জিভ কলার মধ্যে পুরে খাইয়ে দাও। আর নয় তো জিভের টুকরা শিলে বেটে হুঁকোর জলে মিশিয়ে খাওয়াও সাতটা দিন। প্লীহা শুকিয়ে মোটা পেট চিটে হয়ে যাবে। বাঘের গোঁফও অব্যর্থ ওষুধ—মানুষের নয়, গরু-ছাগলের। কয়েক-গাছি গোঁফ ন্যাকড়ায় বেঁধে পায়ে ঝুলিয়ে দাও, গায়ের ও মুখের ঘা সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন। বাতে শয্যাশায়ী তো বাঘের চর্বি মালিশ কর, খোঁড়া মানুষ তড়াক করে শয্যা ছেড়ে উঠবে। বাঘের চামড়া চোখ ওঠার ওষুধ। চামড়া পুড়িয়ে হুঁকোর জলে মিশিয়ে কাদা-কাদা করে প্রলেপ দাও, চোখ সেরে যাবে। বাঘের নখ রুপোয় বাঁধিয়ে ছেলেপুলের কোমরে ধারণ করাও, আপদ-বিপদের দায় নিশ্চিন্ত। কোন রকম দোষদৃষ্টি পাবে না সেই ছেলে। বাঘও যদি লাফ দিয়ে তার ঘাড়ের উপর পড়ে, দাঁত বসাতে পারবে না।

খেয়েদেয়ে মরদ ক'জন পাছ-নৌকোয় গোল হয়ে বসেছে। পান-তামাক চলছে। বন হাসিলের কথা উঠল। সেই একবার যা নিয়ে শশী ঘোষ চেষ্টাচরিত্র করেছিল।. বনই জিতে গেল। শেষ পর্যন্ত যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে বন ছেড়ে পালাল শশী। সেই কাহিনী সে সবিস্তারে বলছিল। সেবারের ত্রুটি আর না ঘটে।

জগার কানে যেতে সে রে-রে করে ওঠে: তোমার মতন আমরা তো ঝগড়া করব না বনের সঙ্গে। বন থাকবে। বনের বাঘ থাকবে। বাঘ না থাকলে বাবুরাই সব জুটবে এসে। নগনা আসবে, টোনি-চক্কোত্তি আর প্রমথ নায়েব আসবে। হাওয়াগাড়ি চড়ে অনুকূল চৌধুরিও আসবে পিছন ধরে। ওদের যে রীতপ্রকৃতি, তার কাছে অনেক ভাল বনের বাঘ।

আজকে প্রথম দিনেই সেই ভাবনা মনে ঢুকেছে। বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে এসেছে কিনা জগন্নাথ! কেশেডাঙার চরে মানুষ আসে না একটি। জনমজুর মেলে না। টাকার লোভ দেখিয়ে শশী এনেছিল কয়েকজনকে। কিন্তু টেঁকে না, পালিয়ে যায়। পশুপক্ষীর

জায়গা—মানুষ থাকবে তো অর্ধেক পশু হয়ে থাকতে হবে এখানে। সেইজন্য বিনি-খাজনার বন্দোবস্ত। কাশবনের চর আর চরের কিনারায় জঙ্গল উত্তরের একটা সরু খাল অবধি। সেই খাল হল ওদিকের সীমানা। জমি সাফসাফাই করবে, বাঁধ বাঁধবে, সাদা বালির নীচে উর্বর কালো মাটি আবিষ্কার করবে—এত শ্রমের পর আবার নগদ খাজনা গণতে হলে পারবে কেন? ধরাপাড়া করলে দয়াবান মালিকই বরঞ্চ সামান্য সুদে দু-দশ টাকা নগদ ছাড়তে পারেন এই মানুষগুলোর খোরাকির জন্য।

পাঁচ বছর না হোক দশ বছর পরে, না হয় পঁচিশ বছর পরে—এক-দিন তো মানুষ এসে পড়বে। ঐ যে-কথা বলল— দলে দলে আসবে ভাল ভাল বড় বড় মানুষ। তখন আবার পথ দেখতে হবে আমাদের, এই যত গোড়ার মানুষ এসেছি। ভাবে জগা, আর হাসে খলখলিয়ে। মানুষই তো এক রকমের বাঘ। গোবাঘা আছে, তেমনি মানুষ-বাঘা। সেই কোন্ মুলুকে জন্মেছিল, মানুষবাঘা তাড়াতে তাড়াতে কোথায় তাদের নিয়ে এসেছে! একেবারে দরিয়ার কিনারে।

বনের বাঘ মানষেলায় যায় না, মানুষবাঘাও তেমনি সহজে আসতে চায় না এইসব দুর্গম বনজঙ্গলে। সেইটে বড় বাঁচোয়া। সেইজন্য বোকাসোকা জগাদের প্রয়োজন। বন কেটে এরা বসত বানায়। পুরোপুরি বানানো হয়ে গেলে তারপরে দলকে দল বড়দরের মানুষরা এসে পড়েন। ভাল ভাল দালানকোঠা হয়। ভারী ভারী মহাজনী নৌকো—এবং ক্রমশ ধোঁয়াকল-স্টীমার দেখা দেয় জলে। ঝনঝন টাকাপয়সা বাজে। ভাল রাস্তাঘাট হয় জুতা-পায়ে বাবুদের চলাচলের জন্য। ঠেলা খেয়ে এরা চলে যায় আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে। হেজেমজে মরে কতক। গগন দাসের মত এককালের দুঃখ-সুখের সাথী কতজনে ভিড়ে যায় বড়দের সঙ্গে। আর যারা নিতান্তই জগাদের মতন, নতুন জায়গার তল্লাসে আবার তারা বেরিয়ে পড়ে।

অথই কালাপানি সামনে—একবেলার পথও নয়। জগা ভাবে:

এখান থেকে তাড়া খেয়ে—আর তো ডাঙাজমি নেই, তখনকার কী উপায় ? জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে ? কালাপানির পারেও নাকি ডাঙা আছে, শোনা যায়। কিন্তু সাঁতরে যাওয়া যায় না। ডিঙি-নৌকোও ডুবে যায়। জাহাজ লাগে। সে হল মবলগ টাকার ব্যাপার—বান গাছের খোলে সঞ্চয় করে-রাখা ঐ কটা টাকায় কুলায় না। ভারী ভারী ডাকাতি আর খুন-খারাবি করলে সরকার নিজ খরচায় জাহাজে করে নিয়ে যেত সেই কালাপানির পার। এখন নাকি বন্ধ হয়ে গেছে। দিনকে-দিন কী অবস্থা—সব পথে কাঁটা পড়ে গেল। ক্ষ্যাপা-মহেশের ধরায় তো কেশেডাঙায় এসে পড়ল, কালাপানি পারের জন্য আবার একদিন কোন্ কায়দা ধরতে হবে, কে জানে ?

—শেষ—